প্রথম অধ্যায়

কোষ ও এর গঠন

CELL AND ITS STRUCTURE

প্রধান শব্দসমূহ : কোষ, ক্রোমোসোম, DNA, RNA, জিন, ট্রান্সক্রিপশন।

মাধ্যমিক পর্যায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ, কোষের গঠন এবং বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ সম্বন্ধে তোমরা পড়েছ। এ অধ্যায়ে বিশেষ করে উদ্ভিদকোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুসমূহের অবস্থান, গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. কোষ প্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন এর অবস্থান, রাসায়নিক গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
২. সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং বিপাকীয় ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
৩. রাইবোসোম, গলগিবস্তু, লাইসোজোম, সেন্ট্রিয়োল-এর অবস্থান, গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
৪. গঠন ও কাজের ভিত্তিতে মসৃণ ও অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
৫. মাইটোকন্ড্রিয়নের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে এর কাজের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. ক্লোরোপ্লাস্টের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে এর কাজের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮. নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৯. কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
১০. জীবের বিভিন্ন কার্যক্রমে কোষের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।
১১. ক্রোমোজোমের গঠন ও এর রাসায়নিক উপাদান বর্ণনা করতে পারবে।
১২. কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১৩. ডিএনএ ও আরএনএ গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৪. আরএনএ এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫. ডিএনএ রেপ্লিকেশনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৬. ট্রান্সক্রিপশনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৭. ট্রান্সলেশন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৮. জিন ও জেনেটিক কোড বর্ণনা করতে পারবে।
১৯. বংশগতীয় বস্তু হিসেবে ডিএনএ এর অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।

Cell (সেল) নামকরণ : Robert Hooke (1635-1703) ১৬৬৫ সালে রয়েল সোসাইটি অব লন্ডন এর যন্ত্রপাতির রক্ষক নিযুক্ত হয়েই ভাবলেন আগামী সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সামনে একটা ভালো কিছু উপস্থাপন করতে হবে। তিনি ভাবলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একটা কিছু করা যায় কিনা। তিনি দেখলেন কাঠের ছিপি (cork) দেখতে নিরেট (solid) অথচ পানিতে ভাসে, এর কারণ কী? তিনি ছিপির একটি পাতলা সেকশন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি সেখানে মৌমাছির চাকের ন্যায় অসংখ্য ছোট ছোট কুঠুরী বা প্রকোষ্ঠ (little boxes) দেখতে পেলেন। তখন তাঁর মনে পড়লো আশ্রমে সন্ন্যাসীদের বা পাদ্রিদের থাকার জন্য এমন ছোট ছোট Cell (প্রকোষ্ঠ) তিনি দেখেছেন। এ থেকেই ছিপির little box গুলোকে তিনি নাম দেন Cell বা প্রকোষ্ঠ। ল্যাটিন *Cellula* শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরী। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ **Micrographia** গ্রন্থে প্রকাশ করেন। জেলখানায় কয়েদিদের জন্য নির্মিত ছোট ছোট প্রকোষ্ঠকেও সেল বলা হয়। অধিকাংশ কোষই আণুবীক্ষণিক, খালি চোখে দেখা যায় না। তবে এর কিছুটা ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। পাখির ডিম একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। হাঁস-মুরগির ডিম খালি চোখেই দেখা যায়। উটপাখির ডিম সবচেয়ে বড় (17 × 12.5 cm)। তুলা বা পাটের আঁশ, তালগাছের আঁশ বেশ লম্বা, খালি চোখে দেখা যায়। মানুষের নিউরন কোষ প্রায় 1.37 মিটার লম্বা। Cell-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে কোষ বা জীবকোষ। Cell অর্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। রবার্ট হুক প্রকৃতপক্ষে মৃত কোষ তথা কেবল প্রকোষ্ঠই দেখেছিলেন। পরে ডাচ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, লক্ষ কর একটা ভালো কিছু করার ইচ্ছা ও চেষ্টা থেকেই কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব।

(Antony Van Leeuwenhoek) প্রথম ১৬৭৪ সালে কোষ প্রাচীর ছাড়াও ভেতরে পূর্ণাঙ্গ কোষীয় প্রবাসহ জীবিত কো পর্যবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী কোষের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

- **Jean Brachet** (1961) এর মতে- 'কোষ হলো জীবের গঠনগত মৌলিক একক।'
- **Loewy Siekevitz** (1963) এর মতে- 'কোষ হলো জৈবিক ক্রিয়াকলাপের একক যা একটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং যা অন্য কোনো সজীব মাধ্যম ছাড়াই আত্ম-জননে সক্ষম।'
- **De Roberties** (1979) এর মতে- 'কোষ হলো জীবের মৌলিক গঠনগত ও কার্যগত একক।'

সেল (Cell) তথা কোষের বৈশিষ্ট্য

১। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গাঠনিক ও আণবিক উপাদান কোষে থাকে।

২। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভেতরে গ্রহণ করতে পারে।

৩। কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে পারে এবং নিজের প্রয়োজনীয় অণুগুলোকে সংশ্লে করতে পারে।

৪। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

৫। চারপাশের যে কোনো উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে পারে।

৬। একটি Homeostatic অবস্থা (অর্থাৎ পরিবেশের অবস্থার তারতম্যের মাঝেও অভ্যন্তরীণ স্থিতি অবস্থা) বজা রাখতে পারে।

৭। কাল পরিক্রমায় অভিযোজিত হতে পারে।

প্রতিটি জীবদেহ এক (এককোষী জীব) বা একাধিক (বহুকোষী জীব) কোষ দিয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ কোষই জীবদেহে গঠন একক। আবার কোষের ভেতরই জীবের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈবিক কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বলে।

কোষীয় অঙ্গাণু (Cell organelles): কোষের সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান জীবন্ত, কার্যসম্পাদনকারী ও কোষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য ক্ষুদ্রাঙ্গসমূহকে কোষীয় অঙ্গাণু বলে; যেমন-মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম ইত্যাদি। অঙ্গাণু অর্থ ক্ষুদ্র অঙ্গ (organelles)।

এখানে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট একটি প্রাণিকোষের লম্বচ্ছেদের চিত্র দেয়া হলো। চিত্রটি ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং পূর্বে আহরিত জ্ঞানের আলোকে পুনরায় এর গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গাণুর অবস্থান ও বাহ্যিক গঠন মিলিয়ে নাও। ৫নং পৃষ্ঠায় দেয়া উদ্ভিদকোষের চিত্রটির সাথে মিলিয়ে এদের মধ্যকার পার্থক্য লিপিবদ্ধ কর।

চিত্র ১.১ : একটি আদর্শ প্রাণিকোষ (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট)।

কোষবিদ্যা (Cytology) : জীববিদ্যার যে শাখায় কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ কোষের প্রকার, অঙ্গাণুর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন, বিভাজন, বিকাশ, জৈবিক কার্যাবলি, বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি (Cytology) বলে। সাইটোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দের *Kytos* (= cell, ফাঁপা) এবং *logos* (= discourse, আলোচনা) সমন্বয়ে গঠিত। Robert Hooke (1635–1703) কে কোষবিদ্যার জনক বলা হয়। তবে আধুনিক কোষবিদ্যার জনক হলো Carl P. Swanson (1911–1996)।

কোষতত্ত্ব (Cell Theory) : কোষ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার পর ১৮৩৮-১৮৩৯ সালে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী শ্লেইডেন (Mathias Jakob Schleiden) ও প্রাণিবিজ্ঞানী থিওডোর সোয়ান (Theodor Schwann) এবং পরে ১৮৫৫ সালে ভারচু (Rudolf. Virchow) 'কোষতত্ত্ব' প্রদান করেন, যাতে বলা হয়–

১. কোষ হলো জীবন্ত সত্তার গাঠনিক, শারীরবৃত্তীয় ও সাংগঠনিক একক।

২. কোষ হলো জীবনের মৌলিক একক।

৩. কোষ বংশগতির একক।

৪. সর্বপ্রকার জীবই এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত এবং পূর্বসৃষ্ট কোষ থেকেই নতুন কোষের সৃষ্টি হয়।

কোষের প্রকারভেদ (Kinds of Cell) :

(১) শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিত্তিতে কোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

(ক) দেহকোষ (Somatic Cell) : জীবদেহের অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠনকারী কোষকে দেহকোষ বলে। উচ্চ শ্রেণির জীবের দেহকোষে সাধারণত ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মূল, কাণ্ড ও পাতার কোষ, স্নায়ু কোষ, রক্তকণিকা ইত্যাদি দেহকোষের উদাহরণ।

(খ) জননকোষ বা গ্যামিট (Reproductive Cell or Gamete) : যৌন প্রজননের জন্য ডিপ্লয়েড জীবের জননাঙ্গে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হ্যাপ্লয়েড কোষকে জননকোষ বলে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জননকোষের উদাহরণ। জননকোষ বা গ্যামিট সর্বদাই হ্যাপ্লয়েড।

(২) নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

(ক) আদিকেন্দ্রিক কোষ বা আদি কোষ (Prokaryotic Cell) : যে কোষে কোনো আবরণীবেষ্টিত নিউক্লিয়াস, এমনকি আবরণীবেষ্টিত (membrane-bound) অন্যকোনো অঙ্গাণুও (organelles) থাকে না তা হলো **আদি কোষ**। আদি কোষে নন-হিস্টোন প্রোটিনযুক্ত একটি মাত্র বৃত্তাকার DNA থাকে যা সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে অবস্থান করে। আদিকোষে বৃত্তাকার DNA যা মুক্তভাবে ছড়ানো থাকে তাকে নিউক্লিঅয়েড (Nucleoid) বলে। এদের রাইবোসোম 70S। আদি কোষ দ্বি-ভাজন বা অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। আদি কোষ দ্বারা গঠিত জীব হলো আদিকোষী জীব (Prokaryotes)। উদাহরণ-মাইকোপ্লাজমা, ব্যাকটেরিয়া (*Escherichia coli* ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া (BGA = Blue Green Algae)। মনেরা রাজ্যের সব জীবই আদিকোষী। [গ্রিক *Pro* = before, এবং *karyon* = nut, nucleus অর্থাৎ নিউক্লিয়াস সংগঠনের আগের অবস্থা] আদিকোষে প্রবাত শ্বসন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোষণ পদ্ধতিতে পুষ্টি ঘটে। কতক ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে।

> **কাজ :** উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের পোস্টার তৈরি।
>
> **উপকরণ :** পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রং পেন্সিল, ইরেজার, উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের চিত্র।
>
> **কার্যপদ্ধতি :** বড় পোস্টার পেপার নিতে হবে। পেপারে লম্বভাবে পাশাপাশি দু'টি কোষের জন্য স্থান নির্ধারণ করতে হবে। প্রথমে পেন্সিল দিয়ে হালকাভাবে চিত্র দু'টি এঁকে নিতে হবে, প্রয়োজনে ইরেজার দিয়ে মুছে আবার আঁকতে হবে। আঁকা চূড়ান্ত হলে রং পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে। চূড়ান্তকরণের আগে অবশ্যই শিক্ষককে দেখিয়ে নিতে হবে।

(খ) প্রকৃতকেন্দ্রিক কোষ বা প্রকৃত কোষ (Eukaryotic Cell) : যে কোষে আবরণীবেষ্টিত নিউক্লিয়াস থাকে তা হলো প্রকৃত কোষ। প্রকৃত কোষে নিউক্লিয়াস ছাড়াও আবরণীবেষ্টিত অন্যান্য অঙ্গাণু (যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, গলগিবস্তু, লাইসোসোম প্রভৃতি) থাকে। দুই স্তরবিশিষ্ট একটি আবরণী (নিউক্লিয়ার এনভেলপ) দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় নিউক্লিয়োপ্লাজম, নিউক্লিয়োলাস এবং একাধিক ক্রোমোসোম নিয়ে নিউক্লিয়াস গঠিত। প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোম দণ্ড (বৃত্তাকার নয়), দুই প্রান্তবিশিষ্ট এবং DNA ও হিস্টোন-প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। এদের রাইবোসোম 80S, DNA সূত্রাকার এবং একাধিক ক্রোমোসোমে অবস্থিত; কোষ বিভাজন মাইটোসিস ও মায়োসিস প্রকৃতির। Eukaryotic শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ গ্রিক *eu* = good; এবং *karyon* = nucleus অর্থাৎ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ। জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট প্রকৃত কোষই প্রকৃত উদ্ভিদকোষ। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস, জিমনোস্পার্মস এবং অ্যানজিওস্পার্মস ইত্যাদি সব উদ্ভিদই প্রকৃত কোষ দিয়ে গঠিত এবং সকল প্রাণিকোষ প্রকৃত কোষ। প্রকৃত কোষ দ্বারা গঠিত জীব হলো প্রকৃতকোষী জীব (Eukaryotes). প্রকৃত কোষে সবাত শ্বসন ঘটে। শোষণ, আত্তিকরণ ও সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে পুষ্টি ঘটে।

> কাজ : শিক্ষক, শিক্ষার্থীদেরকে কমপক্ষে দু'টি দলে ভাগ করে দিবেন। শিক্ষার্থীগণ আদি কোষ ও প্রকৃত কোষের পার্থক্য পাশাপাশি ছকে লিখবেন। দুই দলের তৈরিকৃত ছকের ওপর ভিত্তি করে শেষ দশ মিনিট শিক্ষক একটি চূড়ান্ত ছক তৈরি করে দিবেন। ছক তৈরিকালে কোষের নিউক্লিয়ার বৈশিষ্ট্য, রাইবোসোম, অন্যান্য অঙ্গাণু, DNA, কোষবিভাজন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

কোষ পরিমাপের বিভিন্ন একক

অধিকাংশ উদ্ভিদ কোষ খালি চোখে দেখা যায় না। এদের দেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কোষ এবং কোষের উপাংশগুলোর পরিমাপের জন্য যে এককটি ব্যবহার করা হয় তা হলো μm (মাইক্রোমিটার) বা μ (মাইক্রন) এবং nm (ন্যানোমিটার)। নিম্নে কোষ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন একক ও এদের ব্যবহার দেয়া হলো।

একক	সংকেত	মান	ব্যবহার
১। সেন্টিমিটার	1 cm	= 0.4 inch	খালি চোখে দেখা যায় (যেমন ডিম) এমন কোষ।
২। মিলিমিটার	1mm	= 0.1 cm	খালি চোখে দৃশ্যমান, তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এমন কোষ।
৩। মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন	1μm/1μ	= 0.001 mm	আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় তেমন বেশির ভাগ কোষ ও উপাংশসমূহ।
৪। ন্যানোমিটার	1nm	= 0.001 μm	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কোষ উপাংশসমূহ।
৫। অ্যাংস্ট্রম	1Å	= 0.1 nm	ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক্সরে প্রক্রিয়ায় দেখা যায় এমন কোষ উপাংশসমূহ।

কোষের আয়তন : কোষের কোনো সুনির্দিষ্ট আয়তন নেই। অধিকাংশ কোষই আণুবীক্ষণিক। সবচেয়ে ছোট কোষ হলো- Mycoplasma যার অপর নাম PPLO (Pleuro Pneumonia Like Organism) এবং বড় কোষ হলো উটপাখির ডিম (17 × 12.5 cm)। মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা কোষ হলো- মটর নিউরন যা প্রায় 1.37 মিটার লম্বা এবং স্পাইনাল

আদর্শ উদ্ভিদকোষ

- **জড় বস্তু (পদার্থ)**
  - কোষ প্রাচীর
  - কোষস্থ নির্জীব (জড়) বস্তু
    - সঞ্চিত পদার্থ
      - কার্বোহাইড্রেট
      - প্রোটিন
      - লিপিড
    - নিঃসৃত পদার্থ
      - পিগমেন্ট
      - এনজাইম
      - হরমোন
      - নেকটার ইত্যাদি
    - বর্জ্য পদার্থ
      - রেজিন
      - ট্যানিন
      - গাম (আঠা)
      - ল্যাটেক্স
      - অ্যালকালয়েড
      - জৈব অ্যাসিড
      - উদ্বায়ী তেল
      - খনিজ পদার্থ
- **প্রোটোপ্লাজম (কোষস্থ সজীব বস্তু)**
  - কোষঝিল্লি
  - সাইটোপ্লাজম
    - সাইটোমাতৃকা (সাইটোসোল)
    - কোষীয় অঙ্গাণু
      - প্লাস্টিড
      - মাইটোকন্ড্রিয়া
      - এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম
      - রাইবোসোম
      - গলগি বডি
      - লাইসোসোম
      - সেন্ট্রোসোম
      - কোষীয় কঙ্কাল বা সাইটোস্কেলিটন
      - পারঅক্সিসোম
      - গ্লাইঅক্সিসোম
      - কোষ গহ্বর
  - নিউক্লিয়াস
    - নিউক্লিয়ার এনভেলপ
    - নিউক্লিওপ্লাজম
    - নিউক্লিওলাস
    - নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম

১.১ কোষ প্রাচীর (Cell Wall)

প্রতিটি উদ্ভিদকোষ একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত জড় আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এ জড় ও শক্ত আবরণকে কোষ প্রাচীর বলে। রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোষ দেখেছিলেন তা ছিল মূলত কোষ প্রাচীর। কোষ প্রাচীর উদ্ভিদকোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ কোষে মধ্য পর্দা এবং কোষঝিল্লির মাঝখানে জড় কোষ প্রাচীরের অবস্থান। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর আছে। এক কোষী উদ্ভিদ বা ব্যাকটেরিয়াতে কোষঝিল্লির বাইরে জড় প্রাচীরের অবস্থান।

চিত্র ১.৩ : কোষ প্রাচীরের গঠন।

ভৌত গঠন : একটি বিকশিত কোষ প্রাচীরকে প্রধানত তিনটি ভিন্ন স্তরে (layers) বিভক্ত দেখা যায়। এর প্রথমটি হলো মধ্যপর্দা (middle lamella)। মাইটোটিক কোষ বিভাজনের টেলোফেজ (telophase) পর্যায়ে এর সূচনা ঘটে। সাইটোপ্লাজম থেকে আসা ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট (phragmoplast) এবং গলগি বডি থেকে আসা পেকটিন জাতীয় ভেসিকলস্ (vesicles or droplets) মিলিতভাবে মধ্যপর্দা সৃষ্টি করে। পেকটিক অ্যাসিড বেশি থাকার কারণে এটি প্রথম দিকে জেলির মতো থাকে। কোষ প্রাচীরের যে স্তরটি দুটি পাশাপাশি কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ পর্দা হিসেবে অবস্থান করে তার নাম মধ্যপর্দা। এটি বিগলিত হয়ে গেলে দুটি কোষ পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তরটি হলো প্রাথমিক প্রাচীর (primary wall)। মধ্যপর্দার ওপর সেলুলোজ (cellulose), হেমিসেলুলোজ (hemicellulose) এবং গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoprotein) ইত্যাদি জমা হয়ে একটি পাতলা স্তর (১-৩ μm পুরু) তৈরি করে। এটি প্রাথমিক প্রাচীর। মধ্যপর্দার অন্তঃতলে এটি তৈরি হয়। কোনো কোনো কোষে (যেমন- ট্রাকিড, ফাইবার ইত্যাদি) প্রাথমিক প্রাচীরের ওপর আর একটি স্তর তৈরি হয়। এটি সাধারণত কোষের বৃদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হবার পর ঘটে থাকে। এ স্তরটি অধিকতর পুরু (৫-১০ μm)। এতে সাধারণত সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়। এটি সেকেন্ডারি প্রাচীর (secondary wall) বা তৃতীয় স্তর। ভাজক কোষ এবং অধিক মাত্রায় বিপাকীয় অন্যান্য কোষে সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হয় না। সেকেন্ডারি প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট হয়।

কূপ এলাকা (Pit fields) : এটি হলো প্রাচীরের সবচেয়ে পাতলা (thin) এলাকা। দুটি পাশাপাশি কোষের কূপও একটি অপরটির উল্টোদিকে মুখোমুখি অবস্থিত এবং কূপ দুটির মাঝখানে কেবল মধ্যপর্দা থাকে। মধ্যপর্দাকে পিট মেমব্রেন বলে। মুখোমুখি দুটি কূপকে পিট পেয়ার (pit pair) বলে। আসলে কূপ অঞ্চলে প্রাথমিক প্রাচীর গঠিত হয় না। সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হলে কূপ পাড়হীন অথবা পাড়যুক্ত (bordered pit) হতে পারে। দুটি পাশাপাশি কোষের প্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে নলাকার সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হয়। একে প্লাজমোডেসমাটা (একবচন : প্লাজমোডেসমা) বলে।

রাসায়নিক গঠন : মধ্যপর্দায় অধিক পরিমাণে থাকে পেকটিক অ্যাসিড। এ ছাড়া অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম পেকটেট এবং ম্যাগনেসিয়াম পেকটেট লবণ থাকে- যাকে পেকটিন বলা হয়। এ ছাড়াও অল্প পরিমাণে থাকে প্রোটোপেকটিন। প্রাথমিক প্রাচীরে থাকে প্রধানত সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ এবং গ্লাইকোপ্রোটিন। হেমিসেলুলোজ-এ xylans, arabans, galactans ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পলিস্যাকারাইডস থাকে। গ্লাইকোপ্রোটিনে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং অন্যান্য পদার্থ থাকে। Xyloglucan নামক হেমিসেলুলোজ প্রাচীর গঠনে ক্রসলিংক (cross-link) হিসেবে কাজ করে। অনেক সেকেন্ডারি প্রাচীরে লিগনিন (lignin) থাকে। কোনো কোনো প্রাচীরে সুবেরিন (suberin), ওয়াক্স ইত্যাদি থাকে। ছত্রাকের প্রাচীর কাইটিন এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীর লিপিড-প্রোটিন পলিমার দিয়ে গঠিত। সাধারণত কোষ প্রাচীরে 40% সেলুলোজ, 20% হেমিসেলুলোজ, 30% পেকটিন ও 10% গ্লাইকোপ্রোটিন বিদ্যমান।

সূক্ষ্ম গঠন (Ultra-structure) : কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ। সেলুলোজ হলো একটি পলিস্যাকারাইড যা ৬-কার্বনবিশিষ্ট β-D গ্লুকোজের অসংখ্য অণু নিয়ে গঠিত। এক হাজার থেকে তিন হাজার সেলুলোজ অণু নিয়ে একটি সেলুলোজ চেইন গঠিত হয়। প্রায় একশ সেলুলোজ চেইন মিলিতভাবে একটি ক্রিস্টালাইন মাইসেলি (micelle) গঠন করে। মাইসেলিকে কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক ধরা হয়। প্রায় ২০টি মাইসেলি মিলে একটি **মাইক্রোফাইব্রিল** (microfibril) গঠন করে এবং ২৫০টি মাইক্রোফাইব্রিল মিলিতভাবে একটি ম্যাক্রোফাইব্রিল (macrofibril) গঠন করে। অনেকগুলো ম্যাক্রোফাইব্রিল মিলিতভাবে একটি তন্তু (ফাইবার) গঠন করে।

কোষ প্রাচীরের কাজ : (i) কোষের সুনির্দিষ্ট আকৃতি দান করা; (ii) বাইরের আঘাত হতে ভেতরের সজীব বস্তুকে রক্ষা করা; (iii) প্রয়োজনীয় শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করা; (iv) পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহনে সহায়তা করা এবং (v) এক কোষকে অন্য কোষ হতে পৃথক করা। প্রাণিকোষে কোষ প্রাচীর থাকে না।

প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast)

কোষ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত সমুদয় পদার্থ একসাথে প্রোটোপ্লাস্ট নামে পরিচিত। উদ্ভিদকোষ, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকে জড় কোষ প্রাচীরের নিচেই প্রোটোপ্লাস্টের অবস্থান। প্রোটোপ্লাস্ট দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- সজীব প্রোটোপ্লাজম ও নির্জীব বস্তু বা অপ্রোটোপ্লাজমীয় উপাদান। নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) : কোষের অভ্যন্তরে স্বচ্ছ, আঠালো এবং জেলির ন্যায় অর্ধতরল, কলয়ডালধর্মী সজীব পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজম শব্দটি ১৮৪০ সনে বিজ্ঞানী পার্কিনজে প্রথম ব্যবহার করেন। (Gk. *proto*=আদি, *plasma* = সংগঠন অর্থাৎ আদি বস্তু)। বিজ্ঞানী হাক্সলে-র মতে প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে জীবনের ভৌত ভিত্তি। কারণ প্রোটোপ্লাজমই কোষের তথা দেহের সকল মৌলিক জৈবিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। এ জন্যই **প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।** এতে ৭০%–৯০% পানি থাকে। এ থেকেই বোঝা যায় কেন পানির অপর নাম জীবন।

প্রোটোপ্লাজমের ভৌত বৈশিষ্ট্য : (i) প্রোটোপ্লাজম অর্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন, জেলি সদৃশ অর্ধতরল আঠালো পদার্থ। (ii) এটি দানাদার ও কলয়ডালধর্মী। (iii) ইহা কোষস্থ পরিবেশ অনুযায়ী জেলি থেকে তরলে এবং তরল থেকে জেলিতে পরিবর্তিত হতে পারে। (iv) প্রোটোপ্লাজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা বেশি। (v) উত্তাপ, অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের প্রভাবে প্রোটোপ্লাজম জমাট বাঁধে।

প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : রাসায়নিকভাবে প্রোটোপ্লাজমে জৈব এবং অজৈব পদার্থ আছে। এতে সর্ব পরিমাণে আছে পানি। জৈব পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, এরপর আছে কার্বোহাইড্রে লিপিড ও ভিটামিন। এছাড়াও আছে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, কপার, জিঙ্ক, সোডিয়াম, পটাসি ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, আয়রন ইত্যাদি।

প্রোটোপ্লাজমের জৈবিক বৈশিষ্ট্য : প্রোটোপ্লাজম বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। খাদ্য তৈরি, খাদ্য গ্র আত্তীকরণ, শ্বসন, বৃদ্ধি, জনন ইত্যাদি সকল মেটাবলিক কার্যকলাপ প্রোটোপ্লাজম করে থাকে। প্রোটোপ্লাজমের জৈবি বৈশিষ্ট্যই জীবের বৈশিষ্ট্য। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজম পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। এদেরও মৃত্যু ঘটে।

প্রোটোপ্লাজমের চলন : প্রোটোপ্লাজম কখনো স্থির থাকে না। প্রোটোপ্লাজমের এ গতিময়তাকে চলন (moveme বলে। কোষ প্রাচীরযুক্ত ও কোষ প্রাচীরবিহীন প্রোটোপ্লাজমের চলনে ভিন্নতা দেখা যায়। কোষ প্রাচীরযুক্ত প্রোটোপ্ল জলস্রোতের মতো যে চলন দেখা যায় তাকে আবর্তন বা সাইক্লোসিস (cyclosis) বলে। আবর্তন আবার দু'ধরনের হ থাকে।

(i) **একমুখী আবর্তন :** যে চলনে প্রোটোপ্লাজম একটি গহবরকে কেন্দ্র করে কোষপ্রাচীরের পাশ দিয়ে নির্দিষ্ট প একদিকে ঘুরতে থাকে তাকে একমুখী আবর্তন (rotation) বলে। যেমন- পাতা ঝাঁঝির কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের চলন।

(ii) **বহুমুখী আবর্তন :** যে চলনে প্রোটোপ্লাজম কতগুলো গহবরকে কেন্দ্র করে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন দিকে ঘুর থাকে তখন তাকে **বহুমুখী আবর্তন** (circulation) বলে। যেমন- *Tradescantia*-র কোষস্থ প্রোটোপ্লাজমের চলন।

প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশসমূহ : প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস– এ তিনটি হ প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশ।

১.২ প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লি (Cell membrane)

কোষ প্রাচীরের ঠিক নিচে সমস্ত প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সজীব ঝিল্লি আছে। এ ঝিল্লিকে **কোষঝিল্লি** বল অন্যভাবে, প্রতিটি সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজম যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক, বৈষম্যভেদ্য, লিপো-প্রোটিন দ্বারা গঠিত সজী ঝিল্লী ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে, তাকে প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লি বলে। একে প্লাজমালেমা, সাইটোমেমব্রেন এস নামেও অভিহিত করা হয়। কার্ল নাগেলি (Cardl Nageli ও Cramer, 1855) সর্বপ্রথম এই ঝিল্লিকে প্লাজমামেমব্রে নামকরণ করেন। তবে বর্তমানে অনেকেই একে বায়োমেমব্রেন (biomembrane) বলতে চান। J. Q. Plower (1931) প্লাজমালেমা শব্দটি ব্যবহার করেন। ঝিল্লিটি স্থানে স্থানে ভাঁজবিশিষ্ট হতে পারে। প্রতিটি ভাঁজকে **মাইক্রোভিলাস** (বহুবচনে মাইক্রোভিলাই) বলে। কোষাভ্যন্তরে অধিক প্রবিষ্ট মাইক্রোভিলাসকে বলা হয় পিনোসাইটিক ফোস্কা। প্রাণিকোষে এদে ভালো দেখা যায়।

ভৌত গঠন (Physical Structure) : কোষঝিল্লির ভৌত গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Danielli & Davson (1935) সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট মডেল প্রস্তাব করেন। এটি Sandwitch মডেল নামে পরিচিত। তাঁদের মতে ঝিল্লিটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট এবং প্রতি স্তরে প্রোটিন (monomolecular) এবং লিপিড (bimolecular) উপ-স্তর আছে। দ্বিস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লির ওপর ও নিচে প্রোটিন স্তর এবং মাঝখানে লিপিড স্তর অবস্থিত।

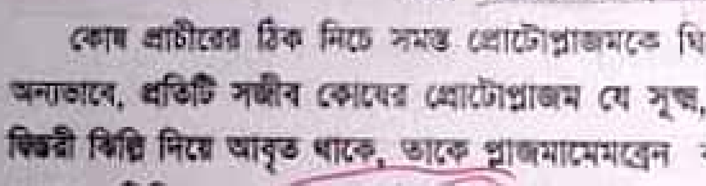

চিত্র ১.৪ : Danielli & Davson প্রস্তাবিত কোষঝিল্লির গঠন।

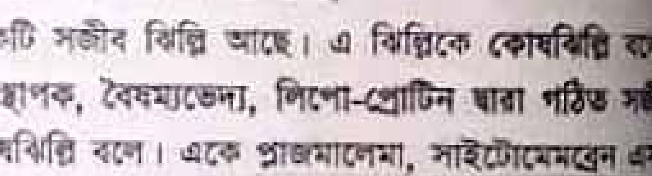

চিত্র ১.৫ : ফসফোলিপিড বাইলেয়ার।

এছাড়াও প্লাজমামেমব্রেন বা কোষঝিল্লির গঠন সম্বন্ধে Benson's model (1966), Lenard & Singer's model (1966), Robertson এর Unit membrane hypothesis (1959), Singer & Nicolson (1972) এর Fluid-mosaic model ইত্যাদি মডেল প্রস্তাবিত হয়েছে।

ইউনিট মেমব্রেন (Unit membrane) : বিজ্ঞানী রবার্টসন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্লাজমামেমব্রেনের ইউনিট মেমব্রেন মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে— সব বায়োলজিক্যাল মেমব্রেনের আণবিক গঠন একই প্রকার অর্থাৎ ফসফোলিপিড বাইলেয়ার দিয়ে গঠিত যার স্থানে স্থানে প্রোটিন প্রোথিত থাকে। স্থানে স্থানে প্রোথিত প্রোটিনসহ ফসফোলিপিড বাইলেয়ারকে কখনো কখনো ইউনিট মেমব্রেন বলা হয়।

ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (Fluid -mosaic model)

বিভিন্ন মডেলের মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণীয় মডেল হলো ফ্লুইড-মোজাইক মডেল (S.J. Singer and G.L. Nicolson-1972)। প্লাজমামেমব্রেন এর গঠন সংক্রান্ত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এস. জে. সিঙ্গার এবং জি. এল. নিকলসন কর্তৃক প্রবর্তিত মডেলকে ফ্লুইড-মোজাইক মডেল বলে। এ মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লি দ্বিস্তরবিশিষ্ট। প্রতিটি স্তর ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত (চিত্র ১.৬)। উভয় স্তরের হাইড্রোকার্বন লেজটি সামনাসামনি (মুখোমুখী) থাকে এবং পানিগ্রাহী (hydrophillic) মেরু অংশ বিপরীত দিকে থাকে। ঝিল্লির প্রোটিন অণুগুলো ফসফোলিপিড স্তরে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে। কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য উপাদানও ফসফোলিপিড মাধ্যমে এখানে সেখানে মিশে থাকতে পারে। লিপিড অণুর মধ্যে প্রোটিনের এরূপ বিন্যাসকে সিঙ্গার ও নিকলসন সমুদ্রতলে ভাসমান হিমশৈল (Iceberg) এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সদৃশগত কারণে এ মডেলকে আইসবার্গ মডেলও বলা হয়।

ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির গাঠনিক উপাদান নিম্নরূপ :

(ক) ফসফোলিপিড বাইলেয়ার : এটি দুই স্তরবিশিষ্ট এবং ফসফোলিপিড (অণু) দিয়ে তৈরি। প্রতিটি ফসফোলিপিডে এক অণু গ্লিসারল থাকে এবং গ্লিসারলের সাথে দুটি ননপোলার ফ্যাটি অ্যাসিড লেজ এবং একটি পোলার ফসফেট হেড থাকে। ফসফেট হেড ও ফ্যাটি অ্যাসিড লেজের মাঝে গ্লিসারল থাকে।

চিত্র ১.৬ : ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির গঠন।

(খ) মেমব্রেন প্রোটিন : কোষঝিল্লিতে তিন ধরনের প্রোটিন শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন :(i) ইনটিগ্রাল প্রোটিন-এগুলো ঝিল্লির উভয় সার্ফেস পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। (ii) পেরিফেরাল প্রোটিন-এগুলো ঝিল্লির সার্ফেসে থাকে এবং (iii) লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন-এগুলো লিপিড কোর-এ সম্পৃক্ত থাকে। মেমব্রেনে অবস্থিত প্রোটিনই মেমব্রেন প্রোটিন।

(গ) গ্লাইকোক্যালিক্স : এটি ঝিল্লির ওপর একটি চিনির স্তর বিশেষ। ফসফোলিপিড অণুর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোলিপিড ও প্রোটিন অণুর সাথে কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে গ্লাইকোপ্রোটিন গঠন করে। গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়। কার্বোহাইড্রেট শৃঙ্খলগুলো সবসময় ঝিল্লির বহিস্তলে অবস্থান করে।

(ঘ) কোলেস্টেরল : এটি লিপিড জাতীয় পদার্থ। ফসফোলিপিড অণুর ফাঁকে ফাঁকে এগুলো অবস্থান করে। প্রাণি কোষের ঝিল্লিতে এটি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। সেল সার্ফেস (cell surfaces)-এ ভেদ্যতা (permeability) ও এনজাইমের কার্যকারিতা পরিবর্তনশীল হতে দেখা যায়। এতে বোঝা যায়, সার্ফেস এলাকা এবং এর উপাদান উভয়ই পরিবর্তনযোগ্য। ফ্লুইড-মোজাইক মডেল অনুযায়ী এসব পরিবর্তনশীলতা ঘটা সম্ভব। এ মডেল অনুযায়ী প্রোটিন এবং গঠন উপাদানসমূহকে স্থির (fixed) ধরা হয় না, বরং মনে করা হয় এরা ফসফোলিপিডে ভেসে থাকে। ফলে বস্তুর একটি মোজাইক তৈরি হয়। প্রোটিনসমূহ আংশিক পানিগ্রাহী (hydrophilic-যখন ঝিল্লির সার্ফেস-এ থাকে) এবং আংশিক পানিরোধী (hydrophobic-যখন লিপিডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় মাঝের দিকে থাকে) হতে পারে। এ মডেল কোষঝিল্লির কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন হতে উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যাদির (protein derivatives) উপস্থিতি সমর্থন করে। কতিপয় বস্তু কোষের ভেতর হতে বাইরে বের করতে এবং বাইর হতে ভেতরে প্রবেশ করাতে কোষঝিল্লির কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে কোষঝিল্লিটি অনেকটা তরল পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। লিপিড অণু তরল পদার্থের ন্যায় ঝিল্লির একই স্তরে স্থান পরিবর্তন করে, পাশে ব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং অক্ষের (long axis) বরাবর ঘুরতে (rotate) পারে। একে **flip-flop movement** বলে। এ তথ্যগুলো ফ্লুইড-মোজাইক মডেলকে বিশেষভাবে সমর্থন করে।

কোষঝিল্লির রাসায়নিক উপাদান : (i) কোষঝিল্লিতে থাকে প্রোটিন, লিপিড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলিস্যাকারাইড (polysaccharides)। (ii) প্রোটিন গাঠনিক উপাদান হিসেবে (structural), এনজাইম হিসেবে (enzymes) এবং বাহক প্রোটিন (carrier protein) হিসেবে থাকে। এদের গঠন ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। (iii) কোষঝিল্লির মোট শুষ্ক ওজনের প্রায় ৭৫ ভাগই লিপিড। লিপিড প্রধানত ফসফোলিপিড (phospholipids) হিসেবে থাকে। ইতোমধ্যেই পাঁচ রকম ফসফোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে-যার সবচেয়ে সরলটি হলো ফসফোটাইডিক অ্যাসিড এবং অন্য চারটি জটিল প্রকৃতির (complex)। জটিল ফসফোলিপিডের মধ্যে লেসিথিন (lecithin) প্রধান। ঝিল্লিস্থ ফসফোলিপিডের অর্ধেকের বেশি থাকে লেসিথিন। (iv) কোনো কোনো ক্ষেত্রে RNA (পিঁয়াজের কোষে) থাকতে পারে।

কোষঝিল্লির কাজ : (i) এটি কোষীয় সব বস্তুকে ঘিরে রাখে।

(ii) বাইরের প্রতিকূল অবস্থা হতে অভ্যন্তরীণ বস্তুকে রক্ষা করে।

(iii) কোষঝিল্লির মধ্যদিয়ে বস্তুর স্থানান্তর ও ব্যাপন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় হয় (control and coordinate)।

(iv) ঝিল্লিটি একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করে যাতে বিশেষ এনজাইম এতে বিন্যস্ত থাকতে পারে।

(v) ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে বস্তু স্থানান্তর করে।

(vi) বিভিন্ন বৃহদাণু (macro-molecule) সংশ্লেষ করতে পারে।

(vii) বিভিন্ন রকম তথ্যের ভিত্তি (information source) হিসেবে কাজ করে।

(viii) পারস্পরিক বন্ধন, বৃদ্ধি ও চলন ইত্যাদি কাজেও এর ভূমিকা আছে।

> **কাজ :** কোষ প্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেনের মধ্যকার পার্থক্যগুলো পাশাপাশি একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে। পার্থক্য নির্ণয়কালে এদের অবস্থান, গঠন, স্তরায়ন, অলংকরণ, সজীবতা ও কাজ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১.৩ সাইটোপ্লাজম ও অঙ্গাণু (Cytoplasm and Organelles)

নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষঝিল্লি দিয়ে পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমীয় অংশের নামই হলো সাইটোপ্লাজম। এটি মাতৃকা ও অঙ্গাণু অংশ নিয়ে গঠিত।

সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকা (Cytoplasmic matrix) : মাতৃকা হলো সাইটোপ্লাজমের ভিত্তি পদার্থ।

ভৌত গঠন : মাতৃকা হলো একটি অর্ধতরল, দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ, সমধর্মী, কলয়ডাল তরল পদার্থ। একে হায়ালোপ্লাজমও বলা হয়। বর্তমানে একে সাইটোসোল (Cytosol) বলা হয়। **H. A. Lardy** (1965) প্রথম সাইটোসোল শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ, পানি, বিভিন্ন অ্যাসিড ও এনজাইম নিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকার অপেক্ষাকৃত ঘন, কম দানাদার বহিঃস্থ শক্ত অঞ্চলকে এক্টোপ্লাজম (কর্টেক্স, প্লাজমাজেল) বলে এবং কেন্দ্রস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন অঞ্চলকে এন্ডোপ্লাজম বলে। সাইটোপ্লাজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা বেশি।

অঙ্গাণু (Organelles) : সাইটোপ্লাজমীয় মাতৃকায় প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাইবোসোম, গলগি বডি, লাইসোসোম, সেন্ট্রোসোম, মাইক্রোটিউবিউলস প্রভৃতি ক্ষুদ্রাঙ্গ এবং বিভিন্ন নির্জীব (জড়) পদার্থও থাকে।

সাইটোপ্লাজমের কাজ : (i) বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ধারণ করা (ii) কতিপয় জৈবিক কাজ করা (iii) কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা (iv) রেচন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করা (v) উত্তেজনায় সাড়া দেয়া এবং (vi) পানি পরিশোষণে সাহায্য করা।

সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদান ও প্রকৃতি (Chemical nature of cytoplasm)

সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদানকে **অজৈব** (inorganic) এবং **জৈব** (organic)– এ দু' শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। অজৈব উপাদানের মধ্যে প্রধান হলো পানি ও পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস। এছাড়াও আছে বিভিন্ন খনিজ বস্তু, আয়ন। জৈব উপাদানের মধ্যে আছে কার্বোহাইড্রেট, জৈব অ্যাসিড, লিপিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, হরমোন, ভিটামিন, বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ। পানির পরিমাণ কোষভেদে ৬৫–৯৬%। সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি অর্ধতরল, দানাদার, অর্ধস্বচ্ছ, সমধর্মী ও কলয়ডাল।

সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic role of cytoplasm): যে কোনো জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়া বিক্রিয়া চলতে থাকে। এর অধিকাংশই সাইটোপ্লাজম নির্ভর। বিপাকীয় ক্রিয়াগুলোর কতক সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়, কতক সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুগুলোতে সংঘটিত হয়। জীবের জন্য সবচেয়ে বড় শারীরবৃত্তীয় কাজ হলো শ্বসন। শ্বসনের প্রথম পর্যায় তথা গ্লাইকোলাইসিস সংঘটিত হয় সাইটোপ্লাজমে। এছাড়া সাইটোপ্লাজম হলো বিভিন্ন এনজাইমের আধার, আর সকল জৈবিক ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম। কাজেই পরোক্ষভাবে জীবের সকল বিপাকীয় কাজের নিয়ন্ত্রকও সাইটোপ্লাজম।

সাইটোপ্লাজমে বিরাজমান অঙ্গাণুসমূহ

সাইটোপ্লাজমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু বিরাজ করে। নিচে সাইটোপ্লাজমের প্রধান প্রধান অঙ্গাণুর বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

১। রাইবোসোম (Ribosome)

সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় বিরাজমান অথবা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে অবস্থিত যে দানাদার কণায় প্রোটিন সংশ্লেষণ ঘটে তাই রাইবোসোম। রাইবোসোম অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং প্রায় গোলাকার। সাধারণত অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উভয় দিকে এরা সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে। সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায়ও রাইবোসোম থাকে। মুক্ত রাইবোসোম আদি কোষের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মুক্ত রাইবোসোমের কোনো আবরণী নাই। সাইটোপ্লাজমে একাধিক রাইবোসোম মুক্তোর মালার মতো অবস্থান করলে তাকে পলিরাইবোসোম বা পলিসোম বলে।

চিত্র ১.৭ : রাইবোসোম : দুই সাব-ইউনিট এবং mRNA ও tRNA এর সম্ভাব্য অবস্থান দেখানো হয়েছে।

আবিষ্কার : অ্যালবার্ট ক্লড (Albert Claude, 1899-1983) নামক একজন বিজ্ঞানী ১৯৫৪ সালে যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমকে সেন্ট্রিফিউজ করে RNA সমৃদ্ধ ৬০০-২০০০ Å

(৬০—২০০ nm) ব্যাসবিশিষ্ট বহু ক্ষুদ্রকণা পৃথক করেন এবং নাম দেন মাইক্রোসোম। এরপর রোমানিয়ান কোষ বিজ্ঞানী George Palade, ১৯৫৫ সালে কোষের ভারী পদার্থরূপে রাইবোসোম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে ইলেক্ট্রন আণুবীক্ষণিক চিত্রে মাইক্রোসোমের দুটি অংশ পৃথকযোগ্য দেখা যায়, একটি হলো অন্তঃপ্লাজমীয় ঝিল্লি এবং অপরটি হলো ক্ষুদ্রাকার কণা। এ কণাকেই পরবর্তীতে রাইবোসোম নাম দেয়া হয়। ১৯৫৮ সালে Richard B. Roberts এর নাম দেন রাইবোসোম। ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয়োপ্লাজমে রাইবোনিউক্লিয়ো-প্রোটিন কণা (Ribonucleo-protein particle-RNP) নামক ক্ষুদ্রাকার রাইবোসোম আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রকারভেদ : আকার ও সেডিমেন্টেশন সহগ (কো-এফিসিয়েন্ট) হিসেবে রাইবোসোম মূলত 70S এবং 80S এই দুই প্রকার। 70S রাইবোসোম (আণবিক ওজন 2.7×10^6 ডাল্টন) পাওয়া যায় আদিকোষী জীবে। আর 80S রাইবোসোম (আণবিক ওজন 40×10^6 ডাল্টন) পাওয়া যায় প্রকৃতকোষী জীবে। 70S রাইবোসোম, 50S এবং 30S এই দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। 80S রাইবোসোম, 60S এবং 40S এই দুই সাব-ইউনিটে বিভক্ত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় আদি কোষে 50S ও 30S সাব-ইউনিট একত্রিত হয়ে 70S একক গঠন করে এবং প্রকৃত কোষে 60S ও 40S সাব-ইউনিট একত্রিত হয়ে 80S একক গঠন করে। [কোনো বস্তুকে সেন্ট্রিফিউজ করলে তলায় তার অধঃক্ষেপ জমা হয়। সেন্ট্রিফিউজ করা কালে বিভিন্ন ভরসম্পন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপণের হারকে S দিয়ে বোঝানো হয়। S= Svedberg unit = ভেদবার্গ একক; সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের দ্রুত ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভরসম্পন্ন বস্তুর অধঃক্ষেপণের হারকে ভেদবার্গ একক বলে। সুইডিস প্রাণরসায়নবিদ Theodor Svedberg এর নামের প্রথম অক্ষর S দিয়ে তা বোঝানো হয়ে থাকে।]

আকৃতি ও ভৌত গঠন : এরা মূলত বৃত্তাকার তবে ত্রিকোণ এবং পঞ্চকোণ বিশিষ্ট বলেও অনেকে দাবি করেছেন। এটি চওড়ায় ২২nm এবং উচ্চতায় ২০nm। রাইবোসোম প্রধানত বহু প্রকার প্রোটিন ও rRNA দিয়ে তৈরি। *E. coli* কোষের শুষ্ক ওজনের প্রায় ২২ ভাগই রাইবোসোম। রাইবোসোমের বহু প্রোটিন মূলত এনজাইম।

mRNA অণু রাইবোসোমের সাথে যুক্ত হলে tRNA-র সহায়তায় এমিনো অ্যাসিড দিয়ে পলিপেপটাইড তথা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় রাইবোসোমে সাব-ইউনিটগুলো পৃথক থাকে। কেবলমাত্র প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় এরা একত্রিত হয়। এ সময় রাইবোসোমে ৪টি স্থান লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো অ্যামাইনোঅ্যাসাইল বা A স্থান, পেপটাইডিল বা P স্থান, নির্গমন বা E স্থান এবং mRNA সংযুক্তি স্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক রাইবোসোম mRNA দ্বারা সংযুক্ত হয়ে পলিরাইবোসোম গঠন করে।

রাসায়নিক গঠন : রাইবোসোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে RNA ও প্রোটিন। এদের অনুপাত প্রায় ১ : ১। 70S রাইবোসোমে রয়েছে 23S, 16S ও 5S মানের ৩টি rRNA অণু এবং ৫২ প্রকারের প্রোটিন অণু। অপরদিকে 80S রাইবোসোমে রয়েছে 28S, 18S, 5.8S ও 5S মানের ৪টি rRNA অণু এবং ৮০ প্রকারের প্রোটিন অণু। এছাড়া এতে অল্প পরিমাণে ধাতব আয়ন, যেমন-Mg^{++}, Ca^{++} ও Mn^{++} ইত্যাদি থাকে।

[আদি কোষের রাইবোসোম রাসায়নিকভাবে পৃথক ধরনের, তাই টেট্রাসাইক্লিন বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষ বন্ধ করে দিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে কিন্তু মানবদেহের প্রোটিন সংশ্লেষণে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।]

উৎপত্তি : আদি কোষে DNA (আদি ক্রোমোসোম) থেকে উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রকৃত কোষে সাব-ইউনিট দু'টি পৃথকভাবে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে তৈরি হয় এবং পরে সাইটোপ্লাজমে চলে আসে। পলিপেপটাইড তৈরি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সাব-ইউনিট পৃথক থাকে।

রাইবোসোমের কাজ : প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষণ করা। তাই রাইবোসোমকে কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয়। প্রোটিন সংশ্লেষণের শুরুতে mRNA আদি কোষের 30S এবং প্রকৃত কোষের 40S সাব-ইউনিটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এরপর আদি কোষে 30S এর সাথে 50S মিলে 70S একক গঠন করে এবং

ইউনিট এসে একত্রিত হয়ে 80S একক গঠন করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ শুরু হয়। এরা সাইটোক্রোম উৎপন্ন করে যারা কোষীয় শ্বসনে ইলেকট্রন পরিবহন করে। গ্লুকোজের ফসফোরাইলেশন রাইবোসোমে সংঘটিত হয়।

২। গলগি বডি (Golgi body)

নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থিত এবং দ্বিস্তরবিশিষ্ট ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ ছোট নালিকা, ফোস্কা, চৌবাচ্চা বা ল্যামেলির ন্যায় সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুর নাম গলগি বডি (গলগি যন্ত্র বা গলগি ক্ষেত্র)। গলগি বডি চেপ্টা, গোলাকার বা লম্বা হতে পারে। এরা সাধারণত নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি একত্রিত হয়ে অবস্থান করে। ইতালীয় স্নায়ুতত্ত্ববিদ ক্যামিলো গলগি (Camillo Golgi, 1843-1926) ১৮৯৮ সালে প্রথম পেঁচা ও বিড়ালের স্নায়ুকোষে এটি দেখতে পান এবং তাঁর নামানুসারে পরবর্তীকালে এ অঙ্গাণুর নাম রাখা হয়েছে গলগি বডি। মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে গলজি বডি সৃষ্টি হয়। এদেরকে ডিকটায়োসোম (dictaosome), ইডিওসোম (Idiosome) বা লাইপোকন্ড্রিয়া (lypochondria) নামেও অভিহিত করা হয়। প্রায় সব প্রাণী কোষেই এরা বিদ্যমান। গলগি বডিতে ফ্যাটিঅ্যাসিড, ভিটামিন-কে, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম (ATPase, ADPase, ট্রান্সফারেজ ইত্যাদি) থাকে। কখনো ক্যারটিনয়েডও থাকে। গলগি বডিকে 'কোষের ট্রাফিক পুলিশ' (Traffic Police of Cell) বলা হয়। কারণ গলগিবডি কোষের কেন্দ্রীয় অংশ থেকে ঝিল্লিবদ্ধ বস্তু (ভেসিকল) কোষের পরিধির দিকে প্লাজমামেমব্রেন পর্যন্ত নিয়ে যায়।

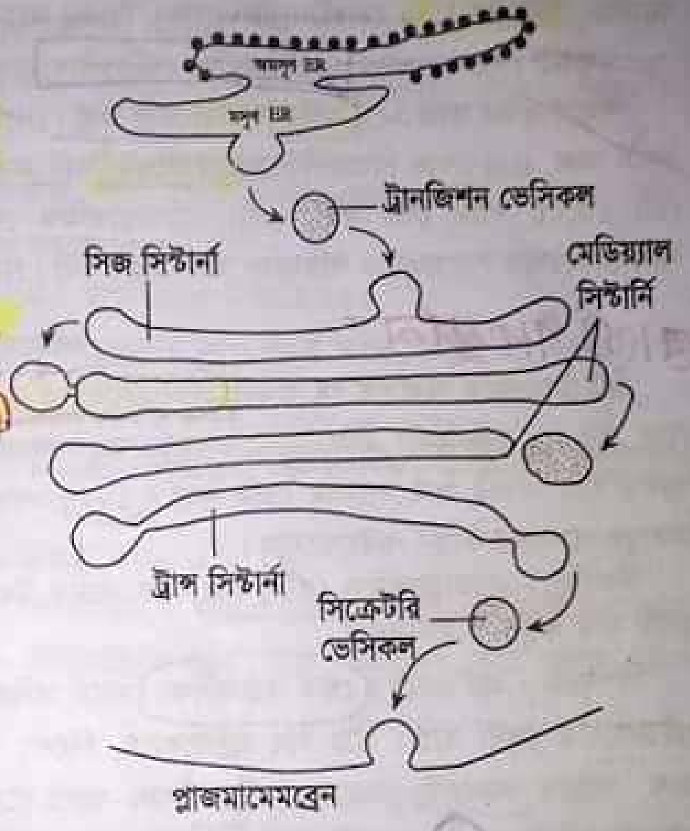

চিত্র ১.৮ : গলগি বডি।

ভৌত গঠন : গলগি যন্ত্রের কতগুলো চ্যাপ্টা থলে বা চৌবাচ্চা আকৃতির গঠনসমূহকে সিস্টার্নি (এক বচনে-সিস্টার্না) বলে এবং কিছুটা অনিয়মিত নালিকা ও ভেসিকলসমূহকে ট্রান্স-গলগি নেটওয়ার্ক (Trans-Golgi Network-TGN) বলে। সিস্টার্নি একসাথে গাদা করে (stack) থাকে। প্রতিটি স্বতন্ত্র গাদাকে (stack) বলা হয় গলগি বডি বা ডিকটায়োসোম (dictyosome)। গলগি যন্ত্রর প্লাজমামেমব্রেনের কাছাকাছি অংশকে বলা হয় ট্রান্স-ফেইস (trans-face)। আর কোষের কেন্দ্রের দিকের অংশকে বলা হয় সিজ-ফেইস (cis-face)। ট্রান্সফেইস-এর শেষ সিস্টার্নাকে বলা হয় ট্রান্সসিস্টার্না (transcisterna) এবং সিজ-ফেইসের শেষ সিস্টার্নাকে বলা হয় সিজ-সিস্টার্না (cis-cisterna), মধ্যভাগের গুলোকে বলা হয় মেডিয়্যাল সিস্টার্নি (medial cisternae)। সিস্টার্নির পার্শ্বদেশে অবস্থিত গোলাকার বৃহৎ তলের মতো গঠনগুলোকে ভ্যাকুওল বলে। সবগুলো সংগঠন ইন্টারসিস্টার্নাল বস্তু দিয়ে একসাথে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে। তিন অংশে তিন ধরনের এনজাইম থাকে এবং এদের কাজও তিন ধরনের।

প্রাণিকোষে সাধারণত গলগিযন্ত্র কোষের এক জায়গায় একসাথে অবস্থান করে কিন্তু উদ্ভিদকোষে দৃশ্যত পৃথক পৃথক শতাধিক গলগি বডি সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকে।

উদ্ভিদ কোষে গলগি বডির প্রধান কাজ হলো গ্লাইকোপ্রোটিনের অলিগোস্যাকারাইড-এ পার্শ্ব শৃঙ্খল সংযুক্ত করা এবং জটিল পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষ ও নিঃসরণ করা। তাই উদ্ভিদ কোষে গলগি বডিকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয়। উদ্ভিদ কোষে গলগি বডির আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কোষ প্রাচীর গঠন করা।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে উৎপাদিত দ্রব্যাদির ঝিল্লিবদ্ধ ভেসিকল (ট্রানজিশন ভেসিকল) সিজ-সিস্টার্নী গ্রহণ করে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে মেডিয়্যাল সিস্টার্নির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ট্রান্সসিস্টার্নী হয়ে কোষে অন্যত্র বা প্লাজমামেমব্রেনে চলে যায়।

রাসায়নিক গঠন : গলগি বডি আবরণীতে ৬০ ভাগ প্রোটিন এবং ৪০ ভাগ লিপিড থাকে। এছাড়া এতে ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন-K ও ক্যারটিনয়েড থাকে। বিভিন্ন ধরনের এনজাইম দ্বারা এদের থলিগুলো পূর্ণ থাকে।

উৎপত্তি : সম্ভবত মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে উৎপত্তি হয়।

গলগি বডির কাজ : (i) লাইসোসোম তৈরি করা। (ii) অ-প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ করা, (iii) কিছু এনজাইম নির্গম করা, (iv) কোষ বিভাজনকালে কোষপ্লেট তৈরি করা, (v) প্রোটিন, হেমিসেলুলোজ, মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করা, (vi) কোষস্থ পানি বের করা, (vii) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি ঝিল্লিবদ্ধ করা, (viii) বিভিন্ন পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণ ও পরিবহনে অংশ গ্রহণ করা। (ix) মাইটোকন্ড্রিয়াকে ATP উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। লাইসোসোম (Lysosome)

সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত যে অঙ্গাণু হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের আধার হিসেবে কাজ করে তাকে লাইসোসোম বলে (Gk. *Lyso* = হজমকারী এবং *soma* =বস্তু)। বহু সংখ্যক নানাবিধ হাইড্রোলাইটিক এনজাইম একটি **স্তিস্তরী ঝিল্লি** দ্বারা আবদ্ধ হয়ে একটি লাইসোসোম তৈরি করে। ১৯৫৫ সালে দ্য দ্যুবে (Christain de Duve, 1917-2013) এ ধরনের অঙ্গাণুর নামকরণ করেন লাইসোসোম।

উৎপত্তি : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে এদের উৎপত্তি এবং গলগি বডি কর্তৃক প্যাকেজকৃত।

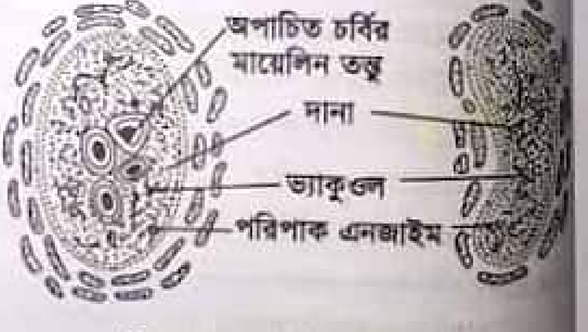

চিত্র ১.৯ : লাইসোসোমের গঠন।

বিস্তৃতি : প্রাণিদেহের শ্বেত রক্তকণিকা কোষে অধিক সংখ্যায় লাইসোসোম দেখা যায়। প্রায় সব প্রাণিকোষে, বিশেষ করে বৃক্ক কোষ, অন্ত্রের আবরণী কোষেও লাইসোসোম আছে। RBC-তে লাইসোসোম থাকে না। সম্প্রতি উদ্ভিদকোষেও লাইসোসোমের ন্যায় **spherosome** আবিষ্কৃত হয়েছে। এদেরকে **oleosome**-ও বলা হয়। এরা আকারে ছোট। তৈল জাতীয় পদার্থ ঝিল্লিবদ্ধ করা এদের প্রধান কাজ। **Oleosome-এর ঝিল্লি একস্তরবিশিষ্ট** বলে জানা যায়।

ভৌত গঠন : লাইসোসোম সাধারণত বৃত্তাকার, এদের ব্যাস সাধারণত ০.২-০.৮ মাইক্রোমিলি। বৃক্ক কোষের লাইসোসোম অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে থাকে। প্রতিটি লাইসোসোম একটি **স্তিস্তরবিশিষ্ট** আবরণী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এদের ভ্যাকুওল ঘন তরলে পূর্ণ থাকে।

রাসায়নিক গঠন : লাইসোসোমের আবরণী ঝিল্লি লিপো-প্রোটিন নির্মিত। ঝিল্লি দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় এতে প্রায় ৬০ ধরনের এনজাইম থাকে। উল্লেখযোগ্য এনজাইমগুলো হলো DNAase, RNAase, অ্যাসিড লাইপেজ, এস্টারেজ, স্যাকারেজ, লাইসোজাইম ইত্যাদি।

লাইসোসোমের কাজ : লাইসোসোমের এনজাইমসমূহ অম্লীয় পরিবেশে কর্মক্ষম হয়; সাইটোপ্লাজমের নিউট্রাল pH-এ এরা কর্মক্ষম থাকে না; তাই কোষের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। প্রয়োজনের সময় সাইটোপ্লাজম থেকে প্রোটন (H^+) এনে অম্লীয় পরিবেশ তৈরি করে এরা কাজ করে। এদের কাজ হলো- (i) এরা ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে। (ii) বিগলনকারী এনজাইমসমূহকে আবদ্ধ করে রেখে এটি কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুকে রক্ষা করে। (iii) লাইসোসোম অন্তঃকোষীয় পরিপাক কাজে সাহায্য করে। (iv) তীব্র খাদ্যাভাবের সময় এর প্রাচীর ফেটে যায় এবং আবদ্ধকৃত এনজাইম বের হয়ে কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুগুলো বিনষ্ট করে দেয়। এ কাজকে বলে স্ব-গ্রাস বা অটোফ্যাজি

(autophagy)। এভাবে সমস্ত কোষটিও পরিপাক হয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় অটোলাইসিস (autolysis)। (v) এরা জীবদেহের অকেজো কোষসমূহকে অটোলাইসিস পদ্ধতিতে ধ্বংস করে বলে এদের আত্মঘাতী থলিকা বা স্কোয়াড (Suicidal bag or squad) বলা হয়। (vi) কোষ বিভাজনকালে এরা কোষীয় ও নিউক্লীয় আবরণী ভাঙতে সাহায্য করে। এরা কোষে কেরাটিন প্রস্তুত করে।

৪। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)

পরিণত কোষে সাইটোপ্লাজমে যে জালিকা বিন্যাস দেখা যায় তাই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা।

আবিষ্কার : বিজ্ঞানী পোর্টার (Keith R. Porter) এবং তাঁর সঙ্গীরা (Claude & Fullam) ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম যকৃত কোষে এটি আবিষ্কার করেন। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নামকরণ করেন ১৯৫৩ সালে।

উৎপত্তি : সাইটোপ্লাজমীয় ঝিল্লি, নিউক্লীয় ঝিল্লি অথবা কোষঝিল্লি হতে এদের উৎপত্তি হয়।

বিস্তৃতি : অধিকাংশ ইউক্যারিয়টিক কোষেই এ অঙ্গাণু পাওয়া যায়। তবে বেশি থাকে যকৃত, অগ্ন্যাশয় ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষে।

প্রকার : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দু'প্রকার- মসৃণ এবং অমসৃণ। রেটিকুলামের গায়ে রাইবোসোম থাকলে তা অমসৃণ বা দানাদার হয়, রাইবোসোম না থাকলে মসৃণ বা অদানাদার হয়।

ভৌত গঠন : গঠনগতভাবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তিন প্রকার; যথা-

(ক) সিস্টার্নি (Cisternae) : এরা দেখতে অনেকটা চেপ্টা, শাখাবিহীন ও লম্বা চৌবাচ্চার মতো এবং সাইটোপ্লাজমে পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। এগুলোর ব্যাস ৪০-৫০ মিলিমাইক্রন (mμ) পুরু। এগুলোর গায়ে অনেক সময় রাইবোসোম যুক্ত থাকে।

(খ) ভেসিকল (Vesicles) : এগুলো বর্তুলাকার ফোস্কার মতো। ২৫-৫০ মিলিমাইক্রন ব্যাসযুক্ত।

(গ) টিউবিউল (Tubules) : এগুলো নালিকার মতো, শাখান্বিত বা অশাখ। এদের ব্যাস ৫০-১৯০ মিলিমাইক্রন। এদের গায়ে সাধারণত রাইবোসোম যুক্ত থাকে না।

চিত্র ১.১০ : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (ক) ত্রিমাত্রিক গঠন, (খ) অমসৃণ ঝিল্লি, (গ) মসৃণ ভেসিকল এবং (ঘ) মসৃণ টিউবিউল।

রাসায়নিক গঠন : এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো- প্রোটিন (৬০-৭০ ভাগ) ও লিপিড (৩০-৪০ ভাগ)। এতে প্রায় ১৫ ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়; যেমন-গ্লুকোজ ৬-ফসফেটেজ, সক্রিয় ATPase, NADH ডায়াফোরেজ ইত্যাদি। অমসৃণ জালিতে RNA এবং গ্লাইঅক্সিসোম নামক ক্ষুদ্রাকার কণা থাকতে পারে। অমসৃণ রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশকে মাইক্রোসোম (microsome) বলে।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ : (i) এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে। (ii) অমসৃণ রেটিকু... প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। (iii) মসৃণ রেটিকুলামে (বিশেষত প্রাণী কোষে) লিপিড, মতান্তরে বিভিন্ন হরমোন, গ্লাইকো... প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয়। (iv) এটি লিপিড ও প্রোটিনের অন্তর্বাহক হিসেবে কাজ করে। (v) অনেকের মতে ... কোষপ্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি হয়। (vi) রাইবোসোম, গ্লাইঅক্সিসোমের ধারক হিসেবে কাজ করে। (vii) এরা ... অণুপ্রবেশকারী বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করে।

গঠন ও কাজে দু'প্রকার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে পার্থক্য

গঠন ও কাজে দু'প্রকার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে পার্থক্য আছে। অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকু... সাইটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে, রাইবোসোম ধারণ করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। মসৃণ এন্ডোপ্লাজ... রেটিকুলাম সাইটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে, কোনো রাইবোসোম বহন করে না, প্রোটিন সংশ্লেষণ করে... তবে লিপিড বা হরমোন সংশ্লেষণ করতে পারে।

৫। মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

প্রকৃত জীবকোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু হলো মাইটোকন্ড্রিয়া। কোষের যাবতীয় জৈবনিক কাজের শক্তি সরবরাহ ক... বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের 'পাওয়ার হাউস' বা শক্তিঘর বলা হয়। এ অঙ্গাণুতে ক্রেবস্ চক্র, ফ্যাটি অ্যাসিড ... ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া প্রভৃতি ঘটে থাকে। **দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণী ঝিল্লি দ্বারা সীমিত সাইটোপ্লাজমস্থ যে অঙ্গাণু... ক্রেবস্ চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ঘটে থাকে এবং শক্তি উৎপন্ন হয় সেই অঙ্গাণুকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে।**

আবিষ্কার ও নামকরণ : কলিকার (Albert Von Kolliker) ১৮৫০ সালে আলোক অণুবীক্ষণের সাহা... সাইটোপ্লাজমে নানা আকৃতিবিশিষ্ট এসব অঙ্গাণু আবিষ্কার করেন। **W. Fleming** (1882) কোষে সুতাকৃতির মাইটোকন্ড্রি... প্রত্যক্ষ করেন এবং **fila** (ফিলা) নামকরণ করেন। **Altman** (1890) এদের বায়োপ্লাস্ট (bioplast) নামকরণ করেন। কা... বেন্ডা (Carl Benda-1897) এ অঙ্গাণুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন। কোষের সাইটোপ্লাজমে এরা বিক্ষিপ্তভা... অবস্থান করে, কোষ আয়তনের প্রায় ২০ ভাগ হলো মাইটোকন্ড্রিয়া। [(Gk- *Mitos*= thread-সুতা এবং *chondrion* = grain-দানা; একবচন- মাইটোকন্ড্রিয়ন।]

উৎপত্তি : বিভাজনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোষে একটিমাত্র মাইটোকন্ড্রিয়ন (বহুবচন- মাইটোকন্ড্রিয়া) থাকলে তা কোষ বিভাজনের সাথেই বিভাজিত হয়ে থাকে।

সংখ্যা : প্রকারভেদে প্রতি কোষে এক হতে একাধিক থাকতে পারে। সাধারণত গড়ে প্রতি কোষে ৩০০ হতে ৪০০ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। যকৃত কোষে ১০০০ বা ততোধিক থাকে। *Amoeba*-তে আরও বেশি থাকে।

আকৃতি : আকৃতিতে এরা বৃত্তাকার, দণ্ডাকার, তন্তুকার (সূত্রাকার), তারকাকার ও কুণ্ডলী আকার হতে পারে।

আয়তন : বৃত্তাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার ব্যাস ০.২-২.০ মাইক্রন। সূত্রাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৪০ থেকে ৭০ মাইক্রন। দণ্ডাকার মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্য ৯ মাইক্রন ও প্রস্থ ০.৫ মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার ভৌত গঠন : নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে মাইটোকন্ড্রিয়া গঠিত :

১। আবরণী : প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ন লিপোপ্রোটিন বাইলেয়ারের দুটি মেমব্রেন নিয়ে গঠিত। বাইরের মেমব্রেন ভাঁজবিহীন, মূলত ভেতরের অংশসমূহকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। বাইরের মেমব্রেন ভেদ করে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অণু এবং আয়ন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, আবার বের হয়ে যেতেও পারে। এতে কিছু ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন থাকে যা প্রয়োজনে সক্রিয় ট্রান্সপোর্টে সহায়তা করে। এতে কোনো ETC, ATP Synthases, ATP তৈরির এনজাইম ইত্যাদি থাকে না। এর কাজ মূলত রক্ষণাত্মক। দুটি আবরণীর মধ্যে ব্যবধান ৬-৮ nm।

২। প্রকোষ্ঠ : দুই মেমব্রেনের মাঝখানের ফাঁকা স্থানকে বলা হয় বহিস্থ কক্ষ (প্রকোষ্ঠ) বা আন্তঃমেমব্রেন ফাঁক এবং ভেতরের মেমব্রেন দিয়ে আবদ্ধ কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ কক্ষ। অভ্যন্তরীণ কক্ষ জেলির ন্যায় ঘন সমসত্ত্ব পদার্থ বা ধাত্র দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই ধাত্র পদার্থকে ম্যাট্রিক্স বলে।

৩। ক্রিস্টি : বাইরের মেমব্রেন সোজা কিন্তু ভেতরের মেমব্রেনটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক সৃষ্টি করে। প্রবর্ধিত অংশকে ক্রিস্টি (cristae) বলে। এদের সংখ্যা ও আকৃতি বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন রকম হয়। এগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার ধাত্রকে কতগুলো অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে। ক্রিস্টির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে অন্তঃক্রিস্টি ফাঁকা স্থান (intracristal space) বলে-যা বহিঃপ্রকোষ্ঠের সাথে সংযুক্ত।

৪। অক্সিসোম (Oxisome) : মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃআবরণীর অন্তর্গাত্রে অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য দানা লেগে থাকে। এদের অক্সিসোম বলে। অক্সিসোম বৃন্তক বা অবৃন্তক হতে পারে। বৃন্তক অক্সিসোম মস্তক, বোঁটা ও ভূমি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

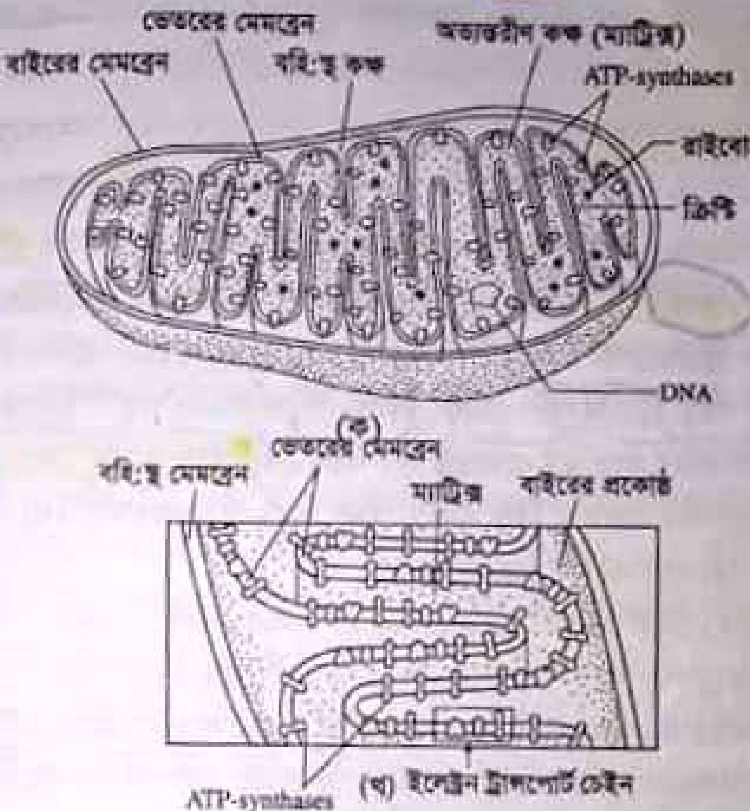

চিত্র ১.১১ : ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়ার দৈর্ঘ্যচ্ছেদ। (ক) অর্ধাংশে ত্রিমাত্রিক, (খ) পাতলা দৈর্ঘ্যচ্ছেদ।

৫। ATP-Synthases ও ETC : ক্রিস্টিতে স্থানে স্থানে ATP-Synthases নামক গোলাকার বস্তু আছে। এতে ATP সংশ্লেষিত হয়। এছাড়া সমস্ত ক্রিস্টিব্যাপী অনেক ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC) অবস্থিত।

৬। DNA ও রাইবোসোম : মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব বৃত্তাকার DNA এবং রাইবোসোম (70S) রয়েছে। এটিও আদি কোষীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এরা ম্যাট্রিক্স-এ থাকে।

রাসায়নিক গঠন : মাইটোকন্ড্রিয়ার শুষ্ক ওজনের প্রায় ৬৫% প্রোটিন, ২৯% গ্লিসারাইডসমূহ, ৪% লেসিথিন ও সেফালিন এবং ২% কোলেস্টেরল। লিপিডের মধ্যে ৯০% হচ্ছে ফসফোলিপিড, বাকি ১০% ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যারোটিনয়েড, ভিটামিন E এবং কিছু অজৈব পদার্থ।

মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লি লিপো-প্রোটিন সমৃদ্ধ। মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রায় ১০০ প্রকারের এনজাইম ও কো-এনজাইম রয়েছে। এছাড়া এতে ০.৫% RNA ও সামান্য DNA থাকে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ : (i) কোষের যাবতীয় কাজের জন্য শক্তি উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ করা। (ii) শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম, কো-এনজাইম প্রভৃতি ধারণ করা। (iii) শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন- ক্রেবস্ চক্র, ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন সম্পন্ন করা। (iv) নিজস্ব DNA, RNA উৎপন্ন করা এবং বংশগতিতে ভূমিকা রাখা। (v) প্রোটিন সংশ্লেষ ও স্নেহ বিপাকে সাহায্য করা। (vi) এরা Ca, K প্রভৃতি পদার্থের সক্রিয় পরিবহনে সক্ষম। (vii) শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠনে অংশগ্রহণ করা। (viii) কোষের বিভিন্ন অংশে ক্যালসিয়াম আয়নের সঠিক ঘনত্ব রক্ষা করা। (ix) কোষের পূর্বনির্ধারিত মৃত্যু (apoptosis) নিয়ন্ত্রণ করা। (x) রক্ত কণিকা ও হরমোন উৎপাদনে সহায়তা করা। (xi) এতে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটায়ন, যেমন- Ca^{2+}, S^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+} ইত্যাদি সঞ্চিত রাখা।

এন্ডোসিমবায়োন্ট (Endosymbiont) : ইউক্যারিয়টিক কোষে বিদ্যমান ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের এন্ডোসিমবায়োন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় ইউক্যারিয়টিক কোষ দ্বারা এন্ডোফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ভক্ষণকৃত কিছু ব্যাক্টেরিয়া থেকে বিবর্তিত হয়ে এসব অঙ্গাণুর উৎপত্তি হয়েছে।

মাইটোকন্ড্রিয়নের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে কাজের আন্তঃসম্পর্ক

মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরের মেমব্রেনটি মূলত রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করে। ভেতরের অংশকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। শক্তি উৎপাদন কাজটি সংঘটিত হয় ভেতরের মেমব্রেন দ্বারা সৃষ্ট ক্রিস্টিতে। ক্রিস্টিতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের সব উপাদান সজ্জিত থাকে এবং এখানেই শক্তি উৎপন্ন হয়। কাজেই মাইটোকন্ড্রিয়ার বহিঃগঠন রক্ষণাত্মক এবং অন্তর্গঠন কর্মধায়ক। বহির্গঠন কর্মধায়ক অংশের কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্য আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

> কাজ : পোস্টার পেপারে পাশাপাশি ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার চিত্র আঁকতে হবে। অঙ্কিত চিত্রে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে। চিত্রের নিচে পাশাপাশি একটি ছকে এদের মধ্যকার পার্থক্য লিখতে হবে।
>
> উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রং পেন্সিল, স্কেল, ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার চিত্র।

৬। প্লাস্টিড (Plastid)

স্ট্রোমা ও গ্রানা সমৃদ্ধ এবং লিপো-প্রোটিন ঝিল্লি দ্বারা সীমিত সাইটোপ্লাজমস্থ সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রাঙ্গের নাম প্লাস্টিড। ১৮৮৩ সালে শিম্পার (W. Schimper, 1856-1901) সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ্য করেন এবং এর নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট। পরবর্তীতে অন্যান্য প্লাস্টিড আবিষ্কৃত হয়েছে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই এদেরকে স্পষ্ট দেখা যায়। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল প্রভৃতি কোষে প্লাস্টিড নেই। নীলাভ সবুজ শৈবালে প্লাজমামেমব্রেন ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে থাইলাকয়েড সৃষ্টি করে এবং থাইলাকয়েড ক্লোরোফিল ধারণ করে।

প্লাস্টিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা- (ক) লিউকোপ্লাস্ট, (খ) ক্রোমোপ্লাস্ট এবং (গ) ক্লোরোপ্লাস্ট। প্লাস্টিডগুলোর মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) : এরা বর্ণহীন (*leucos* = বর্ণহীন)। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে, বিশেষ করে ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

অবস্থান : মূল, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যে সব অঙ্গে সূর্যালোক পৌছায় না সে সব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট অবস্থিত।

আকার-আকৃতি : লিউকোপ্লাস্ট অর্ধবৃত্তাকৃতি, মূলাকৃতি বা নলাকৃতির হতে পারে।

প্রকারভেদ : সঞ্চিত খাদ্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে লিউকোপ্লাস্টকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

অ্যামাইলোপ্লাস্ট (amyloplast) : স্টার্চ বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে অ্যামাইলোপ্লাস্ট বলা হয়।

ইলায়োপ্লাস্ট (elaioplast) : চর্বিজাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে ইলায়োপ্লাস্ট বলা হয়।

অ্যালিউরোপ্লাস্ট (aleuroplast) : প্রোটিন সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে অ্যালিউরোপ্লাস্ট বা প্রোটিনোপ্লাস্ট বলা হয়।

কাজ : খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং শর্করা থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করা এদের প্রধান কাজ।

(খ) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) : রঙিন (*chrome* = রঙিন) প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলা হয়। ক্যারোটিন (কমলা-লাল) এবং জ্যান্থোফিল (হলুদ) পিগমেন্টের জন্যে এরা রঙিন হয়। আকৃতিতেও এরা ভিন্নতর। উদ্ভিদের যে সব অঙ্গ বর্ণময় সে সব অঙ্গে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। যেমন-ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদি। সম্ভবত ক্লোরোপ্লাস্ট হতে ক্রোমোপ্লাস্ট সৃষ্টি হয়।

কাজ : ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির জন্য পুষ্প ও পাতা রঙিন ও সুন্দর হয় তাই কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে। রঙের কারণে ফল এবং বীজের বিস্তারেও এদের ভূমিকা আছে। এদের পুষ্টিক খাদ্যমূল্য আছে।

(গ) ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) : সবুজ বর্ণের প্লাস্টিডকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b, ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিলের সমন্বয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত। ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা (pigment) অধিক মাত্রায় ধারণ করে বলে এরা সবুজ বর্ণের। এতে অন্যান্য বর্ণকণিকাও কিছু কিছু পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উদ্ভিদের জন্য ক্লোরোপ্লাস্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞানী শিম্পার সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ

করেন এবং নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্ট খাদ্য সংশ্লেষে সাহায্য করে বলে 'কোষের রান্নাঘর' (kitchen of cell) বা 'শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা' (factory of synthesis of sugar) বলে। এটি শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু।

প্রতি কোষে সংখ্যা : এক হতে একাধিক। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষে সাধারণত ১০ হতে ৪০টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে সাধারণত আরও কম থাকে।

আকৃতি : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি সাধারণত লেন্সের মতো হয়ে থাকে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে এদের আকৃতি হরেক রকম হতে পারে, যেমন- পেয়ালাকৃতি (*Chlamydomonas*), সর্পিলাকার (*Spirogyra*), জালিকাকার (*Oedogonium*), তারকাকার (*Zygnema*), ফিতা বা আংটি আকৃতির (*Ulothrix*), গোলাকার (*Pithophara*) ইত্যাদি। শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্টের বৈচিত্র্য বেশি।

আকার : লেন্স আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্টের ব্যাস সাধারণত ৩-৫ মাইক্রন। *Spirogyra* এর সর্পিলাকার ক্লোরোপ্লাস্ট সোজা অবস্থায় কোষের দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশি লম্বা।

উৎপত্তি : নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি হয়। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে আদি প্লাস্টিড হতে এদের উৎপত্তি হয়। আদি প্লাস্টিড ০.৫ মাইক্রন ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলাকার বস্তু। প্রতিটি আদি প্লাস্টিডে ঘন স্ট্রোমা (ধাত্র পদার্থ) একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সৃষ্টির সাথে সাথে আদি প্লাস্টিড পূর্ণাঙ্গ ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হতে থাকে। আদি প্লাস্টিডের দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণীর ভেতরের স্তর হতে ফোস্কা (vesicles) বের হয়ে আসে এবং ধাত্র পদার্থে সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়। এ ফোস্কাগুলো মিলিত হয়ে একটি ল্যামেলাম তৈরি করে। কিছু কিছু স্থানে একাধিক ল্যামেলি গ্রানাম তৈরি করে। কিছু কিছু ল্যামেলি বিভিন্ন গ্রানার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এভাবে আদি প্লাস্টিড হতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন সূর্যালোক না পেলে ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়, তাই সবুজ অংশ বর্ণহীন হয়।

ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন : একটি পরিণত ক্লোরোপ্লাস্ট নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১। আবরণী ঝিল্লি : সমস্ত ক্লোরোপ্লাস্ট একটি দুই স্তরবিশিষ্ট আংশিক অনুপ্রবেশ্য (semipermeable) মেমব্রেন (ঝিল্লি) দ্বারা আবৃত থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট মেমব্রেনে ফসফোলিপিড-এর পরিবর্তে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড (glycosyl glyceride) থাকে। এটি একটি ব্যতিক্রমী গঠন।

২। স্ট্রোমা : আবরণী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত পানিগ্রাহী, কলয়েডধর্মী ম্যাট্রিক্স তরলকে স্ট্রোমা (stroma) বলে। স্ট্রোমাতে 70S রাইবোসোম, অসমোফিলিক দানা, DNA, RNA, ইত্যাদি থাকে। এতে শর্করা তৈরির এনজাইমও থাকে। সালোকসংশ্লেষণে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা উৎপাদন প্রক্রিয়া (C_3 বা C_4 চক্র) স্ট্রোমাতে ঘটে থাকে।

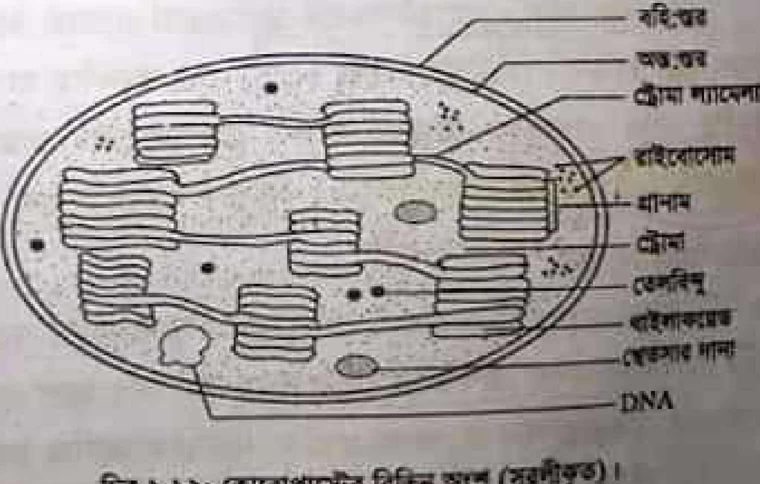

চিত্র ১.১২: ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ (সরলীকৃত)।

৩। থাইলাকয়েড ও গ্রানাম : স্ট্রোমাতে অসংখ্য থলে আকৃতির 100-300 Å প্রস্থ বিশিষ্ট ত্রিমাত্রিক সজ্জার গঠন বিদ্যমান। এদের থাইলাকয়েড (thylacoid) বলে। প্রত্যেকটি থাইলাকয়েডের ভেতরে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। এ প্রকোষ্ঠে থাকে ক্লোরোফিল-a, ক্লোরোফিল-b, জ্যান্থোফিল, ক্যারোটিন, লিপিড ও এনজাইম। এসব বস্তুকে একত্রে স্ফটিকাকার দানার মতো দেখায়। তখন এদের কোয়ান্টোসোম বলে। কতগুলো থাইলাকয়েড একসাথে একটির ওপর আর একটি সজ্জিত হয়ে স্তূপের মতো থাকে। থাইলাকয়েডের এ স্তূপকে গ্রানাম (granum, বহুবচনে গ্রানা) বলা হয়। ১০ থেকে

১০০টি থাইলাকয়েড উপর্যুপরি সজ্জিত হয়ে একটি গ্রানাম গঠন করে। প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্টে সাধারণত ৪০-৬০টি থাকে। একটি গ্রানামের আকার ০.৩-১.৭ μm (মাইক্রোমিটার)। গ্রানাম চক্রের ঝিল্লির ভেতরের গায়ে কোয়ান্টোসোম নামক কিছু স্ফটিকার বস্তু থাকে।

৪। স্ট্রোমা ল্যামেলি : দুটি পাশাপাশি গ্রানার কিছু সংখ্যক থাইলাকয়েডস্ সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্তকারী নালিকাকে স্ট্রোমা ল্যামেলি (একবচন-ল্যামেলাম) বলে। এদের অভ্যন্তরেও কিছু পরিমাণ ক্লোরোফিল বিদ্যমান থাকে।

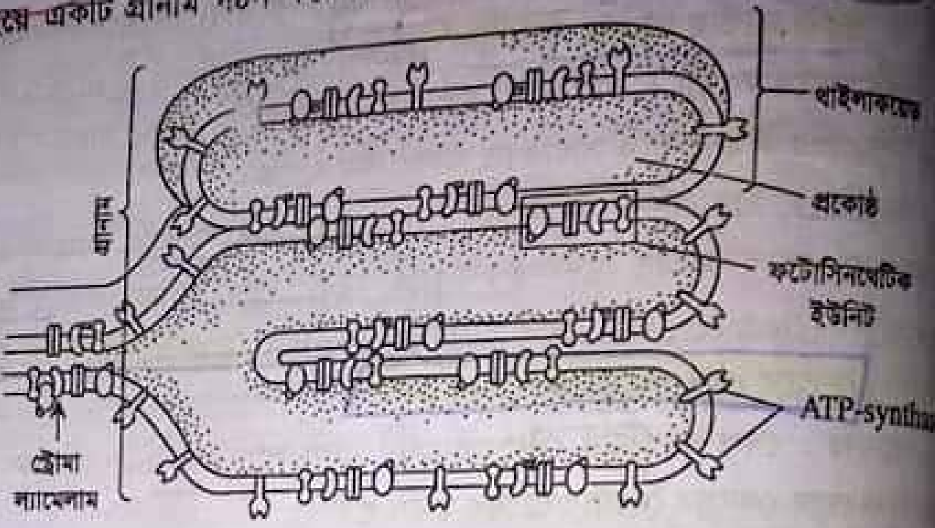

চিত্র ১.১৩ : ক্লোরোপ্লাস্ট-গ্রানামের ত্রিমাত্রিক সূক্ষ্ম গঠন।

৫। ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP-synthases : থাইলাকয়েড মেমব্রেন বহু গোলাকার বস্তু বহন করে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনের ভেতরের গাত্রে অসংখ্য সালোকসংশ্লেষণকারী একক ও ATP সিন্থেসেস নামক বস্তু থাকে। ATP-সিন্থেসেস নামক বস্তুতে ATP-তৈরির সকল এনজাইম থাকে। মেমব্রেনগুলোতে অসংখ্য ফটোসিনথেটিক ইউনিট থাকে। প্রতি ইউনিটে ক্লোরোফিল-এ, ক্লোরোফিল-বি, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল এর প্রায় ৩০০-৪০০টি অণু থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, মেটাল আয়ন, ফসফোলিপিড, কুইনোন, সালফোলিপিড ইত্যাদি থাকে।

৬। DNA ও রাইবোসোম : একটি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সমান আকৃতির প্রায় ২০০টি DNA অণু থাকতে পারে। ক্লোরোপ্লাস্টে তার নিজস্ব বৃত্তাকার DNA ও রাইবোসোম থাকে। এদের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্ট নিজের অনুরূপ সৃষ্টি (reproduce) ও কিছু প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি বা সংশ্লেষ করতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনো আদিকোষীয় DNA ও রাইবোসোম এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট প্রধানত কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন নিয়ে গঠিত। এছাড়া এতে থাকে ক্লোরোফিল। প্রোটিনের মধ্যে ৮০% হচ্ছে অদ্রবণীয় যা লিপিডের সঙ্গে একত্রে ঝিল্লি নির্মাণ করে. বাকি ২০% দ্রবণীয় এবং এনজাইম হিসেবে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের রয়েছে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণকণিকা। এর ৭৫% ক্লোরোফিল-a ও ২৫% ক্লোরোফিল-b। এছাড়াও রয়েছে সামান্য ক্যারোটিনয়েড ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ

(i) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা ক্লোরোপ্লাস্টের প্রধান কাজ।

(ii) সৌরশক্তিকে জৈবিকশক্তিতে রূপান্তর করা এবং বায়ুর CO_2 কে কোয়ান্টোসোমে সংবন্ধন করা।

(iii) ক্লোরোপ্লাস্টের প্রয়োজনে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করা।

(iv) ফটোফসফোরাইলেশন অর্থাৎ সূর্যালোকের সাহায্যে ADP-কে ATP-তে রূপান্তর করা।

(v) ফটোরেসপিরেশন করা।

(vi) সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সে সাহায্য করা।

ক্লোরোপ্লাস্টের বহিঃগঠন ও অন্তঃগঠনের সাথে কাজের আন্তঃসম্পর্ক

ক্লোরোপ্লাস্ট দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণী দ্বারা আবদ্ধ অঙ্গাণু। আবরণীর কাজ রক্ষণাত্মক। ভেতরে স্ট্রোমা, থাইলাকয়েড, ফটোসিনথেটিক ইউনিটসমূহ মিলিতভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের অন্তঃগঠন কর্মবিধায়ক, উৎপাদক। বহিঃগঠন রক্ষণাত্মক এবং অভ্যন্তরে কাঁচামাল পাঠানো এবং অভ্যন্তর থেকে উৎপাদিত দ্রব্য বাইরে পাঠানো নিয়ন্ত্রণ করা।

লিউকোপ্লাস্ট	ক্রোমোপ্লাস্ট	ক্লোরোপ্লাস্ট
১। এরা বর্ণহীন।	১। এরা রঙিন।	১। এরা সবুজ।
২। মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড প্রভৃতি যেসব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেসব অঙ্গের কোষে লিউকোপ্লাস্ট থাকে।	২। উদ্ভিদের যেসব অঙ্গ বর্ণময় যেমন- ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, গাজরের মূল ইত্যাদিতে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে।	২। উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গ যেমন- পাতা, ফুলের সবুজ বৃতি ও কচি কাণ্ডে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।
৩। এতে কোনো ধরনের পিগমেন্ট থাকে না।	৩। এতে ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ইত্যাদি পিগমেন্ট থাকে।	৩। এতে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।
৪। এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্রোমোপ্লাস্ট ও ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	৪। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট হতে ক্রোমোপ্লাস্টে পরিণত হয়।	৪। সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয় অর্থাৎ সবুজ অঙ্গ বর্ণহীন হয়ে যায়।
৫। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং শর্করা থেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করা এর প্রধান কাজ।	৫। ফুলের পরাগায়ন এবং ফল ও বীজ বিস্তারের জন্য কীটপতঙ্গ ও প্রাণিকুলকে আকৃষ্ট করা এর প্রধান কাজ।	৫। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা এর প্রধান কাজ।

৭। সেন্ট্রিয়োল (Centriole)

প্রধানত প্রাণিকোষ ও কিছু সংখ্যক উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিয়োল থাকে। এরা নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত, স্বপ্রজননক্ষমতা সম্পন্ন এবং একটি গহ্বরকে ঘিরে ৯টি গুচ্ছ প্রান্তীয় মাইক্রোটিউবিউল নির্মিত খাটো নলে গঠিত। বিজ্ঞানী Von Benden ১৮৮৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন এবং জার্মান জীববিজ্ঞানী Theodor Bovery ১৮৮৮ সালে এদের নামকরণ করেন।

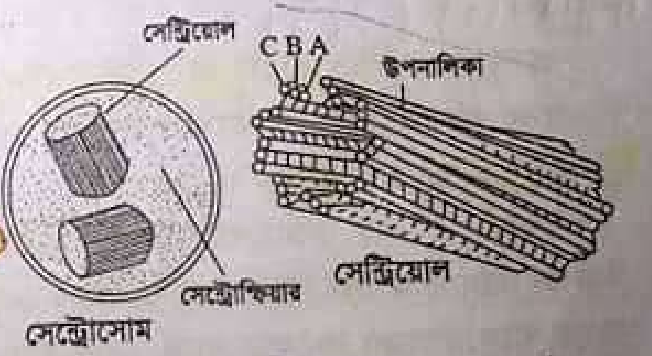

চিত্র ১.১৪ : সেন্ট্রোসোম ও সেন্ট্রিয়োল এর গঠন।

বিস্তৃতি : শৈবাল, ছত্রাক, মসবর্গীয় উদ্ভিদ, ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ, নগ্নবীজী উদ্ভিদে এবং অধিকাংশ প্রাণিকোষে সেন্ট্রিয়োল থাকে। আদি কোষ, ডায়াটম, ঈস্ট ও আবৃতবীজী উদ্ভিদে এটি অনুপস্থিত। সাধারণত নিউক্লিয়াসের খুব কাছাকাছি এটি অবস্থান করে। সেন্ট্রিয়োল জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। একজোড়া সেন্ট্রিয়োলকে একসাথে ডিপ্লোসোম (diplosome) বলে।

ভৌত গঠন : এটি নলাকার, প্রায় ০.১৫–০.২৫ μm ব্যাসবিশিষ্ট। এরা দেখতে বেলনাকার, দুই মুখ খোলা পিপার মতো। প্রতিটি সেন্ট্রিয়োল তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত; যথা- (১) প্রাচীর বা সিলিন্ডার ওয়াল (cylinder wall) (২) ত্রয়ী অণুনালিকা বা ট্রিপলেটস (triplets) এবং (৩) যোজক বা লিংকার (linkers)। এদেরকে একত্রে সেন্ট্রিয়োল বলে। সেন্ট্রিয়োল আবরণী বেষ্টিত নয় এবং এতে কোনো DNA বা RNA থাকে না। এরা প্রোটিন, লিপিড এবং ATP নিয়ে গঠিত।

সেন্ট্রিয়োল প্রাচীর ৯টি ত্রয়ী অণুনালিকা দিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অণুনালিকা সমদূরে অবস্থিত এবং প্রত্যেকে তিনটি করে উপনালিকা নিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানী Threadgold (1968) পরপর সংলগ্ন তিনটি উপনালিকাকে ভেতর থেকে বাইরের দিকে যথাক্রমে A, B ও C নামে চিহ্নিত করেন। উপনালিকাগুলো পার্শ্ববর্তী অণুনালিকার সাথে এক প্রকারের ঘন উপাদানের

সাহায্যে যুক্ত থাকে। সেন্ট্রিয়োলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরল পদার্থকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার (Centrosphere) ব... সেন্ট্রোস্ফিয়ার সেন্ট্রিয়োল ধারণ করে। সেন্ট্রোস্ফিয়ার ও সেন্ট্রিয়োলকে একত্রে সেন্ট্রোসোম (Centrosome) বলে। ১... সালে Bovery সেন্ট্রোসোম নামকরণ করেন।

রাসায়নিক গঠন : সেন্ট্রিয়োল সাধারণত প্রোটিন, লিপিড ও ATP নিয়ে গঠিত।

সেন্ট্রিয়োলের কাজ : (i) কোষ বিভাজনের সময় মাকুতন্তু গঠন করা। (ii) কোষ বিভাজনে সাহায্য করা। (iii) সি... ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষে সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি করা। (iv) শুক্রাণুর লেজ গঠন করা।

৮। কোষীয় কঙ্কাল (Cytoskeleton)

সকল প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলোর অন্তর্বর্তী স্থানে কতগুলো সূত্রক সম্মিলিতভাবে জালিকার ম... গঠন তৈরি করে। এদেরকে কোষীয় কঙ্কাল বা সাইটোস্কেলিটন বলে। বিজ্ঞানী কোল্টজফ (Koltzoff, 1928) এ... সাইটোস্কেলিটন শব্দটি ব্যবহার করেন। সাধারণত প্রোটিন নির্মিত তিন ধরনের সূত্রক সমন্বয়ে কোষীয় কঙ্কাল গঠি... এগুলো হলো- মাইক্রোটিউবিউলস, মাইক্রোফিলামেন্ট ও ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট। এরা কোষীয় চলনে এবং সেন্ট্রিয়ো... সিলিয়া ও ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

(১) মাইক্রোটিউবিউলস (Microtubules) : মাইক্রোটিউবিউলস অশাখ, লম্বা ও নলাকার। এরা কোষ বিভাজ... করণ, আন্তঃকোষীয় পরিবহন এবং ফ্ল্যাজেলা ও সিলিয়ার আন্দোলনে ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানী রবার্ট ও ফ্রা... (Robert ও Franchi) ১৯৫৩ সালে প্রাণীর স্নায়ুকোষে মাইক্রোটিউবিউলস আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী Ledbetter এ... Porter ১৯৫৩ সালে উদ্ভিদ কোষে এদের অবস্থান প্রথম প্রত্যক্ষ করেন।

ভৌত গঠন : প্রতিটি মাইক্রোটিউবিউলস দেখতে লম্বা, শাখাহীন, ফাঁপা টিউব জাতীয়। সাধারণত এদের ব্যাস ১০-২০ মিলিমাইক্রন এবং লম্বায় কয়েক মাইক্রন পর্যন্ত হয়। এদের এক প্রান্তকে '+' এবং অন্য প্রান্তকে '–' হিসেবে চিহ্নি... করা হয়।

রাসায়নিক গঠন : প্রতিটি মাইক্রোটিউবিউলসে ১৩টি প্রোটোটিউবিউল সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে। মাইক্রোটিউ-বিউলসের প্রতিটি প্রোটোটিউবিউল ডাইমেরিক প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এদের প্রতিটি প্রোটিন অণু $\alpha-\beta$ (আলফা-বিটা) টিউবিউলিন (tubulin) প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত।

অবস্থান : এরা ফ্ল্যাজেলা, সিলিয়া ইত্যাদির উপ-গাঠনিক উপাদান হিসেবে অবস্থান করে, ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে সংযুক্ত থাকে, স্পিন্ডল ফাইবারে থাকে, সেন্ট্রিয়োল ও বেসাল বডিতে থাকে।

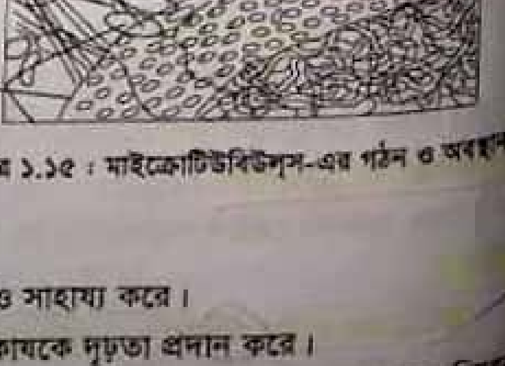

চিত্র ১.১৫ : মাইক্রোটিউবিউলস-এর গঠন ও অবস্থান।

মাইক্রোটিউবিউলস-এর কাজ :

(i) ফ্ল্যাজেলা, সিলিয়া ইত্যাদির আন্দোলনে সাহায্য করে।

(ii) কোষ বিভাজনের সময় মাইটোটিক অ্যাপারেটাস তৈরি করে; সেন্ট্রোমিয়ারের সাথে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোসোমকে পৃথক করতে এবং বিপরীত মেরুতে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

(iii) মাইক্রোফাইব্রিলের বিন্যাস নির্দেশ করে। এরা কোষ প্রাচীর গঠনেও সাহায্য করে।

(iv) এরা সাইটোস্কেলিটন বা কোষীয় কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে এবং কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

(v) সেল মেমব্রেন, নিউক্লিয়ার এনভেলপ ও অন্যান্য অঙ্গাণুর সাথে সংযুক্ত থেকে এদের সাথে যোগাযোগ ও পরিবহন কার্যে সাহায্য করে।

(২) মাইক্রোফিলামেন্ট (Microfilaments) : প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রোটিন দিয়ে তৈরি যেসব অতিসূক্ষ্ম সংকোচনশীল তন্তু কোষের চলনে অংশগ্রহণ করে তাদের মাইক্রোফিলামেন্ট বলে। বিজ্ঞানী প্যালেভিজ (Paleviz, 1974) প্রথম কোষে এদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। এদেরকে অ্যাকটিন ফিলামেন্টও (actin filaments) বলা হয়। এগুলো কোষ ঝিল্লির নিচে ফিতার ন্যায় বিন্যস্ত থেকে অবস্থান করে।

গঠন : মাইক্রোফিলামেন্ট সরু, লম্বা, সংকোচনশীল ও প্যাঁচানো দ্বিতন্ত্রী। সাধারণত এদের ব্যাস 30-60Å পর্যন্ত হয়। এরা অ্যাকটিন ও মায়োসিন প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

কাজ : (i) কোষের আকৃতি দান ও যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদানে অংশগ্রহণ করে।

(ii) এরা সাইটোপ্লাজমীয় চলন, ফ্যাগোসাইটোসিস, পিনোসাইটোসিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) এরা কোষের সাইটোকাইনেসিস ঘটিয়ে কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

(iv) কোষীয় অঙ্গাণুর অবস্থান পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে।

(v) এরা ক্রোমোসোমের বিপরীত মেরুতে চলনে সাহায্য করে।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট (Intermediate filaments) : এগুলো মাইক্রোটিউবিউলস ও মাইক্রোফিলামেন্টের মধ্যবর্তী এক ধরনের তন্তু। এদের আকৃতি প্রায় 10 nm (ন্যানোমিটার) ব্যাসবিশিষ্ট ফিলামেন্ট। এগুলো প্রোটিন দিয়ে গঠিত। বিভিন্ন কোষে চার ধরনের ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট পাওয়া যায়, যেমন- কেরাটিন, ল্যামিন, নিউরোফিলামেন্ট এবং ভাইমেন্টিন।

কাজ : (i) এরা কোষের আকৃতি দান ও যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদানে অংশগ্রহণ করে।

(ii) কোষের অন্যান্য তন্তুকে যথাস্থানে রাখতে সহায়তা করে।

৯। পারঅক্সিসোম (Peroxisome)

পারঅক্সিসোম প্রায় সব ধরনের কোষে দেখা গেলেও প্রাণীর কিডনি ও লিভার কোষে অধিক থাকে। অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের আউটপকেটিং-এর মাধ্যমে এরা তৈরি হয়। এরা এক আবরণী বিশিষ্ট, ব্যাস ০.২-১৭ μm, ভেতরে দানাদার। এর ভেতরে ক্রিস্টাল বা দানার আকারে সঞ্চয়ী এনজাইম জমা থাকে। এর মধ্যে catalase প্রধান এনজাইম। এদেরকে মাইক্রোসোম (microsome) নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৬৭ সালে বেলজিয়াম সাইটোলজিস্ট Christian de Duve কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে পারঅক্সিসোম অঙ্গাণুটি আবিষ্কার করেন। এই এনজাইম $2H_2O_2$ (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড)কে $2H_2O + O_2$ (পানি ও অক্সিজেন)-এ রূপান্তরিত করে। H_2O_2 বিষতুল্য, তাই catalase এনজাইমের সাহায্যে H_2O_2 কে H_2O ও O_2 এ রূপান্তর করে কোষকে রক্ষা করে। এছাড়া কোষে অক্সিজেনের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করাও এদের কাজ। O_2 প্রয়োজনীয়, কিন্তু অধিক হলে কোষের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া কো-এনজাইম NAD পুনঃউৎপাদনে, DNA এবং RNA এর নাইট্রোজেন ক্ষারসমূহ ভাঙতে (breakdown) এবং পুনঃউৎপাদনে (recycling) পারঅক্সিসোমের ভূমিকা আছে।

১০। গ্লাইঅক্সিসোম (Glyoxisome)

বীজের লিপিড সঞ্চয়ী কোষে এদেরকে দেখা যায়। এদের কাজ হলো বীজের অঙ্কুরোদগমকালে লিপিডকে ভেঙে গ্রহণোপযোগী চিনিতে পরিণত করা যাতে করে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে নিজের খাদ্য তৈরির আগ পর্যন্ত অঙ্কুরিত চারার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এরাও আবরণী বিশিষ্ট।

১১। কোষ গহ্বর (Cell Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে দৃশ্যত যে ফাঁকা অংশ দেখা যায় তাই কোষ গহ্বর। অপরিণত কোষে এদের সংখ্যা অনেক থাকে এবং আকারে অত্যন্ত ছোট থাকে। কিন্তু পরিণত উদ্ভিদ কোষে সবগুলো গহ্বর মিলিতভাবে একটি বড় আকৃতির গহ্বর সৃষ্টি করে। প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত যে পাতলা পর্দা এ গহ্বরকে বেষ্টন করে থাকে তাকে টনোপ্লাস্ট (tonoplast) বলে। এ পর্দা রাবার জাতীয়। কোষ গহ্বরের অভ্যন্তরের রসকে কোষরস বলে। কোষ রসে পানি, নানা প্রকার অজৈব লবণ, জৈব অ্যাসিড, শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার রং ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে।

কাজ : (i) কোষরস ধারণ করা। (ii) প্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ ধারণ করা। (iii) এরা কোষের অভ্যন্তরের pH রক্ষা করে। (iv) এরা কোষের ভেতরের পানির চাপ রক্ষা করে।

১.৪ নিউক্লিয়াস (Nucleus)

প্রকৃত কোষে যে অঙ্গাণু দ্বিস্তরবিশিষ্ট ডবল আবরণী বেষ্টিত অবস্থায় প্রোটোপ্লাজমিক রস ও ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করে তাই নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কোষের মস্তিষ্ক, প্রাণকেন্দ্র, কেন্দ্রিকা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) ১৮৩১ সালে অর্কিড (রাস্না) পত্রকোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার ও নামকরণ করেন। ল্যাটিন Nux বা nut থেকে Nucleus শব্দের উৎপত্তি।

সংখ্যা ও বিস্তৃতি : প্রতি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। আদি কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। সংখ্যক প্রকৃত কোষ, যেমন- সিভ কোষ, মানুষের লোহিত রক্ত কণিকা প্রভৃতিতে পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াসও থাকতে পারে, যেমন- *Vaucheria, Botrydium, Sphaeroplea* ইত্যাদি শৈবাল এবং *Penicillium* সহ কতিপয় ছত্রাক। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এ ধরনের গঠনকে সিনোসাইট (Coenocyte) বলা হয়।

আকৃতি : নিউক্লিয়াস সাধারণত বৃত্তাকার হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপবৃত্তাকার, ফিউজিফরম (মূলাকার), পাঁচ থালার মতো এবং শাখান্বিতও হতে পারে।

অবস্থান : নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের মাঝখানে অবস্থিত থাকে; কোষ গহ্বর বড় হলে নিউক্লিয়াসটি কিনারার দিকে অবস্থান করে।

আকার ও আয়তন : আকার ও আয়তনে এটি ছোট বড় হতে পারে। গোলাকার নিউক্লিয়াসের ব্যাস সাধারণত ৫ মাইক্রন। সচরাচর এটি কোষের ১০-১৫% স্থান দখল করে থাকতে পারে। স্পার্ম বা শুক্রাণুর প্রায় ৯০%ই নিউক্লিয়াস।

নিউক্লিয়াসের কাজ : নিউক্লিয়াস কোষের সব ধরনের জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে কোষের মস্তিষ্ক, কোষের প্রাণ বা প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। এতে ক্রোমোসোম থাকে যার দ্বারা বংশ পরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায়। এরা RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে এটি মূলত নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এতে থাকে সাধারণ প্রোটিন, লিপিড, এনজাইম, DNA এবং সামান্য RNA, কিছু পরিমাণ কো-এনজাইম ও অন্যান্য উপাদান।

একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের গঠন

নিম্নলিখিত চারটি অংশে নিয়ে একটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়— (ক) নিউক্লিয়ার এনভেলপ, (খ) নিউক্লিয়োপ্লাজম, (গ) নিউক্লিয়োলাস এবং (ঘ) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু।

(ক) নিউক্লিয়ার এনভেলপ (Nuclear envelope) : নিউক্লিয়াস দু'টি দ্বিস্তরী মেমব্রেন দ্বারা আবৃত স্থান। প্রতিটি মেমব্রেন দ্বিস্তরী ফসফোলিপিড বাইলেয়ার দ্বারা গঠিত। প্লাজমামেমব্রেন এবং অধিকাংশ অঙ্গাণুর আবরণী একটি দ্বিস্তরী মেমব্রেন দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াসের আবরণীকে নিউক্লিয়ার এনভেলপ বলা হয়। নিউক্লিয়ার এনভেলপে সর্বত্রই বিশেষ ধরনের অসংখ্য ছিদ্র থাকে যা অন্যান্য আবরণীতে থাকে না। ছিদ্রের ব্যাস ৯ nm. ছিদ্রের কাছে দুটি আবরণী এক সাথে মিলিত থাকে। প্রতিটি ছিদ্র সংকোচন-প্রসারণশীল। একটি প্রোটিন নেটওয়ার্ক দ্বারা এর সংকোচন-প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

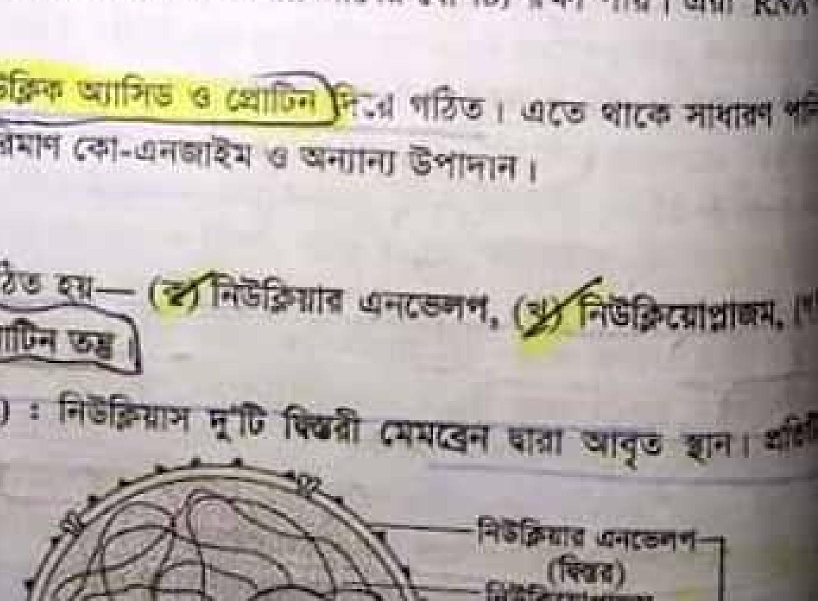

চিত্র ১.১৬ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট নিউক্লিয়াস ও এর বিভিন্ন অংশ।

ছিদ্রটিকে ঘিরে চারপাশে বৃত্তাকারে প্রোটিন গ্রানিউল থাকে এবং মাঝখানে একটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের প্রোটিন থাকে। একে ট্রান্সপোর্টার বলে। অ্যাংকর প্রোটিন দ্বারা ট্রান্সপোর্টার নিউক্লিয়ার এনভেলপের সাথে সংযুক্ত থাকে। বৃত্তাকার

প্রোটিনগুলো স্পোক দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। প্রোটিন-এ সাবইউনিট ও ফাইবার থাকতে পারে। নিউক্লিয়াসের ভেতরের দিকে একটি ফাইবার খাঁচার মাধ্যমে সবগুলো প্রোটিন একসাথে ঝুলে থাকে। মোট ৮টি প্রোটিন গ্রানিউল দ্বারা ছিদ্রটি নিয়ন্ত্রিত। কেন্দ্রীয় প্রোটিনটি বিভিন্ন দ্রব্য, বিশেষ করে বড় অণু যেমন- RNA; নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইর থেকে ভেতরে পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো স্থানে নিউক্লিয়ার এনভেলপের বাইরের আবরণী অন্যকোনো অঙ্গাণুর, বিশেষ করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে সংযুক্ত থাকে।

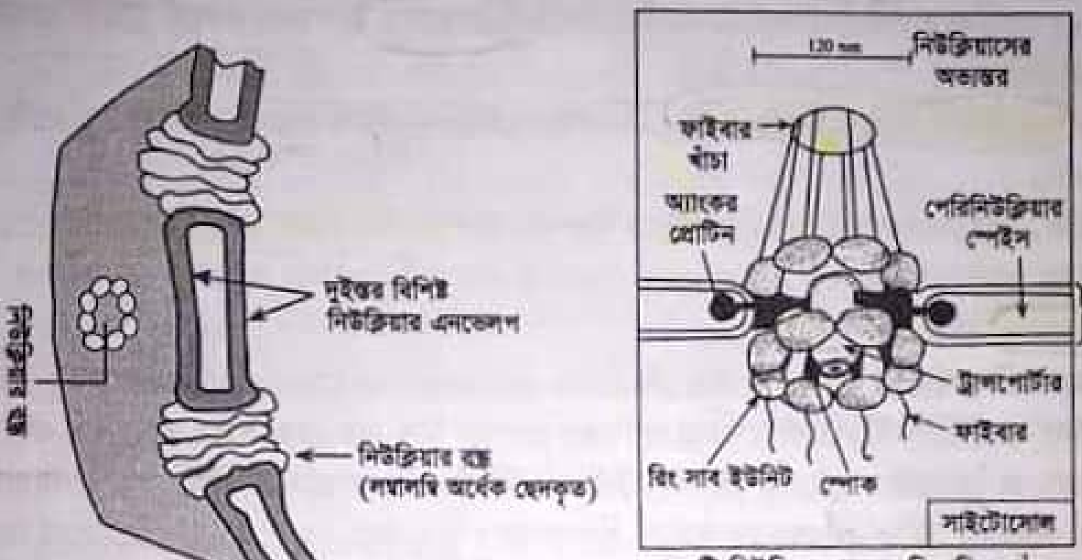

একটি নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের বিস্তারিত গঠন

চিত্র ১.১৭ : নিউক্লিয়ার রন্ধ্রের গঠন।

নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর কাজ : (i) সাইটোপ্লাজম হতে নিউক্লিয়োপ্লাজম, নিউক্লিয়োলাস এবং ক্রোমাটিন জালিকাকে পৃথক করা এবং সংরক্ষণ করা। (ii) অভ্যন্তরীণ দ্রব্য ও বহিস্থ সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও পরিবহন করা। (iii) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়াসের অবস্থানকে দৃঢ় করা। (iv) অভ্যন্তরে উৎপন্ন উপাদান রন্ধ্রের মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমে পাঠানো।

(খ) নিউক্লিয়োপ্লাজম (Nucleoplasm) : নিউক্লিয়ার এনভেলপ দ্বারা আবৃত স্বচ্ছ, ঘন ও দানাদার তরল পদার্থই নিউক্লিয়োপ্লাজম। একে ক্যারিওলিম্ফ-ও বলে। এটি নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমিক রস। প্রোটোপ্লাজমের বৈশিষ্ট্যসমূহ এতে বিদ্যমান। নিউক্লিয়োলাস এবং ক্রোমোসোম এতে অবস্থান করে।

নিউক্লিয়োপ্লাজমের কাজ : (i) ক্রোমাটিন জালিকা ধারণ করা, (ii) নিউক্লিয়োলাস ধারণ করা, (iii) নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন জৈবনিক কাজে সাহায্য করা, (iv) এনজাইমের কার্যকলাপের মূল ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা।

সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়োপ্লাজমের মধ্যে পার্থক্য

সাইটোপ্লাজমের মতো নিউক্লিয়োপ্লাজমও রাসায়নিকভাবে অজৈব ও জৈব উপাদান দিয়ে গঠিত। সাইটোপ্লাজমের ন্যায় এটি কলয়ডাল নয়, এটি এমোর্ফাস (amorphous)। এতে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক বেশি। এতে আছে ক্ষারীয় প্রোটিন, অম্লীয় প্রোটিন, সেডিমেন্টেবল প্রোটিন, কো-এনজাইম, অ্যাসিটাইল কো-এ ইত্যাদি। এতে কোনো পিগমেন্ট থাকে না। ক্রোমোসোম গঠনের মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ হলো নিউক্লিয়োপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুসমূহ এখানে অনুপস্থিত।

(গ) নিউক্লিয়োলাস (Nucleolus) : নিউক্লিয়াসে যে ছোট ও অধিকতর ঘন গোলাকার বস্তু দেখা যায় তাই নিউক্লিয়োলাস। বিজ্ঞানী ফন্টানা (Fontana) ১৭৮১ সালে সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এটি দেখতে পান এবং ১৮৪০ সালে বোম্যান (Bowman) এর নামকরণ করেন।

অবস্থান : নিউক্লিয়োলাস সাধারণত নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে লাগানো থাকে। ক্রোমোসোমের স্থানটিতে এটি লাগানো থাকে সে স্থানটিকে বলা হয় SAT বা সেটেলাইট।

সংখ্যা : প্রতি নিউক্লিয়াসে সাধারণত একটি নিউক্লিয়োলাস থাকে। সাধারণত যে সব কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয় না সে সব কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়োলাস থাকে না। যে সব কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ বেশি পরিমাণ হয় সে সব কোষের নিউক্লিয়াসে একাধিক নিউক্লিয়োলাস থাকতে পারে।

উৎপত্তি : SAT ক্রোমোসোমের সেটেলাইটে অবস্থিত জিন নিউক্লিয়োলাস উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ভৌত গঠন : এর কোনো স্থিতি আবিষ্কৃত হয়নি। নিউক্লিয়োলাসকে সাধারণত তন্তুময়, দানাদার ও ম্যাট্রিক্স -এ অংশে ভাগ করা যায়।

রাসায়নিক গঠন : নিউক্লিয়োলাসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন, RNA এবং যৎসামান্য DNA।

নিউক্লিয়োলাসের কাজ : (i) বিভিন্ন প্রকার RNA সংশ্লেষণ করা, (ii) প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা, (iii) নিউক্লিয়োটাইডের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা।

(ঘ) নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু (Nuclear reticulum or Chromatin fibre) : কোষের বিশ্রাম অবস্থায় (অ-বিভাজন অবস্থায়) নিউক্লিয়াসের ভেতরে জালিকার আকারে কিছু তন্তু দেখা যায়। তন্তুঘটিত এই জালিকাকে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু বলা হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনরত অবস্থায় বা পর্যায় মধ্যক অবস্থায় যে অংশ বা বস্তু ক্ষারকীয় রং নেয় সেই বস্তুকে বলা হয় ক্রোমাটিন। প্রকৃতপক্ষে DNA এবং এর সাথে সাথী প্রোটিনের মিলিত অংশই ক্রোমাটিন। কোষ বিভাজন অবস্থায় ক্রোমাটিন তন্তু ক্রমাগত কুণ্ডলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়ে পৃথক পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ও আকৃতিতে দৃশ্যমান হয় তখন এদেরকে ক্রোমোসোম বলা হয়। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে সাধারণত প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র বিভাজনরত কোষেই বিশেষ রঞ্জন পদ্ধতিতে এদেরকে দেখা যায়। প্রতিটি ক্রোমোসোমে এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার, দু'টি ক্রোমাটিড এবং কোনো কোনো ক্রোমোসোমে সেটেলাইট থাকে। ক্রোমোসোমে জিন অবস্থিত এবং জিনগুলো প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দায়ী।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে প্রতিটি ক্রোমোসোম DNA, RNA, হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে গঠিত; এ ছাড়া কিছু ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ধাতু আছে। কতগুলো নিউক্লিয়োটাইডের সমন্বয়ে একটি DNA অণু গঠিত।

নিউক্লিয়ার রেটিকুলামের কাজ : (i) বংশগতির বৈশিষ্ট্যের ধারণ ও বাহন হিসেবে কাজ করা, (ii) মিউটেশন, প্রকরণ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজেও মুখ্য ভূমিকা পালন করা।

> **কাজ :** পোস্টার পেপারে বড় করে একটি নিউক্লিয়াসের চিত্র আঁকতে হবে এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে। এবার নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়োলাসের মধ্যকার পার্থক্য একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে।
>
> **উপকরণ :** পোস্টার-পেপার, পেন্সিল, রং পেন্সিল, স্কেল, ইত্যাদি।

কোষস্থ নির্জীব বস্তু (Ergastic substances) : কোষীয় বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট বহু নির্জীব বস্তু কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং কোষ গহ্বরে জমা হয়। নির্জীব বস্তুগুলো দ্রবীভূত অবস্থায়, ক্রিস্টাল হিসেবে, ফোঁটা বা দানাদার বস্তু হিসেবে অবস্থান করতে পারে। নির্জীব বস্তুগুলোকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (ক) সঞ্চিত পদার্থ, (খ) নিঃসৃত পদার্থ এবং (গ) বর্জ্য পদার্থ। বাকি PEN

(ক) সঞ্চিত পদার্থ (Reserve materials) : প্রধান প্রধান সঞ্চিত পদার্থগুলো হলো-শর্করা (কার্বোহাইড্রেট), আমিষ (প্রোটিন) এবং চর্বি (লিপিড)। দ্রবণীয় শর্করার মধ্যে থাকে গ্লুকোজ, চিনি, ইনুলিন। অদ্রবণীয় শর্করার মধ্যে থাকে

স্টার্চগ্রেইন (শ্বেতসার দানা), সেলুলোজ এবং গ্লাইকোজেন। তৈল এবং চর্বি সাধারণত ফোঁটা ফোঁটা হিসেবে সাইটোপ্লাজমে বিরাজ করে। আমিষ তথা নাইট্রোজেনঘটিত সঞ্চিত পদার্থগুলো তরল এবং নিরেট উভয় অবস্থায় বিরাজ করে। সঞ্চিত পদার্থের অধিকাংশই সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

(খ) নিঃসৃত পদার্থ (Secretory products) : প্রধান প্রধান নিঃসৃত পদার্থ হলো পিগমেন্ট, এনজাইম, হরমোন এবং নেকটার। ক্লোরোফিল, এনথোসায়ানিন, ক্যারোটিনয়েড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পিগমেন্ট।

(গ) বর্জ্য পদার্থ (Excretory products) : বর্জ্য পদার্থসমূহ অধিকাংশই প্রোটোপ্লাজমের মেটাবলিক কার্য প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদে বর্জ্য পদার্থ নির্গমনের পৃথক তন্ত্র না থাকায় এরা কোষে জমা হয়। উল্লেখযোগ্য বর্জ্য পদার্থসমূহ হলো রেজিন, ট্যানিন, গাম, ল্যাটেক্স, অ্যালকালয়েড, অর্গানিক অ্যাসিড, উদ্বায়ী তেল এবং খনিজ ক্রিস্টাল। প্রধান খনিজ ক্রিস্টাল হলো ক্যালসিয়াম অক্সালেট। কখনো এরা সূঁচের মতো আকারে অবস্থান করে। তখন একে বলা হয় র‍্যাফাইড। আঙুরের থোকার মতো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ক্রিস্টালকে বলা হয় সিস্টোলিথ (cystolith)।

কাজ : চার্ট তৈরি-সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুগুলোর নাম, গঠন ও কাজ। **উপকরণ :** পোস্টার পেপার, রংপেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি। একটি বড় পোস্টার পেপারে একটি ছক কেটে বামপাশে অঙ্গাণুগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত চিত্র, মাঝখানের ঘরে এদের গঠন এবং ডানপাশের ঘরে এদের কাজ লিখে একটি ছক তৈরি করতে হবে। ছকটি পাঠকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষে ঝুলাতে হবে।

জীবের বিভিন্ন কার্যক্রমে কোষের অবদান : জীবের গঠন ও কার্যের একক হলো কোষ। জীবদেহের সকল কার্যক্রম কোষভিত্তিক। গ্লাইকোলাইসিস, শ্বসন, ফটোসিনথেসিস, কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধি, প্রোটিন সিনথেসিস, এনজাইম তৈরি ইত্যাদি প্রক্রিয়ার রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ সবই কোষের সাইটোপ্লাজম বা অঙ্গাণুগুলোতে সংঘটিত হয়। জীবের সকল কার্যক্রমের আধার হলো কোষ।

ক্রোমোসোম (Chromosome)

ক্রোমোসোম নিউক্লিয়াসের অন্যতম বস্তু। প্রত্যেক নিউক্লিয়াসে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণত একই প্রজাতির বিভিন্ন নমুনায় ক্রোমোসোম সংখ্যা একই থাকে। আদি কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস না থাকাতে তাতে কোনো সুগঠিত ক্রোমোসোম থাকে না। তবে ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান DNA (কতক ভাইরাসে RNA) বিদ্যমান থাকে। এদেরকে আদিক্রোমোসোম (prochromosome) বলা হয়। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বিভাজনরত কোষে ক্রোমোসোম দেখা যায়। এ জন্য সাধারণত বিশেষ রঞ্জক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

কোষস্থ নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত অনুলিপন ক্ষমতাসম্পন্ন, রং ধারণকারী এবং নিউক্লিয়োপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সব সূত্রাকৃতির ক্ষুদ্রাঙ্গ বংশগতীয় উপাদান, মিউটেশন, প্রকরণ প্রভৃতি কাজে ভূমিকা পালন করে তাদেরকে ক্রোমোসোম বলে। ক্রোমোসোম কখনো কখনো নিউক্লিয়াসের বাইরে সাইটোপ্লাজমেও থাকতে পারে।

আবিষ্কার : **Karl Nagli** (1842) সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম প্রত্যক্ষ করেন। **E. Strasburger** (1875) কোষ বিভাজনের সময় সুতার মতো কিছু গঠন লক্ষ্য করেন। **Walter Flemming (1888)** এসব সুতার মতো গঠনগুলোকে ক্রোমাটিন (chromatin) নামকরণ করেন। বর্ণধারণ ক্ষমতার জন্য **W. Waldeyer (1888)** এদের ক্রোমোসোম নামকরণ করেন। গ্রিক *Chroma* অর্থ colour (বর্ণ) এবং *soma* অর্থ body (দেহ)। কাজেই ক্রোমোসোম অর্থ হলো **'রঞ্জিত দেহ'** বা **'রং ধারণকারী দেহ'**। কারণ এরা কতগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে। **Sutton** ও **Boveri** (1902) ক্রোমোসোমকে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের বাহক ও ধারক হিসেবে বর্ণনা করেন। **Theophilus Painter** (1921) সর্বপ্রথম মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

সংখ্যা : প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে এর সংখ্যা ২ হতে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদে সর্বাধিক সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া গিয়েছে *Ophioglossum reticulatum* ১২০০। পুষ্পক উদ্ভিদে সর্বনিম্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া

গিয়েছে *Haplopappus gracilis*, 2n = 4 এবং সর্বাধিক সংখ্যক *Poa littarosa*, 2n = 506 - 530। প্রাণীতে সর্বনিম্ন 2, (গোলকৃমি = *Ascaris megalocephalus* sub. sp. *univalens*) এবং সর্বাধিক 2n = 1600 (রেডিওলারিয়া প্রোটোজোয়া = *Aulacantha* sp. এ)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এখনো সমস্ত জীবজগতের ১০ ভাগও ক্রোমোসোম করা হয়নি। উচ্চতর জীবে সাধারণত প্রতি দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা ২ হতে ৮০-এর মধ্যে থাকে।

নিচে কয়েকটি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোসোম সংখ্যা উল্লেখ করা হলো—

উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা (2n)	প্রাণীর নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা (2n)
ধান	*Oryza sativa*	24	মানুষ	*Homo sapiens*	46
গম	*Triticum aestivum*	42	গরু	*Boss indica*	60
ভুট্টা	*Zea mays*	20	ছাগল	*Capra hircus*	60
পিঁয়াজ	*Allium cepa*	16	কবুতর	*Columba livia*	80
শসা	*Cucumis sativus*	14	সোনাব্যাঙ	*Rana pipiens*	26
গোল আলু	*Solanum tuberosum*	48	খরগোশ	*Oryctolagus cuniculus*	44
টমেটো	*Lycopersicon esculentum*	24	গরিলা	*Gorilla gorilla*	48
তামাক	*Nicotiana tabacum*	28	গিনিপিগ	*Cavia porcellus*	64
পেঁপে	*Carica papaya*	18	গৃহমাছি	*Musca domestica*	12
বাঁধাকপি	*Brassica oleracea*	18	ফলের মাছি	*Drosophila melanogaster*	08
পাট	*Corchorus capsularis*	14	কিউলেক্স মশা	*Culex pipiens*	06
মুলা	*Raphanus sativus*	18	গোলকৃমি	*Ascaris megalocephalus*	2
চীনাবাদাম	*Arachis hypogaea*	40	রেশম পোকা	*Bombyx mori*	46

আয়তন ও আকৃতি : সাধারণত প্রতিটি প্রজাতির জীবে ক্রোমোসোমের একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন থাকে। প্রজাতি অনুসারে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩.৫–৩০ মাইক্রোমিটার এবং ব্যাস ০.২-২.০ মাইক্রোমিটার হয়ে থাকে। মানবদেহের ক্রোমোসোমের গড় দৈর্ঘ্য ৪-৬ মাইক্রোমিটার। *Drosophila* মাছির ৩ মাইক্রোমিটার ও ভুট্টার ৮-১২ মাইক্রোমিটার।

অবস্থান : নিউক্লিয়াসে।

ক্রোমোসোমের ভৌত গঠন

কোষে স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রোমোসোম পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় এগুলো অত্যন্ত সুগঠিত থাকে এবং পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। জটিল (যৌগিক) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোমোসোমের নিম্নলিখিত অংশগুলো লক্ষ করা যায়।

১। ক্রোমাটিন (Chromatin) : ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো ক্রোমাটিন (রঞ্জিত সূত্রাকার দেহ) যা প্রকৃতপক্ষে DNA প্রোটিন যৌগ। প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়োপ্রোটিন যৌগের সূত্রটি 11 nm পুরু যা ক্রমান্বয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে 30 nm, 300 nm এবং শেষ পর্যায়ে 700 nm পুরু ক্রোমাটিনে পরিণত হয় (মানুষের একটি ক্রোমোসোমে DNA ১০,০০০ ভাঁজ খাটো হতে দেখা যায়।)। হিস্টোন প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় DNAকে বলা হয় নিউক্লিয়োসোম। Heitz (1928) ক্রোমাটিন তন্তুকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা-হেটেরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন।

ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমাটিনের যে অংশ অধিক কুণ্ডলিত থাকে তাকে হেটেরোক্রোমাটিন বলে। এই অংশ বংশানুসৃতিতে অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকে। mRNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না। ক্রোমাটিনের যে অংশ কম

কুণ্ডলিত থাকে সেই অংশকে ইউক্রোমাটিন বলা হয়। এই অংশ বংশানুস্মৃতিতে সক্রিয় থাকে। এটি ক্রোমোসোমের বিস্তৃত অংশ এবং mRNA সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

২। ক্রোমাটিড (Chromatid) : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোম প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় এবং মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোমকে লম্বালম্বিভাবে দুটি অংশে বিভক্ত দেখা যায় যার প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমোসোমে সমান ও সমান্তরাল এক জোড়া ক্রোমাটিড থাকে। এরা সাধারণত সিস্টার ক্রোমাটিড নামে পরিচিত। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ক্রোমাটিড একটি একক DNA অণু দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী Vejdovsky (1921) এদের ক্রোমোনেমাটা (একবচন-ক্রোমোনেমা) নামে অভিহিত করেছেন।

৩। সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) : প্রতিটি ক্রোমোসোমে একটি অরঞ্জিত অঞ্চল থাকে। ক্রোমাটিডের এই অরঞ্জিত অঞ্চলকে বলা হয় সেন্ট্রোমিয়ার। সিস্টারক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানটি ক্রোমোসোমে একটি খাঁজ-এর সৃষ্টি করে। এই খাঁজকে বলা হয় মুখ্যকুঞ্চন বা Primary constriction। আদর্শ ক্রোমোসোমে একটিমাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় একটি ক্রোমোসোমে ২টি বা অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকতে পারে, আবার একটিও না থাকতে পারে।

৪। বাহু (Arm) : সেন্ট্রোমিয়ার-এর দুপাশের ক্রোমোসোমাল অংশকে বাহু বলা হয়। প্রতিটি ক্রোমোসোমের দুটি বাহু থাকে। বাহু দুটি সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বা অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হতে পারে। ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বাহু দুটির দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হয়।

৫। কাইনেটোকোর (Kinetochore) : প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ারে একটি ছোট গাঠনিক অবকাঠামো থাকে যাকে কাইনেটোকোর বলে। কাইনেটোকোর-এ মাইক্রোটিউবিউল সংযুক্ত হয়।

৬। ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) : মায়োটিক প্রোফেজ-এর সূচনালগ্নে ক্রোমোসোমের দেহে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা দেখা যায় সেগুলো ক্রোমোমিয়ার নামে পরিচিত। মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়।

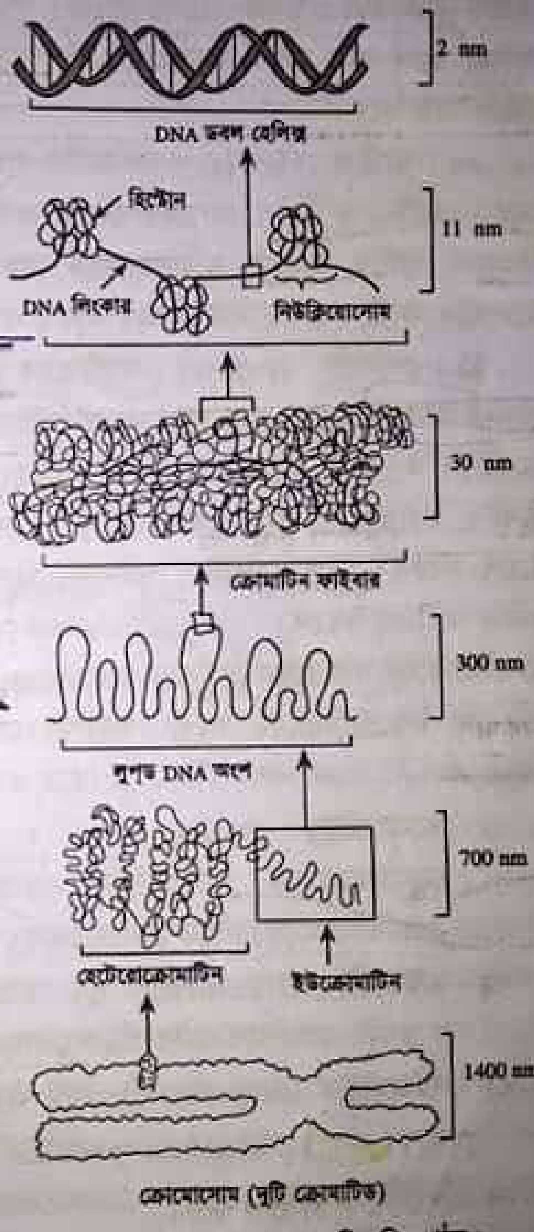

চিত্র ১.১৮ : ক্রোমোসোমের বিস্তারিত গঠন।

৭। গৌণকুঞ্চন (Secondary constriction) : সেন্ট্রোমিয়ার নামক মুখ্যকুঞ্চন ছাড়াও কোনো কোনো ক্রোমোসোমের বাহুতে এক বা একাধিক গৌণকুঞ্চন থাকতে পারে। গৌণকুঞ্চনকে 'নিউক্লিয়োলাস পুনর্গঠন অঞ্চল' নামেও অভিহিত করা হয়।

৮। স্যাটেলাইট (Satellite) : কোনো কোনো ক্রোমোসোমের এক বাহুর প্রান্তে ক্রোমাটিন সূত্র দ্বারা সংযুক্ত প্রায় গোলাকৃতির একটি অংশ দেখা যায়। ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকের এ গোলাকৃতি অঞ্চলকে স্যাটেলাইট এবং এ ধরনের ক্রোমোসোমকে 'স্যাট ক্রোমোসোম' (sat chromosome) বলে। অন্যভাবে নিউক্লিয়োলাস বহনকারী ক্রোমোসোমকে স্যাট

ক্রোমোসোম বলে। তুলা, পাট, ছোলা ইত্যাদি উদ্ভিদে কোনো কোনো ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট আছে। ক্রোমোসোমে স্যাটেলাইট থাকে।

৯। টেলোমিয়ার (Telomere) : বিজ্ঞানী এইচ. জে. মুলার (H.J. Muller)-এর মতে ক্রোমোসোমের উভয় প্রান্তের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলকে টেলোমিয়ার বলে। অধিক বয়সে মানুষের জরা রোধে টেলোমিয়ার বিশেষ ভূমিকা রাখে বলে ধারণা করা হয়। টেলোমারেজ এনজাইম মানুষের জরা রোধে কাজ করে।

১০। ম্যাট্রিক্স (Matrix) : ক্রোমাটিন সূত্রের চারদিকে পেলিকল দ্বারা আবৃত প্রোটিন ও RNA পদার্থের স্তরকে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা বলে। কোষ বিভাজন পর্যায়ে ম্যাট্রিক্স দ্রবীভূত হয়ে যায়। তবে আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যাট্রিক্স এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি।

১১। পেলিকল (Pelicle) : ম্যাট্রিক্সসহ ক্রোমোসোমের বাইরে একটি পাতলা আবরণী কল্পনা করা হয়। একে পেলিকল বলে। আধুনিক গবেষণায় ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পেলিকলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। তবে ম্যাক ক্লিন্টন, সোয়ানসন প্রমুখ কোষ বিজ্ঞানী ক্রোমোসোমে পেলিকলের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু ডার্লিংটন, নভিকফ, রিস প্রমুখ বিজ্ঞানী পেলিকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

চিত্র ১.১৯ : ক্রোমোসোমের স্থূল গঠ

ক্রোমোসোমের প্রকারভেদ (Types of Chromosome)

(ক) সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ক্রোমোসোম নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার; যথা—

- **মনোসেন্ট্রিক (Monocentric)** : এক সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোসোমকে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। অধিকাংশ প্রজাতিতে মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম দেখা যায়।
- **ডাইসেন্ট্রিক (Dicentric)** : দুই সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোসোমকে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। কয়েকটি প্রজাতিতে ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম দেখা যায়।
- **পলিসেন্ট্রিক (Polycentric)** : দুই এর অধিক সেন্ট্রোমিয়ার বিশিষ্ট ক্রোমোসোমকে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমো বলে। কলা গাছের (*Musa sp*) কয়েকটি প্রজাতিতে পলিসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম দেখা যায়।
- **ডিফিউজড (Diffused)** : ক্রোমোসোমের সুনির্দিষ্ট স্থানে সুস্পষ্টভাবে কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না।
- **অ্যাসেন্ট্রিক (Acentric)** : এক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের কোনো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না। তখন তাকে অ্যাসে ক্রোমোসোম বলে। কোষ বিভাজনে এরা অংশগ্রহণ করে না। সদ্য ভঙ্গুরকৃত কোনো ক্রোমোসোমের অংশবি এ ধরনের হয়।

(খ) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম নিম্নলিখিত চার আকৃতির হয়, যথা—

(i) মধ্যকেন্দ্রিক বা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Metacentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একে মাঝখানে অবস্থিত তাকে মধ্যকেন্দ্রিক বা মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। মধ্যকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমের দুই বাহু সম বিশিষ্ট হয় এবং অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখায়। *Solanum nigrum* এর সক ক্রোমোসোমই মধ্যকেন্দ্রিক। মধ্যকেন্দ্রিক আদি বৈশিষ্ট্য।

(ii) উপ-মধ্যকেন্দ্রিক বা সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Submetacentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি মধ্যখান থেকে একটু এক পাশে অবস্থিত তাকে উপ-মধ্যকেন্দ্রিক বা সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। উপ-মধ্যকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমের দুই বাহু সামান্য অসম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয় এবং অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'L' অক্ষরের মতো দেখায়।

(iii) উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক বা এক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Acrocentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি কোনো এক প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থিত তাকে উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক বা এক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমের এক বাহু অনেক লম্বা এবং অপর বাহু বেশ খাটো থাকে। অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'J' অক্ষরের মতো দেখায়। একই উদ্ভিদ প্রজাতিতে একাধিক প্রকার ক্রোমোসোম থাকতে পারে; যেমন- *Typhonium trilobatum* (ঘেটকচু) এর গাঢ় পার্পল প্রকরণে ১১টি মধ্যকেন্দ্রিক, ৪টি উপ-মধ্যকেন্দ্রিক এবং ২টি উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক। এটি একটি মনোসোমিক উদ্ভিদ।

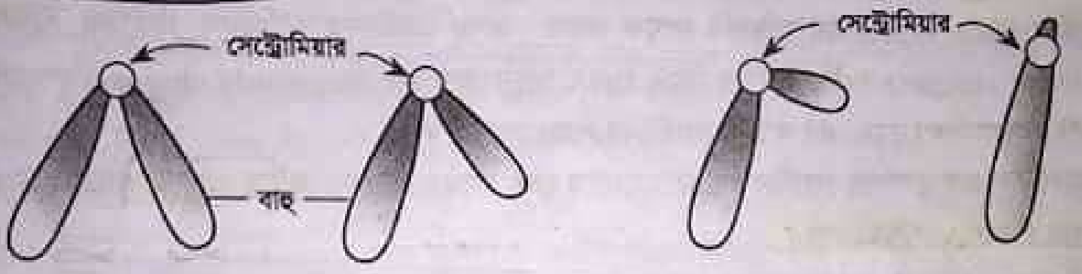

চিত্র ১.২০ : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম।

(iv) প্রান্তকেন্দ্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম (Telocentric) : যে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে প্রান্তভাগে অবস্থিত তাকে প্রান্তকেন্দ্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম বলে। প্রান্তকেন্দ্রিক ক্রোমোসোমকে এক বাহু বিশিষ্ট মনে হয়। অ্যানাফেজ পর্যায়ে এর আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'I' অক্ষরের মতো বা একটি দণ্ডের মতো দেখায়। উদ্ভিদে সাধারণত প্রান্তকেন্দ্রিক ক্রোমোসোম থাকে না।

(গ) দেহ গঠন ও লিঙ্গ নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রোমোসোম দু'ধরনের হয়, যথা-

১। অটোসোম (Autosome) : যেসব ক্রোমোসোম দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে তাদেরকে অটোসোম বলে। অটোসোমের সেটকে A চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম।

২। সেক্স ক্রোমোসোম (Sex chromosome) : সেক্স ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। সেক্স ক্রোমোসোম দু'প্রকার; যথা- X ও Y। মানুষের একজোড়া সেক্স ক্রোমোসোম থাকে। স্ত্রীদেহে দুটি সেক্স ক্রোমোসোম এক প্রকার (XX) এবং পুরুষ দেহে সেক্স ক্রোমোসোম দুটি ভিন্ন ধরনের (XY) হয়।

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন বা উপাদান : ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। ক্রোমোসোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো : (১) নিউক্লিক অ্যাসিড ও (২) প্রোটিন।

(১) নিউক্লিক অ্যাসিড : ক্রোমোসোমে দু'ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়; যথা : (i) DNA ও (ii) RNA।

(i) DNA : DNA এর পুরো নাম Deoxyribo Nucleic Acid। DNA হলো প্রকৃত ক্রোমোসোমের স্থায়ী উপাদান। ক্রোমোসোমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ। এটি দ্বি'সূত্রবিশিষ্ট পলি নিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থায়ামিন ও সাইটোসিন) থাকে। বিজ্ঞানী সুইফট (১৯৬৪) এবং বোনার (১৯৬৮)-এর মতে ক্রোমোসোমে DNA ও হিস্টোন প্রোটিনের অনুপাত হচ্ছে ১ : ১। জীবের প্রায় ৯০ ভাগ DNA ক্রোমোসোমে থাকে।

(ii) RNA : RNA এর পুরো নাম Ribo Nucleic Acid। ক্রোমোসোমে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ০.২–১.৪ ... RNA ক্রোমোসোমের স্থায়ী উপাদান নয়। প্রতিটি RNA অণু সাধারণত একসূত্রবিশিষ্ট। এটি পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল ও সাইটোসিন দ্বারা গঠিত। অনেক ভাইরাস কোষে DNA এর পরিবর্তে RNA থাকে।

(২) প্রোটিন : প্রোটিন ক্রোমোসোমের মূল কাঠামো গঠনকারী রাসায়নিক উপাদান। এ কাঠামোতে নিউক্লিক অ্যাসিড বিন্যস্ত থাকে। ক্রোমোসোমে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ। ক্রোমোসোমে দু'ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়। যথা– (i) নিম্ন আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রোটিন ও (ii) উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন অম্লীয় প্রোটিন।

(i) নিম্ন আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রোটিন : ক্রোমোসোমে প্রোটামিন অথবা হিস্টোন হিসেবে এ দুটি ক্ষারীয় প্রোটিনের মধ্যে যে কোনো একটিকে পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ ক্রোমোসোমে হিস্টোন প্রোটিন থাকে। প্রোটামিন পাওয়া যায় শুধু শুক্রাণুর ক্রোমোসোমে। ক্রোমোসোমে হিস্টোনের পরিমাণ DNA এর পরিমাণের কাছাকাছি থাকে।

কতক প্রোটিন DNA অণুর সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। এসব প্রোটিনের আর্জিনিন, লাইসিন, হিস্টিডিন ইত্যাদির ধনাত্মক (Positively charged) সাইড গ্রুপের সাথে DNA অণুর ঋণাত্মক (negatively charged) ফসফেট গ্রুপের ... তৈরি করে। অন্যান্য প্রোটিন DNA-এর বাউন্ড প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

(ii) উচ্চ আণবিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রোটিন : ক্রোমোসোমে বেশ কয়েক ধরনের অম্লীয় প্রোটিন থাকে। উল্লেখযোগ্য হলো DNA পলিমারেজ ও RNA পলিমারেজ।

উল্লিখিত উপাদান ছাড়াও ক্রোমোসোমে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লিপিড, এনজাইম, আয়রন এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে থাকে।

ক্রোমোসোমের কাজ : (১) ক্রোমোসোম বংশগতির ধারক ও বাহক, তাই বংশপরম্পরায় জীবের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, বহন করে এবং স্থানান্তর করে। (২) বিভক্তির মাধ্যমে ক্রোমোসোম কোষ বিভাজনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। (৩) ... জিন-অণু ধারণ করে। (৪) DNA-এর ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি mRNA এর মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। (৫) ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। (৬) বংশগতির বাহক জিন জীবের জীবনের ব্লু প্রিন্ট হিসেবে কাজ করে।

কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোমের ভূমিকা (The role of chromosome in the cell division)

জীবদেহের বৃদ্ধি ও জনন উভয় কাজের জন্যই কোষ বিভাজন জরুরি। কোষ বিভাজনের মুখ্য বস্তু ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমকে বাদ দিয়ে কোষ বিভাজন সম্ভব নয়। কোষ বিভাজনের শুরু এবং শেষ উভয়ই ক্রোমোসোম নির্ভর। ক্রোমোসোমে অবস্থিত DNA প্রতিলিপনের মাধ্যমে কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ক্রোমোসোমস্থ DNA প্রতিলিপিত না হলে কোষ বিভাজন শুরু হবে না। কাজেই দেখা যায় কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোমের ভূমিকা মুখ্য। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোষস্থ ক্রোমোসোমের প্রতিলিপন, দ্বিত্বন, বিভাজন ও মেরুকরণ সবই আবশ্যকীয় বিষয়। ... ক্রোমোসোমবিহীন কোষ তার অস্তিত্বও রক্ষা করতে পারে না, এমনকি কোষ বিভাজনকালে ক্রোমোসোমের বণ্টন নীতি ... বহির্ভূত হলে কোষের বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বে বিরূপ প্রভাব পড়বে। কাজেই বলা যায়, কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় ক্রোমোসোমের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ক্রোমোসোম কতবার বিভক্ত হবে তার উপর নির্ভর করে কোষ বিভাজনের ধরন, মাইটোসিস বা মায়োসিস।

বংশগতীয় বস্তু (Genetic materials)

মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততি পেয়ে থাকে। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। আমরা আমের বীজ থেকে আম গাছ, কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল গাছ, ধানের বীজ থেকে ধান গাছ, পাটের বীজ থেকে পাট গাছ হতে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। ইংরেজি প্রবাদ 'Like father like son' ...

'যেমন পিতা তেমন পুত্র'। এ বিষয় নিয়ে গবেষণার প্রথম পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা ধারণা পান যে, মাতা-পিতার মিলনে প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। মাতা-পিতা হতে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে আসার প্রক্রিয়াকে বংশগতি (heredity) বলে। একে জেনেটিক ট্রান্সমিশন (genetic transmission)ও বলা হয়। জেনেটিক ট্রান্সমিশন হলো বংশগতির সমনাম। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে বংশগতিবিদ্যা (genetics) বলে।

যেসব বস্তুর মাধ্যমে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান-সন্ততিতে বাহিত হয় তাদেরকে একত্রে বংশগতি বস্তু (hereditary material) বলা হয়। বংশগতীয় বস্তুর প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমে রয়েছে DNA, যেখানে জিনগুলো সুসজ্জিত থাকে। জিনই হচ্ছে জীবের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক যা পর্যায়ক্রমে বাহ্যিক চরিত্রসমূহ ফুটিয়ে তোলে। নিচে এগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)

১৮৬৯ সালে সুইস চিকিৎসক ও রসায়নবিদ **Friedrich Miescher** (মিশার) ক্ষতস্থানের পুঁজের শ্বেতরক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থেকে একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করেন এবং নামকরণ করেন নিউক্লিন (nuclein)। নিউক্লিন শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে ভিন্নধর্মী। ১৮৮৯ সালে অল্টম্যান (Altman) নিউক্লিনে অ্যাসিডের ধর্ম দেখতে পান এবং তিনি এর নামকরণ করেন নিউক্লিক অ্যাসিড। ১৮৯৪ সালে **Albrecht Kossel** নিউক্লিক অ্যাসিডের দু'ধরনের নাইট্রোজেন বেস—পিউরিন ও পাইরিমিডিন এবং স্যুগার ও ফসফোরিক অ্যাসিড শনাক্ত করেন। এজন্য তাঁকে ১৯১০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। **Lavine** ১৯২১ সালে DNA ও RNA নামে দু'ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেন।

নিউক্লিক অ্যাসিড কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস মৌল নিয়ে গঠিত। এতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১৫% এবং ফসফরাসের পরিমাণ ১০%।

জীবকোষে দু'প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। এদের একটি DNA এবং অপরটি হলো RNA। DNA সাধারণত নিউক্লিয়াসের ক্রোমাটিনে থাকে। RNA-এর শতকরা ৯০ ভাগ থাকে সাইটোপ্লাজমে এবং বাকি ১০ ভাগ থাকে নিউক্লিয়োলাসে।

নিউক্লিক অ্যাসিড কী? নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিয়েজ এনজাইম বা মৃদু ক্ষার দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড। কাজেই বলা যায়, অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড, পলিমার সৃষ্টির মাধ্যমে গঠিত অ্যাসিডের নাম হলো নিউক্লিক অ্যাসিড। আবার নিউক্লিয়োটাইডকে মৃদু অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে উৎপন্ন হয় নাইট্রোজেন ক্ষারক, পেন্টোজ শ্যুগার এবং ফসফোরিক অ্যাসিড। এভাবেও বলা যায়, নিউক্লিক অ্যাসিড হলো নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, পেন্টোজ শ্যুগার এবং ফসফোরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত অ্যাসিড যা জীবের বংশগতির ধারাসহ সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো কোষের সবচেয়ে বড় রাসায়নিক অণু। নিউক্লিক অ্যাসিড বংশগতির সকল বৈশিষ্ট্য বহন করে বলে এদের মাস্টার মলিকিউল (master molecule) বলে।

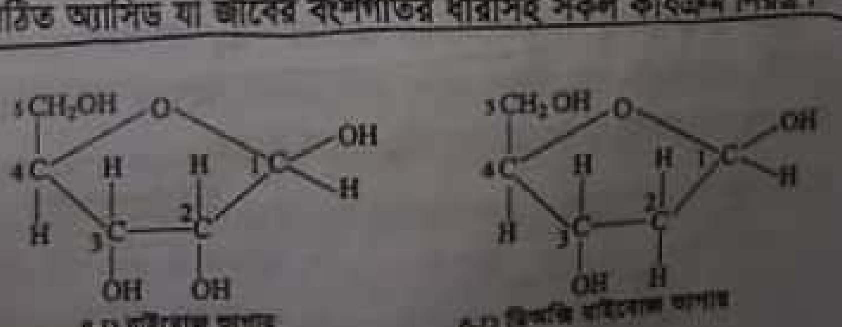

চিত্র ১.২১ : পেন্টোজ শ্যুগার।

নিউক্লিক অ্যাসিডের মূল উপাদান: নিউক্লিক অ্যাসিডকে হাইড্রোলাইসিসের পর নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ পাওয়া যায়।

১। পেন্টোজ শ্যুগার, ২। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, ৩। ফসফোরিক অ্যাসিড।

১। পেন্টোজ শ্যুগার (Pentose sugar) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট শ্যুগার (চিনি)-কে বলা হয় পেন্টোজ শ্যুগার। নি অ্যাসিডে দু'ধরনের পেন্টোজ শ্যুগার থাকে। এর একটি রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যটি ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। RN রাইবোজ শ্যুগার এবং DNA-তে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার থাকে। পেন্টোজ শ্যুগার ফসফোরিক অ্যাসিডের সাথে যু গঠনে সক্ষম। রিং স্ট্রাকচারবিশিষ্ট β-D রাইবোজ অথবা β-D ডিঅক্সিরাইবোজ নিউক্লিক অ্যাসিড গঠন করে।

রাইবোজ এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার প্রায় একই রকম গঠনবিশিষ্ট, পার্থক্য শুধু এই যে, ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগারের ২নং কার্বনে অক্সিজেন অনুপস্থিত (ডিঅক্সি = অক্সিজেন ছাড়া)। রাইবোজ শ্যুগার দিয়ে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার দিয়ে ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) গঠিত হয়।

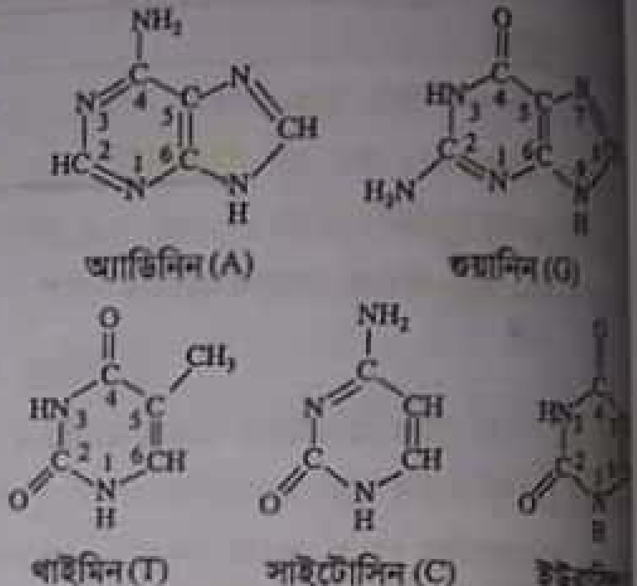

চিত্র ১.২২ : পিউরিন (অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন) এবং পাইরিমিডিন (থাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল)।

২। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক (Nitrogenous base) : নিউক্লিক অ্যাসিডে দুই প্রকার নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে। নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে এই ক্ষারকসমূহ গঠিত। ক্ষারকগুলো এক রিং বিশিষ্ট বা দুই রিং বিশিষ্ট হতে পারে। এই রিং এর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্ষারক দুই প্রকার; যথা-(i) পিউরিন এবং (ii) পাইরিমিডিন।

(i) পিউরিন (Purine) : দুই রিংবিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পিউরিন। এর সাধারণ সংকেত হলো $C_5H_4N_4$। নিউক্লিক অ্যাসিডে দু'প্রকার পিউরিন ক্ষারক থাকে, যথা- অ্যাডি (Adenine) এবং গুয়ানিন (Guanine)।

(ii) পাইরিমিডিন (Pyrimidine) : এক রিং বিশিষ্ট ক্ষারককে বলা হয় পাইরিমিডিন। এর সাধারণ সংকেত $C_4H_4N_2$। নিউক্লিক অ্যাসিডে তিন প্রকার পাইরিমিডিন ক্ষারক থাকে, যথা- থাইমিন (thymine), সাইটোসিন (cyto এবং ইউরাসিল (uracil)। ইউরাসিল কেবল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডে (RNA) থাকে। থাইমিন কেবল ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডে (DNA) থাকে। (মনে রাখতে হবে নাম বড় যার গঠন ছোট তার।)

ক্ষারকসমূহের নামকরণ : অ্যাডিনিন এবং থাইমিন-এর নামকরণ করা হয়েছে থাইমাস (Thymus) থেকে। থাই গ্ল্যান্ড থেকে এদেরকে প্রথম পৃথক করা হয়েছিল। এডিনো অর্থ হলো গ্ল্যান্ড (gland)। সাইটোসিন-এর নাম এসেছে সাইটো (cyto) থেকে; সাইটো অর্থ হলো সেল (cell)। গুয়ানিন-এর নাম এসেছে গুয়ানো (guano) থেকে। গুয়ানো অর্থ হলো বাদুর বা সীবার্ড এর পড়ন্ত মল (fecaldropping)। সাধারণত ক্ষারকগুলো বর্ণমালা 'AGTCU' দ্বারাই পরিচিত।

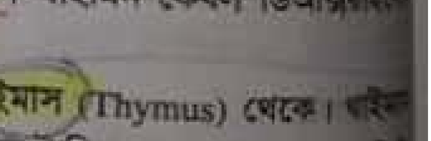

(H_3PO_4)
ফসফোরিক অ্যাসিড

৩। ফসফোরিক অ্যাসিড (Phosphoric acid) : নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি অন্যতম উপাদান হলো ফসফোরিক অ্যাসিড। এর আণবিক সংকেত H_3PO_4। এতে তিনটি একযোজী হাইড্রক্সিল গ্রুপ এবং একটি দ্বিযোজী অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে, সেগুলো পাঁচযোজী ফসফরাস পরমাণুর সাথে সংযুক্ত।

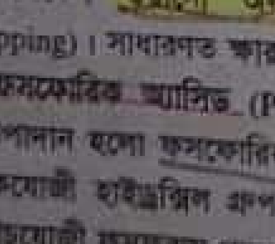

চিত্র ১.২৩ : নিউক্লিওসাইড (অ্যাডিনোসিনের গঠন)।

নিউক্লিওসাইড (Nucleoside) গঠন : এক অণু নাইট্রোজেন ক্ষারক ও এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার যুক্ত হয়ে গঠিত গ্লাইকোসাইড যৌগ বলা হয় নিউক্লিওসাইড। ক্ষারক পাইরিমিডিন হলে তাকে বলা পাইরিমিডিন নিউক্লিওসাইড, আর ক্ষারক পিউরিন হলে তাকে বলা পিউরিন নিউক্লিওসাইড। পাইরিমিডিন নিউক্লিওসাইডে ক্ষারকের (T,C,U) ১নং নাইট্রোজেন, পেন্টোজ শ্যুগারের ১নং কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকের সা

গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যুক্ত থাকে। কিন্তু পিউরিন নিউক্লিয়োসাইডে ক্ষারকের (A/G) ৯নং নাইট্রোজেন (১নং নয়) পেন্টোজ শ্যুগারের ১নং কার্বনের হাইড্রক্সিল মূলকের সাথে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যুক্ত থাকে।

বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়োসাইড :

পেন্টোজ শ্যুগার	অ্যাডিনিন (A)	গুয়ানিন (G)	ইউরাসিল (U)	সাইটোসিন (C)	থাইমিন (T)
রাইবোজ	অ্যাডিনোসিন	গুয়ানোসিন	ইউরিডিন	সাইটিডিন	–
ডিঅক্সিরাইবোজ	ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন	ডিঅক্সি গুয়ানোসিন	–	ডিঅক্সি সাইটিডিন	ডিঅক্সি থাইমিডিন

নিউক্লিয়োটাইড (Nucleotide) গঠন : এক অণু নিউক্লিয়োসাইড-এর সাথে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠিত যৌগকে নিউক্লিয়োটাইড বলে। অন্যভাবে বলা যায়, নিউক্লিয়োসাইডের ফসফেট এস্টার হলো নিউক্লিয়োটাইড। নিউক্লিয়োটাইড হলো নিউক্লিক অ্যাসিডের (DNA অণুর) গাঠনিক একক। এক অণু নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক, এক অণু পেন্টোজ শ্যুগার এবং এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয় তাকে বলে নিউক্লিয়োটাইড। পেন্টোজ শ্যুগার-এর ৩নং ও ৫নং কার্বনের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়।

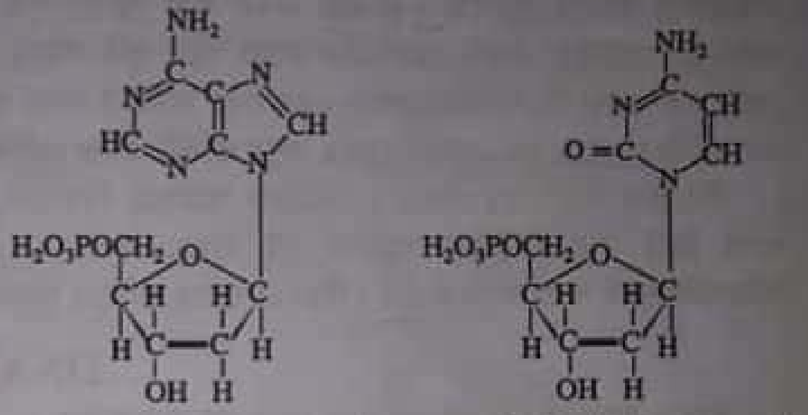
dAMP (ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) dCMP (ডিঅক্সি সাইটিডিন মনোফসফেট)

চিত্র ১.২৪ : দুটি নিউক্লিয়োটাইড : dAMP ও dCMP।

বিভিন্ন প্রকার নিউক্লিয়োটাইড

শ্যুগার রাইবোজ হলে :

অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট = AMP = অ্যাডিনিন নিউক্লিয়োটাইড (অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড)

গুয়ানোসিন মনোফসফেট = GMP = গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড (গুয়ানিলিক অ্যাসিড)

সাইটিডিন মনোফসফেট = CMP = সাইটোসিন নিউক্লিয়োটাইড (সাইটিডিলিক অ্যাসিড)

ইউরিডিন মনোফসফেট = UMP = ইউরাসিল নিউক্লিয়োটাইড (ইউরিডিলিক অ্যাসিড)

শ্যুগার ডিঅক্সিরাইবোজ হলে :

ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট = dAMP = অ্যাডিনিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সি অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড)

ডিঅক্সি গুয়ানোসিন মনোফসফেট = dGMP = গুয়ানিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সিগুয়ানিলিক অ্যাসিড)

ডিঅক্সি সাইটিডিন মনোফসফেট = dCMP = সাইটোসিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সি সাইটিডিলিক অ্যাসিড)

ডিঅক্সি থাইমিডিন মনোফসফেট = dTMP = থাইমিন ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড (ডিঅক্সি থাইমিডিলিক অ্যাসিড)

অর্থাৎ ক্ষারকের (বা নিউক্লিয়োসাইডের) নামানুসারে নিউক্লিয়োটাইডের নামকরণ করা হয়।

একটি নিউক্লিয়োটাইডে একটি ফসফেট যুক্ত থাকে। এর সাথে আরও এক বা একাধিক ফসফেট যুক্ত হতে পারে। এভাবে ফসফেট সংযুক্তির মাধ্যমে AMP (অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) থেকে ADP (অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট), আবার ADP থেকে ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) সৃষ্টি হয়।

AMP (অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) + P = ADP; ADP + P = ATP

GMP (গুয়ানোসিন মনোফসফেট) + P = GDP; GDP + P = GTP

CMP (সাইটিডিন মনোফসফেট) + P = CDP; CDP + P = CTP

UMP (ইউরিডিন মনোফসফেট) + P = UDP; UDP + P = UTP

কাজ : নিউক্লিয়োটাইডগুলো DNA ও RNA তৈরির মূল কাঠামো গঠন করে। এছাড়া মধ্যবর্তী বিপাকে (NAD⁺, NADP⁺), প্রোটিন সংশ্লেষণে (GTP), শ্বসনে (ATP), ফসফোলিপিড সংশ্লেষণে (CTP) বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ডাইনিউক্লিয়োটাইড (Dinucleiotide) : একটি নিউক্লিয়োটাইড যখন আরেকটি নিউক্লিয়োটাইডের সাথে ফস ডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয় তখন তাকে ডাইনিউক্লিয়োটাইড বলে। ১ম নিউক্লিয়োটাইডের পেন্টোজ শ্যু ৫নং কার্বনের সাথে এবং ২য় নিউক্লিয়োটাইডের পেন্টোজ শ্যুগারের ৩নং কার্বন ফসফেট ডাই-এস্টার বন্ধন দ্বারা যুক্ত ফলে একটি ডাইনিউক্লিয়োটাইড গঠিত হয়।

পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleiotide) : অনেকগুলো নিউক্লিয়োটাইড ৫′→৩′ অনুমুখী হয়ে পরস্পর ফস ডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে একটি লম্বা রৈখিক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তখন তাকে পলিনিউক্লিয়োটাইড ব পলিনিউক্লিয়োটাইড একটি চেইন-এর মতো গঠন সৃষ্টি করে। এই চেইন-এ ফসফেট অণু একদিকে পেন্টোজ শ্যু (রাইবোজ অথবা ডি-অক্সিরাইবোজ) -এর ৫নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে এবং অপর দিকে পাশের পেন্টোজ শ্যুগার ৩নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। DNA অণুর প্রতিটি একক হেলিক্স একটি পলিনিউক্লিয়োটাইড চেইন।

নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকার : নিউক্লিক অ্যাসিডে বিদ্যমান পেন্টোজ শ্যুগারটি রাইবোজ, না ডিঅক্সিরাইবোজ ও ওপর ভিত্তি করে নিউক্লিক অ্যাসিড দুই প্রকার; যথা–(১) ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA এবং (২) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

DNA

DNA হলো Deoxyribonucleic acid-এর অ্যাক্রোনিম (acronym) বা সংক্ষিপ্ত রূপ। DNA হলো জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। DNA-এর গঠন একক হলো নিউক্লিয়োটাইড এবং লক্ষ লক্ষ নিউক্লিয়োটাইড-এর পলিমার হলো একটি DNA অণু। DNA হলো একটি বৃহদাণুর জৈব অ্যাসিড যা জীবনের আণবিক ভিত্তি (molecular core of life) হিসেবে স্বীকৃত। DNA–এর গঠন উপাদান হলো পাঁচকার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার (S); অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T) নামক চার ধরনের নাইট্রোজিনাস ক্ষারক এবং ফসফোরিক অ্যাসিড (P)। কোনো নির্দিষ্ট জীবের (যেমন মানুষ) প্রতিটি কোষেই সমপরিমাণ DNA থাকে।

প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো DNA। কতক ভাইরাসে DNA থাকে। DNA সূত্রাকার কি আদিকোষ, মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে বৃত্তাকার DNA থাকে। কোষে DNA-এর পরিমাণ পিকোগ্রাম (১ পিকো গ্রাম = $১০^{-১২}$ গ্রাম) এককে প্রকাশ করা হয়।

DNA-এর ভৌত গঠন (Physical Structure of DNA)

১৮৬৯ সালে নিউক্লিক অ্যাসিড আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই এর প্রকৃতি, গঠন উপাদান এবং ভৌত গঠন সম্বন্ধে জানার জন্য বিস্তর গবেষণা শুরু হয়। জার্মান রসায়নবিদ **Robert Feulgen** ১৯১৪ সালে DNA রঞ্জন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা **Feulgen staining** নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫০ সালে Erwin Chargaff বিস্তর গবেষণার পর দেখাতে সক্ষম হন যে কোনো জীবের DNA-তে A এবং T এর পরিমাণ সমান। আবার G এবং C এর পরিমাণও সমান। DNA অণুতে সমান পরিমাণ A ও T এবং সমপরিমাণ C ও G থাকার এই নীতিমালাকে বলা হয় **Chargaff's rule**. নাইট্রোজিনাস ক্ষারকের অর্ধেক হবে পিউরিন (A, G) এবং অর্ধেক হবে পাইরিমিডিন (T, C)। একই সময়ে Maurice Wilkins এবং Rosalind Franklin DNA অণুর X-ray ক্রিস্টালোগ্রাফি করে এর ভৌত অবকাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির মাধ্যমে তারা DNA গঠনকারী আন্তঃঅণুর দূরত্ব 2.0 nm, 0.34 nm এবং 3.4 nm বলে জানান। তাঁরা আরো বলেন যে, সম্ভবত DNA অণু ডাবল স্ট্র্যান্ড (একটি বা তিনটি নয়) এবং এরা বাঁকানো গঠনে বিদ্যমান, যার কারণে আন্তঃঅণুর বিভিন্ন দূরত্ব দেখা যায়।

Watson ও Crick-এর DNA মডেল

বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে Watson এবং Crick ইতোমধ্যেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবগত হন :

i. DNA হলো চার প্রকার নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত পলিমার।
ii. জানা হয়ে যায় নিউক্লিয়োটাইডসমূহের রাসায়নিক গঠন।
iii. যেহেতু DNA অম্লীয়, কাজেই ফসফেট গ্রুপ অবশ্যই উন্মুক্ত (exposed) থাকবে।
iv. Chargaff's data অনুযায়ী A-এর সংখ্যা T-এর সমান হবে এবং G-এর সংখ্যা C-এর সমান হবে।

v. Wilkins ও Franklin এর আণবিক মাপ 2.0 nm, 0.34 nm, 3.4 nm এবং helix ধারণা।

vi. দুটি পিউরিন বিপরীতমুখী হয়ে পাশাপাশি 2 nm দূরত্বে বসতে পারে না; আবার দুটি পাইরিমিডিন পাশাপাশি বসলে দূরত্ব 2 nm এর কম হবে। কাজেই একটি পিউরিন ও একটি পাইরিমিডিন ডাবল হেলিক্স-এ বিপরীতমুখী হয়ে বসতে হবে, তবেই দুই স্ট্র্যান্ড-এর দূরত্ব 2 nm সমান থাকবে।

vii. A ও T দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত হয় এবং G ও C তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত হয়।

viii. দুটি স্ট্র্যান্ড একটি অপরটির সম্পূরক (Complementary), একইরূপ (identical) নয়।

উপরিউক্ত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে Watson ও Crick (J.D. Watson 1928 & Francis H.C. Crick, 1916-2004) ১৯৫৩ সনে DNA অণুর (তার, সিট, স্ক্রু, বল্টু ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায়) একটি ভৌত মডেল উপস্থাপন করেন যা পরবর্তীতে সঠিক মডেল হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। এই মডেল উদ্ভাবনের কারণে উইলকিন্সসহ তাঁদেরকে ১৯৬৩ সনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Watson ও Crick প্রদত্ত ডাবল হেলিক্স মডেল অনুযায়ী DNA অণুর ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

(১) DNA অণু দ্বিসূত্রক, বিন্যাস ডান থেকে বাম দিকে ঘুরানো (প্যাঁচানো) সিঁড়ির মতো, যাকে বলা হয় ডাবল হেলিক্স (double helix)।

ডান থেকে বাম

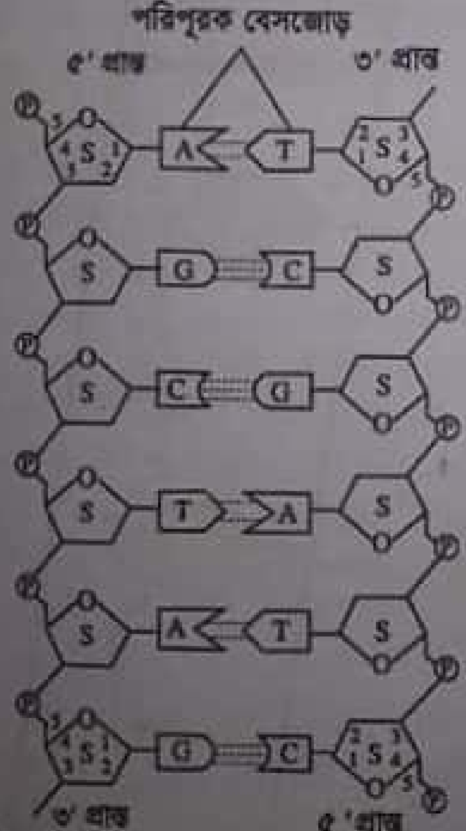

চিত্র ১.২৫ : DNA অণুর একাংশ (সরলীকৃত)। S-সুগার, P-ফসফেট, A, T, G, C = নাইট্রোজিনাস বেস, ... হাইড্রোজেন বন্ড।

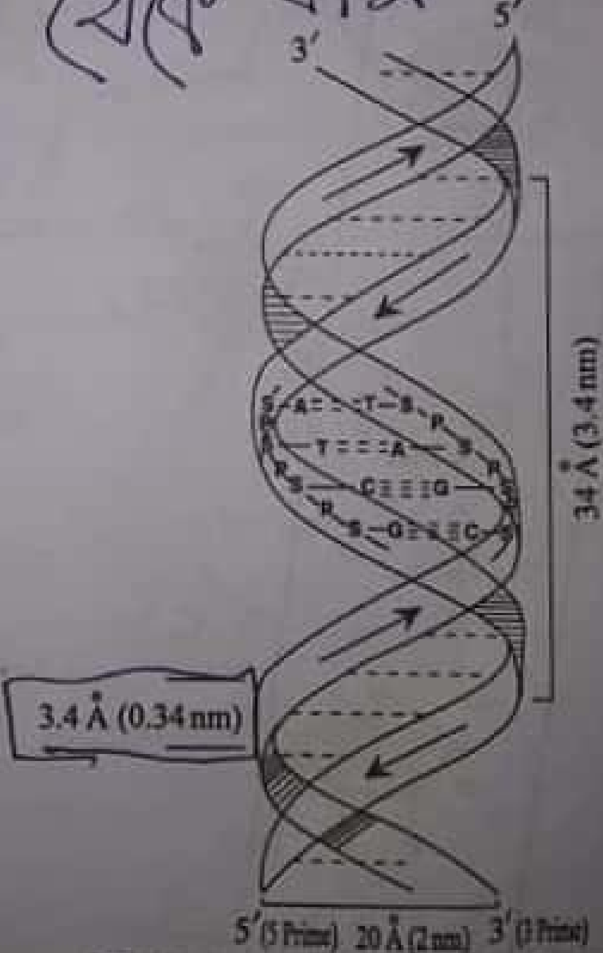

চিত্র ১.২৬ : DNA ডাবল হেলিক্স (ওয়াটসন-ক্রিক মডেল) P-ফসফেট, S-সুগার, A-অ্যাডিনিন, T-থাইমিন, G-গুয়ানিন, C-সাইটোসিন, = হাইড্রোজেন বন্ড।

(২) সূত্র দুটি সমদূরত্বে পরস্পর বিপরীতমুখী (একটি 5′→ 3′ কার্বনমুখী এবং অপরটি 3′→ 5′ কার্বনমুখী) হয়ে অবস্থান করে।

(৩) সূত্র দুটি তৈরি হয় ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগার (S) ও ফসফেটের (P) পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে।

(৪) সূত্র দুটির মাঝখানের প্রতিটি ধাপ তৈরি হয় একজোড়া নাইট্রোজেন বেস (A = T বা G ≡ C) দিয়ে।

(৫) ফসফেট যুক্ত থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগারের 3' ও 5' কার্বনের (৩য় ও ৫ম কার্বনের) সাথে এবং ক্ষারকগুলো যুক্ত থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ স্যুগারের 1' কার্বনের (১ম কার্বনের) সাথে। কাজেই সূত্রকের বাইরের দিকে ফসফেট এবং ভেতরের দিকে নাইট্রোজেন ক্ষারক থাকে।

(৬) DNA অণুতে চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক (অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন) থাকে। অ্যাডিনিন (A) এর সম্পূরক ক্ষারক থাইমিন (T) এবং গুয়ানিন (G) এর সম্পূরক ক্ষারক সাইটোসিন (C)।

(৭) একটি সূত্রের অ্যাডিনিন অপর সূত্রের থাইমিনের সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে (A = T / T = A) এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন অপর সূত্রের সাইটোসিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনী (G ≡ C / C ≡ G) দিয়ে যুক্ত হয়। কাজেই সিঁড়ির ধাপ হবে A = T অথবা G ≡ C। বন্ড তৈরি হয় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ক্ষারের O–HN, NH–N এবং NH–O এর মধ্যে। C এবং G এর মধ্যে এই তিনটি অপশনই বিদ্যমান। A এবং T এর মধ্যে দুইটি অপশন বিদ্যমান, T তে O থাকলেও পাশে A তে HN নাই।

(৮) DNA অণুর সূত্র দুটির প্রতিটি প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের দৈর্ঘ্য 34 Å (3.4 nm)। প্রতিটি প্যাঁচে নাইট্রোজিনাস বেস জোড়ের ১০টি ধাপ সমদূরত্বে অবস্থান করে। ফলে সিঁড়ির এক ধাপ থেকে অপর ধাপের দূরত্ব হয় 3.4 Å (0.34 nm)।

(৯) প্রতিটি প্যাঁচে হেলিক্স দুটির ব্যাস 20 Å (2 nm)। তবে অণুর দৈর্ঘ্য প্রজাতিভেদে বিভিন্ন।

(১০) হেলিক্সের প্রতিটি সম্পূর্ণ প্যাঁচ বা ঘূর্ণনে শৃঙ্খলের বাইরের দিকে একটি গভীর খাঁজ (major groove) ও একটি অগভীর খাঁজ বা ভাঁজের (minor groove) সৃষ্টি হয়।

(১১) DNA-এর আণবিক ওজন 10^6–10^9 এর মধ্যে।

মোট কথা দু'টি ডিঅক্সিরাইবো পলিনিউক্লিয়োটাইডের সূত্র বিপরীতমুখীভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু গঠন করে। অণুটি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো বিন্যস্ত থাকে।

DNA-এর রাসায়নিক গঠন (Chemical Structure of DNA) : যে সব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে DNA গঠিত সে সব রাসায়নিক পদার্থই হলো DNA-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান। এক খণ্ড DNA-কে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কতগুলো নিউক্লিয়োটাইড। নিউক্লিয়োটাইডকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ফসফোরিক অ্যাসিড ও নিউক্লিয়োসাইড। নিউক্লিয়োসাইডকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারক এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারকসমূহকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নামক ক্ষারক (নাইট্রোজেন বেস)। কাজেই DNA (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান হলো (১) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, (২) ফসফোরিক অ্যাসিড এবং (৩) নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক। ক্ষারকগুলো অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন নামক পিউরিন এবং সাইটোসিন ও থাইমিন নামক পাইরিমিডিন।

DNA-এর কাজ (Functions of the DNA) : নিচে DNA-এর কয়েকটি কাজ উল্লেখ করা হলো-

১। ক্রোমোসোমের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
২। বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
৩। জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।
৪। জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে।
৫। জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।
৬। জীবের সকল শারীরতাত্ত্বিক ও জৈবিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।
৭। জীবের পরিবৃত্তির (mutation) ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
৮। DNA এবং তার হেলিক্সের কোনো অংশে গোলযোগ দেখা দিলে তা মেরামত করে নিতে সক্ষম।

DNA কীভাবে কাজ করে ?

DNA-র প্রধান কাজ হলো জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। 'জিন' এর মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়।

ট্রিপলেট হলো জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক। প্রতিটি ট্রিপলেট একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড নির্দেশ mRNA-তে, DNA ট্রিপলেটের সম্পূরক পরপর তিনটি বেস সিকোয়েন্সকে বলা হয় কোডন (codon)। প্রতিটি একটি অ্যামিনো অ্যাসিড কোড করে।

DNA-এর জৈবিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব (Biological significance of DNA) : DNA বংশগতি বিষয়ক বৈশি ধারক ও বাহক। অধিকাংশে জীবের বংশগতির একক অর্থাৎ জিন (gene) DNA ছাড়া অন্য কিছুই নয়। নি কারণগুলোর জন্যই DNA-কে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।

(i) DNA দ্বারা কোষ বিভাজনের সময় এক নির্ভুল প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়।

(ii) DNA কোষের জন্য নির্দিষ্ট প্রকারের প্রোটিন সংশ্লেষ করে।

(iii) DNA বংশগতির সব ধরনের জৈবিক সংকেত বহন করার ক্ষমতা রাখে।

(iv) DNA-এর গঠন অত্যন্ত স্থায়ী এবং মিউটেশন ছাড়া এর কোনো পরিবর্তন হয় না।

(v) জীবকোষের জৈবিক সংকেত প্রেরক হচ্ছে DNA।

(vi) কোনো কারণে DNA অণুর গঠনে কোনো পরিবর্তন হলে পরিবৃত্তির উদ্ভব হয়। আর পরিবৃত্ত হলো বিব মূল উপাদান।

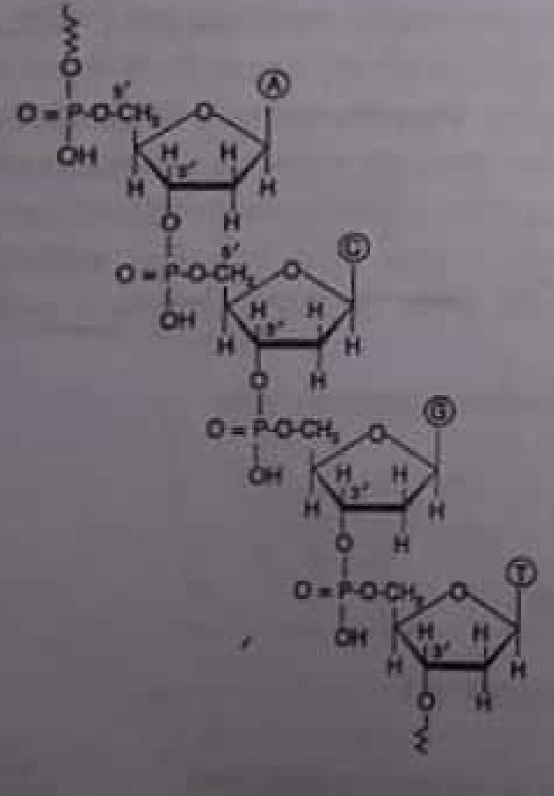

চিত্র ১.২৭ : DNA অণুর একটি শিকলের একাংশ।

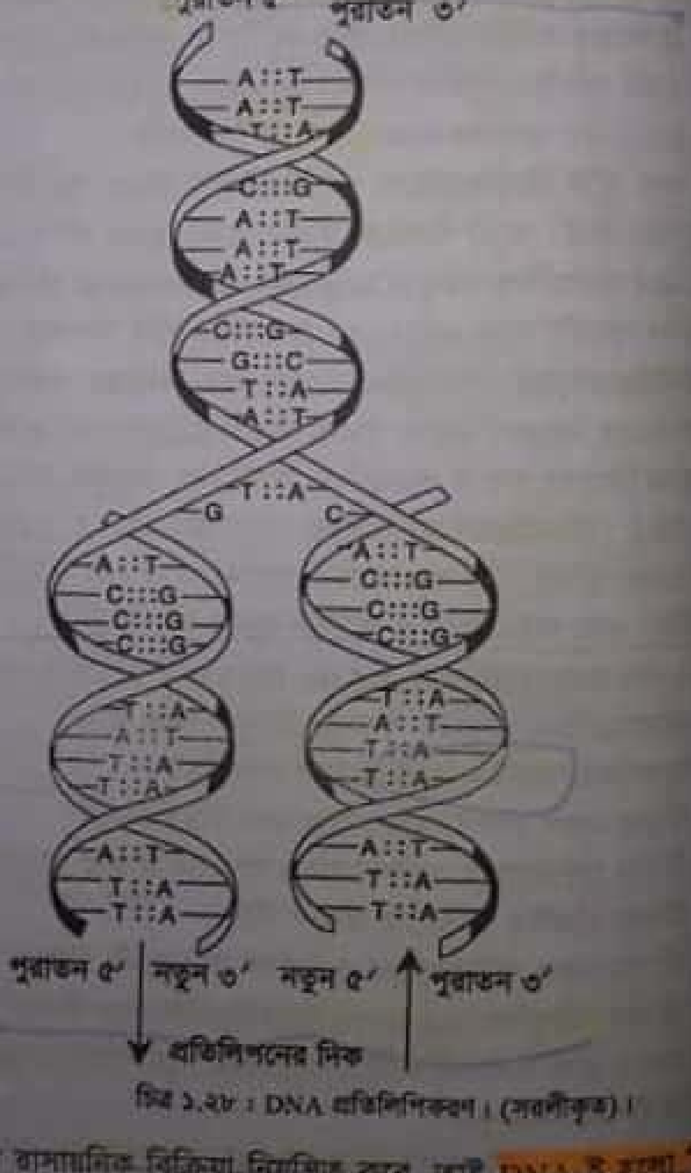

চিত্র ১.২৮ : DNA প্রতিলিপিকরণ। (সরলীকৃত)।

পরিশেষে বলা যায়, DNA-অণু জীবকোষের সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, তাই DNA-ই হলো 'মাস্টার মলিকিউল' (master molecule)।

RNA

RNA হলো Ribonucleic acid এর অ্যাক্রোনিম বা সংক্ষিপ্ত রূপ। যে নিউক্লিক অ্যাসিডের পলিনিউক্লিয়োটাইডের মনোমার এককগুলোতে গাঠনিক উপাদানরূপে রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যতম বেস (ক্ষারক) হিসেবে ইউরাসিল থাকে, তা হলো রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড RNA)।

অবস্থান বা বিস্তৃতি : সকল জীব কোষে RNA থাকে। একটি কোষে বিরাজমান RNA এর শতকরা ৯০ ভাগ থাকে সাইটোপ্লাজমে, বাকি ১০ ভাগ নিউক্লিয়াসে। সাইটোপ্লাজম, রাইবোসোম, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং প্লাস্টিডেও RNA পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়োলাসে এবং DNA-এর সহযোগী হিসেবে ক্রোমোসোমে RNA থাকে। ব্যাকটেরিয়া কোষেও RNA পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু ভাইরাসেও RNA উপস্থিত থাকে।

ভৌত গঠন : RNA এক সূত্রক চেইন-এর মতো। এটি স্থানে স্থানে কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে। এর গঠনে একাধিক U-আকৃতির ফাঁস (hairpin loop) বা লুপ থাকে।

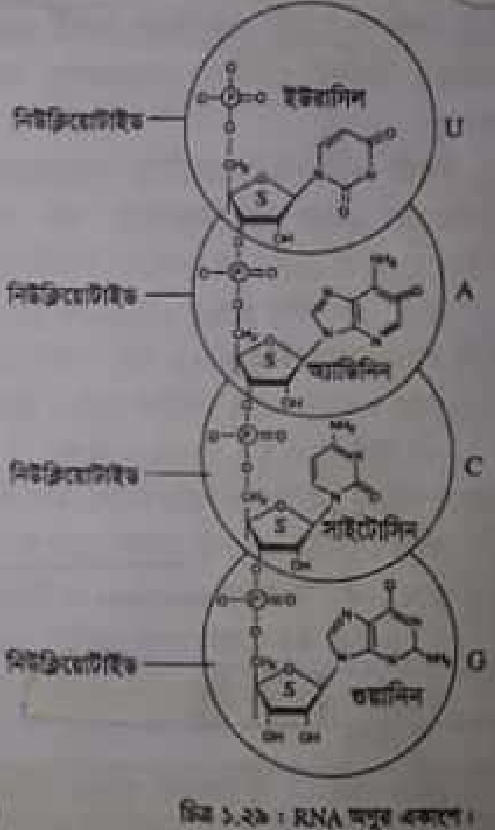

চিত্র ১.২৯ : RNA অণুর একাংশ।

রাসায়নিক গঠন : নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে RNA গঠিত।

(i) পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শ্যুগার (পেন্টোজ শ্যুগার)।

(ii) নাইট্রোজিনাস বেস (ক্ষারক)-অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল এবং সাইটোসিন।

(iii) ফসফেট (ফসফোরিক অ্যাসিড)।

RNA-এর শ্রেণিবিভাগ : গঠন ও কাজের ভিত্তিতে RNA-কে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(i) ট্রান্সফার RNA (Transfer RNA বা tRNA) : যে সব RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী একেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর করে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে সেগুলোকে ট্রান্সফার RNA বলে। প্রতিটি কোষে প্রায় ৩১-৪২ ধরনের tRNA থাকে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে tRNA সৃষ্টি হয়। প্রতিটি tRNA-তে মোটামুটি ৯০টি নিউক্লিয়োটাইড থাকে। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি tRNA এক সূত্রক এবং লম্বা চেইনের মতো থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি ভাঁজ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বেস-এর মধ্যে জোড়ার সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি tRNA-তে একাধিক ফাঁস (loop) সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁস হলো অ্যান্টিকোডন ফাঁস যা mRNA-এর কোডন-এর সাথে মুখোমুখি বসে যেতে পারে। tRNA-র ৩' প্রান্ত এক সূত্রক এবং সব সময়ই CCA ধারায় বেস সজ্জিত থাকে। এখানে অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্ত হয়। একে বলা হয় অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট। ফাঁস অবস্থায় সব সময়ই অ্যান্টিকোডন ফাঁস ও অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট বিপরীত অবস্থানে থাকে। তিনটি বেস নিয়ে অ্যান্টিকোডন সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১.৩০ : tRNA-এর ক্লোভার লিফ মডেল।

কাজ : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় জেনেটিক কোড অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর করা।

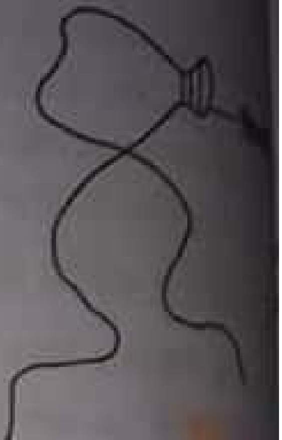

চিত্র ১.৩১ : একটি

(ii) রাইবোসোমাল RNA (Ribosomal RNA বা rRNA) : যে সব RNA রাইবোসোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে রাইবোসোমাল RNA বলে। কোষের সমস্ত RNA-এর শতকরা ৮০-৯০ ভাগই rRNA। কোষের রাইবোসোমে এদের অবস্থান।

কাজ : রাইবোসোম নামক কোষ-অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে যার মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

(iii) বার্তাবহ RNA (Messenger RNA বা mRNA): যে সব RNA জিনের সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষের ছাঁচ হিসেবে কার্যকর হয়ে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রম বাছাই করে, সেগুলোকে মেসেঞ্জার RNA বা বার্তাবহ RNA বলে। DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA সৃষ্টি হয়। mRNA লম্বা চেইনের মতো। mRNA-এর ৫' প্রান্তের কয়েকটি বেস কোডনবিহীন, এ প্রান্তকে ৫'-লিডার (5'-leader) বলে। আবার ৩' প্রান্তের বেস কোডনবিহীন, এ প্রান্তকে ৩'-ট্রেইলার (3'-trailer) বলা হয়। মাঝখানের অংশকে কোডিং অংশ (coding বলে। পরপর তিনটি বেস মিলে একটি কোডন হয়।

mRNA নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা বহন করে।

কাজ : নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে এবং রাইবোসোম ও tRNA-র সাহায্যে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রমের শৃঙ্খল তৈরি করে।

চিত্র ১.৩২: mRNA এর গঠন।

(iv) বংশগতীয় RNA (Genetic RNA বা gRNA): যে সব RNA কিছু ভাইরাসদেহে বংশগতি বস্তু হিসে করে তাকে বংশগতীয় RNA বলে। এসব ক্ষেত্রে জীবদেহে DNA অনুপস্থিত থাকে। (যেমন- TMV)

কাজ : প্রধান কাজ প্রোটিন তৈরি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশগতির বস্তু হিসেবেও কাজ করে। (যেমন- TMV)

(v) মাইনর RNA (Minor RNA) : সাইটোপ্লাজমীয় RNA ও নিউক্লীয় RNA নামে কিছু ক্ষুদ্র RNA রয়ে কোষে বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে মিশে এনজাইমের কাঠামো দান করে। এরা মাইনর RNA হিসেবে পরিচিত।

কাজ : বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের কাঠামো দান করা এবং এনজাইম হিসেবে কাজ করা।

RNA-এর কাজ (Functions of RNA) :

১। RNA-এর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ।
২। tRNA-অ্যামিনো অ্যাসিড স্থানান্তর করে।
৩। rRNA রাইবোনিউক্লিয়োপ্রোটিন গঠন করে।
৪। mRNA, DNA হতে বার্তা বহন করে রাইবোসোমে পৌঁ

বৈশিষ্ট্য	DNA	RNA
১। ভৌত গঠন	দ্বিসূত্রক, ঘুরানো সিঁড়ির মতো	একসূত্রক, শিকলের ন্যায়
২। রাসায়নিক গঠন	(i) এতে থাকে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার (ii) DNA-এর পাইরিমিডিনে থাইমিন ও সাইটোসিন বেস থাকে।	(i) এতে থাকে রাইবোজ সুগার। (ii) RNA-এর পাইরিমিডিনে ইউরাসিল সাইটোসিন বেস থাকে।
৩। প্রকার	DNA-অণুর কোনো প্রকারভেদ নেই। কার্যগত দিক হতে DNA একই রকম হয়।	কার্যগত দিক হতে RNA পাঁচ প্রকার। যথা- tRNA, rRNA, mRNA, gRNA, মাইনর RNA
৪। উৎপত্তি	অনুলিপনের মাধ্যমে নতুন DNA সৃষ্টি হয়।	নতুনভাবে RNA সৃষ্টি হয়। কোনো অনুলিপন হয়
৫। অবস্থান	প্রধানত ক্রোমোসোমে থাকে। তবে কখনো মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টেও অবস্থান করে।	ক্রোমোসোম, সাইটোপ্লাজম, রাইবোসোম নিউক্লিয়োলাসে থাকে।
৬। প্রধান কাজ	বংশগতির ধারক, বাহক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা।	প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
৭। বংশগতি	DNA বংশগত চরিত্র বহন করে।	RNA সাধারণত বংশগত চরিত্র বহন করে না।
৮। সংখ্যা	এতে নিউক্লিয়োটাইডের সংখ্যা অনেক বেশি।	এতে নিউক্লিয়োটাইডের সংখ্যা অনেক কম।
৯। আণবিক ওজন	এদের আণবিক ওজন দশ লক্ষ হতে বহু কোটি ডাল্টন পর্যন্ত হয়।	এদের আণবিক ওজন কয়েক লক্ষের বেশি হয় না।

DNA অণুর প্রতিলিপন, দ্বিত্বন বা প্রতিরূপ সৃষ্টি (Replication of DNA) : DNA-এর প্রতিলিপন হয় তা অনেক আগে থেকেই জানা ছিল কিন্তু সঠিক প্রতিলিপন পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা যায় অনেক পরে। প্রাথমিকভাবে DNA অণুর প্রতিলিপনের তিনটি অনুকল্প প্রস্তাবিত হয় (১৯৫৬), এগুলো হলো–

(১) সংরক্ষণশীল অনুকল্প (২) অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্প (৩) বিচ্ছুরণশীল অনুকল্প।

নিম্নে প্রক্রিয়াগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

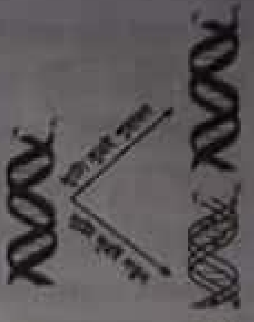

(১) সংরক্ষণশীল অনুকল্প (Conservative hypothesis) : এ প্রক্রিয়ায় মাতৃ DNA-র অণুসূত্র দুটো সম্পূর্ণভাবে পরস্পর থেকে পৃথক হবার পর প্রত্যেকটি ছাঁচ হিসেবে আলাদাভাবে দুটো নতুন অণুসূত্র তৈরি করে। এরপর সৃষ্ট নতুন অণুসূত্র ছাঁচ থেকে পৃথক হয়ে নতুন DNA অণু সৃষ্টি করে এবং মাতৃ অণুসূত্র দুটো আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয়।

(২) অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্প (Semiconservative hypothesis) : এ প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃ DNA অণু থেকে দুটি নতুন DNA অণু সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্ট DNA অণু দুটোর প্রত্যেকটিতে একটি মাতৃসূত্র অন্যটি নতুন সূত্র। এজন্য একে অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্প বা পদ্ধতি বলে।

(৩) বিচ্ছুরণশীল অনুকল্প (Dispersive hypothesis) : এ প্রক্রিয়ায় মাতৃ DNA অণুর সূত্রদ্বয় বিশ্লিষ্ট বা খণ্ডিত হয়ে প্রতিলিপি সৃষ্টি করে। এরপর বিভিন্ন পরিমাণের নতুন ও পুরাতন (মাতৃ) খণ্ডকের সংযুক্তির মাধ্যমে দুটো DNA অণু গঠিত হয়।

১৯৫৭-১৯৫৮ সালে প্রমাণিত হয় যে, DNA প্রতিলিপিত হয় অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে। স্টেন্ট (১৯৫৭) 'অর্ধ-সংরক্ষণশীল' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। মেসেলসন-স্টাহ্‌ল (Messelson-Stahl, 1958) পরীক্ষার মাধ্যমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে অর্ধ-সংরক্ষণশীল অনুকল্পটি প্রমাণ করেন। ১৯৬০ সালে সুয়েকা মানব হেলা কোষে এবং সাইমন ১৯৬১ সালে *Chlamydomonas* শৈবালে অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতি প্রমাণ করেন।

অর্ধ-সংরক্ষণশীল প্রক্রিয়ায় DNA অণুর প্রতিলিপন বা অনুলিপন

জীবকোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো তার DNA। বহুকোষী জীবের দেহ গঠনের জন্য জাইগোট কোষকে বারবার বিভাজিত হতে হয়। এককোষী জীবের প্রজনন তথা সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও কোষ বিভাজিত হয়। একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হওয়ার আগেই মাতৃকোষের DNA ডাবল হেলিক্সটিকে দুটি ডাবল হেলিক্স-এ পরিণত হতে হয়। কোষ বিভাজন শুরু হওয়ার আগে ইন্টারফেজ পর্যায়ে একটি DNA ডাবল হেলিক্স থেকে দুটি ডাবল হেলিক্স তৈরি হয়। এটিই হলো DNA অণুর প্রতিরূপ সৃষ্টি বা রেপ্লিকেশন। যে প্রক্রিয়ায় মাতৃ DNA থেকে তার অনুরূপ DNA উৎপন্ন হয় তাকে DNA প্রতিলিপন বা অনুলিপন বলে। কোষ চক্রের S ধাপে DNA প্রতিলিপন সম্পন্ন হয়। DNA অণুর অনুলিপন তথা রেপ্লিকেশন হয়ে থাকে অর্ধ-সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে (Semi-conservative method) অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট ডাবল হেলিক্স-এর একটি হেলিক্স থাকবে পুরাতন এবং একটি হেলিক্স হবে নতুনভাবে সৃষ্ট। Mathew Messelson ও Franklin Stahl ১৯৫৮ সনে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আদি কোষের DNA বৃত্তাকার, এতে কোনো প্রান্ত বা মাথা নেই, তাই যে কোনো এক জায়গায় প্রতিলিপন ... এবং রেপ্লিকেশন ফর্ক দুই দিকে সরে গিয়ে মাঝামাঝি স্থানে মিলিত হয়ে দ্রুত প্রতিলিপন শেষ হয়। ব্যাকটেরিয়া... DNA প্রতিলিপনে প্রতি মিনিটে দশ লক্ষ পর্যন্ত বেসপেয়ার যুক্ত হতে পারে। প্রকৃত কোষের DNA লম্বা সূত্রাকা... দুটি প্রান্ত থাকে। তাছাড়া প্রকৃত কোষের DNA-এর প্রতিলিপন গতি কম, মিনিটে ৫০০-৫০০০ পর্যন্ত বেসপে... হতে পারে। এ কারণে প্রকৃত কোষের লম্বা সূত্রাকার DNA-এর কোনো প্রান্তেই প্রতিলিপন শুরু হয় না, প্রতিলিপন ... সূত্রের মাঝে একই সাথে বহু জায়গায় (ড্রসোফিলাতে ৫০০০০ স্থানে)।

রেপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজন : (i) একটি ছাঁচ (ii) অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড ট্রাইফসফেট (dATP, dGTP, dT... dCTP; d = deoxyribose), (iii) নিউক্লিয়োটাইডের মধ্যে বন্ড সৃষ্টির জন্য প্রচুর শক্তি, যা ট্রাইফসফেট থেকে আ... গুরুত্বপূর্ণ কিছু এনজাইম ও সহযোগী প্রোটিন যাদেরকে একত্রে বলা হয় রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স বা রেপ্লিসোম (Repl... complex or replisome). রেপ্লিসোমের প্রধান এনজাইম হলো DNA পলিমারেজ। এ ছাড়াও আছে হেলিকেজ, ... সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন (SSBP), গাইরেজ, এপিআইসোমারেজ ইত্যাদি।

নিচে প্রতিলিপন প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

১। DNA ডাবল হেলিক্স-এর এক বা একাধিক বিন্দুতে প্রতিলিপন কাজের সূচনা ঘটে যাকে বলা হয় Ori... replication অর্থাৎ 'অরি' বা প্রতিলিপন সূচনা বিন্দু।

২। সূচনা বিন্দু থেকে ডাবল হেলিক্স-এর পাক খুলতে শুরু করে এবং একই সাথে A=T, G ≡ C নিউক্লিয়োটা... মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে উক্ত স্থানে ডাবল হেলিক্স দুটি একক হেলিক্স-এ পরিণত ... হেলিকেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এরূপ ঘটে থাকে। হেলিকেজ এনজাইম ATP থেকে শক্তি নিয়ে হাইড্রোজেন ... বিচ্ছিন্নকরণ কাজ করে থাকে।

গাইরেজ (gyrase) এনজাইম সম্মুখের DNA স্ট্র্যান্ড-এর প্যাঁচকে (twist) একত্র হতে দেয় না, তবে অনুলিপন... পেছনের অংশের প্যাঁচ তৈরিতে সহায়তা করে। প্রকৃত কোষে এ কাজটি করে এপিআইসোমারেজ এনজাইম।

৩। পৃথক হওয়া প্রতিটি একক হেলিক্স নতুন সম্পূরক হেলিক্স তৈরির ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪। প্রতিটি সূচনা বিন্দুতে দুটি করে রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স থাকে। ডাবল হেলিক্স-এর জোড়া ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়া... সাথে সাথে রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স দুটি, একটি অপরটির বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে। রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স-এ সিঙ্গ... single strand binding protein পৃথক হওয়া সূত্র দুটিকে পুনরায় সংযুক্ত হতে দেয় না। ডাবল হেলিক্স-... নিউক্লিয়োটাইড জোড় ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়ার ফলে সেখানে Y-আকৃতির একটি রেপ্লিকেশন ফর্ক (fork) তৈরি হয়।

চিত্র ১.৩৩ : DNA প্রতিলিপন প্রক্রিয়া।

৫। প্রাইমেজ (Primase) এনজাইম পৃথককৃত একটি সূত্রকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে তার একটি অংশ কপি করে একটি প্রাইমার তৈরি করে দেয়। প্রাইমার হলো RNA-এর কয়েকটি ক্ষারকের সংক্ষিপ্ত সিকোয়েন্স। প্রাইমারে মুক্ত ৩′-OH গ্রুপ থাকে। DNA পলিমারেজ এনজাইম-III একটি নিউক্লিয়োসাইড ট্রাইফসফেট এনে মুক্ত ৩′-OH গ্রুপে সংযুক্ত করে প্রতিলিপন কাজের সূচনা করে। এ সময় ট্রাইফসফেটের একটি ফসফেট নিউক্লিয়োসাইডের সাথে সংযুক্ত থেকে যায় (তাই নিউক্লিয়োটাইড) এবং অপর দুটি পাইরোফসফেট হিসেবে মুক্ত হয়ে যায়। এ সময় অনেক শক্তি নির্গত হয়। পরে পাইরোফসফেট ভেঙে দুটি ফসফেট আয়ন-এ পরিণত হয়। এ সময়ও শক্তি নির্গত হয়। DNA পলিমারেজ-III কেবলমাত্র ৩′-OH প্রান্তে নতুন নিউক্লিয়োটাইড যোগ করতে পারে। এ কারণেই নতুন সৃষ্ট DNA হেলিক্স সবসময়ই ৫′-প্রান্ত থেকে ৩′-প্রান্তের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিলিপন শুরু হওয়ার পর এক সময় DNA পলিমারেজ এনজাইম প্রাইমারকে সরিয়ে দেয়, কারণ DNA স্ট্র্যান্ড-এ RNA থাকতে পারে না।

[এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়োসাইড ট্রাইফসফেটের শেষ দুটি ফসফেট পাইরোফসফেট হিসেবে স্থান ত্যাগ করে, সংযুক্ত অপর ফসফেট ডিঅক্সিরাইবোজের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। প্রথম নিউক্লিয়োটাইডের ৩′-OH গ্রুপ দ্বিতীয় নিউক্লিয়োটাইডের ৫′-ফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে সুগার-ফসফেট-সুগার বন্ধন তৈরি করে। দ্বিতীয় নিউক্লিয়োটাইডের ৩′-OH গ্রুপের সাথে তৃতীয় নিউক্লিয়োটাইডের ৫′-ফসফেট সংযুক্ত হয়। এভাবে প্রতিলিপন চলতে থাকে। মনে রাখতে হবে আগত নিউক্লিয়োটাইডের ৫′-ফসফেট পূর্বের নিউক্লিয়োটাইডের ৩′-OH গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়। কোন নিউক্লিয়োটাইডের পর কোন নিউক্লিয়োটাইড এসে যুক্ত হবে তা ছাঁচ হেলিক্স-এর তথ্যের উপর নির্ভর করবে। তবে অবশ্যই AT, GC রীতি অনুযায়ী হবে।]

৬। পৃথককৃত দুটি সূত্রের একটি তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে বা নিরবচ্ছিন্নভাবে ফর্ক-এর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন সৃষ্ট এই সূত্রকে বলা হয় অগ্রগামী সূত্র বা লিডিং সূত্র (leading strand)। অপর সূত্রটি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে না। খণ্ড খণ্ডভাবে সৃষ্ট নতুন সূত্রকে বলা হয় ধীরগামী সূত্র বা ল্যাগিং সূত্র (lagging strand)। (তীর চিহ্নের মাধ্যমে প্রতিরূপ সৃষ্টির অগ্রসরমান দিক দেখানো হয়েছে।)

৭। লিডিং সূত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অগ্রসর হওয়ার কারণে ল্যাগিং সূত্রে জোড়াবিহীন নিউক্লিয়োটাইডের সারি তৈরি হয়। জোড়াবিহীন নিউক্লিয়োটাইডের সারিটি একটু লম্বা হলে প্রাইমেজ এনজাইম কার্যকরী হয় এবং একটি প্রাইমার তৈরি করে অর্থাৎ মুক্ত ৩′-OH প্রান্ত সৃষ্টি করে দেয় ফলে প্রতিলিপন কাজ শুরু হয়। লিডিং সূত্রের মতো এখানে প্রতিলিপন নিরবচ্ছিন্ন হয় না– খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। প্রতিটি খণ্ডের জন্য একটি প্রাইমার ব্যবহৃত হয়। DNA পলিমারেজ-I, প্রাইমারকে DNA দ্বারা প্রতিস্থাপন করে দেয়, ফলে এখানে একটি ছোট গ্যাপ থেকে যায়।

৮। DNA অণুর অনুলিপনে ল্যাগিং সূত্রের প্রতিলিপিত খণ্ডকে বলা হয় Okazaki খণ্ড (আবিষ্কারকের নামানুসারে)। লাইগেজ এনজাইম Okazaki খণ্ডগুলোর মধ্যকার গ্যাপকে সংযুক্ত করে প্রতিলিপিত অংশকে নিরবচ্ছিন্নতা দান করে।

৯। একই সাথে DNA ডাবল হেলিক্স-এর বিভিন্ন স্থানে প্রতিলিপন কার্য শুরু হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপূর্ণ ডাবল হেলিক্সটিই প্রতিলিপিত হয়ে দুটি ডাবল হেলিক্স-এ পরিণত হয় অর্থাৎ প্রতিলিপন সমাপ্ত হয়। প্রতিলিপন সমাপ্ত হলে রেপ্লিসোম (এনজাইম কমপ্লেক্স) বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যায়।

DNA প্রুফ রিডিং এবং DNA মেরামত

নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরিকালে ভুল নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। মানুষের প্রতি ১০০০ জিন এর মধ্যে একটি ভুল হতে পারে। যেমন A = T এর স্থলে A = C হয়ে যেতে পারে। DNA-এর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে ভুল ধরার জন্য প্রুফ রিডিং ব্যবস্থা আছে। এ ধরনের ভুলকে বলা হয় Mismatch। ভুল ধরা পড়লে তা মেরামত করে নেয়ারও ব্যবস্থা আছে। যেমন A এর সাথে C যুক্ত হয়ে থাকলে, মেরামতের মাধ্যমে C-কে সরিয়ে দিয়ে T অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়।

এছাড়া পরিবেশীয় বিভিন্ন উপাদানের কারণে (UV রশ্মি, বিষাক্ত যৌগ, কারসিনোজেনিক পদার্থ ইত্যাদি) DNA-এর ক্ষত (damage) হতে পারে। এটিও মেরামতের ব্যবস্থা আছে। Mismatch-এর কারণে মানুষের এক ধরনের কোলন

ক্যান্সার হয়ে থাকে। মানুষের Xerodesma Pigmentosum নামক এক প্রকার চর্মরোগ হয়ে থাকে। সাধারণ... দ্বারা DNA এর যে ক্ষত হয় তা মেরামতের ব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিতে না থাকলে রৌদ্রতাপে তার স্কিন ক্যান্সার হয়...

রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স (Replication complex) : DNA প্রতিলিপনের সময় সৃষ্ট রেপ্লিকেশন ফর্কের নিকট... কিছু এনজাইম ও প্রোটিন সমন্বিত হয়ে একটি জটিল আণবিক যান্ত্রিক গঠন সৃষ্টি করে, একে বলা হয় রেপ্লিকেশন... বা রেপ্লিসোম। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো–

উপাদান	DNA প্রতিলিপনে কাজ
i. টপোআইসোমারেজ	DNA অণুকে অতিমাত্রায় প্যাঁচানো অবস্থা থেকে মুক্ত করে থাকে।
ii. DNA হেলিকেজ	রেপ্লিকেশন ফর্কে DNA ডাবল হেলিক্স প্যাঁচগুলো খুলে দেয়।
iii. DNA পলিমারেজ	নিউক্লিয়োটাইড অণু যুক্ত করে 5′ প্রান্ত - 3′ প্রান্ত নির্দেশিত পরিপূরক... বা শিকল গঠন করে থাকে। DNA প্রুফ রিডিং করে।
iv. সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন (SSBP)	DNA অণুর একক স্ট্র্যান্ডে সংযুক্ত হয় যাতে এরা পুনরায় দ্বি-তন্ত্রী অ... ফিরে না আসে।
v. লাইগেজ	ওকাজাকি খণ্ডকে পরিপূরক স্ট্র্যান্ডে যুক্ত করে।
vi. প্রাইমেজ	RNA প্রাইমারকে স্ট্র্যান্ডের প্রান্তে যুক্ত করে।

জীবজগতে DNA প্রতিলিপনের গুরুত্ব অপরিসীম। কোষ বিভাজন এবং গ্যামিট সৃষ্টির জন্য DNA প্রতি... অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ দেহের বৃদ্ধি ও জনন এবং এর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে স্থানান্তর ইত্যাদি... DNA প্রতিলিপন বাধ্যতামূলক।

ট্রান্সক্রিপশন (Transcription)

ইতোমধ্যেই আমরা DNA এবং RNA-এর গঠন ও কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। এখন DNA ... গ্রথিত (encoded) রাসায়নিক সংকেত বা তথ্যগুলো কীভাবে DNA থেকে RNA-তে এবং RNA থেকে প্রোটি... প্রবাহিত হয় এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবো। DNA অণুতে গ্রথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে RNA(m... অণুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন। (HIV-এর ক্ষেত্রে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন ঘটে।) RNA তৈরি... প্রক্রিয়াটি DNA কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সহজভাবে বলা যায়, **DNA থেকে RNA উৎপাদন প্রক্রিয়ার নাম হলো ট্রান্সক্রি...** RNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সলেশন। ট্রান্সক্রিপশন নিউক্লিয়াসে সংঘটিত হয় এবং এতে সৃষ্ট m... নিউক্লিয়ার ছিদ্রের মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াটির একটি সরল রূপরেখা নিম্নে দেয়া হলো :

5′------ ACTGCCATTCCCGGCATAACG ------ 3′
3′------ TGACGGTAAGGGCCGTATTGC ------ 5′ } DNA

↓ RNA পলিমারেজ II

5′------ ACUGCCAUUCCCGGCAUAACG ---------- 3′ mRNA

DNA অণুর 5′→ 3′ স্ট্র্যান্ডটির নাম সেন্স বা কোডিং স্ট্র্যান্ড, আর 3′ → 5′ স্ট্র্যান্ডকে বলে এন্টি-সেন্স বা ... কোডিং স্ট্র্যান্ড। RNA এ পলিমারেজ II ডাবল স্ট্র্যান্ডযুক্ত DNA কে টেমপ্লেট বা ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে সংশ্লেষ... এক স্ট্র্যান্ডযুক্ত mRNA অণু। এটি DNA অণুর হুবহু কপি হলেও T এর স্থলে U থাকে। DNA থেকে m... সংশ্লেষণের সময় এভাবে বেসপেয়ার সংযোগ এর বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় ক্যাপ সাইট থেকে। প্রাক RNA এর 5 প্রান্তে 9 মিথাইল গুয়ানোসাইন যুক্ত হয়ে একে ... দেয়। এরই নাম ক্যাপিং বা টুপি পরানো। তারপরে ট্রান্সলেট হয় না এমন অল্প একটু জায়গা থাকে। এর নাম ... সিকোয়েন্স। তারপর অবস্থিত প্রারম্ভ নিয়ন্ত্রক কোডন, AUG। এটি ট্রান্সলেশন শুরুর সংকেত দেয়। স্টপ কোডন ... ট্রান্সলেশন বন্ধের সংকেত।

ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার জন্য যা প্রয়োজন

(i) DNA ছাঁচ (template)

(ii) RNA-পলিমারেজ এনজাইম যা একাধিক রকম হতে পারে।

(iii) মুক্ত রাইবোনিউক্লিয়োটাইড ট্রাইফসফেট (ATP, GTP, CTP এবং UTP).

(iv) রাসায়নিক শক্তি, ট্রাইফসফেট ভেঙ্গে নিউক্লিয়োটাইড এবং পাইরোফসফেট সৃষ্টিকালে মুক্ত হয়। পাইরোফসফেট ভেঙ্গে দুই আয়ন ফসফেট তৈরি কালেও কিছু অতিরিক্ত শক্তি পাওয়া যায়।

(v) কিছু সহযোগী প্রোটিন।

প্রকৃত কোষে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া : ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- (i) সূচনা (initiation), (ii) সূত্র বর্ধিতকরণ (elongation) এবং (iii) সমাপ্তিকরণ (termination).

(i) ট্রান্সক্রিপশন সূচনা (initiation) : DNA-তে প্রতিটি জিনের জন্য একটি প্রোমোটার (promoter) থাকে (প্রোমোটার হলো জিনের রেগুলেটরি অংশের বিশেষ সিকোয়েন্স বিশিষ্ট একটি অংশ।)। প্রথমে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর নামক

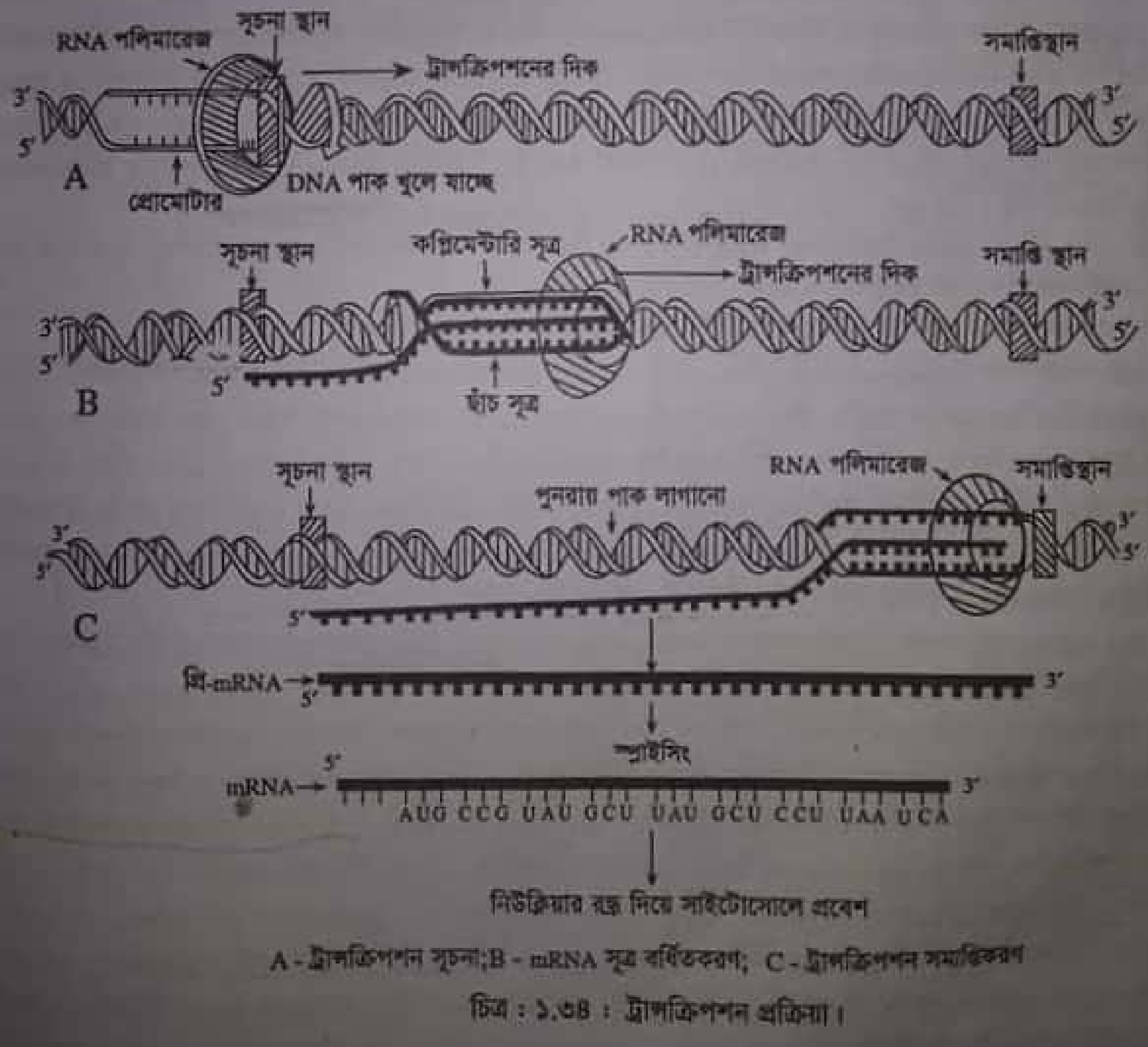

A - ট্রান্সক্রিপশন সূচনা; B - mRNA সূত্র বর্ধিতকরণ; C - ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্তিকরণ

চিত্র : ১.৩৪ : ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া।

একদল প্রোটিন প্রোমোটারে আবদ্ধ হয়। এরপর RNA-পলিমারেজ এনজাইম ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর ও প্রোমোটারে সংযুক্ত হয়। (আদি কোষে, যেমন ব্যাকটেরিয়াতে RNA-পলিমারেজ সরাসরি প্রোমোটারে সংযুক্ত হয়)। প্রোমোটার RNA-পলিমারেজ এনজাইমকে নির্দেশ দান করে কোথা থেকে ট্রান্সক্রিপশন শুরু করতে হবে এবং DNA ডাবল হেলিক্স-এর কোন স্ট্র্যান্ড-এ ট্রান্সক্রিপশন হবে। প্রোমোটারে সংযুক্ত হবার পর RNA পলিমারেজ প্রথমে DNA-এর পাক খুলে নেয়।

• সাধারণত প্রথমে কমপক্ষে ২০টি বেসপেয়ারের পাক খুলে যায়।

• DNA ডাবল হেলিক্স-এর যে স্ট্র্যান্ডে কাঙ্ক্ষিত জিন অবস্থিত সেই স্ট্র্যান্ডকে ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহার করে ট্রান্সক্রাইব করা শুরু করে। অপর স্ট্র্যান্ডটিকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড, যা ট্রান্সক্রাইব করা হয় না।

• ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় ৫-৩ মুখী অবস্থায়। RNA পলিমারেজ-II (প্রকৃত কোষে তিন ধরনের RNA পলিমারেজ থাকে। কিন্তু আদিকোষে এক ধরনের পলিমারেজ থাকে) ATP, GTP, CTP এবং UTP থেকে বেসপেয়ারিং নীতি অনুযায়ী ছাঁচে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডের পরিপূরকটি বেছে নিয়ে ছাঁচের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে RNA তৈরি সূচনা করে। সূচনা স্থান ও সমাপ্তি স্থান পূর্ব নির্ধারিত থাকে।

(ii) RNA স্ট্র্যান্ড বৃদ্ধিকরণ বা বর্ধিতকরণ (elongation) : RNA পলিমারেজ এনজাইম বেসপেয়ারিং রীতি অনুযায়ী একটির পর একটি নিউক্লিয়োটাইড সংযুক্ত করতে করতে ছাঁচ স্ট্র্যান্ড ধরে ৩′ থেকে ৫′ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ছাঁচ স্ট্যান্ড-এ যদি ATTCGA সিকোয়েন্সে বেস সজ্জিত থাকে, তা হলে RNA-তে UAAGCU সিকোয়েন্সের বেসসমূহ সজ্জিত হয়। তৈরিকৃত RNA সূত্রটি হবে ছাঁচ DNA সূত্রের অ্যান্টিপ্যারালাল কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি সূত্রের অনুরূপ, শুধু T এর স্থলে U হবে। কারণ RNA-তে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে।
DNA সূত্রের খোলা অংশের ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্ত হলে RNA পলিমারেজ পুনরায় সামনে থেকে আরেকটি অংশ খুলে দেয় এবং একই সাথে পেছনের অংশ সংযুক্ত করে পাক তৈরি করে দেয়।
এসব কাজে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা ফসফেট বিচ্ছিন্নকরণ থেকে সরবরাহ করা হয়।

(iii) সমাপ্তিকরণ (termination) : DNA-এর ছাঁচ স্ট্র্যান্ডে ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্তিকরণ স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে। RNA পলিমারেজ ছাঁচ ধরে সামনে অগ্রসর হতে হতে সমাপ্তিকরণ স্থানে (DNA সূত্রের একটি নির্দিষ্ট বেস সিকোয়েন্স) পৌঁছে গেলে ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্ত হয়। কোনো কোনো জিন-এর ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপশন সমাপ্ত হলে তৈরিকৃত RNA সূত্রটিসহ RNA পলিমারেজ এনজাইম এমনিতেই সরে পৃথক হয়ে যায়। কোনো কোনো জিনের জন্য একটি সাহায্যকারী প্রোটিন ট্রান্সক্রাইব করা অংশটিকে (এবং RNA পলিমারেজ) টেনে পৃথক করে নিয়ে আসে। DNA প্রতিলিপির মতো এখানে কোনো প্রুফরিডিং ও মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

(iv) mRNA চূড়ান্তকরণ : ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে যে mRNA সূত্রটি তৈরি হলো তাকে বলা হয় প্রি-mRNA। প্রি-mRNA চূড়ান্ত mRNA সূত্র থেকে দীর্ঘ। বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে প্রি-mRNA থেকে চূড়ান্ত mRNA তৈরি হয়। (আদিকোষে সরাসরি চূড়ান্ত mRNA তৈরি হয় এবং সাথে সাথেই ট্রান্সলেশন শুরু হয়।) প্রক্রিয়াজাতকরণ হলো mRNA সূত্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করা। প্রতিটি জিন-এ এমন কিছু অংশ থাকে যে অংশ থেকে কখনো ট্রান্সলেশন হবে না। এই অংশসমূহকে বলা হয় introns (intervening sequence)। যে অংশগুলো থেকে ট্রান্সলেশন হবে সেই অংশগুলোকে বলা হয় exons (expresed sequence)। স্প্লাইসিং (splicing) অর্থাৎ mRNA সূত্র থেকে introns অংশসমূহ কেটে বাদ দিয়ে কেবল exons অংশ রেখে mRNA চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্তকরণের পূর্বে mRNA-এর ৫′ প্রান্তে গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড বিশিষ্ট 'ক্যাপ' যুক্ত করা হয় এবং ৩′ প্রান্তে পলি A (৫০-২৫০টি এডিনিন) লেজযুক্ত করা হয়। ক্যাপ ও লেজ সংযুক্তির কারণে চূড়ান্তকৃত mRNA অণুটি নিউক্লিয়াস থেকে ছিদ্র পথ দিয়ে দ্রুত সাইটোপ্লাজমে যেতে পারে, হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের ক্ষতিকারক ভূমিকা থেকে মুক্ত থাকে এবং সহজে রাইবোসোমে সংযুক্ত হতে পারে।

mRNA ট্রান্সক্রিপশন ও প্রসেসিং হয় নিউক্লিয়াসে, আর ট্রান্সলেশন হয় সাইটোপ্লাজমে। ট্রান্সক্রিপশনের সময় সকল ...নকে এনজাইমের সাহায্যে কেটে অপসারণ করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী এক্সনগুলোকে পুনরায় জোড়া দিয়ে সংযুক্ত করা ... এ ঘটনাকে জিন স্প্লাইসিং বলা হয়। mRNA স্প্লাইসিং করতে স্প্লাইসিয়োসোম (spliceosome) লাগে। কতগুলো ...ন ও snRNA (= small nuclear RNA) মিলিতভাবে স্প্লাইসিয়োসোম গঠন করে।

ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার একটি জিন থেকে একটি ১০০০ ...ক্লিয়োটাইড বিশিষ্ট mRNA ট্রান্সক্রিপ্ট করতে মাত্র সময় লাগে এক সেকেন্ড। জিনোমের (DNA-এর) যতটুকু অংশে ...বিচ্ছিন্নভাবে একটি RNA অণু ট্রান্সক্রাইব করে তাকে ট্রান্সক্রিপশন একক বলা হয়। একটি ট্রান্সক্রিপশন এককে ...মোটার, শুরুর বিন্দু এবং শেষ বিন্দু-এই তিনটি অংশ আছে। আদিকোষ এবং প্রকৃতকোষের ট্রান্সক্রিপশনে কিছুটা ...ক্য আছে। DNA- অণুর যে অংশ বিশেষ একটি পলিপেপটাইড চেইন এর সকল তথ্য সংরক্ষণ করে তাকে জিন বা ...ট্রন (cistron) বলে।

ট্রান্সলেশন (Translation)

জীবদেহে জিন-এর প্রকাশের জন্য প্রয়োজন DNA-এর জিন অংশ থেকে RNA (mRNA) সৃষ্টি করা, যাকে বলা হয় ...ক্রিপশন, এবং mRNA থেকে পলিপেপটাইড চেইন তথা প্রোটিন সৃষ্টি করা, যাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন। অর্থাৎ RNA ...শিত পথে পলিপেপটাইড চেইন তথা প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সলেশন। সহজ কথায় mRNA থেকে ...ন তৈরি প্রক্রিয়া হলো ট্রান্সলেশন। ট্রান্সলেশন হলো DNA-এর ভাষাকে mRNA-এর মাধ্যমে প্রোটিনের ভাষায় ...দ বা রূপান্তর করা। DNA থেকে তথ্য বা নির্দেশ 'কপি' করে থাকে mRNA (transcription)। DNA এর ভাষাকে ... এর মাধ্যমে প্রোটিনের ভাষায় রূপান্তরিত করাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন (translation)। ট্রান্সলেশন রাইবোসোমে ...টিত হয়। শৃঙ্খলিত পলিপেপটাইডই হলো প্রোটিন।

...জনীয় উপাদানসমূহ

(i) mRNA যা DNA থেকে জেনেটিক কোড বহন করে নিয়ে আসে। এটি প্রোটিন সংশ্লেষণের ছাঁচরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ii) tRNA যা সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে আনে। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য কমপক্ষে একটি tRNA থাকে। tRNA অণু খুবই ছোট। এতে ৭৫-৮০টি নিউক্লিয়োটাইড থাকে। tRNA-এর ৩' প্রান্তে অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্তির জন্য কোডন থাকে এবং মাঝামাঝি অবস্থায় বিপরীত দিকে mRNA-এর সাথে সংযুক্তির জন্য ৩ বেস-এর একটি অ্যান্টিকোডন থাকে।

(iii) অ্যামিনো অ্যাসিড সাধারণত বিশ প্রকার। বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য ৬১ প্রকার কোডন থাকে।

(iv) রাইবোসোম হলো tRNA বসার মঞ্চ। প্রতিটি রাইবোসোমে tRNA বসার জন্য দুটি স্থান থাকে, A-স্থান এবং P-স্থান। একটি রাইবোসোম যে কোনো mRNA-র সাথে এবং সকল tRNA-র সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

(v) অ্যাকটিভেটিং এনজাইম : এদেরকে সাধারণত অ্যামিনো-অ্যাসিল tRNA সিন্থেটেজ (Aminoacyl-tRNA Synthetases) বলে। প্রতিটি অ্যাকটিভেটিং এনজাইম একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ও একটি tRNA-এর জন্য নির্দিষ্ট। প্রতিটি এনজাইমে তিনটি কার্যকরী সাইট থাকে; (i) একটি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য, (ii) একটি ATP-এর জন্য এবং (iii) একটি নির্দিষ্ট tRNA-এর জন্য। এনজাইম প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিড (AA) ও ATP এর সাথে ক্রিয়া করে AA-AMP bond তৈরি করে এবং পাইরোফসফেট বের হয়ে যায়। এরপর এটি tRNA এর সাথে যুক্ত হয়। দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পেপটাইড বন্ড সৃষ্টির শক্তি এ পর্যায় থেকেই আসে। এনজাইমে tRNA-এর সাথে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্তির পর AMP বের হয়ে যায় এবং পরে

ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া

- নির্দিষ্ট প্রথম অ্যামিনো-অ্যাসিডসহ শক্তিকৃত (charged) tRNA এবং রাইবোসোমের ক্ষুদ্র একক mRN সূচনা বিন্দুতে সংযুক্ত হয়। রাইবোসোমের ক্ষুদ্র এককটি mRNA সূত্রের স্বীকৃত সিকোয়েন্স-এ সংযুক্ত হ সাধারণত শুরু করার কোড হলো AUG, কাজেই প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড হলো মেথিওনিন, মেথিও tRNA-এর অ্যান্টিকোডন mRNA সূত্রের সম্পূরক বেসপেয়ারিং-এর সূচনা কোডন UAC-এর সাথে আ এর সবগুলোকে মিলিতভাবে সূচনা-যৌগ (initiation complex) বলে।

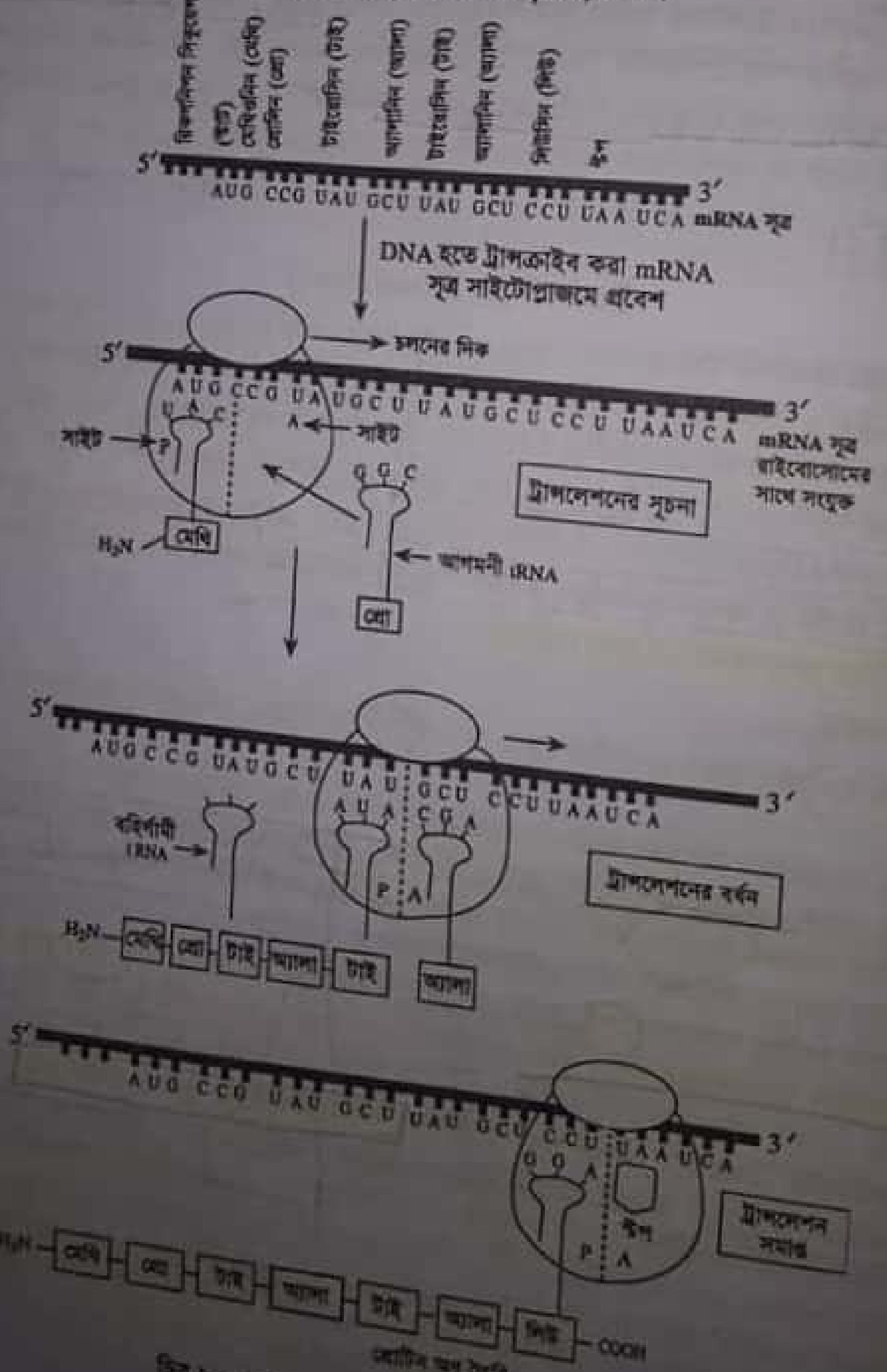

চিত্র ১.৩৫ : ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া।

- এরপর রাইবোসোমের বড় এককটি এসে এই যৌগের সাথে যুক্ত হয়। বড় এককে দুটি সাইট থাকে। প্রথমটি A-সাইট ও পরেরটি P-সাইট। সাইট দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত। tRNA প্রথমে A সাইট-এ যুক্ত হয় এবং পরে A-সাইট খালি করে P-সাইট এ চলে যায়। P-সাইট-এ অ্যামিনো অ্যাসিড পলিপেপটাইড চেইনে সংযুক্ত হয়। খালি A-সাইট এ পুনরায় অপর একটি অ্যামিনো-অ্যাসিডসহ নতুন tRNA যুক্ত হয়।
- GTP থেকে শক্তি গ্রহণ করে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর (initiation factor) নামক এক দল প্রোটিন mRNA, tRNA, রাইবোসোম ইত্যাদিকে এক সাথে এনে দেয়।
- সংযুক্ত স্থানে mRNA এবং tRNA সূত্রদ্বয় অ্যান্টিপ্যারালাল এবং বেস-পেয়ারিং কমপ্লিমেন্টারি বা সম্পূরক।
- অ্যামিনো অ্যাসিডকে সংযুক্ত করে tRNA সূচনা যৌগ থেকে সরে গিয়ে সাইটোসোল-এ (Cytosol = সাইটোপ্লাজমের তরল অংশ) চলে আসে এবং পুনরায় একই জাতীয় অপর অ্যামিনো অ্যাসিড আনার জন্য প্রস্তুত হয়।
- রাইবোসোম mRNA সূত্রের ৫′–৩′ মুখী অবস্থায় চলতে থাকে, ফলে একটির পর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড তথা প্রোটিন অণু গঠন করে।

প্রক্রিয়াটি চলতে থাকলে

(i) পরবর্তী শক্তিকৃত tRNA খালি A-সাইট-এ প্রবেশ করে।

(ii) tRNA এর অ্যামিনো অ্যাসিড P-সাইট-এ এসে বর্ধিষ্ণু পলিপেপটাইড চেইনের সাথে যুক্ত হয় এবং

(iii) সম্পূর্ণ tRNA পলিপেপটাইড যৌগ, এর কোডনসহ নতুন করে শূন্য হওয়া P-সাইট-এ চলে আসে। Elongation factors বলে এক দল প্রোটিন এসব কাজে সহায়তা করে।

- রাইবোসোম mRNA বরাবর চলতে চলতে যখন স্টপ কোডন (UAA, UAG বা UGA)-এ প্রবেশ করে অর্থাৎ রাইবোসোমের A-সাইটে স্টপ কোডন প্রবেশ করে তখন ট্রান্সলেশন বন্ধ হয়ে যায়। এসব কোডন কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড বা কোনো tRNA এনকোড করে না, বরং এর পরিবর্তে একটি Protein release factor-এর সাথে সংযুক্ত হয়।
- নতুন সৃষ্ট প্রোটিন অণুটি তখন রাইবোসোম হতে মুক্ত হয়ে যায়।
- ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। পলিসোম (পলিরাইবোসোম) ট্রান্সলেশনের গতি অনেক বাড়িয়ে দেয়।

বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া (প্রোটিন সংশ্লেষণ) ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কতিপয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং মানবদেহকে রোগ থেকে মুক্তি দেয়।

অ্যান্টিবায়োটিক	বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পর্যায়
ক্লোরোমাইসিন →	পেপটাইড বন্ধনী সৃষ্টিতে
ইরিথ্রোমাইসিন	রাইবোসোমে mRNA-এর চলনে
নিওমাইসিন	mRNA ও tRNA-এর মধ্যে আন্তঃক্রিয়াতে
স্ট্রেপ্টোমাইসিন →	ট্রান্সলেশনের সূচনা পর্যায়
টেট্রাসাইক্লিন	রাইবোসোমের tRNA-এর সংযুক্তি পর্যায়ে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে mRNA দ্বারা সরাসরি নির্ধারিত হয় প্রোটিন অণুর অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম। আর mRNA হচ্ছে DNA অণুর একটি অংশের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তাহলে বোঝা যায় প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম পরোক্ষভাবে DNA দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

আদিকোষে নিউক্লিয়াস না থাকায় একই সাথে এক প্রান্তে ট্রান্সক্রিপশন এবং অপর প্রান্তে ট্রান্সলেশন চলতে থাকে।

প্রোটিন বড় অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ, তবে মাত্র ২০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন অনুক্রমে সজ্জিত হ... বড় প্রোটিন অণু গঠন করে। দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

ট্রান্সক্রিপশন	ট্রান্সলেশন
১। DNA অণুতে গ্রথিত রাসায়নিক তথ্যগুলোকে RNA (mRNA) অণুতে কপি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন।	১। mRNA থেকে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা... ট্রান্সলেশন।
২। এ প্রক্রিয়াটি কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।	২। এ প্রক্রিয়াটি সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। (m... নিউক্লিয়ার রন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে সাইটোপ্লাজমে আসে।)
৩। ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি রাইবোসোমের সাথে সম্পর্কিত নয়।	৩। এক্ষেত্রে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটি কোষের রাইবোসো... সাথে সংশ্লিষ্ট।
৪। এ প্রক্রিয়ায় RNA পলিমারেজ এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	৪। এ প্রক্রিয়ায় অ্যাকটিভেটিং এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূ... পালন করে।
৫। প্রোমোটারে সংযুক্ত হওয়ার পর RNA পলিমারেজ প্রথমে DNA-এর প্যাচ খুলে নেয়।	৫। এনজাইমে tRNA এর সাথে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ... সংযুক্তির পর AMP বের হয়ে যায় এবং ... এনজাইমে মুক্ত হয়।

জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় (Central Dogma of Biology) : রেপ্লিকেশন (Replication), ট্রান্সক্রি... (Transcription) ও ট্রান্সলেশন (Translation) এর মাধ্যমে DNA ও RNA এবং প্রোটিন এর মধ্যে একটি স... বিদ্যমান। এ সম্পর্কটি হচ্ছে- এদের একটি থেকে অন্যটির উৎপাদন (চিত্র ১.৩৬)। DNA থেকে RNA উৎপাদন, RNA থেকে প্রোটিন উৎপাদন এবং প্রোটিন (এনজাইম) দ্বারা DNA ও RNA উভয়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ- এই হচ্ছে এ সম্পর্কের মূল কথা। এ ধারণা বা প্রত্যয়টি জীববিজ্ঞানের একটি মৌল প্রত্যয় (Dogma)। এ কারণে এ প্রত্যয়কে বলে জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় (Central Dogma of Biology)। ওয়াটসন প্র... ১৯৫৮ সালে প্রস্তাবিত এ কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টিকে ১৯৬৮ সালে কমনার (Barry Commoner) চাক্রিক (cyclic) রূপ দ... করেন। ১৯৭০ এর দশকে জানা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে RNA থেকে DNA তৈরি হতে পারে। এর নাম রিভা... ট্রান্সক্রিপশন (Reverse Transcription)।

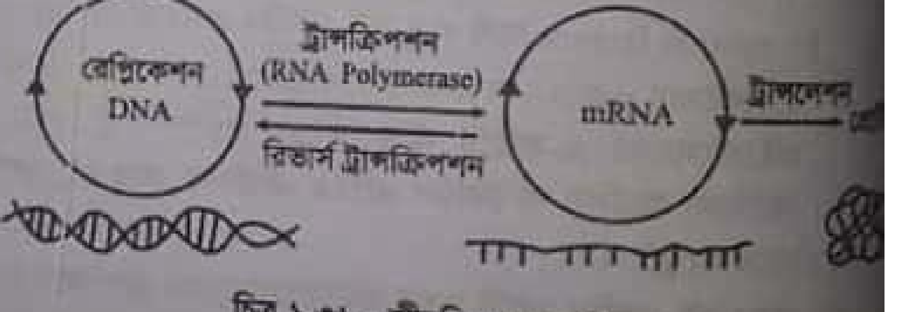

চিত্র ১.৩৬ : জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।

জিন (Gene)

ছেলেটি তার বাবার বুদ্ধিমত্তা পেয়েছে বা মেয়েটি তার মায়ের চুল ও চোখ পেয়েছে, এমন কথা আমরা বলতে শু... থাকলে এমনটি দেখেও থাকি। কিন্তু কেমন করে কার মাধ্যমে বাবা বা মা থেকে তাদের ছেলে-মেয়েতে বৈশিষ্ট্য... স্থানান্তরিত হলো? একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকেই ঐ ছেলেটি বা মেয়েটির জীবন শুরু হয়েছে। ঐ নিষিক্ত ডিম্বাণুতে না ছি... বাবার বুদ্ধিমত্তা, না ছিল মায়ের চোখ বা চুল কিন্তু এমন কিছু ছিল যা পরবর্তীতে মায়ের চোখের গড়ন, চুলের বৈশিষ্ট্য ... বাবার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। যার মাধ্যমে মা-বা বা থেকে ছেলে-মেয়েতে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো এসেছে তার নামই জিন। অর্থাৎ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রতম এককে জিন বলা হয়।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, 1822–1884) মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণা করা কালে (১৮৬০ এর দশকে) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের বাহককে কণা বা ফ্যাক্টর বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে জোহানসেন ...

১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম ঐ কণা বা ফ্যাক্টরকেই জিন (gene) হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯১২ সালে T. H. Morgan প্রমাণ করেন যে, জিন কোষের ক্রোমোসোমে অবস্থিত। ভারতীয় বিজ্ঞানী **Har Gobinda Khorana** কৃত্রিম জিন সংশ্লেষণ করে ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরষ্কার পান।

ক্রোমোসোমের যে স্থানে একটি জিন অবস্থান করে ঐ স্থানকে লোকাস (locus) বলে । কিন্তু জিন কী?

বীডল এবং ট্যাটাম (George Beadle and Edward L. Tatum- 1941) *Neurospora crassa* নামক ছত্রাক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর বলেন যে, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট এনজাইম তৈরির জন্য দায়ী। এর মাধ্যমেই Garrool (1908) সর্বপ্রথম 'এক জিন এক এনজাইম' মতবাদ চালু করেন। এর আগে থেকেই জানা ছিল এনজাইম মানেই প্রোটিন, তাই পরবর্তীতে উক্ত মতবাদ পরিমার্জন করে বলা হয় 'এক জিন এক পলিপেপটাইড চেইন'। অর্থাৎ এনজাইম এবং প্রোটিন অণু জিন কর্তৃক সৃষ্ট।

সিকল সেল হিমোগ্লোবিন (৬০০ অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত) নিয়ে কাজ করে Vernon Ingram (১৯৫৯) দেখান যে, এই প্রোটিনে ৬০০ অ্যামিনো অ্যাসিড একটি নির্দিষ্ট সাজ (sequense) অনুযায়ী সজ্জিত। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে অ্যামিনো অ্যাসিডের ভিন্ন ভিন্ন সাজ পদ্ধতির জন্যই বহু বৈচিত্র্যময় এনজাইম তৈরি হয় এবং এক একটি এনজাইম এক একটি সুনির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য দায়ী। তাই প্রোটিনকে বলা হলো জীবনের ভাষা (Language of life)।

ক্রোমোসোমে, বিশেষ করে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমে প্রোটিন এবং **DNA** দু'টোই থাকে, এর কোনোটি জিন ?

Pneumococci নিয়ে গবেষণা করে Frederick Griffith দেখেন যে, এর ভাইরুলেন্ট প্রকরণের ক্যাপসুল সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যটি স্থানান্তরযোগ্য। পরে O.T. Avery প্রমাণ করেন যে, এই ব্যাকটেরিয়ার ক্যাপসুল (দেহের চারদিকে পুরু আবরণ) তৈরির বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয় DNA দিয়ে। কাজেই বোঝা গেল **DNA-ই হচ্ছে জিন**।

আধুনিক ধারণা মতে, জিনকে বিভিন্ন একক রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন-রেকন, মিউটন, রেপ্লিকন ও সিস্ট্রন।

১। **রেকন (Recon) :** এটি জিন রিকম্বিনেশন এর একক, DNA অণুর যে ক্ষুদ্রতম একক জেনেটিক রিকম্বিনেশনে অংশ গ্রহণ করে তাকে রেকন বলে। রেকন এক অথবা দুই জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত।

২। **মিউটন (Muton):** একে জিন মিউটেশনের একক বলা হয়। DNA অণুর যে ক্ষুদ্রতম অংশে মিউটেশন সংঘটিত হয়, তাকে মিউটন বলে। এক বা একাধিক নিউক্লিয়োটাইড যুগল নিয়ে মিউটন গঠিত হয়ে থাকে।

৩। **রেপ্লিকন (Replicon) :** DNA-এর যে অংশ DNA-এর অনুলিপন নিয়ন্ত্রণ করে তাকে রেপ্লিকন বলে।

৪। **সিস্ট্রন (Cistron) :** জিন কার্যের একক। DNA অণুর যে খণ্ডাংশ কোষীয় বস্তুর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সিস্ট্রন বলে। *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার একটি সিস্ট্রনে প্রায় ১৫০০টি নিউক্লিয়োটাইড যুগল থাকে। প্রতিটি সিস্ট্রনে অনেক রেকন ও মিউটন থাকে। তাই রেকন ও মিউটন অপেক্ষা সিস্ট্রনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিন ও সিস্ট্রন প্রায় সমতুল্য (equivalent) অর্থ বহন করে।

জিন হলো ক্রোমোসোমের লোকাসে অবস্থিত **DNA** অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স যা জীবের একটি নির্দিষ্ট 'কার্যকর সংকেত' আবদ্ধ (encode) করে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। অন্যভাবে বলা যায়, জিন ক্রোমোসোমস্থ **DNA**-এর একটি অংশ যা একটি কর্মক্ষম পলিপেপটাইড শিকল গঠনের উপযুক্ত বার্তা বহন করে।

জিনের বৈশিষ্ট্যাবলি

i. জিন নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত।

ii. এরা প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমে অবস্থান করে এবং আদি কোষের নিউক্লিয় বস্তু বা প্লাসমিডে অবস্থান করে।

iii. এটি জীবের প্রকরণ (variety) এবং পরিব্যক্তিতে (mutation) মুখ্য ভূমিকা রাখে।

iv. জিন জীবের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে বহন করে।

v. জীবের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিন দায়ী।

কোনো প্রজাতির কোষে বিদ্যমান সকল ধরনের এক সেট ক্রোমোসোমে বিদ্যমান সকল জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী Hans Winkler ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম জিনোম শব্দটি ব্যবহার করেন। মানব জিনোমে ৩০০০ মিলিয়ন ক্ষারক-যুগল (base pairs) থাকে যা 24 (22A + 1X + 1Y)টি ক্রোমোসোমে বন্টিত থাকে। সব মানুষের জিনোমের গঠন ৯৯.৯ ভাগ একই রকম। জিনের গঠনের ০.১ ভাগ ভিন্নতার কারণে বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ দেখা যায়। মানব জিনোমে মাত্র ২ ভাগ জিন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে। বাকি ৯৮ ভাগ জিনই নিষ্ক্রিয় থাকে। এদের জাঙ্ক DNA (junk DNA) বলে। মানুষের জিনোমের সাথে শিম্পাঞ্জির জিনোমের ৯৮ ভাগ এবং গরিলা জিনোমের ৯৭ ভাগ মিল রয়েছে।

জিনের প্রকৃতি : যে কোনো জিনেই মিউটেশন ঘটতে পারে যার মাধ্যমে একটি স্থায়ী ও বংশপরম্পরায় স্থানান্তরযোগ্য নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো একাধিক জিন মিলে একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- মানুষের উচ্চতা। আবার কখনো একটি জিন অন্য জিনের প্রকাশকে পরিবর্তন করে দিতে পারে, অনেক জিনের প্রকাশ পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নিয়ামক দ্বারা জিনের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। জিনের বড় ধরনের পরিবর্তন জীবের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়। প্রকৃতকোষী জীবের জিনে কোডিং ও নন-কোডিং অংশ থাকে। এদেরকে যথাক্রমে এক্সন (exon) ও ইন্ট্রন (intron) বলে। কেবল এক্সন প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

একটি স্তন্যপায়ী জীবের কোষে ৫০,০০০ এর অধিক জিন থাকতে পারে। প্রতিটি জিন একটি সুনির্দিষ্ট DNA খণ্ড নিয়ে গঠিত এবং এর নিউক্লিয়োটাইড সংখ্যা ও অনুক্রমও সুনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট ক্ষারক অনুক্রম সুনির্দিষ্ট তথ্য বা সংকেত নির্দেশ করে। এ পর্যন্ত হিসাবকৃত ক্ষুদ্রতম জিনে ৭৫টি নিউক্লিয়োটাইড এবং বৃহত্তম জিনে ৪০,০০০টি নিউক্লিয়োটাইড রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রকৃতকোষী জীবের বিশেষ করে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও পাখির জিনের সংকেত বহনকারী এক্সন (exon) মাঝে মাঝে সংকেতবিহীন ইনট্রন (intron) অংশ লক্ষ্য করা যায়। এমন ধরনের জিনকে স্প্লিট জিন (split gene) বলে। হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্টের তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালে মানুষের জিনোমে ২৯০০ মিলিয়ন নিউক্লিয়োটাইড এবং প্রায় ৩০,০০০ হাজার জিন এর উপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে।

আদি কোষে জিন প্রকাশ : জিন ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যার জন্য Jacob & Monad (1961) 'অপেরন মডেল' প্রস্তাব করেন। আদি কোষে (eg. *E. coli*) জিন প্রকাশের ইউনিটকে বলা হয় operon (অপেরন)। চারটি অংশ নিয়ে অপেরন গঠিত হয়। অংশ চারটি হলো–

১। গাঠনিক জিন (Structural gene) : যা এনজাইম সংশ্লেষ করে।

২। প্রোমোটার বা উদ্দীপক জিন (Promoter gene) : যেখানে RNA-পলিমারেজ এনজাইম সংযুক্ত হয়।

৩। অপারেটর বা চালক জিন (Operator gene) : চালক জিন গাঠনিক জিনের প্রোটিন উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রক জিন (Regulator gene) : যা অপারেটর জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

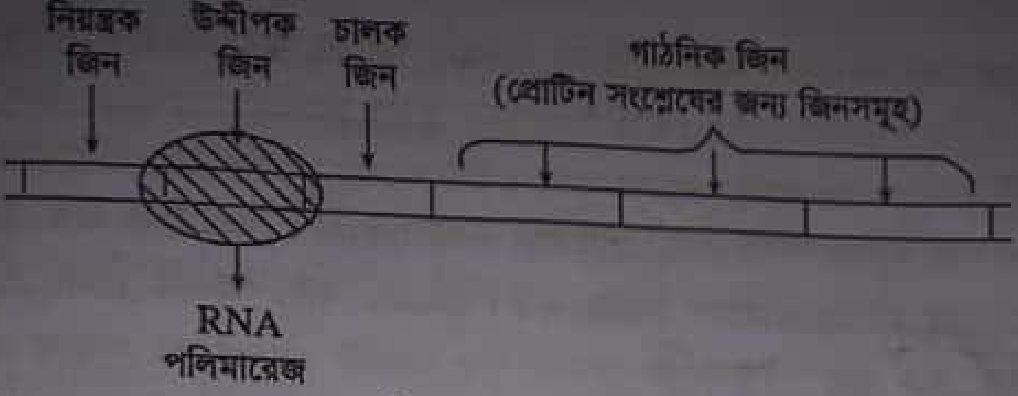

চিত্র ১.৩৭ : অপেরন।

প্রতিটি আদিকোষী জীবে একাধিক অপেরন থাকে, যেমন- ল্যাক্টোজ অপেরন, ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন ইত্যাদি। ল্যাক্টোজ অপেরন ক্রিয়াশীল হয় ল্যাক্টোজ-এর উপস্থিতিতে। আর ট্রিপ্টোফ্যান অপেরন কর্মশীল হয় ট্রিপ্টোফ্যান না থাকলে। ল্যাক্টোজ অপেরনের গাঠনিক জিন তিনটি আর ট্রিপ্টোফ্যানের গাঠনিক জিন পাঁচটি। গাঠনিক জিনসমূহ এক সাথে পরপর থাকে এবং সবাই মিলে একই mRNA ট্রান্সক্রাইব করে। রেগুলেটর জিন অনেক সময় রিপ্রেসর প্রোটিন তৈরি করে যা ট্রান্সক্রিপশনে বাধা প্রদান করে, তখন অপেরন কর্মশীল থাকে না।

প্রকৃত কোষে জিন প্রকাশ : জীবদেহের সকল তথ্য জিন তথা DNA-তে সংরক্ষিত থাকে। প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে এসব তথ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় জিন প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে তাকে জিনের ক্রিয়া (action of gene) বলে। প্রকৃত কোষে জিন প্রকাশ ঘটে যথাক্রমে (i) ট্রান্সক্রিপশন, (ii) mRNA প্রসেসিং, (iii) ট্রান্সলেশন, (iv) ট্রান্সলেশন পরবর্তী প্রসেসিং এবং (v) ফিড ব্যাক (feed back) ইনহিবিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোসোমে 'অপেরন' এর জিন ক্রিয়া-কৌশল চিত্রে দেখান হয়েছে। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্রোমোসোমস্থ জিনের ক্রিয়া-কৌশল অপেক্ষাকৃত জটিল। ক্রোমোসোমের ইউক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয়, হেটারোক্রোমাটিন অংশের জিন ক্রিয়াশীল হয় না।

আদি কোষ ও প্রকৃত কোষের জিনগত কিছু পার্থক্য নিম্নরূপ

(i) আদি কোষে 'অপেরনের' মাধ্যমে নিকট সম্পর্কযুক্ত একাধিক জিন ট্রান্সক্রাইব হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত কোষে জিনসমূহ সাধারণত পৃথক পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে। কাজেই প্রতিটি জিন-এ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। হরমোন-এ সাড়া দেয়া বিভিন্ন জিন (পৃথক পৃথকভাবে দূরে দূরে অবস্থিত) তাদের প্রোমোটারের কাছে বিশেষ সিকোয়েন্স-এর হরমোন রেস্পন্স এলিমেন্ট (Hormone response element) থাকে।

(ii) ব্যাকটেরিয়া তথা আদি কোষে এক প্রকার RNA পলিমারেজ এনজাইম থাকে কিন্তু প্রকৃত কোষে ভিন্ন তিন প্রকার RNA পলিমারেজ এনজাইম থাকে। বিভিন্ন ধরনের পলিমারেজ বিশেষ ধরনের বিশেষ বিশেষ জিনকে ট্রান্সক্রাইব করে।

(iii) আদি কোষে একটি পেপটাইড সাবইউনিটের সহায়তায় RNA পলিমারেজ প্রোমোটারকে পুনঃক্রিয়াশীল করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত কোষে ট্রান্সক্রিপশনের সূচনা পর্বে বহু প্রোটিন সম্পৃক্ত হয়।

(iv) প্রকৃত কোষে প্রোমোটার বহু ধরনের হয়।

জেনেটিক কোড (Genetic code)

কোড অর্থ হলো গোপন সংকেত বা গোপন বার্তা। আমরা জানি যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য এক বংশধর থেকে পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত হয়। এক ধরনের কোড তথা গোপন সংকেতের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের এই স্থানান্তর ঘটে থাকে। জীবের বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরকারী কোডকে বলা হয় জেনেটিক কোড। DNA-তে এই কোড অবস্থিত। আর তিনটি নিউক্লিওটাইডের একেকটি বিশেষ বিন্যাস বা ট্রাইনিউক্লিওটাইডের অনুক্রমকে (sequence) কোডন বলে।

DNA-এর নিউক্লিয়োটাইড বিন্যাসের সাথে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড বিন্যাসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাথমিক
করেন Sarabhai ও তাঁর সহকর্মীগণ (1964) এবং Yanoklei ও তাঁর সহকর্মীগণ (1964)। DNA-এর নিউ
এ চার ধরনের নাইট্রোজিনাস বেস থাকে। এগুলো হলো অ্যাডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থা
DNA অণুতে পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি বেস মিলিতভাবে একটি জেনেটিক কোড তৈরি করে। প্রতিটি কোড
অ্যামিনো অ্যাসিডের যে কোনো একটিকে নির্দেশ করে। mRNA সৃষ্টির মাধ্যমে DNA অণু এই কোড
সাইটোপ্লাজমে প্রেরণ করে এবং সাইটোপ্লাজমে কোডের তথ্য অনুযায়ী এনজাইমসহ অন্যান্য প্রোটিন সংশ্লে
সংশ্লেষিত প্রোটিনের মাধ্যমেই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হয়। একাধিক কোড যখন একটি
অ্যাসিডকে কোড করতে পারে তখন তাকে জেনেটিক কোডের অধোগামিতা বলে। কাজেই দেখা যায়, জেনেটি
হলো নিউক্লিয়োটাইডের অনুক্রম (sequence) ও অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুক্রমের মধ্যে যোগাযোগের পদ্ধতি। বি
এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

DNA অণুতে পর্যায়ক্রমিকভাবে সজ্জিত প্রতি তিনটি নিউক্লিয়োটাইড-এর মধ্যে একটি গোপন কোড (স
নিহিত থাকে। DNA অণু থেকে যখন mRNA ট্রান্সক্রাইব হয় তখন এই গোপন সংকেত mRNA অণুতে চলে
DNA-এর তিনটি নিউক্লিয়োটাইডের বিপরীতে যে তিনটি কমপ্লিমেন্টারি নিউক্লিয়োটাইড mRNA অণুতে সজ্জিত
তিনটিকে একত্রে বলা হয় ট্রিপলেট (triplet)। ফ্রান্সিস ক্রিক ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ প্রমাণ করেন যে, জেনেটিক কো
অক্ষর বিশিষ্ট বা ট্রিপলেট কোড। mRNA অণুর এই ট্রিপলেটকে বলা হয় কোডন (codon)। Nirenberg ও Ma
সহকর্মীরা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য ৬৪ ধরনের ট্রিপলেট কোড আবিষ্কার করেন।
ট্রিপলেট একটি সুনির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দেশ করে। এই নির্দেশিত অ্যামিনো অ্যাসিড tRNA এর
পলিপেপটাইড চেইন-এ সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরিতে অংশ নেয়। tRNA-তে তিনটি নিউক্লিয়োটাইডের যে ট্রি
mRNA-এর সম্পূরক ট্রিপলেটের সাথে (কোডনের সাথে) সংযুক্ত হতে পারে তাকে বলা হয় অ্যান্টিকোডন (antico
কোডনগুলো RNA গঠনকারী চারটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস-এর প্রতিনিধিত্বকারী অক্ষরের মাধ্যমে (A = অ্যাডিনিন;
ইউরাসিল; C = সাইটোসিন; G = গুয়ানিন) প্রকাশ করা হয়। এই চারটি নাইট্রোজেনঘটিত বেস লেটার (A, U, C
বিভিন্ন কম্বিনেশনে (৪ × ৪ × ৪ = ৬৪ ধরনের) ৬৪টি কোডন তৈরি করে। এর মধ্যে তিনটি কোডন (UAA, U
UGA) কোনো অ্যামিনো-অ্যাসিডকে নির্দেশ করে না, বরং ট্রান্সলেশন বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে। এদের উপস্থি
প্রোটিন সংশ্লেষণের সমাপ্তি ঘটে। বাকি ৬১টি কোডন-এর প্রতিটি কোনো না কোনো অ্যামিনো-অ্যাসিডকে নির্দেশ
UAA, UAG ও UGA এ তিনটি কোডকে সমাপ্তি কোড (nonsence code) বলে। ৬১টি কোডনের মধ্যে A
ট্রান্সলেশন শুরু করার কোডন (starting codon)। এটি ট্রান্সলেশন শুরু করার নির্দেশ প্রদান করে এবং অ্যামিনো অ
মেথিওনিন নির্দেশ করে। কোড-এর ভাষা একমুখী (নিউক্লিক অ্যাসিড → প্রোটিন)।

কোনো কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কোড থাকলেও অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড ২, ৩
এমনকি ৬টি পর্যন্ত কোড দিয়ে নির্ধারিত হয়। যেমন-লাইসিন এর জন্য ২টি, ভ্যালিন এর জন্য ৪টি, আর্জি
এর জন্য ৬টি কোড থাকে। ১৯৬৬ সালে জেনেটিক কোডের সম্পূর্ণ অর্থ জানা সম্ভব হয়। জেনেটিক কোডের পাঠো
জন্য নিরেনবার্গ ও হরগোবিন্দ খোরানা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৮ সালে।

কোডনের দ্বিতীয় অক্ষর

কোডনের প্রথম অক্ষর	U	C	A	G	কোডনের তৃতীয় অক্ষর
U	UUU, UUC } ফিনাইল অ্যালানিন UUA, UUG } লিউসিন	UCU, UCC, UCA, UCG } সেরিন	UAU, UAC } টাইরোসিন UAA, UAG সমাপ্ত নির্দেশ	UGU, UGC } সিস্টিন UGA সমাপ্ত নির্দেশ UGG । ট্রিপটোফেন	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG } লিউসিন	CCU, CCC, CCA, CCG } প্রোলিন	CAU, CAC } হিস্টিডিন CAA, CAG } গ্লুটামিন	CGU, CGC, CGA, CGG } আর্জিনিন	U C A G
A	AUU, AUC, AUA } আইসো-লিউসিন AUG শুরুর নির্দেশ মেথিওনিন	ACU, ACC, ACA, ACG } থ্রিওনিন	AAU, AAC } অ্যাসপারাজিন AAA, AAG } লাইসিন	AGU, AGC } সেরিন AGA, AGG } আর্জিনিন	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG } ভ্যালিন	GCU, GCC, GCA, GCG } অ্যালানিন	GAU, GAC } অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড GAA, GAG } গ্লুটামিক অ্যাসিড	GGU, GGC, GGA, GGG } গ্লাইসিন	U C A G

* তিন দিক থেকে তিনটি অক্ষর মিলিতভাবে একটি কোডন তৈরি করে।

নটিক কোড বা কোডনের বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of genetic code)

১। একাধিক কোডন একটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে কোড বা নির্দেশ করে (যেমন- লিউসিন)

২। একটি কোডন কখনো একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডকে কোড করে না।

৩। কোডন তৈরিতে নিউক্লিয়োটাইড (এখানে letter বা অক্ষর) কখনো অভারলেপ (overlap) করে না (non-overlapping) বরং ক্রমসজ্জা (sequence) অনুসরণ করে।

৪। কোডনসমূহ সার্বজনীন (universal) অর্থাৎ বিশ্বের সকল প্রজাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সেই আদিকাল থেকে শত বিবর্তন ধারা অতিক্রম করে এখনো একই রকম আছে।

৫। জেনেটিক কোড সর্বদা তিন অক্ষরবিশিষ্ট বা ট্রিপলেট কোড।

৬। শুরু ও সমাপ্তি কোড সুনির্দিষ্ট। কোডন AUG দিয়ে চেইন শুরু এবং কোডন UAA, UAG ও UGA দিয়ে চেইন সমাপ্তি বা শেষ হয়।

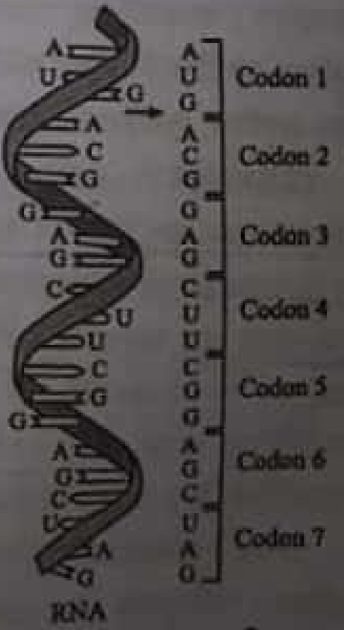

চিত্র ১.৩৮ : জেনেটিক কোড

৭। দুটি কোডের মধ্যে অতিরিক্ত নিউক্লিয়োটাইড থাকে না। আবার সমাপ্তি কোডন না আসা পর্যন্ত অবিরাম আমিনো অ্যাসিড সংযুক্তি চলতে থাকে।

সামান্য ব্যতিক্রম

মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে (এদের DNA আদি কোষ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়) এবং অ্যামিনো কোডনের সাজানো পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কতক প্রোটিস্ট-এ UAA এবং UAG ট্রান্সলেশন বন্ধ নির্দেশ না দিয়ে বরং গ্লুটামিন কোড করে। এর ব্যাখ্যা এখনো জানা যায়নি, একে সার্বজনীন-এর সামান্য ব্যতিক্রম বলা হয়।

বংশগতি নির্ণয়ে DNA-এর ভূমিকা

আমরা জেনেছি মাতা-পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হওয়াকে বংশগতি। বংশগতির ভিত্তি হলো বংশগতি বস্তু অর্থাৎ ক্রোমোসোম, DNA, RNA ইত্যাদি। কাজেই বংশগতি নির্ণয়ে এদের ভূমিকা সরাসরি।

DNA-এর ভূমিকা : এখন সর্বজন স্বীকৃত যে ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনই জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ DNA-ই জিন। DNA, ক্রোমোসোমের একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ। কাজেই কেবলমাত্র DNA-ই বংশগতির বস্তু এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (chemical basis of heridity)। DNA-ই সরাসরি মাতা-পিতা হতে বৈশিষ্ট্য তার সন্তান-সন্ততিতে বহন করে নিয়ে আসে।

সার-সংক্ষেপ

কোষ : জীবদেহ গঠনকারী একক হলো কোষ। জীবদেহের সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুও কোষ। কাজেই জীবদেহের গঠন ও কাজের এককই কোষ হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে বোতলের কর্ক পরীক্ষাকালে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার প্রকোষ্ঠ দেখতে পান এবং ঐ প্রকোষ্ঠকেই নাম দেন Cell, যার বাংলা করা হয়েছে কোষ। যে কোষ জীবের দেহ গঠন করে তাকে বলা হয় দেহকোষ, আবার জনন কাজের জন্য সৃষ্ট শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে বলা হয় জননকোষ। ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবের কোষকে বলা হয় আদিকোষ, কারণ এদের কোষ আদি প্রকৃতির, সুগঠিত নিউক্লিয়াসবিহীন। পুষ্পক উদ্ভিদ, মানুষ ইত্যাদি জীবের কোষ হলো প্রকৃত কোষ, কারণ এদের কোষ উন্নত প্রকৃতির, সুগঠিত নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।

ক্রোমোসোম : ক্রোমোসোম হলো কোষস্থ সূত্রাকার অঙ্গাণু যা সাধারণত নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত। ক্রোমোসোমের মূল উপাদান হলো DNA, কাজেই ক্রোমোসোমই বংশগতির ধারক ও বাহক। ক্রোমোসোম আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৫ সালে (কোষ আবিষ্কার হওয়ার অনেক পরে) এবং নামকরণ করা হয় ১৮৮৮ সালে। ক্রোমোসোম অর্থ হলো 'রঙিন দেহ' কারণ এরা কতগুলো বেসিক রং ধারণ করতে পারে। প্রতিটি জীবপ্রজাতি একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম ধারণ করে, যার সংখ্যা প্রজাতিভেদে 2n = ২ থেকে 2n = ১৬০০ পর্যন্ত জানা গেছে। প্রতিটি ক্রোমোসোমে কমপক্ষে একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে এবং সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানভেদে ক্রোমোসোম প্রধানত চারি প্রকার, যথা-মধ্যকেন্দ্রিক, উপ-মধ্যকেন্দ্রিক, উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক এবং প্রান্তকেন্দ্রিক। কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোম প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

DNA : ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডকে সংক্ষেপে DNA বলা হয়। প্রকৃতকোষের ক্রোমোসোমে অবস্থিত DNA সূত্রাকার। আদি কোষ এবং ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি অঙ্গাণুর (যদি থাকে) DNA বৃত্তাকার। প্রতিটি DNA গঠিত হয় এক অণু পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, এক অণু ফসফোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজিনাস বেস দিয়ে। কোষ বিভাজনকালে ক্রোমোসোমের বিভক্তির আগে DNA সূত্রের দ্বিত্বন তথা প্রতিলিপন হয়। DNA

প্রতিলিপিত হয় অর্ধসংরক্ষণশীল উপায়ে। DNA-এর ভৌত গঠন ঘুরানো সিঁড়ির মতো, দ্বিসূত্রক যা ডবল হেলিক্স হিসেবে পরিচিত।

RNA : রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত নাম RNA. সকল জীবকোষেই RNA থাকে। রাসায়নিকভাবে রাইবোজ স্যুগার, নাইট্রোজিনাস বেস এবং ফসফেট নিয়ে RNA গঠিত। এটি সূত্রাকার এবং একসূত্রক। সাধারণত পাঁচ প্রকার RNA দেখতে পাওয়া যায়, যথা- tRNA, mRNA, rRNA, gRNA এবং মাইনর RNA। DNA-এর ছাঁচ থেকে mRNA ট্রান্সক্রিপ্ট হয় এবং প্রোটিন তৈরির ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। tRNA অ্যামিনো অ্যাসিডকে বহন করে mRNA এর ছাঁচের সাথে যুক্ত করে প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে। কিছু কিছু ভাইরাসে বংশগতির বস্তু হিসেবে RNA কাজ করে।

জিন : জিন হলো ক্রোমোসোমের লোকাসে অবস্থিত DNA অণুর সুনির্দিষ্ট অংশ যা জীবের একটি নির্দিষ্ট সংকেত আবদ্ধ করে রাখে এবং প্রোটিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বংশপরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়। প্রতিটি জিন-এ নিউক্লিওটাইড-এর সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। একটি জিনে ৭৫টি থেকে ৪০,০০০ পর্যন্ত নিউক্লিওটাইড থাকতে পারে।

ট্রান্সক্রিপশন : DNA থেকে RNA তৈরি হয়। DNA থেকে RNA তৈরি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন। সাধারণত প্রোটিন তৈরির জন্যই DNA তার অংশবিশেষকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে RNA তৈরি করে। প্রোটিন তৈরির জন্য mRNA এবং tRNA জরুরি। tRNA অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে mRNA-কে প্রদান করে এবং DNA কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট বার্তা অনুযায়ী mRNA প্রোটিন তৈরি করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। ডি-অক্সিরাইবোজের কয় নম্বর কার্বনে অক্সিজেন নেই?

(ক) ২ নং-এ (খ) ৩ নং-এ (গ) ৪ নং-এ (ঘ) ৫ নং-এ

২। ক্লোরোপ্লাস্টের বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) এরা সবুজ এবং খাদ্য তৈরি করতে পারে

(ii) লিউকোপ্লাস্ট হতে সৃষ্টি হয়

(iii) ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমের দেহের সকল কোষে এমন একটি উপাদান আছে যা বংশগতির আণবিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় অধঃস্তন প্রজন্মে স্থানান্তর করে।

৩। উদ্দীপকের উপাদানটির বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) দ্বিসূত্রক

(ii) নাইট্রোজেন বেসে ইউরাসিল থাকে

(iii) অনুলিপির মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোষ বিভাজন

CELL DIVISION

প্রধান শব্দসমূহ : সাইটোকাইনেসিস, কোষ চক্র, ক্রসিংওভার, সিন্যাপসিস

মাধ্যমিক শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা কোষ বিভাজন সম্বন্ধে জেনেছ। এ অধ্যায়ে কোষ বিভাজন, বিশেষ করে কোষ চক্র ও মায়োসিস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. মাইটোসিস ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. মিওসিসের (মায়োসিস= প্রকৃত উচ্চারণ মায়োসিস) পর্যায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. মিওসিসের (মায়োসিস) পর্যায়সমূহের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
৪. জীবদেহে মিওসিসের (মায়োসিস) গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৫. জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় মিওসিস (মায়োসিস) কোষ বিভাজনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।
৬. ব্যবহারিক : মাইটোসিস বিভাজন পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি কোষের একটি স্বাভাবিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এককোষী জীবসমূহ, যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট প্রভৃতি বার বার বিভাজনের মাধ্যমেই একটি থেকে অসংখ্য এককোষী জীবে পরিণত হয়। বিশালদেহী একটি বটগাছের সূচনাও ঘটে একটি মাত্র কোষ (জাইগোট = নিষিক্ত ডিম্বক) হতে। গাছ থেকে গাছের সৃষ্টি হয়, প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয় প্রাণী, আর তেমনি কোষ থেকেই কেবল কোষ সৃষ্টি হতে পারে। এককোষী নিষিক্ত ডিম্বক হতে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এক সময় কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে একটি পরিণত মানুষের সৃষ্টি হয়। জীবদেহে কোষ বিভাজন একটি মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া, এর মাধ্যমেই জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষের বিভক্তির মাধ্যমে একটি থেকে দুটি বা চারটি কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলা হয়। কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট নতুন কোষকে বলে অপত্য কোষ (daughter cell) এবং যে কোষটি থেকে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় সে কোষটি হলো মাতৃকোষ (mother cell)। Walter Flemming ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সামুদ্রিক স্যালামান্ডার (*Triturus maculosa*) কোষে প্রথম কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন।

কোষ বিভাজনের প্রকার : জীব জগতে তিন প্রকার কোষ বিভাজন দেখা যায়। যথা :

১। অ্যামাইটোসিস (Amitosis) বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন,
২। মাইটোসিস (Mitosis) বা সমীকরণিক কোষ বিভাজন এবং
৩। মায়োসিস (Meiosis) বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন।

১। অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন
(Amitosis or Direct Cell Division)

যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম কোনো জটিল মাধ্যমিক পর্যায় ছাড়াই সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য (শিশু) কোষের সৃষ্টি করে তাকে অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।

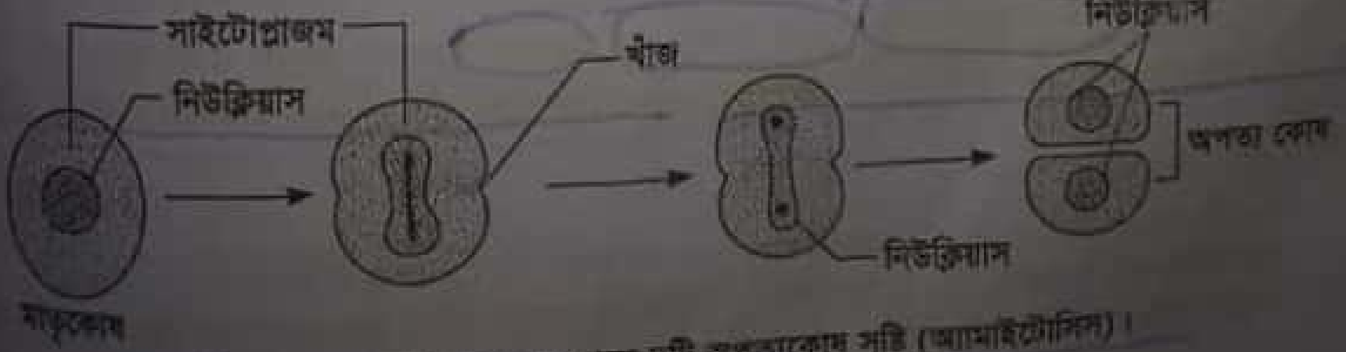

চিত্র ২.১ : একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি (অ্যামাইটোসিস)।

Scanned by CamScanner

প্রক্রিয়া : অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই সরাসরি মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে থাকে। নিউক্লিয়াসটি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি দু'অংশে ভাগ হয়। নিউক্লিয়াসটি প্রথমে লম্বা হয় ও মাঝখানে ভাগ হয়ে নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। পরে কোষটির মধ্যভাগে একটি চক্রাকার গর্ত ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়ে পরিশেষে দু'ভাগ করে ফেলে। ফলে একটি কোষ দুটি অপত্য কোষে (daughter cell) পরিণত হয়। প্রতিটি অপত্য কোষ ক্রমে বৃদ্ধি মাতৃকোষের অনুরূপ আকৃতি লাভ করে। কতক ইস্ট, অ্যামিবা প্রভৃতি এককোষী জীবে এ প্রকার কোষ বিভাজন যায়। ব্যাকটেরিয়ার দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়াও কতকটা অ্যামাইটোসিস এর মতোই। উভয় প্রক্রিয়া প্রায় সমার্থক।

অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ার তাৎপর্য

(i) বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার (১৮৯২) এর মতে, অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া থেকেই জটিল ও উন্নত কোষ বিভাজন প্র উৎপত্তি হয়েছে।

(ii) কোনো কোনো এককোষী জীবের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

২। মাইটোসিস বা সমীকরণিক কোষ বিভাজন
(Mitosis or Equational Cell Division)

প্রকৃতকোষী জীবদেহ গঠনের কোষ বিভাজন হলো মাইটোসিস। মাইটোসিস কোষ বিভাজনে একটি প্রকৃত কো প্রতিটি ক্রোমোসোমের একটি করে ক্রোমাটিড দু'দিকে দু'মেরুতে সরে গিয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে এবং প্রাণিকোষে প্লাজমামেমব্রেন ভেত দিকে ঢুকে গিয়ে সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজন বলা হয় ক্যারিওকাইনেসিস (karyokinesis) এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয় সাইটোকাইনে (cytokinesis)। এ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যাগত, আকৃতিগত ও গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ নতুন দুটি কোষের প্রতিটিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা, গুণাগুণ ও গঠনাকৃতি মাতৃকোষের ক্রোমোসোমের সং গুণাগুণ ও গঠনাকৃতির অনুরূপ থাকে। এ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম উভয়ই একবার বিভাজিত হয়। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম উভয়ই একবার করে বিভক্ত হয় তা মাইটোসিস কোষ বিভাজন। অন্যভাবে, যে কোষ বিভাজনে একটি দেহ কোষের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে সমআকৃতি সমগুণসম্পন্ন দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টির মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয় সেই কোষ বিভাজনই মাইটোসি নিউক্লিয়াসের এরূপ বিভাজন প্রথম দেখতে পান স্লাইখার (Schleicher-1879) এবং নাম দেন ক্যারিওকাইনেসিস। প ওয়াল্টার ফ্লেমিং (Walter Flemming, 1882) এ প্রকার পূর্ণ বিভাজনকে মাইটোসিস নামে অভিহিত করেন।

মাইটোসিস বিভাজনে মাতৃকোষের প্রতিটি ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ারসহ লম্বালম্বিভাবে সমান দু'অংশে ভাগ হয় এ প্রতিটি অংশে এর নিকটবর্তী মেরুতে গমন করে। ফলে সৃষ্ট নতুন কোষ দুটিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই মাইটোসিসকে ইকোয়েশনাল বা সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয়।

মাইটোসিস কোথায় ঘটে : মাইটোসিস প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন দৈহিক কোষে ঘটে থাকে, যেম উদ্ভিদের কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার শীর্ষ, মূলের বর্ধিষ্ণু শীর্ষ, ক্যাম্বিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলে মাইটোসিস হয়ে থাকে। জীবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাইটোসিস প্রক্রিয়ারই ফল। জননাঙ্গের গঠন এবং বৃদ্ধিও মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য

১। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে তথা অনুদৈর্ঘ্যে দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়।

২। প্রতিটি ক্রোমাটিড তথা অপত্য ক্রোমোসোম তার নিকটস্থ মেরুতে পৌঁছে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। কাজেই দুটি অপত্য কোষেই ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান থাকে।

Scanned by CamScanner

। অপত্য কোষগুলো মাতৃকোষের সমগুণসম্পন্ন হয়, কারণ জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক জিনসমূহ বহনকারী ক্রোমোসোমগুলোর প্রতিটি সমানভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষের নিউক্লিয়াসে যায়।

। অপত্য কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে।

। অপত্য কোষ বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃকোষের সমান আয়তনের হয়।

কোষ চক্র ও ইন্টারফেজ (Cell Cycle & Interphase)

...কটি সুস্থ বর্ধিষ্ণু কোষের জীবন শুরু হয় মাতৃকোষের বিভাজনের ফলে তার সৃষ্টির মাধ্যমে এবং শেষ হয় বিভাজিত ...পত্য কোষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। একটি কোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন– এ তিনটি কাজ যে চক্রের ... সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় কোষ চক্র (Cell Cycle)। হাওয়ার্ড ও পেল্ক (Howard & Pelc, 1953) এই কোষ ...প্রস্তাব করেন। এই চক্রটি বার বার চলতেই থাকে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দেহে ১০০ ($১০^{১৪}$) ট্রিলিয়ন ...n) কোষ থাকে। দেহকে সুস্থ রাখতে হলে এর মধ্যে সঠিক সময়ে সঠিক কোষটিকে বিভক্ত হতে হবে। এ ...নের জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োজনীয় সিগনাল বা সংকেত। কিছু কোষ আছে যারা দ্রুত বিভাজনের ...শেষায়িত (যেমন ভ্রূণ কোষ, মূল ও কাণ্ডের শীর্ষ মেরিস্টেম কোষ); কিছু কোষ আছে প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা পেলে ...ত হতে পারে; আবার অনেক কোষ আছে ... বিভক্ত হয় না, যেমন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ...ক্ত কোষ, পেশিকোষ, স্নায়ুকোষ, উদ্ভিদের ...কোষসমূহ।

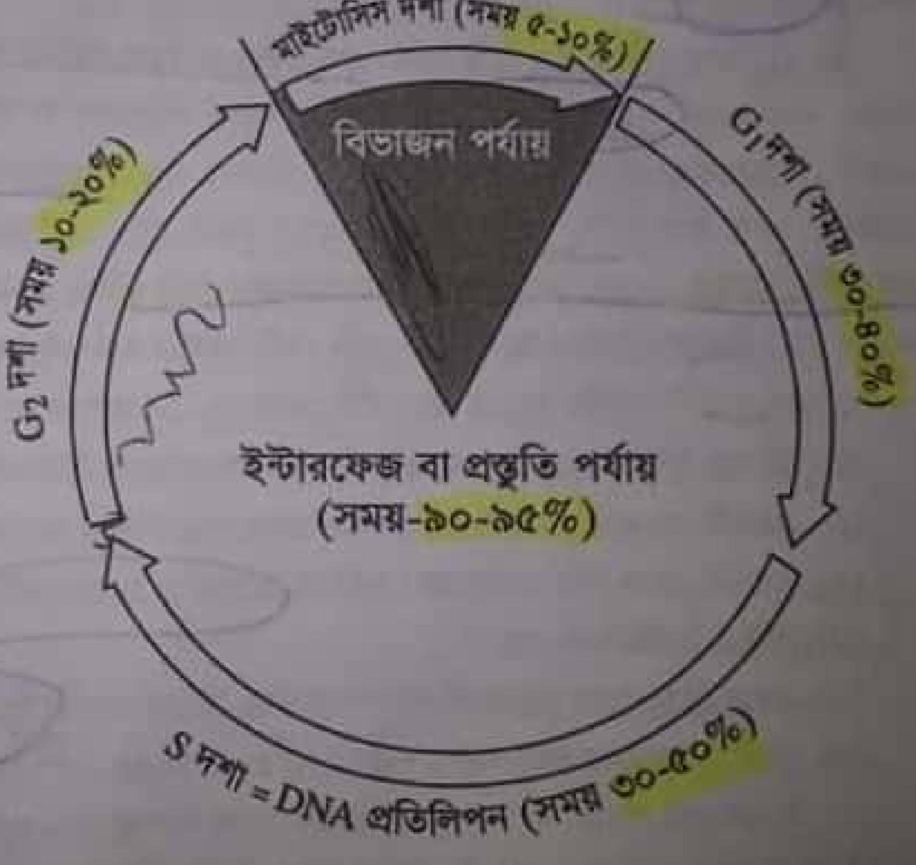

চিত্র ২.২ : হাওয়ার্ড ও পেল্ক কোষ চক্র।

...ষ চক্র দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত, যথা- ... বিভাজনরত অবস্থাকে বলা হয় এম. ফেজ (Mitotic Phase) বা মাইটোসিস এবং দুটি ...ফেজ-এর মধ্যবর্তী অবিভাজন অবস্থাকে ... ইন্টারফেজ (Interphase)। এম. ফেজ ...ইন্টারফেজ পর্যায়ক্রমিকভাবে পরপর এসে ...চক্র সম্পন্ন করে। কোষ চক্রের মোট ...মাত্র ৫-১০ ভাগ ব্যয় হয় এম. ফেজ-এ, ...াকি ৯০-৯৫ ভাগ সময় ব্যয় হয় ...ফেজ অবস্থায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ... নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র অল্পসংখ্যক কোষ ...সিস পর্যায়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় ...শ কোষই ইন্টারফেজ পর্যায়ে থাকে।

...জেনেটিক প্রোগ্রাম দ্বারা কোষ চক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা প্রদান করে সাইক্লিন-Cdk যৌগ। বিভিন্ন ... ও গ্রোথ ফ্যাক্টর (gf) বাহ্যিক উদ্দীপনা দান করে। আমাদের দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে রক্তের অণুচক্রিকা ...গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করে যার উদ্দীপনায় চারপাশের কোষ বিভাজিত হয়ে ক্ষতস্থান জোড়া লাগিয়ে দেয়। দেহের ...সিস্টেমের জন্য দরকারি কোষসমূহ বিভাজিত হওয়ার জন্য শ্বেত রক্তকণিকা একটি গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করে দেয়। ...arrow-তে লোহিত রক্তকণিকা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 'কিডনি' erythroprotein তৈরি করে।

...) ইন্টারফেজ (Interphase) : ইন্টারফেজ অবস্থাটি বেশ দীর্ঘ। পরবর্তী বিভাজন পর্যায়টিকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন ...না ইন্টারফেজ অবস্থায় নিউক্লিয়াসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তাই ইন্টারফেজ অবস্থায় কোষের

Scanned by CamScanner

নিউক্লিয়াসকে বলা হয় বিপাকীয় নিউক্লিয়াস। এক কথায় বলা যায় এম. ফেজ (মাইটোসিস)-কে সুসম্পন্ন করতে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় ইন্টারফেজ অবস্থায়। ইন্টারফেজ-কে সাধারণত ৩টি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা হয়; যথা- G_1, S এবং G_2। টার্গেট কোষের (যে কোষ বিভাজিত হবে) সার্ফেসে বিশেষ রিসেপ্টর প্রোটিনের সাথে গ্রোথ ফ্যাক্টর সংযুক্ত হয়ে কোষ চক্র শুরু করার নির্দেশ দান করে।

i. G_1 দশা (গ্যাপ$_1$) : একটি কোষ পরবর্তীতে বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কিনা, তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এ উপপর্যায়ে। G_1-এর প্রথমেই সাইক্লিন নামক এক প্রকার প্রোটিন তৈরি হয় যা Cdk (Cyclin dependent kinase)-এর সাথে যুক্ত হয়ে সমগ্র প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। Cdk ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ সময় প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রোটিন, RNA এবং DNA প্রতিলিপনের সকল উপাদান তৈরি হয়। যে কোষটি আর বিভাজিত হবে না তা এক সপ্তাহ বা এক বছর অর্থাৎ আমৃত্যু G_1 উপপর্যায়েই আবদ্ধ হয়ে যায়। মোট কোষ চক্রের ৩০-৪০% সময় এ উপপর্যায়ে ব্যয় হয়।

ii. S দশা (সিনথেসিস = S) : এই উপপর্যায়ের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমস্থ DNA সূত্রের প্রতিলিপন। পরবর্তী উপ-পর্যায়ে প্রবেশের আগেই DNA প্রতিলিপন সম্পন্ন হয়। এই উপপর্যায়ে সময় ব্যয় হয় মোট সময়ের ৩০-৫০ ভাগ।

iii. G_2 দশা (গ্যাপ$_2$) : এটি হলো এম. ফেজ-এ (মাইটোসিস দশা) প্রবেশ করার প্রস্তুতি পর্যায়। এই উপপর্যায়ের প্রধান কাজ হলো মাইক্রোটিউবিউল গঠনকারী পদার্থ সংশ্লেষণ যা দিয়ে মাইটোসিস পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হয়। একটি সেন্ট্রোসোম থেকে দুটি সেন্ট্রোসোম-এ পরিণত হয়। সেন্ট্রোসোম মাইক্রোটিউবিউল তৈরি সূচনা করে। বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (ATP) এখানে তৈরি হয়। G_2 থেকে মাইটোসিস-এ প্রবেশ করতে হলে ম্যাচুরেশন প্রোমোটিং ফ্যাক্টর (MPF) নামক প্রোটিনের প্রয়োজন পড়ে। কিছু সংখ্যক কোষ G_2 উপপর্যায়ে এসেও আটকা পড়ে যায়, আর কখনো বিভাজন পর্যায়ে প্রবেশ করে না। মোট সময়ের ১০-২০ ভাগ সময় এ উপপর্যায়ে ব্যয় হয়।

G_1 থেকে S-উপপর্যায় এবং S-উপপর্যায় থেকে G_2-তে স্থানান্তরের জন্য Cdk প্রোটিনের অ্যাক্টিভেশন প্রয়োজন হয়।

জীব জীবনে ইন্টারফেজ-এর গুরুত্ব : জীব জীবনে কোষের ইন্টারফেজ পর্যায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(i) কোষটি পরবর্তী কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা ইন্টারফেজ-এর প্রথম দিকেই ঠিক হয়।

(ii) পরবর্তী কোষ বিভাজনের জন্য প্রোটিন, RNA ও DNA প্রতিলিপনের সকল উপাদান তৈরি হয়।

(iii) DNA প্রতিলিপন হয়।

(iv) কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় স্পিন্ডল তন্তু তৈরির জন্য মাইক্রোটিউবিউলস সৃষ্টি হয়।

(v) কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি (ATP) তৈরি হয়।

(vi) ইন্টারফেজ পর্যায় না থাকলে বিভাজন পর্যায় সম্পন্ন হবে না। বিভাজন প্রক্রিয়া না থাকলে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি, জীবের পূর্ণাঙ্গ গঠন ও বিকাশ হবে না, অর্থাৎ নতুন জীবই সৃষ্টি হবে না।

জীব জীবনে কোষ চক্রের গুরুত্ব/তাৎপর্য : ইন্টারফেজ ও মাইটোটিক কোষ বিভাজন পর্যায়ক্রমিকভাবে কোষ চক্র সম্পন্ন করে। কোষচক্রের গুরুত্ব অসীম।

(i) কোষ চক্র না হলে এককোষী বা বহুকোষী কোনো জীবেরই বংশবৃদ্ধি হবে না।

(ii) কোষ চক্রের ইন্টারফেজ-এর প্রস্তুতির কারণেই মাইটোসিস হয়, আর মাইটোসিস বহুকোষী জীবের বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটায়, প্রজননাঙ্গ তৈরি করে এবং ক্ষয়পূরণ করে।

(iii) প্রতিটি জীবে স্বাভাবিক কোষ চক্র ঐ জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পন্ন করে।

(iv) অস্বাভাবিক অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত কোষ চক্র জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত করে। এমনকি ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

Scanned by CamScanner

(খ) এম. ফেজ (মাইটোসিস) : কোষ চক্র G_2 ফেজ থেকে মাইটোসিস বা বিভাজন পর্যায়ে প্রবেশ করে। একটি জটিল প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও পুনর্গঠন, সাইটোপ্লাজমের নতুন দুই কোষে গমন, সেলমেমব্রেন এবং উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এম পর্যায় সমাপ্ত হয়। কোষ চক্রের মোট সময়ের মাত্র ৫-১০ ভাগ সময় ব্যয় হয় মাইটোটিক ফেজের জন্য। এভাবেই ইন্টারফেজ → এম ফেজ → ইন্টারফেজ চক্রাকারে চলতে থাকে। সম্পূর্ণ মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; যথা- (i) ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis)— নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও (ii) সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis)— সাইটোপ্লাজমের বিভাজন।

(i) ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis) : মাইটোসিস বলতে মূলত ক্যারিওকাইনেসিসকেই বোঝানো হয়ে থাকে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে বৃহৎ এবং জটিল পর্যায়ে একটি মাতৃকোষের অভ্যন্তরে একটি নিউক্লিয়াস থেকে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়, তাকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে। কোষ বিভাজন একটি অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলে একে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা সঠিক নয়। তবুও বর্ণনা ও ধারাবাহিকতার সুবিধার জন্য মাইটোসিসকে প্রধানত পাঁচটি দশা বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

(১) প্রোফেজ (Prophase) বা আদ্যপর্যায় : মাইটোসিস-এর প্রথম পর্যায়কে প্রোফেজ বলে। এ পর্যায়ে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়। নিউক্লিয়াস, বিশেষ করে ক্রোমোসোমগুলোতে জল-বিয়োজন (dehydration) আরম্ভ হয়। ক্রমাগত জল বিয়োজনের ফলে ক্রোমোসোমগুলো সংকুচিত হতে থাকে, ফলে ক্রমাগত খাটো ও মোটা হয়, রং ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্পষ্ট হতে স্পষ্টতরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এ পর্যায়ের শেষের দিকে নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। সাইক্লিন ডিপেনডেন্ট কাইনেজ (Cdk) কর্তৃক কতক প্রোটিনের ফসফরাইলেশনের কারণে ক্রোমোসোম সংকোচন শুরু হয় এবং কতক প্রোটিনের ফসফোরাইলেশনের কারণে নিউক্লিয়ার এনভেলপের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।

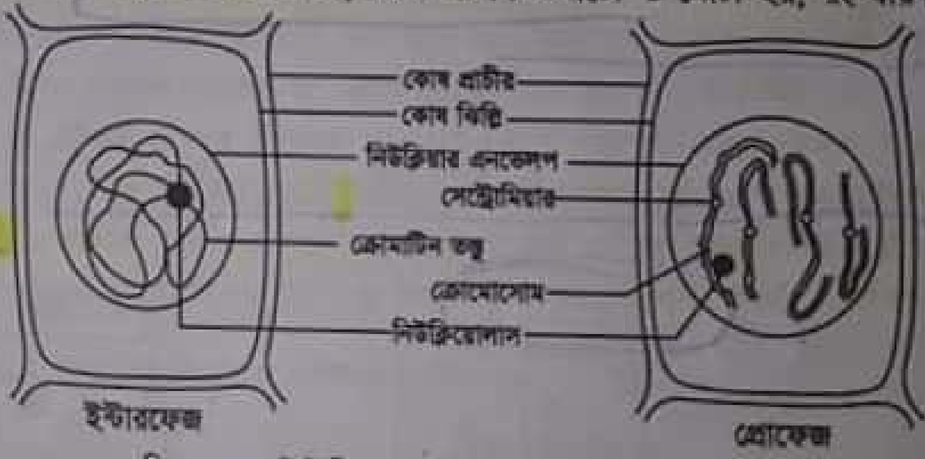

চিত্র ২.৩ : মাইটোসিস-এর ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ পর্যায়।

এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত লম্বালম্বিভাবে (অনুদৈর্ঘ্যে) দুটি সূত্রে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি সূত্রকে ক্রোমাটিড বলা হয়। ক্রোমোসোমগুলো আদ্যপর্যায়ে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হলেও আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণত অবিভক্তই মনে হয়। এ পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু সৃষ্টির সূচনা ঘটে।

(২) প্রো-মেটাফেজ (Pro-metaphase) বা প্রাক্‌-মধ্যপর্যায় : প্রোফেজ পর্যায়ের পরবর্তী এবং মেটাফেজ পর্যায়ের পূর্ববর্তী পর্যায়কে প্রো-মেটাফেজ বলে। প্রোফেজের একেবারে শেষদিকে উদ্ভিদকোষে কতগুলো তন্তুময় প্রোটিনের সমন্বয়ে দু'মেরুযুক্ত স্পিন্ডল যন্ত্রের (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ের প্রথম দিকেই স্পিন্ডল যন্ত্রের তন্তুগুলোর আঘাতে নিউক্লিয়ার এনভেলপ বিলুপ্ত হতে থাকে এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে নিউক্লিয়োলাসেরও বিলুপ্তি ঘটে। স্পিন্ডল যন্ত্রের দু'মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল বলা হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের তন্তুগুলো এক মেরু হতে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেরকে স্পিন্ডল ফাইবার (spindle fibre) বলা হয়। প্রো-মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডল যন্ত্রের নির্দিষ্ট তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। এসময় ক্রোমোসোম একটু আন্দোলিত হয় যাকে ক্রোমোসোমীয় নৃত্য বলা হয়ে থাকে। আসলে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে যেতে থাকে। ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্তকারী তন্তুকে ট্র্যাকশন ফাইবার (traction fibre) বলা হয়। ক্রোমোসোমগুলো এ সময় বিষুবীয় অঞ্চলে

Scanned by CamScanner

বিন্যস্ত হতে থাকে। (প্রাণিকোষে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি ছাড়াও পূর্বে বিভক্ত সেন্ট্রিয়োল দু'মেরুতে অবস্থান করে এবং ... হতে অ্যাস্টার তন্তু বিচ্ছুরিত হয়।)

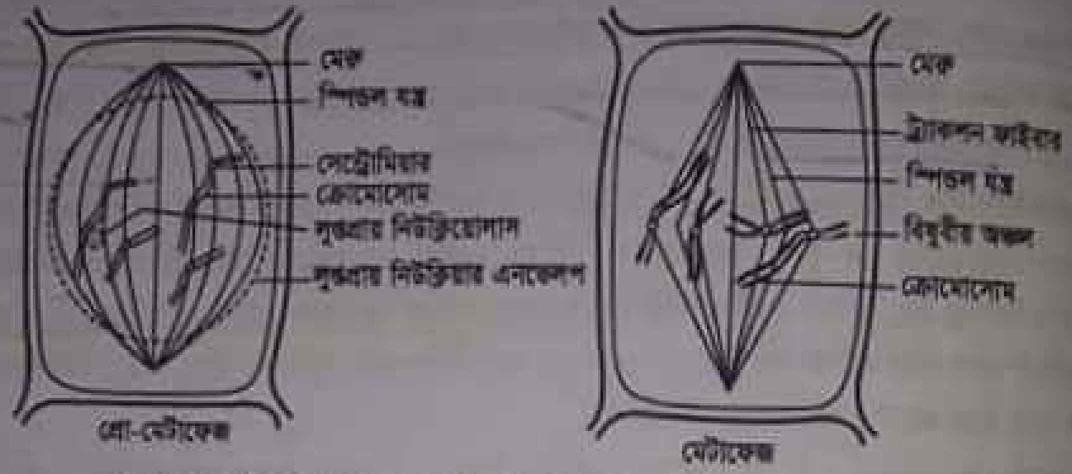

চিত্র ২.৪ : মাইটোসিস-এর প্রো-মেটাফেজ এবং মেটাফেজ পর্যায়।

স্পিন্ডল ফাইবার সেন্ট্রোমিয়ারের কাইনেটোকোরের মটর প্রোটিনে সংযুক্ত হয়। এই প্রোটিন ATP ভেঙে ADP ... সৃষ্টি করে এবং শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি খরচ করে ক্রোমোসোম মাইক্রোটিউবিউল ধরে চলতে থাকে।

(৩)মেটাফেজ (Metaphase) বা মধ্যপর্যায় : এ পর্যায়ের প্রথমেই সমস্ত ক্রোমোসোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে। স্পিন্ডল যন্ত্রের দু'মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে বিষুবীয় বা নিরক্ষীয় অঞ্চল বলা হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে মেটাকাইনেসিস বলে। এ পর্যায়ে ক্রোমাটিডগুলো সবচেয়ে বেশি খাটো ও স্পষ্ট দেখা যায়। এ পর্যায়ে কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা, আকার ও আকৃতি নির্ণয় করা যায়। মেটাফেজ পর্যায়ের শেষ ভাগে প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য সেন্ট্রোমিয়ার সৃষ্টি করে।

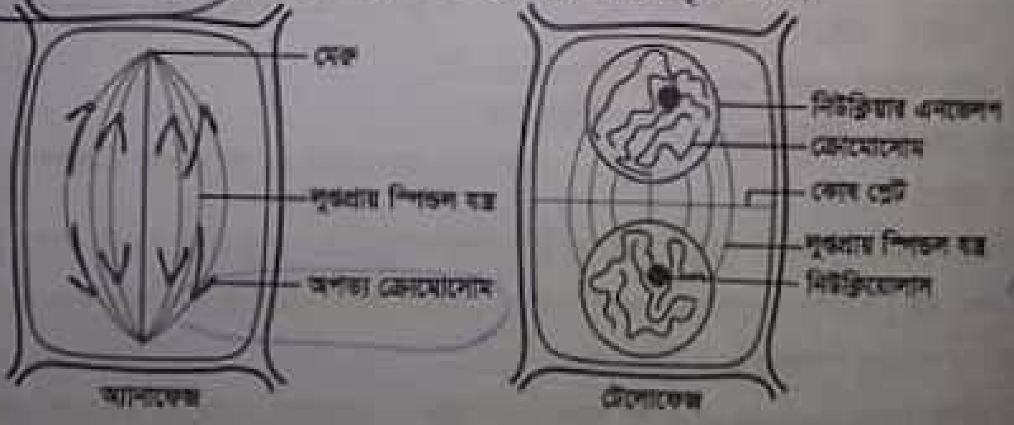

চিত্র ২.৫ : মাইটোসিস-এর অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ পর্যায়।

(৪) অ্যানাফেজ (Anaphase) বা গতিপর্যায় : সেন্ট্রোমিয়ার পৃথক হওয়ার সাথে সাথে অ্যানাফেজ পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে অপত্য ক্রোমোসোমসমূহ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরুমুখী চলতে শুরু করে। সেন্ট্রোমিয়ারের পূর্ণ বিভক্তির ফলে প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি অপত্য ক্রোমোসোমে পরিণত হয় এবং প্রতিটি অপত্য ক্রোমোসোম এদের নিকটস্থ মেরুর দিকে ধাবিত হয়। অপত্য ক্রোমোসোমের মেরু অভিমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ারই অগ্রগামী থাকে এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়, ফলে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমগুলো ইংরেজি V (মেটাসেন্ট্রিক), L (সাবমেটাসেন্ট্রিক), J (অ্যাক্রোসেন্ট্রিক) ও I (টেলোসেন্ট্রিক) অক্ষরের মতো দেখায়। অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌঁছালেই অ্যানাফেজ বা গতিপর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

Scanned by CamScanner

(৫) টেলোফেজ (Telophase) বা অন্ত্যপর্যায় : কোষ বিভাজনের এ পর্যায়ে অপত্য ক্রোমোসোমসমূহ দুই বিপরীত মেরুতে স্থির অবস্থান নেয়। এ পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলোতে আবার জলযোজন (hydration) ঘটে। ফলে এরা ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়। ক্রোমোসোমগুলো ক্রমশ সরু ও লম্বা হতে থাকে এবং অদৃশ্য অস্পষ্ট হতে থাকে। এ পর্যায়ের শেষের দিকে দুই মেরুতে ক্রোমোসোমগুলোর চারদিকে নিউক্লিয়ার এনভেলপ এবং স্যাট ক্রোমোসোমের গৌণ কুঞ্চনে নিউক্লিয়োলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। ফলে দু'মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল ফাইবারগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(ii) সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis) : টেলোফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে সাইটোকাইনেসিস আরম্ভ হয়। বিভাজনরত কোষের সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে বিভক্ত হওয়াই সাইটোকাইনেসিস। উদ্ভিদ কোষে সাইটোকাইনেসিস ঘটে কোষপ্লেট ও কোষ প্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে। উদ্ভিদ কোষে স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে কোষ প্রাচীরকে স্পর্শ করে। সূত্রগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। বিষুবীয় অঞ্চলেই লাইসোসোমের ন্যায় ফ্র্যাগমোসোম জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে প্লাজমালেমা (plasmalema) নামক ঝিল্লির সৃষ্টি করে। এরা কোষপ্লেট সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কোষপ্লেটের ওপর হেমিসেলুলোজ ও অন্যান্য দ্রব্য জমা হয়ে কোষপ্রাচীর গঠন করে। কোষপ্রাচীর গঠনের ফলে মাতৃকোষটি পরবর্তীতে দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুটি অপত্য কোষের জন্ম হয়।

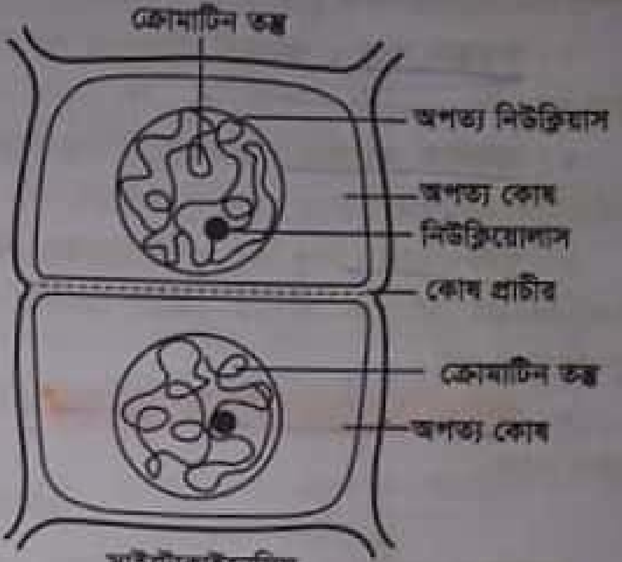

চিত্র ২.৬ : সাইটোকাইনেসিস প্রক্রিয়া।

[প্রাণীর ক্ষেত্রে স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর কোষঝিল্লিটি গর্তের ন্যায় ভেতরের দিকে ঢুকে যায় এবং এ গর্ত সব দিক হতে ক্রমান্বয়ে গভীরতর হয়ে মাঝখানে একত্রে মিলিত হয়, ফলে কোষটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। প্রোটিন actin এবং myosin কোষঝিল্লির এই খাঁজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।]

সাইটোকাইনেসিস না হলে (এবং ক্যারিওকাইনেসিস চলতে থাকলে) একই কোষে বহু নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন (free nuclear division)। ডাবের পানি মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজনের ফসল। কোনো কোনো শৈবাল, ছত্রাক ও প্রাণিকোষে ক্যারিওকাইনেসিস ঘটে কিন্তু সাইটোকাইনেসিস ঘটে না। এর ফলে একটি কোষে বহু নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ কোষকে সিনোসাইটিক (coenocytic) এবং প্রাণিকোষকে প্লাজমোডিয়াম (plasmodium) বলে।

মাইটোসিসের গুরুত্ব (তাৎপর্য বা প্রয়োজনীয়তা)

জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো।

১। দেহ গঠন ও দৈহিক বৃদ্ধি : বহুকোষী জীবে জাইগোট নামক একটি মাত্র কোষের মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী দেহ গঠিত হয় এবং এর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।

২। বংশবৃদ্ধি : কতক এককোষী সুকেন্দ্রিক (eukaryotic) জীবে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি ঘটে (যেমন- *Chlamydomonas*)।

৩। জননাঙ্গ সৃষ্টি ও জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি : মাইটোসিস বিভাজনের ফলেই বহুকোষী জীবের জননাঙ্গ সৃষ্টি হয়, ফলে বংশবৃদ্ধির ক্রমধারা বজায় রাখতে পারে। জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে এই প্রক্রিয়া আবশ্যক।

Scanned by CamScanner

৪। নির্দিষ্ট আকার-আয়তন রক্ষা : এ বিভাজন প্রক্রিয়ার ফলে কোষের স্বাভাবিক আকার, আকৃতি, আয়তন ও গুণাগুণ বজায় থাকে।

৫। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা : সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ (অঙ্গাণু) ও রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে নিউক্লিয়াস কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার পরিমাণগত ও নিয়ন্ত্রণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

৬। ক্রোমোসোমের সমতা রক্ষা : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কারণে দেহের সব কোষে সমসংখ্যক ও সমগুণ সম্পন্ন ক্রোমোসোম থাকে।

৭। ক্ষতস্থান পূরণ : বহুকোষী জীবদেহে সৃষ্ট যে কোনো ক্ষতস্থান মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূরণ হয়।

৮। ক্রমাগত ক্ষয়পূরণ : জীবকোষে কিছু কিছু কোষ আছে যাদের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। এসব কোষ বিনষ্ট হলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের পূরণ ঘটে।

৯। পুনরুৎপাদন : কিছু কিছু অতিপ্রয়োজনীয় কোষের জীবনকাল অতি সীমিত (যেমন- মানুষের লোহিত রক্তকণিকা এবং কর্নিয়ার বাইরের কোষ)। এগুলো ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে এ কোষগুলোর পুনরুৎপাদন ঘটে।

১০। গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা : এ প্রকার বিভাজনের ফলে জীবজগতের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস

কোষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা মাইটোসিস নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হলে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস ঘটে থাকে, ফলে টিউমার ও ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার কোষে সাইক্লিন-Cdk নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়ে যায়। P^{53} নামক প্রোটিন সাধারণত কোষকে বিভাজন হতে বিরত রাখায় ভূমিকা রাখে। এটি defective হলে (মানুষের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কোষেই defective P^{53} আছে) কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ক্যান্সার হয়। মানুষের অধিক হারে ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবত এটি একটি কারণ। কোষ বিভাজনের জন্য কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে। ক্যান্সার কোষ তাদের গ্রোথ ফ্যাক্টর নিজেরাই তৈরি করে নেয়, অথবা বিভাজনের জন্য এদের কোনো গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগে না।

কোষের মৃত্যু : বহুকোষী জীবদেহে প্রতিদিন অনেক কোষের মৃত্যু ঘটে। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়। মানব দেহে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কোষের মৃত্যু ঘটে। দুটি উপায়ে কোষে মৃত্যু ঘটে। একটি হলো Necrosis, অপরটি হলো Apoptosis.

i. Necrosis : পুষ্টি অভাব হলে অথবা বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোষ মরে যায়।

ii. Apoptosis : এটি হলো জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু। কোনো কোষ জীবদেহ বা অঙ্গের জন্য এখন প্রয়োজনীয় নয়, তাই এদের ধ্বংস হতে হয়। যেমন মানুষের ভ্রূণাবস্থায় পাতলা টিস্যু দিয়ে হাতের সকল অঙ্গুল লাগানো থাকে। পরে মাঝখানের টিস্যু ধ্বংসের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে পাঁচটি আঙ্গুল পৃথক হয়। একটি কোষ যত বেশি দিন বাঁচবে তার ক্ষতিগ্রস্ত (damage) হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় যা থেকে সহজেই ক্যান্সার হতে পারে। তাই এদের ধ্বংস বা মৃত্যু দরকার। এটি সাধারণত আমাদের ত্বক এবং অন্ত্রের এপিথেলিয়াল কোষের ব্যাপারে প্রযোজ্য, কারণ এরা প্রতিনিয়ত উচ্চমাত্রার বিষাক্ত পদার্থে উন্মুক্ত হয়। আমাদের দেহে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ কোষের মৃত্যু হয়, তার অধিকাংশই ত্বক ও অন্ত্রের এপিথেলিয়াম লাইনিং-এর কোষ।

Scanned by CamScanner

৩। মায়োসিস বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন
(Meiosis or Reductional Cell Division)

মায়োসিস কোষ বিভাজন ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে (অথবা হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে জাইগোটে) ঘটে থাকে। এ
জন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে দু'বার বিভক্ত হয় এবং বিভক্তির ফলে সৃষ্ট চারটি কোষে
মোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। তাই এ প্রকার কোষ বিভাজনকে মায়োসিস বা
মূলক কোষ বিভাজন বলে। এ প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস দু'বার এবং ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয়। যে কোষ বিভাজন
ক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পর পর দু'বার এবং ক্রোমোসোম মাত্র একবার বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষের ক্রোমোসোমের অর্ধেক
খ্যক ক্রোমোসোমযুক্ত চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে মায়োসিস কোষ বিভাজন বলে। গ্রিক *Meious* (to lessen-
করা) হতে Meiosis শব্দের উদ্ভব ঘটে।

সহজভাবে বলা যায়, যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় এবং নতুন সৃষ্ট
ষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায় তা-ই মায়োসিস।

আবিষ্কার ও নামকরণ : বেনেডিন (E. V. Beneden) এবং হাউসার (Houser) *Ascaris* কৃমির গ্যামিটে হ্যাপ্লয়েড
খ্যক ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন ১৮৮৩ সনে। স্ট্রাসবুর্গার (Strasburger) ১৮৮৮ সনে পুষ্পক উদ্ভিদের জনন
তৃকোষের ক্রোমোসোমে হ্রাসমূলক বিভাজন লক্ষ্য করেন। ১৯০৫ সনে ফার্মার (J. B. Farmer) ও মুর (J. E. Moore)
প্রথম হ্রাসমূলক বিভাজনকে Miosis (মিয়োসিস বা মিওসিস) বলেন। পরবর্তীতে গ্রিক মূল শব্দের (meioum= to
sen) ওপর ভিত্তি করে এর বানান করা হয় Meiosis অর্থাৎ মায়োসিস। এখন এটি মায়োসিস হিসেবেই উচ্চারিত।

কোথায় হয় ? মায়োসিস সর্বদা জনন মাতৃকোষে (meiocyte) সম্পন্ন হয়। কখনো দৈহিক কোষে হয় না এবং সর্বদাই
সংখ্যক ক্রোমোসোমবিশিষ্ট কোষে হয়। নিম্ন শ্রেণির জীবে (হ্যাপ্লয়েড) মায়োসিস হয় নিষেকের পর জাইগোটে, আর
চ শ্রেণির জীবে (ডিপ্লয়েড) মায়োসিস হয় নিষেকের পূর্বে জনন মাতৃকোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টিকালে।

নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় মায়োসিসের অবদান

উচ্চ শ্রেণির জীবে মায়োসিসের ফলে একটি জনন মাতৃকোষ হতে চারটি জনন কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক কোষে
তৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। আমরা জানি, দুটি জনন কোষ (পুং জননকোষ এবং
জননকোষ) একসাথে মিলিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে। জাইগোট পরে বার বার মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে একটি
এবং ভ্রূণের কোষগুলো আরও বিভাজিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি করে। কাজেই জননকোষগুলোতে
মোসোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে জনন মাতৃকোষের অর্ধেক না হলে তাদের যৌন মিলনের ফলে সৃষ্ট জীবে ক্রোমোসোম
খ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। হ্যাপ্লয়েড জীবে (যেমন- শৈবাল) দুটি গ্যামিটের যৌন মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোটেও
মোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। যেহেতু ক্রোমোসোমই জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন (gene) বহন করে, সেহেতু
মোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলে সন্তান-সন্ততি আর তার পিতা-মাতার গুণসম্পন্ন হবে না এবং প্রত্যেকটি প্রজাতিতে
টি আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। পরিণামে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। ডিপ্লয়েড জীবে গ্যামিট সৃষ্টিকালে জনন
কোষে এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে মায়োসিস হয় বলেই প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় টিকে থাকে এবং
নের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়।

মায়োসিসের বৈশিষ্ট্য : মায়োসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস সাধারণত জনন মাতৃকোষে হয়ে থাকে।
- এ ধরনের কোষবিভাজনে নিউক্লিয়াস দু'বার বিভক্ত হয় কিন্তু ক্রোমোসোম মাত্র একবার বিভক্ত হয়। ফলে নতুন সৃষ্ট কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষে অর্ধেক হয়।
- প্রোফেজ-১ দীর্ঘস্থায়ী বিধায় একে ৫টি উপ-পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে।
- হোমোলোগাস ক্রোমোসোম জোড়া বেঁধে বাইভেলেন্ট সৃষ্টি করে।
- কায়াজমা সৃষ্টি ও ক্রসিংওভার হয় বলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে 'জিন' বিনিময় ঘটে।
- একটি মাতৃকোষ (2n) হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

Scanned by CamScanner

৭। ক্রোমোসোমের স্বতন্ত্র বিন্যাস ঘটে।

৮। ক্রসিংওভার ও ক্রোমোসোমের স্বতন্ত্র বিন্যাস ঘটে বলে এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষগুলো কখনো মাতৃ
সমগুণ সম্পন্ন হয় না।

৯। মায়োসিস শেষে সৃষ্ট নতুন কোষে নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। বংশগতিতে বিশেষত্ব
সৃষ্টিতে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মায়োসিস হলো জীবসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির একটি প্রধান উপায়।

মায়োসিস প্রক্রিয়া : মায়োসিস একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় একটি কোষ পর পর বিভক্ত হয়। কোষ, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোমের বিভক্তির ওপর ভিত্তি করে মায়োসিস প্রক্রিয়াকে দুটি প্রধান পর্যায়ে করা হয়; যথা- (ক) মায়োসিস-১ এবং (খ) মায়োসিস-২। মায়োসিস -১-এ ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেকে আনীত হয়। জন্য একে **রিডাকশনাল বা হ্রাসমূলক** বিভাজনও বলা হয়। মায়োসিস-২-এ ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান থাকে। কেননা বিভাজন মূলত একটি মাইটোটিক বিভাজন প্রক্রিয়া। এজন্য একে **ইকোয়েশনাল বা সমীকরণিক** বিভাজনও বলা প্রত্যেক পর্বকে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ—এ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। মায়োসিস প্রক্রিয়া DNA-এর দ্বিগুন হয় প্রোফেজ-১ এর পূর্বে। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদে মায়োসিস অত্যন্ত জটিল বলে এখানে ডিপ্লয়েড (2n) উদ্ভিদের মায়োসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(ক) মায়োসিস-১ (Meiosis-1) বা প্রথম মায়োসিস বিভাজন

মায়োসিস কোষ বিভাজনে মায়োসিস-১ই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ পর্যায়েই ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেকে পায় এবং সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশের পারস্পরিক বিনিময় (ক্রসিং ওভার) ঘটে। মায়োসিস-১কে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় যথা-প্রোফেজ-১, মেটাফেজ-১, অ্যানাফেজ-১ ও টেলোফেজ-১। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

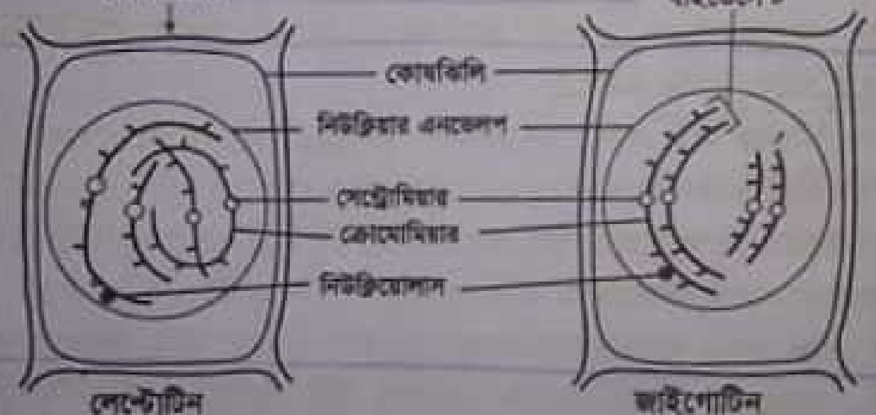

চিত্র ২.৭ : মায়োসিস বিভাজনে প্রোফেজ-১ এর লেপ্টোটিন ও জাইগোটিন উপ-পর্যায়।

(১) প্রোফেজ-১ (Prophase-1) : মায়োসিস-১ এর প্রথম পর্যায় হলো প্রোফেজ-১। প্রোফেজ পর্যায়টি অনেক দীর্ঘ হয়। মানবের শুক্রাশয়-এ মায়োটিক প্রোফেজ-এ সময় লাগে এক সপ্তাহ, বিভাজনটি সম্পন্ন হতে সময় লাগে প্রায় মাস। প্রোফেজ শুরু হওয়ার আগেই DNA প্রতিলিপিত হয়, তবে দৃষ্টিগোচর হয় না। এ পর্যায়টি অত্যন্ত জটিল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী বিধায় একে পাঁচটি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রোফেজ-১ এর উপ-পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

(ক) লেপ্টোটিন (Leptotene : গ্রিক *Leptos* = fine, thin- চিকন, পাতলা; *tene* = thread- সুতা বা তন্তু) নিউক্লিয়াসের জলবিয়োজনের মাধ্যমেই শুরু হয় লেপ্টোটিন উপ-পর্যায়। ক্রমাগত জলবিয়োজনের ফলে চিকন সুতার ন্যায় ক্রোমোসোমগুলোও ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও পুরু হতে থাকে এবং অধিকতর রঞ্জক ধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। ক্রোমোসোমগুলো আলোক অণুবীক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় এবং ক্রোমোসোমে বহু ক্রোমোমিয়ার দেখা যায়। ক্রোমোসোম অবিভক্ত ও দীর্ঘ থাকে। জলবিয়োজন ও ক্রোমোসোম সংকোচন চলতে থাকে। প্রাণিকোষে এ উপ-পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ারগুলো সাধারণত নিউক্লিয়ার এনভেলপের সন্নিকটে এক স্থানে এসে জড়ো হওয়ায় ক্রোমোসোমগুলোকে একটি

Scanned by CamScanner

...টি ফুলের তোড়ার মতো দেখায়। তাই অনেক সময় একে বুকে (bouquet) বলা হয়। ক্রোমোসোমের এ প্রকার বিন্যাসকে পোলারাইজড বিন্যাস বলে।]

(খ) জাইগোটিন (Zygotene : গ্রিক zygos = yoke-জোয়াল, জোড়া; tene = thread- সুতা) : এ উপ-পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম* (একটি 'মাতা' হতে আগত এবং অন্যটি 'পিতা' হতে আগত) একটি জোড়ার সৃষ্টি করে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণই এ জোড়া সৃষ্টির কারণ। জোড়া সৃষ্টি কার্য ক্রোমোসোমদ্বয়ের একপ্রান্ত হতে আরম্ভ হয়ে অন্যপ্রান্তে শেষ হতে পারে, অথবা সেন্ট্রোমিয়ারদ্বয়ের মধ্যে আরম্ভ হয়ে দু'দিকে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে পারে, অথবা স্থানে স্থানে আরম্ভ হতে পারে।

দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হওয়াকে সিনাপসিস (synapsis) বলে। প্রতিটি জোড়বাঁধা ক্রোমোসোম জোড়াকে বাইভেলেন্ট (bivalent) বলে। কোষে যতগুলো ক্রোমোসোম থাকবে তার অর্ধেক সংখ্যক বাইভেলেন্ট সৃষ্টি হবে। নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ তখনো দেখা যায়।

(গ) প্যাকাইটিন (Pachytene : গ্রিক *Pachys* = thick-মোটা, পুরু; tene = thread- সুতা) : ক্রমাগত সংকোচনের ফলে এ উপ-পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলোকে আরও খাটো ও মোটা দেখা যায়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাইভেলেন্টের প্রতিটি ক্রোমোসোমকে সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত অনুদৈর্ঘ্যে দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায়, অর্থাৎ প্রতি বাইভেলেন্টে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার এবং চারটি ক্রোমাটিড থাকে। এ অবস্থাকে টেট্রাড বলে। প্যাকাইটিনের পূর্বে প্রতিটি ক্রোমোসোমের দুটি করে ক্রোমাটিড দৃষ্টিগোচর হয় না। একই ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডকে সিস্টার ক্রোমাটিড বলে এবং একই জোড়ার দুটি ভিন্ন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে নন-সিস্টার ক্রোমাটিড বলে। এ উপ-পর্যায়ের শেষের দিকে বাইভেলেন্টের যে কোনো দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড সম্ভবত একই স্থানে ভেঙে গিয়ে পুনরায় একটির সাথে অন্যটির জোড়া লাগে। ফলে ঐ

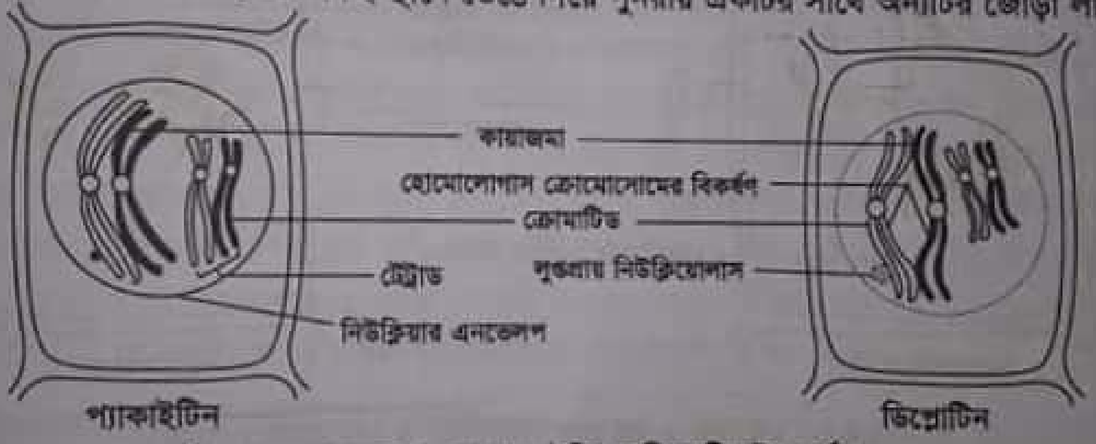

চিত্র ২.৮ : প্রোফেজ-১ এর প্যাকাইটিন ও ডিপ্লোটিন উপ-পর্যায়।

জোড়ার স্থানে একটি ইংরেজি 'X' আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের 'X' আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো জোড়াস্থলকে একবচনে কায়াজমা (Gk. *Chiasma* = cross) এবং বহুবচনে কায়াজমাটা বলে। নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে পরস্পর অংশের বিনিময়কে ক্রসিং ওভার বা ক্রস ওভার বলে। কোনো কোনো বাইভেলেন্টে (বিশেষ করে যদি খাটো হয়) কায়াজমা একবারেই উৎপন্ন না হতে পারে; আবার কোনো কোনো বাইভেলেন্টে (বিশেষ করে যদি দীর্ঘ হয়) একাধিকও হতে পারে। কায়াজমাটা সৃষ্টির ফলে যে ক্রসিং ওভার হয় তাতে ক্রোমোসোমে জিনগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পর্যায়েও নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ দেখা যায়।

(ঘ) ডিপ্লোটিন (Diplotene : গ্রিক *Diplos* = double-ডাবল; *tene* = thread- সুতা) : ক্রমাগত সংকোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলো এ উপ-পর্যায়ে আরও খাটো ও মোটা হয়। বাইভেলেন্টের ক্রোমোসোমদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ

---

*হোমোলোগাস ক্রোমোসোম : ... জিনের আকার, আকৃতি, সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ও সংখ্যা প্রভৃতি দিক হতে দুটি ক্রোমোসোম এক রকম থাকে। এদের একটিকে অপরটির হোমোলোগ (homolog) বলা হয় এবং একত্রে দু'টিকে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম বলা হয়। দুটি হোমোলোগের যে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থানে অবস্থিত জিন দুটি (এলিল) একই বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। সমরূপ সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে।

Scanned by CamScanner

শুরু হয়। ফলে এরা বিপরীত দিকে সরে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু কায়াজমাটার স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ বিকর্ষণ কয়েক স্থানে শুরু হতে পারে। তবে সাধারণত সেন্ট্রোমিয়ারদ্বয়ের মধ্যেই প্রথম এবং ব্যাপকভাবে বিকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে দুটি কায়াজমাটার মধ্যবর্তী অংশে লুপের (loop) সৃষ্টি হয়। কায়াজমাটাগুলো স্পষ্ট হয় এবং প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে। কায়াজমার এরূপ প্রান্তের দিকে সরে যাওয়াকে প্রান্তীয়করণ (terminalization) দুই বা ততোধিক বাহু পরস্পর আবর্তনের (rotatory movement) ফলে পাশাপাশি লুপ ৯০° কোণ করে অবস্থান একটি মাত্র কায়াজমা থাকলে এটি ১৮০° হতে পারে।

(ঙ) ডায়াকাইনেসিস (Diakinesis : গ্রিক *Dia* = across- অপর পাশে, বিপরীত দিকে; *kinesis*- সমাবেশ) এ উপ-পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো আরও খর্বাকৃতি ও মোটা হয়। প্রান্তীয়করণ তখনও চলতে থাকে। বাইভেলেন্ট ক্রোমোসোমের ওপর ধাত্র জমা হয় বলে তখন আর ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায় না। এক সময় বাইভেলেন্ট নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থল হতে পরিধির দিকে চলে আসে। এ উপ-পর্যায়ের শেষ দিকে নিউক্লিয়োলাস অদৃশ্য হয়ে যায়, নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাণিকোষে সেন্ট্রিয়োল মেরুতে পৌঁছে যায়।

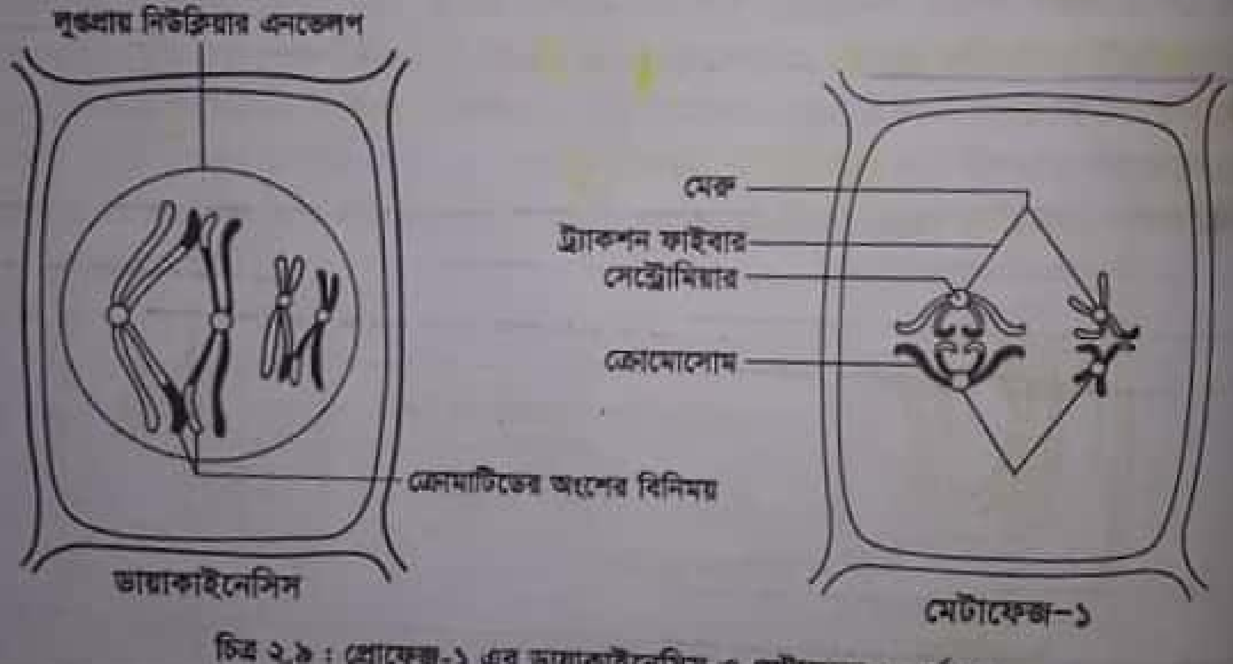

চিত্র ২.৯ : প্রোফেজ-১ এর ডায়াকাইনেসিস ও মেটাফেজ-১ পর্যায়।

> কাজ : শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি দলে ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেক দলকে প্রোফেজ-১ এর পাঁচটি উপ-পর্যায়ের কোনো একটি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। পরদিন ক্লাসে প্রত্যেক দল তাদের জন্য নির্দিষ্ট উপ-পর্যায় উপস্থাপন করে পোস্টার পেপারে একটি চার্টও করা যেতে পারে।

(২) মেটাফেজ-১ (Metaphase-1) : বাইভেলেন্টের প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার স্ব-স্ব মেরুর দিকে এবং বিষুবীয় হতে সমদূরে অবস্থান করে। কতিপয় ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত হয়। মাইটোটিক মেটাফেজের মতো এ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না। ক্রোমোসোমের মধ্যে লুপ সৃষ্টি হয়। ক্রোমোসোমগুলো আরও খাটো ও মোটা হয়। বাইভেলেন্টের ক্রোমোসোমদ্বয় ট্র্যাকশন ফাইবারের টানে পৃথক হতে থাকলে এ পর্যায়ের সমাপ্তি

(৩) অ্যানাফেজ-১ (Anaphase-1) : এ পর্যায়ে এসে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পৃথক হয়ে যায়। বাইভেলেন্টের দুটি ক্রোমোসোম (দুটি ক্রোমাটিড নয়) বিপরীতমুখী দুটি মেরুর দিকে ধাবিত হয়। ক্রোমোসোম সংকোচন, কাণ্ডদেহের প্রসারণ ও অন্যান্য কারণে ক্রোমোসোমের মেরুমুখী চলন ঘটে। এরূপ চলনকালে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়। ফলে ক্রোমোসোমগুলোকে ইংরেজি V (মেটাসেন্ট্রিক), L (সাবমেটাসেন্ট্রিক), J (এক্রোসেন্ট্রিক) এবং I (টেলোসেন্ট্রিক) অক্ষরের মতো দেখায়। ট্র্যাকশন ফাইবারের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে থাকে।

Scanned by CamScanner

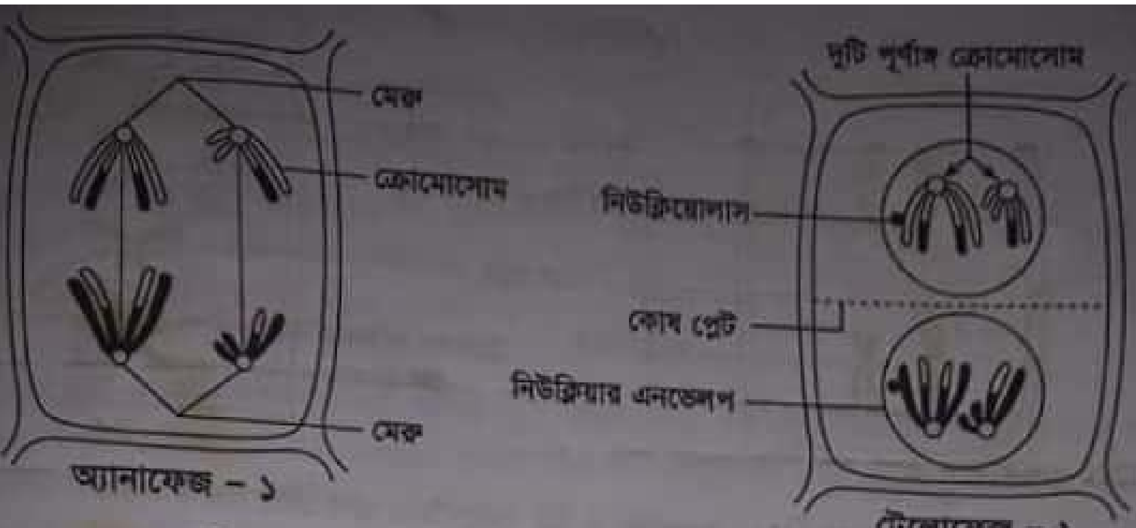

চিত্র ২.১০ : মায়োসিস-এর অ্যানাফেজ-১ এবং টেলোফেজ-১ পর্যায়।

উভয় মেরুতে প্রতিটি বাইভেলেন্টের একটি অবিভক্ত পূর্ণাঙ্গ ক্রোমোসোম পৌঁছে বলে প্রতি মেরুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতি মেরুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা দাঁড়ায় $2n$ এর পরিবর্তে n।

(৪) টেলোফেজ-১ (Telophase-1) : টেলোফেজ-১ হলো মায়োসিস-১ এর শেষ পর্যায়। এ পর্যায়ে মেরুতে অবস্থিত n সংখ্যক ক্রোমোসোমের চারদিকে আবার নিউক্লিয়ার এনভেলপ এবং অভ্যন্তরে নিউক্লিয়োলাসের আবির্ভাব ঘটে। নিউক্লিয়াসে জলযোজন ঘটে, ফলে ক্রোমোসোমগুলো ক্রমান্বয়ে সরু হতে থাকে। কাজেই রঞ্জন ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। প্রজাতির বিভিন্নতা অনুসারে টেলোফেজ-১ পর্যায়ে সাইটোকাইনেসিস ঘটতে পারে অর্থাৎ কোষের বিষুবীয় অঞ্চলে কোষপ্লেট সৃষ্টির মাধ্যমে কোষস্থ সাইটোপ্লাজম সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হতে পারে। অথবা, কোষপ্লেট সৃষ্টি না হয়েই মায়োসিস-২ এর প্রোফেজ পর্যায় শুরু হয়ে যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, মায়োসিসের টেলোফেজ-১ শেষে যে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তার প্রতিটিতে n সংখ্যক ক্রোমোসোম ($2n$ সংখ্যক ক্রোমেসোমের পরিবর্তে) থাকে। অনেক প্রজাতিতে টেলোফেজ-১ ঘটে না।

ইন্টারকাইনেসিস (Interkinesis) বা সাইটোকাইনেসিস-১

মায়োসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভক্তির অন্তর্বর্তীকালীন বা মধ্যবর্তী সময়কে ইন্টারকাইনেসিস বলে। এ সময়ে প্রয়োজনীয় RNA, প্রোটিন ইত্যাদি সংশ্লেষিত হয়। DNA-র প্রতিরূপ বা অনুলিপন ঘটে না।

(খ) মায়োসিস-২ (Meiosis-2) বা দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজন

মায়োসিস-২ এর প্রধান তাৎপর্য হলো দুটি কোষ হতে চারটি কোষের উৎপত্তি। এটি মূলত মাইটোসিস বিভাজন। মাইটোসিসের সময় DNA অণুর যে প্রতিরূপ সৃষ্টি হয় তা এখানে প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রক্রিয়াটি প্রোফেজ-১ ধাপের আগেই সম্পন্ন হয়ে যায়। মায়োসিস-২-কে প্রোফেজ-২, মেটাফেজ-২, অ্যানাফেজ-২ এবং টেলোফেজ-২ এ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

(১) প্রোফেজ-২ (Prophase-2) : জলবিয়োজনের ফলে ক্রোমোসোমগুলো পুনরায় সংকুচিত হয়। ফলে খাটো ও মোটা হয়, রঞ্জক ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম হতেই ক্রোমোসোমগুলোকে ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায়। এ পর্যায়ের শেষ দিকে নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর বিলুপ্তি ঘটে বা অদৃশ্য হয়ে যায়।

(২) মেটাফেজ-২ (Metaphase-2) : এ পর্যায়ে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে এবং ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে যুক্ত হয়। ক্রোমোসোমগুলো আরও খাটো ও মোটা হয়। শেষ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে বিভক্ত হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

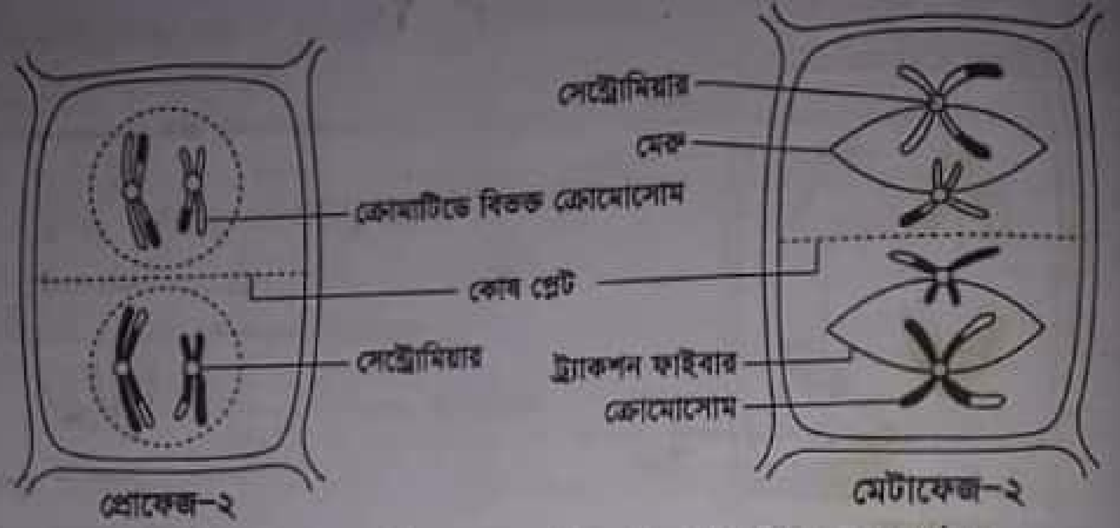

চিত্র ২.১১ : মায়োসিস-২ এর প্রোফেজ-২ এবং মেটাফেজ-২ পর্যায়।

(৩) অ্যানাফেজ-২ (Anaphase-2) : সেন্ট্রোমিয়ারের পূর্ণ বিভক্তির ফলে প্রতি ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিড পৃথক হয়ে যায় এবং ট্র্যাকশন ফাইবারের সংকোচন ও কাণ্ডদেহের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রোমাটিডগুলো ধীরে বিপরীত মেরুতে পৌঁছায়। মেরুমুখী চলনকালে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমাটিডগুলোকে V, L, J আকৃতির দেখায়।

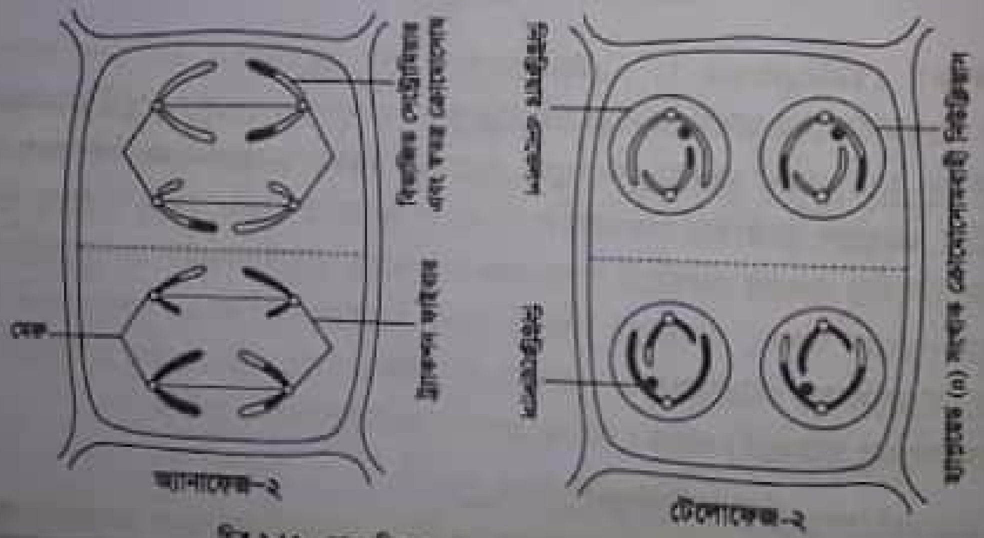

চিত্র ২.১২ : মায়োসিস-২ এর অ্যানাফেজ-২ এবং টেলোফেজ-২ পর্যায়।

(৪) টেলোফেজ-২ (Telophase-2) : টেলোফেজ-২ হলো মায়োসিস-২ প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়। মেরুতে ক্রো তথা ক্রোমোসোমগুলো স্থির হয় এবং এদের চারদিকে নিউক্লিয়ার এনভেলপের আবির্ভাব ঘটে এবং স্যাট ক্রোমো নিউক্লিয়োলাস সৃষ্টি হয়; ফলে দুটি পৃথক নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়াসে জলযোজন ঘটে, ক্রোমোসোম সম্প্রসারিত ও সরু হয় এবং রঞ্জক ধারণ ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে, ফলে আর দেখা যায় না।

সাইটোকাইনেসিস-২ : দুটি নিউক্লিয়াসের মাঝখানে কোষঝিল্লি এবং উদ্ভিদ কোষে কোষঝিল্লি ছাড়াও কোষ গঠন হয় এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস তার চারপাশে সাইটোপ্লাজম, কোষঝি কোষপ্রাচীর সহযোগে একটি স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়। মায়োসিসের মাধ্যমে বিভাজন শেষে একটি মাতৃকোষ হতে কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রতি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়। সৃষ্ট চারটি সমগুণ সম্পন্ন হয় না।

মায়োসিসের গুরুত্ব (বা তাৎপর্য বা প্রয়োজনীয়তা)

জীবজগতে মায়োসিসের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, অধিকাংশে জীবের যৌন জনন প্রক্রিয়া এ পদ্ধতি অনুসরণ এর ফলে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন জীব জন্মলাভ করে। তবে নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের হয়। মায়োসিসের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো।

Scanned by CamScanner

১। জননকোষ সৃষ্টি : মায়োসিসের ফলে জননকোষ (গ্যামিট) উৎপন্ন হয়, তাই যৌন জননক্ষম জীবে মায়োসিস না ঘটলে বংশবৃদ্ধি অসম্ভব।

২। ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব রাখা : প্রজাতিতে বংশানুক্রমে ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব (constant) রাখা কেবলমাত্র এ প্রক্রিয়ার জন্য সম্ভব হচ্ছে। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে জাইগোটে এবং ডিপ্লয়েড উদ্ভিদে জনন মাতৃকোষে মায়োসিস না ঘটলে পিতা-মাতা হতে সন্তান-সন্ততিতে ক্রমাগতভাবে পুরুষানুক্রমে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ, চারগুণ, আটগুণ, ষোলগুণ এভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জীবজগতে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতো এবং পরিণামে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যেতো।

৩। প্রজাতির স্বকীয়তা ঠিক রাখা : ক্রোমোসোম সংখ্যা সঠিক রাখার মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয়তা রক্ষিত হচ্ছে।

৪। বৈচিত্র্যের সৃষ্টি : যৌন প্রজননসম্পন্ন কোনো দুটি জীবই হুবহু এক রকম হয় না। পৃথিবীর প্রায় সাত'শ কোটি মানুষ একই প্রজাতিভুক্ত হয়েও একজন অন্যজন থেকে ভিন্নতর। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় গ্যামিটে ক্রোমোসোমের স্বাধীন বিন্যাস এবং ক্রসিং ওভারের ফলে পৃথিবীতে এ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৫। অভিব্যক্তি : মায়োসিস আনে বৈচিত্র্য, আর বৈচিত্র্য আনে অভিব্যক্তির ধারা ও প্রবাহ।

৬। গ্যামিট সৃষ্টি ও বংশবৃদ্ধি : ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় গ্যামিট। আর গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমেই যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি ঘটে।

৭। জনুক্রম : যে সকল জীবের জীবনচক্রে জনুক্রম আছে সেখানে মায়োসিস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

৮। মেন্ডেলের সূত্র : মেন্ডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা দেয়া মায়োসিস ছাড়া সম্ভব নয়।

ক্রসিং ওভার (Crossing over)

মায়োসিস-১ এর প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড-এর মধ্যে অংশের বিনিময় হওয়াকে ক্রসিং ওভার বলে। ক্রসিং ওভারের ফলে ক্রোমোসোমের জিনসমূহের মূল বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং লিঙ্কড জিনসমূহের মধ্যে নতুন সমন্বয় (combination) তৈরি হয়। থমাস হান্ট মর্গান (Thomas Hunt Morgan, 1866-1945) ১৯০৯ সালে ভূট্টা উদ্ভিদে প্রথম ক্রসিং ওভার সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

ক্রসিং ওভারের কৌশল

(i) প্রথমে দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড একই স্থান বরাবর ভেঙে যায়।

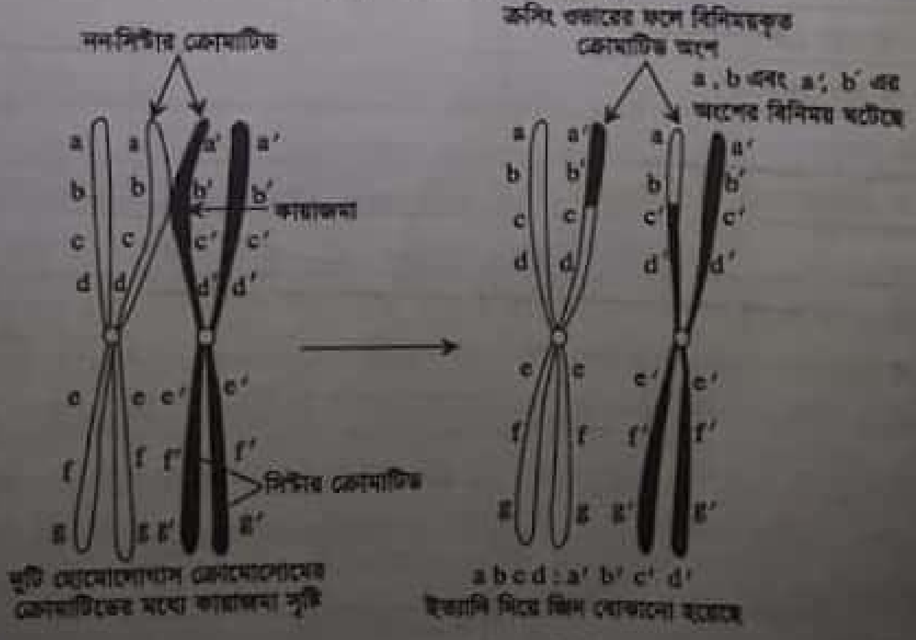

চিত্র ২.১৩ : এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার।

Scanned by CamScanner

বিশেষ বক্তব্য : বালিতে একটি পেঁয়াজ স্থাপন করে ২/১ দিন পানি দিলে মূল গজাবে। একটি ওয়াচ গ্লাসে কিছু অ্যাসিটোকারমাইন রং এবং ১-২ ড্রপ নর্মাল HCl যোগ করে তাতে পেঁয়াজ মূল রেখে কয়েকবার তাপ দিলে মূলের অগ্রভাগ কাল এবং নরম হবে। পরে কাল ও নরম অগ্রভাগ স্লাইডে নিয়ে কাভার স্লিপ উপরে দিয়ে আস্তে চাপ দিলে মূলের অগ্রভাগের কোষগুলো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হবে এবং কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায় দেখা যাবে। পেঁয়াজ মূলে ১৬টি ক্রোমোসোম থাকে। পাশের চিত্রে পেঁয়াজ মূলের মাইটোসিস বিভাজনের কয়েকটি পর্যায় দেখানো হলো। (উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা. বি. এর সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স ল্যাবে (১৯৬৯) এ কাজটি করা হয়।)

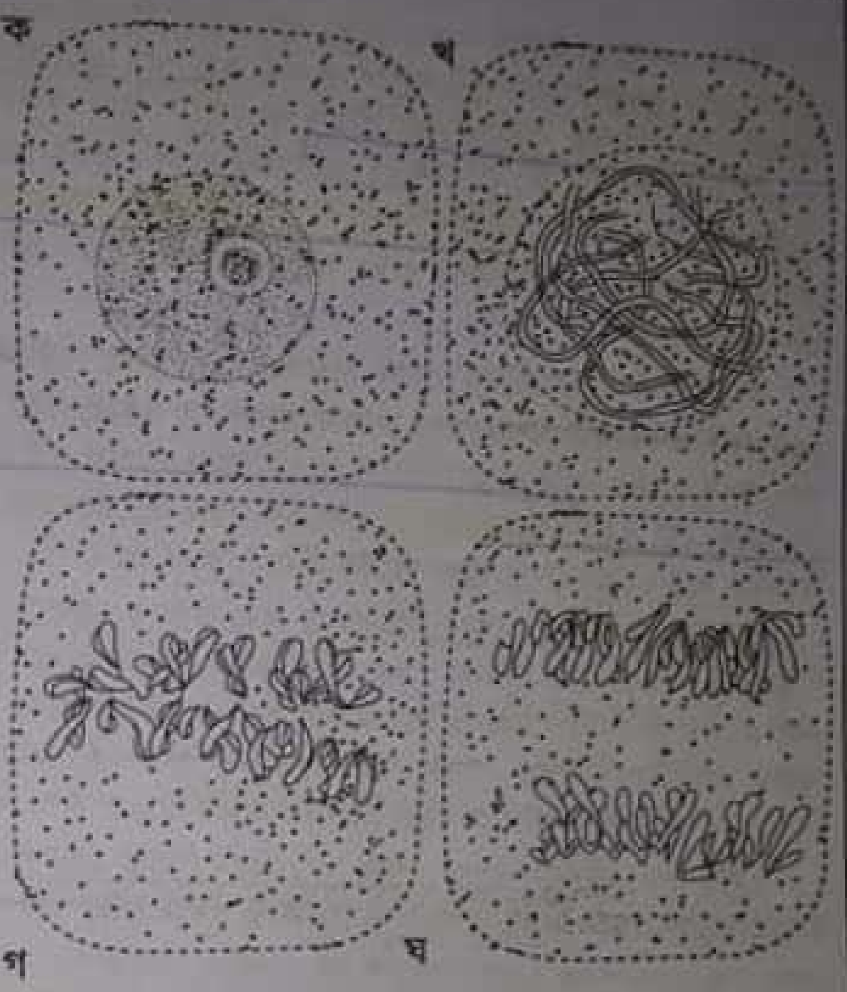

চিত্র ২.১৪ : পেঁয়াজ মূলের মাইটোসিস-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক) ইন্টারফেজ, (খ) প্রোফেজ, (গ) মেটাফেজ, (ঘ) অ্যানাফেজ পর্যায়গুলো স্লাইড দেখে হাতে আঁকা।

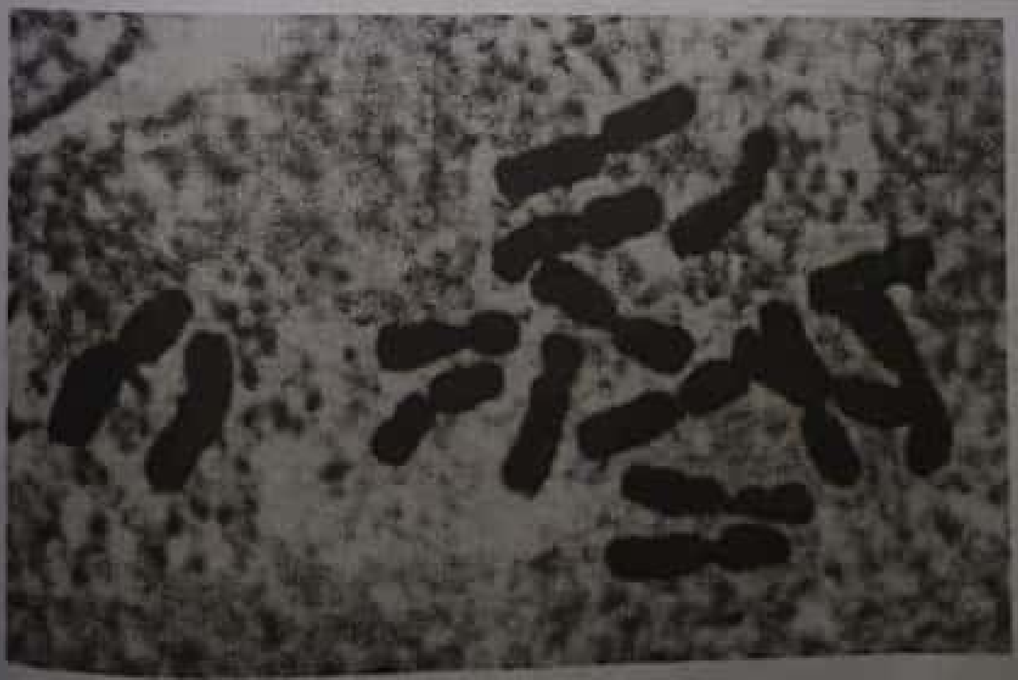

শিক্ষার্থীগণ ১৬টি ক্রোমোসোম গোনে দেখবে। শিক্ষকের সহায়তায় সেন্ট্রোমিয়ার অনুযায়ী ১৬টি ক্রোমোসোমের আকৃতি আঁকতে পারবে।

চিত্র ২.১৫ : পেঁয়াজ মূলের মাইটোসিস-এর মেটাফেজ পর্যায়ের মাইক্রো ফটোগ্রাফ। সাইটোলজি ল্যাব ; ঢা. বি. (২০১৩)

সার-সংক্ষেপ

ক্রসিং ওভার : ক্রসিং ওভার হলো দুটি ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময়। প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে প্রতি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে দুটি অংশে বিভক্ত হয়, এর প্রতিটিকে বলা হয় ক্রোমাটিড। একই ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডকে বলা হয় সিস্টার ক্রোমাটিড। প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে একজোড়া ক্রোমোসোম এক সাথে থাকে, তাই এক জোড়া ক্রোমোসোমে ৪টি (দুই জোড়া) ক্রোমাটিড থাকে। একই জোড়ার দু'টি ভিন্ন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে বলা হয় নন-সিস্টার ক্রোমাটিড। ক্রসিং ওভার হয় দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে। ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে দুটি ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে। ক্রসিং ওভারের ফলেই মাতা-পিতার মিশ্র বৈশিষ্ট্য সন্তানে প্রকাশ পায়।

সিন্যাপসিস : মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ পর্যায়ের জাইগোটিন উপ-পর্যায়ে দুটি করে ক্রোমোসোম (এদেরকে বলা হয় হোমোলোগাস ক্রোমোসোম; এর একটি মাতা হতে আগত এবং অপরটি পিতা হতে আগত) জোড় করে অবস্থান নেয়। দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মাঝে একূপ জোড় হওয়াকে বলা হয় সিন্যাপসিস। হোমোলোগাস জোড়াকে বলা হয় বাইভেলেন্ট। সিন্যাপসিস ঘটাই মায়োসিসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এখান থেকেই হ্রাসমূলক বিভাজন তথা ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হওয়ার সূচনা হয়।

সাইটোকাইনেসিস : কোষ বিভাজনের মুখ্য উদ্দেশ্য কোষকে বিভক্তকরণ ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। কিন্তু নিউক্লিয়াসের বিভাজনই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কোষের বড় অংশই সাইটোপ্লাজম, কাজেই কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ে কোষের সাইটোপ্লাজমও বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি কোষের সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে অবস্থান করাই সাইটোকাইনেসিস অথবা সাইটোপ্লাজমের বিভক্তিই সাইটোকাইনেসিস। সাইটোপ্লাজম ভাগ না হলে কেবল নিউক্লিয়াসের বিভক্তির মাধ্যমে কোষ বিভাজন সমাপ্ত হবে না এবং ফলপ্রসূ হবে না।

কোষ চক্র : বিভাজনযোগ্য কোষ সব সময়ই বিভক্ত হতে থাকে। এই বিভক্তির কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায় চক্রাকারে চলতে থাকে। কোষ বিভক্ত হওয়ার আগে একটু বিশ্রাম নেয়, তারপর কোষস্থ DNA অনুলিপন হয়, এরপর আবার বিশ্রাম নেয় এবং শেষ পর্যন্ত কোষ বিভাজন হয়। বিশ্রাম, অনুলিপন, আবার বিশ্রাম—এই কাজগুলো চক্রাকারে চলতে থাকে। বিভাজন ছাড়া বাকি তিনটিকে বলা হয় প্রস্তুতি পর্যায়। কোষ বিভাজন পর্যায় এবং বিভাজনের প্রস্তুতি পর্যায় পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে চলতে থাকে এবং এ চক্রকেই বলা হয় কোষ চক্র।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) :

১। কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করে ?

(ক) প্রোফেজ, (খ) মেটাফেজ, (গ) টেলোফেজ, (ঘ) অ্যানাফেজ

২। মাইটোসিস অ্যানাফেজ-এর বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) অপত্য ক্রোমোসোম সৃষ্টি।

(ii) অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুমুখী চলতে শুরু করা।

(iii) নিউক্লিয়োলাস ও নিউক্লিয়ার এনভেলপ উপস্থিত।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

উন্নতজাতের ফসলি উদ্ভিদ 'হরি' উৎপাদনে কোষ বিভাজনের ভূমিকা রয়েছে।

৩। উদ্দীপকের উদ্ভিদটি উৎপাদনে কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ের ভূমিকা রয়েছে ?

(ক) লেপ্টোটিন (খ) জাইগোটিন (গ) ডিপ্লোটিন (ঘ) প্যাকাইটিন

Scanned by CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

কোষ রসায়ন

CELL CHEMISTRY

প্রধান শব্দসমূহ: কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, সুক্রোজ, এনজাইম।

প্রতিটি জীবদেহ কতগুলো রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। এসব রাসায়নিক উপাদানগুলো কোষনির্ভর। কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে তোমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. জীবের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।
৩. জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. উৎসেচক এর ক্রিয়ার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. উৎসেচক এর শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে।
৬. বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচকের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান (Biochemicals in Cell)

কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। কোষে জীবন ধারণের সব উপাদান তৈরি হয় এবং বিরাজ করে। উদ্ভিদদেহও বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভিদের জীবন গঠন ও জীবন ধারণের জন্যে বহু রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এদের অনেকগুলোই দেহের অভ্যন্তরে তথা কোষাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে **জৈব রসায়ন** (Biochemistry) বলা হয়। সজীব উদ্ভিদদেহ বিশ্লেষণ করলে প্রধান যে উপাদান পাওয়া যায় তা হলো পানি। দেহের প্রায় শতকরা ৬০-৯০ অংশ হলো পানি। বাকি যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে **কঠিন বস্তু** (solid matters) বলে। ১৭টি মৌলিক পদার্থ, যেমন- C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Na, Cl, Mn, B, S, Mo, Cu ও Zn মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান। জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, অন্যান্য জৈব অ্যাসিড, বিভিন্ন এনজাইম ইত্যাদি প্রধান। অজৈব পদার্থের মধ্যে পানি অন্যতম। সাধারণত দুগ্ধজাত খাদ্য, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, শস্যদানা, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে অজৈব লবণ বা খনিজ লবণ বিদ্যমান থাকে। নিচে কয়েকটি জৈব পদার্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো। জীবদেহের প্রধান জৈব পদার্থ হলো কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড।

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) বা শর্করা

জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান ও সঞ্চয়ী উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। আমাদের খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদানও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট কী? সাধারণভাবে, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে; যেখানে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ১:২:১ যেমন- গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$)। তবে অনেক যৌগ আছে যেখানে এমন অনুপাত না থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট; যেমন- সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$)। আবার এমন অনুপাত থাকলেও সেটা কার্বোহাইড্রেট নয়; যেমন- ফরম্যালডিহাইড (HCHO), অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) ইত্যাদি (কারণ এখানে অনুপাত ঠিক নেই)। আধুনিক ধারণা অনুসারে নাইট্রোজেন বা সালফার সমৃদ্ধ সামান্য কিছু যৌগকেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বোহাইড্রেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই বর্তমান ধারণা অনুযায়ী, **যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে।**

...হাইড্রেটস অব কার্বন' থেকে কার্বোহাইড্রেট নামকরণ হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় 'কার্বনের জলযোজন' অর্থাৎ এক অণু ... সাথে এক অণু কার্বন (CH_2O) এই অনুপাতে গঠিত বিভিন্ন প্রকার যৌগ (Diverse compounds based on the ...al formula CH_2O are carbohydrates)। এই সাধারণ ফর্মুলাটি কেবলমাত্র মনোস্যাকারাইডস- এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ... গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি)। একাধিক মনোস্যাকারাইড সহযোগে যে সব কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয় ঐ সব ক্ষেত্রে ... সাধারণ ফর্মুলা প্রযোজ্য নয়। যখন এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে একত্র হয়ে ... অণু সুকরোজ গঠন করে তখন এই সাধারণ ফর্মুলা কার্যকরী হয় না, কারণ বন্ধনী সৃষ্টিকালে এক অণু পানি (H_2O) ... হয়ে যায়, তাই সুকরোজ-এর ফর্মুলা দাঁড়ায় $C_{12}H_{22}O_{11}$। অধিকাংশে উদ্ভিদদেহে শুকনো ওজনের ৫০-৮০ ভাগ ...হাইড্রেট থাকে। সারা বিশ্বে সকল জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যা জীবদেহে গাঠনিক ...ন ও সঞ্চয়ী উপাদান হিসেবে থাকে।

শর্করার (কার্বোহাইড্রেট) বৈশিষ্ট্য

১। এটি দানাদার (চিনি), তন্তুময় (সেলুলোজ) ও পাউডার জাতীয় পদার্থ।
২। এরা স্বাদে মিষ্টি (সুক্রোজ) বা স্বাদহীন (সেলুলোজ)।
৩। তাপ প্রয়োগে অঙ্গারে পরিণত হয়।
৪। পানিতে অধিকাংশই দ্রবণীয় (সরল ও অলিগো কার্বোহাইড্রেট)
৫। এসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে।
৬। এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ : নিচে কার্বোহাইড্রেট-এর কাজ উল্লেখ করা হলো।

১। জীব দেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে এবং জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।
২। উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩। উদ্ভিদদেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাঠামো (carbon skeleton) প্রদান করে।
৪। প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫। উদ্ভিদ দেহে সঞ্চয়ী পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে।
৬। ক্যালভিন চক্র, ক্রেবস্ চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে কার্বোহাইড্রেট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
৭। বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইমের গাঠনিক অংশ হিসেবে থাকে। যেমন-ATP, NADP, FAD ইত্যাদি।
৮। ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকে সাহায্য করে।
৯। নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ হলো পেন্টোজ জাতীয় শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)

কার্বোহাইড্রেট-এর শ্রেণিবিভাগ

(ক) স্বাদের ওপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেট দু' প্রকার, যথা- (১) শ্যুগার : এরা স্বাদে মিষ্টি, দানাদার এবং পানিতে ...য়, যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুকরোজ ইত্যাদি; (২) নন-শ্যুগার : এরা স্বাদে মিষ্ট নয়, অদানাদার এবং পানিতে ...ণীয়, যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

(খ) রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো- ১। ...স্যাকারাইড (Monosaccharides); ২। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharides); ৩। অলিগোস্যাকারাইড (...saccharides) এবং ৪। পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)। নিম্নে রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেটের ...রূপ বর্ণনা করা হলো।

১। মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides) : গ্রিক *mono* = এক, saccharin = sugar বা চিনি। যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলো মনোস্যাকারাইড। মনোস্যাকারাইড অন্যান্য জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক ইউনিট (building unit) হিসেবে কাজ করে। এর সাধারণ সংকেত হচ্ছে $C_nH_{2n}O_n$। মনোস্যাকারাইডসমূহে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (–CO–) এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে। মনোস্যাকারাইডে কার্বনের সংখ্যা ৩-১০। কার্বনের সংখ্যা অনুযায়ী মনোস্যাকারাইডকে তিন কার্বনবিশিষ্ট ট্রায়োজ (triose), চার কার্বনবিশিষ্ট টেট্রোজ (tetrose), পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ (pentose), ছয় কার্বনবিশিষ্ট হেক্সোজ (hexose), সাত কার্বনবিশিষ্ট হেপ্টোজ (Heptose) ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। জীবদেহের অধিকাংশ মনোস্যাকারাইড অপ্টিক্যাল আইসোমারের D সিরিজভুক্ত।

মনোস্যাকারাইডগুলোতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (>C=O) মুক্তভাবে থাকায় এরা বিজারক (reducing) পদার্থ হিসেবে কাজ করে। কাজেই –CHO বা, >C=O গ্রুপ যুক্ত কার্বোহাইড্রেটকে রিডিউসিং শ্যুগার (reducing sugar) বলা হয়। বেনেডিক্ট দ্রবণের $Cu(OH)_2$ (কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড) উক্ত শ্যুগারের –CHO বা, C = O গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্রাস অক্সাইড-এ (Cu_2O) পরিণত হয়, যা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়। রিডিউসিং শ্যুগার পরীক্ষা করতে তাই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মনোস্যাকারাইডসমূহ সাধারণত মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট।

(i) ট্রায়োজ (triose, $C_3H_6O_3$) : তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় ট্রায়োজ। গ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন হলো দুটি সরল ট্রায়োজ। এরা দ্রবণীয় মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদে এরা ফসফেট এস্টার হিসেবে কাজ করে। গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড-এর ১নং কার্বনে একটি কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে অ্যালডিহাইড গ্রুপ নির্দেশ করে এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোনের ২নং কার্বনে কার্বনাইল অক্সিজেন যুক্ত হয়ে একে কিটোন গ্রুপ নির্দেশ করে। কাজেই গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড হলো একটি অ্যালডোজ (aldose) এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন হলো একটি কিটোজ (ketose)।

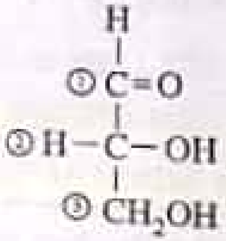

গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড
(অ্যালডোজ)

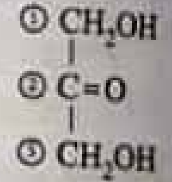

ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন
(কিটোজ)

অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপকে বলা হয় রিডিউসিং গ্রুপ (reducing group) কারণ এরা সহজেই কতিপয় যৌগের সাথে জারিত (oxidation) হয়ে যায় এবং ঐ যৌগ বিজারিত (reduction) হয়। তাই অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপযুক্ত চিনিকে বলা হয় রিডিউসিং শ্যুগার (reducing sugar) বা বিজারক শর্করা।

(ii) টেট্রোজ (tetrose, $C_4H_8O_4$) : চার কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় টেট্রোজ। ইরিথ্রোজ (erythrose) হলো একটি টেট্রোজ। উদ্ভিদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ইরিথ্রোজ-4 ফসফেট হিসেবে বিরাজ করে। ক্যালভিন চক্রে এর ভূমিকা আছে।

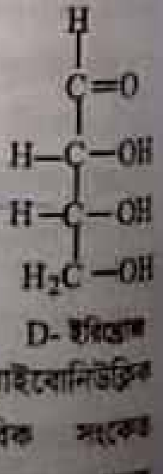

D- ইরিথ্রোজ

(iii) পেন্টোজ (pentose, $C_5H_{10}O_5$) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় পেন্টোজ। জাইলোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ, রাইবুলোজ ইত্যাদি হলো পেন্টোজ শ্যুগার-এর উদাহরণ।

■ **রাইবোজ (ribose) :** এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শ্যুগার। ১৮৯১ সালে Emil Fisher এটি আবিষ্কার করেন। এটি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের (RNA) একটি গঠন একক। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। এতে একটি (–CHO) গ্রুপ থাকায় একে অ্যালডোপেন্টোজ বলা হয়। রাইবোজ শর্করার গলনাঙ্ক ৯৫° সে.। গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড উৎপন্ন করে। RNA-তে কেবলমাত্র রাইবোজ শ্যুগারই নিউক্লিয়োটাইড বা নিউক্লিয়োসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এটি নির্দিষ্ট পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস এর

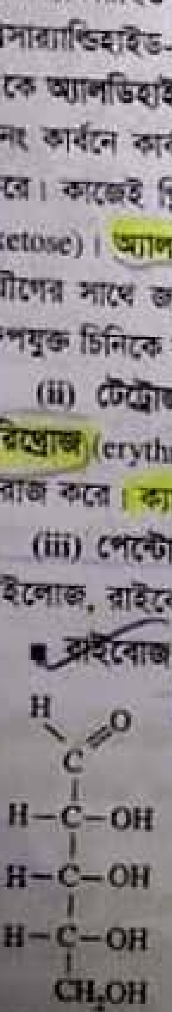

D-রাইবোজ (স্ট্রেইট শৃঙ্খলাকার)

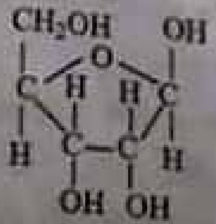

D-রাইবোজ (রিং শৃঙ্খলাকার)

...যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিয়োসাইড উৎপন্ন করে। নিউক্লিয়োসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে নিউক্লিয়োটাইডে পরিণত হয়। কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি প্রক্রিয়াতেও রাইবোজ ভূমিকা পালন করে। ATP, NAD+, NADP+, FAD, Co-A ইত্যাদি জৈব অণুর সাথেও রাইবোজ যুক্ত থাকে। রাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

• **ডিঅক্সিরাইবোজ (deoxyribose) :** ডিঅক্সিরাইবোজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পেন্টোজ শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$। এতে একটি অ্যালডিহাইড (–CHO) মূলক (বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) থাকায় একে ডিঅক্সি-অ্যালডোপেন্টোজও বলে। এটি রাইবোজ শ্যুগার-এর সাথে পার্থক্য শুধু এই যে, এর ২নং কার্বনে –OH গ্রুপের পরিবর্তে কেবল একটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু আছে। ডিঅক্সির অর্থ হলো অক্সিজেন ছাড়া (without oxygen) অর্থাৎ ২নং কার্বনে কোনো অক্সিজেন নেই। এর ১নং কার্বন অবস্থানে যে কোনো একটি পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস (A, T, G, C) যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিয়োসাইড সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৫নং কার্বন অবস্থানে অজৈব ফসফেট যুক্ত হলে একটি ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড সৃষ্টি হয়। DNA-নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিয়োটাইড গঠনের অংশ হিসেবে বিরাজ করে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। এই শ্যুগার ছাড়া DNA গঠন সম্ভব নয়। ডিঅক্সিরাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

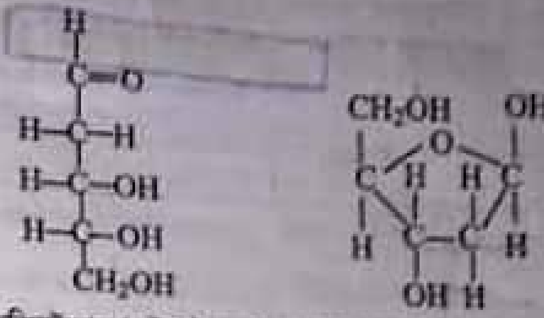

D-2, ডিঅক্সিরাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার) β-D-2, ডিঅক্সিরাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

পার্থক্যের বিষয়	রাইবোজ	ডিঅক্সিরাইবোজ
১. উপাদান	এটি হলো RNA এর অপরিহার্য উপাদান।	এটি হলো DNA এর অপরিহার্য উপাদান।
২. অ্যাসিড	গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল অ্যাসিড তৈরি করে।	গাঢ় HCl অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লেভুলিনিক অ্যাসিড তৈরি করে।
৩. অক্সিজেন পরমাণু	আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
৪. গ্রুপ	২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে।	২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে না।
৫. অংশগ্রহণ	নিউক্লিয়োটাইড ও শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।	ডিঅক্সিনিউক্লিয়োটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(iv) হেক্সোজ (hexose, $C_6H_{12}O_6$) : ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় হেক্সোজ। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো প্রধান প্রধান হেক্সোজ। এরা উদ্ভিদ কোষে মুক্ত অবস্থায় অথবা অন্য জটিল কার্বোহাইড্রেট-এর অংশ হিসেবে বিরাজ করে। সাধারণত গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজকে মুক্ত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

• **গ্লুকোজ (Glucose) :** গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ একটি উল্লেখযোগ্য মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদ কোষে দ্রবণীয় অবস্থায় একে পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) আছে। এটি একটি রিডিউসিং শ্যুগার।

বিভিন্ন প্রকার পাকা ফল ও মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ থাকে। পাকা আঙ্গুরে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ১২-৩০ ভাগ। একে অনেক সময় গ্রেইপ শ্যুগার (grape sugar) বা আঙ্গুরের শর্করা বলা হয়। উদ্ভিদে গ্লুকোজ কখনো সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে না। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।

উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালি : প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদ থেকে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয়। আবার গবেষণাগারে হাইড্রোলাইসিস করে সুকরোজ ও স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ প্রস্তুত করা যায়।

বৈশিষ্ট্য : গ্লুকোজ সাদা দানাদার পদার্থ। স্বাদে মিষ্টি এবং পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। এটি অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয়।

গ্লুকোজের ব্যবহার : রোগীর পথ্য হিসেবে গ্লুকোজ-এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত। বিভিন্ন ফল সংরক্ষণে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিসেবে ওষুধ শিল্পে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। ভিটামিন 'সি' তৈরি করার জন্য গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্লুকোজের রিং স্ট্রাকচার এবং α/β-D গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ১নং কার্বন এবং ৫নং কার্বন কাছাকাছি এলে (যে সাধারণত কাছাকাছি আসে) এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু তৈরি হয়। এর ফলে ১নং কার্বনে একটি -OH গ্রুপ হয়। নতুন সৃষ্ট এই -OH গ্রুপ ১নং কার্বনের α (আলফা) অথবা β (বিটা) অবস্থানে থাকতে পারে। -OH গ্রুপের α এবং β অবস্থানের কারণে গ্লুকোজের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে; যেমন- β-গ্লুকোজ গঠন করে সেলুলোজ, কিন্তু α-গ্লুকোজ গঠন করে স্টার্চ। সেলুলোজ কোষের গাঠনিক বস্তু এবং স্টার্চ কোষের সঞ্চয়ী খাদ্য।

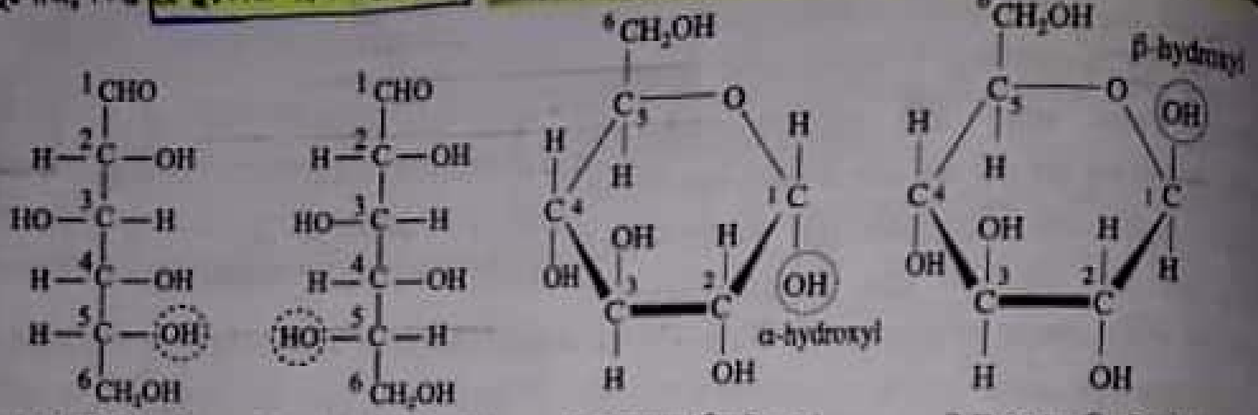

D-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L-গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) α-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার) β-D-গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার)

D এবং L গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (-OH) মূলক ডান দিকে থাকলে তাকে বলা হয় D-গ্লুকোজ। ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (-OH) মূলক বাম দিকে থাকলে তাকে বলা হয় L-গ্লুকোজ। D-গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত (dextrorotatory) হয় যাকে d বা '+' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। L-গ্লুকোজ বামাবর্ত (laevorotatory) হয় যাকে *l* বা '−' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। দক্ষিণাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক 'ডান'; বামাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক 'বাম'। গ্লুকোজের d বা *l* ফর্ম optical rotation ছাড়া অন্যান্য সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য একই প্রকার। উদ্ভিদে সব সময়ই D-গ্লুকোজ থাকে।

ফ্রুক্টোজ (Fructose) : গ্লুকোজের ন্যায় ফ্রুক্টোজও ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজের মতোই)। এটিও একটি রিডিউসিং সুগার। এর গঠনে রয়েছে একটি কিটো গ্রুপ (>C = O)। একে কিটোহেক্সোজও বলা হয়। অধিকাংশ পাকা মিষ্টি ফল ও মধুতে ফ্রুক্টোজ থাকে। তাই এর আরেক নাম ফলের চিনি বা ফ্রুট সুগার (fruit sugar)। গ্লুকোজ থেকে সহজেই ফ্রুক্টোজ তৈরি হয় আবার সুকরোজ হাইড্রোলাইসিস-এর ফলেও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। এটি সুকরোজ এর একটি গঠন উপাদান। গ্লুকোজের মতো ফ্রুক্টোজও D এবং L দু'প্রকার আছে। প্রথম ফ্রুট তথা ফল থেকে শনাক্ত করা হয়েছিল বলে নাম করা হয় ফ্রুক্টোজ। ফ্রুক্টোজ সমপরিমাণ গ্লুকোজের সাথে যুক্ত হয়ে চিনি গঠন করে। তাই একে বীট ও আখের কাণ্ড রসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

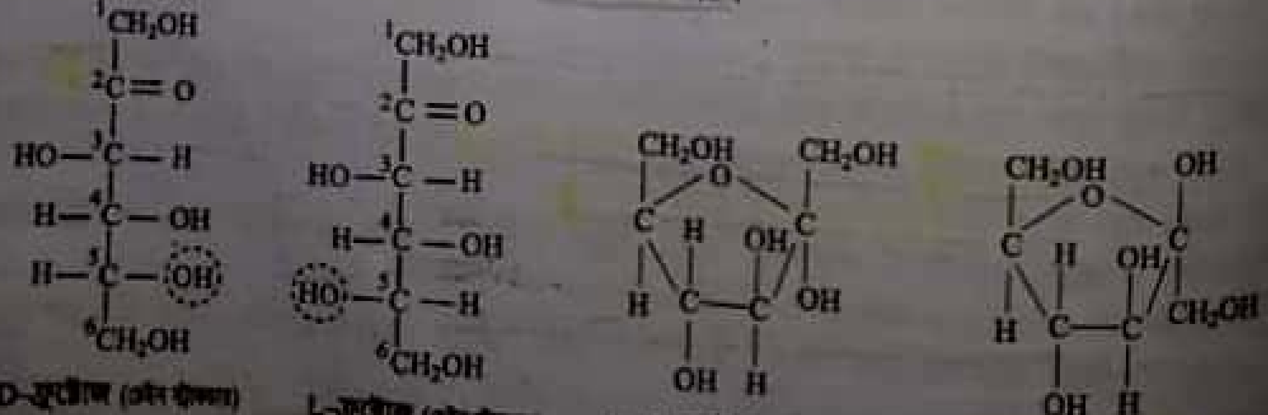
D-ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L-ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার) α-D-ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার) β-D-ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

বৈশিষ্ট্য : এটি একটি সাদা বর্ণের, দানাদার, স্ফটিকাকার ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ। পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। এটি অ্যালকোহলেও দ্রবণীয়। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই একে আইসোমার বলে।

ব্যবহার। কনফেকশনারিতে নানা ধরনের মিষ্টান্ন জাতীয় জিনিস প্রস্তুত করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ফ্রুক্টোজ তৈরি করে। সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।

গ্লুকোজ	ফ্রুক্টোজ
১। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (-CHO) আছে।	১। এটি একটি কিটোহেক্সোজ কারণ এতে কিটো গ্রুপ (>C = O) আছে।
২। একে গ্রেইপ শ্যুগার বা আঙুরের শর্করা বলা হয়।	২। একে ফ্রুট শ্যুগার বলা হয়।
৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	৩। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৪। শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।	৪। শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৫। এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	৫। এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।

- ম্যানোজ (Mannose) : ম্যানোজ একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোজ শ্যুগার।
- গ্যালাক্টোজ (Galactose) : গ্যালাক্টোজ আর একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটিও একটি অ্যালডোজ শ্যুগার।

গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ হলো গাঠনিক আইসোমার। এদের সবার গাঠনিক ফর্মুলা $C_6H_{12}O_6$ কিন্তু এদের রাসায়নিক বিন্যাস ভিন্ন।

আপেক্ষিক মিষ্টতা : সুকরোজ-১০০; গ্লুকোজ-৭৪; ফ্রুক্টোজ-১৭৩; মল্টোজ- ৩২; ল্যাক্টোজ- ১৬; স্যাকারিন- ৫০০; থাউমাটিন- ২০০০।

(v) হেপ্টোজ (heptose, $C_7H_{14}O_7$): সাত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় হেপ্টোজ। সেডোহেপ্টোলোজ হলো একটি হেপ্টোজ শ্যুগার।

২। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) : দুটি মনোস্যাকারাইড একত্রে যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। সুকরোজ, সেলোবায়োজ, ম্যালটোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি হলো উল্লেখযোগ্য ডাইস্যাকারাইড। ডাইস্যাকারাইডের সাধারণ সংকেত হলো $C_{12}H_{22}O_{11}$।

সুক্রোজ → গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ, ম্যালটোজ → গ্লুকোজ + গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ → গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

দুই অণু মনোস্যাকারাইডের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফলে দুটো -OH মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারিত হলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডাইস্যাকারাইড অণুতে উভয় মনোস্যাকারাইডের C-O-C নতুন বন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্ট বন্ধনকে (–O–) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী (Glycosidic bond) বলে।

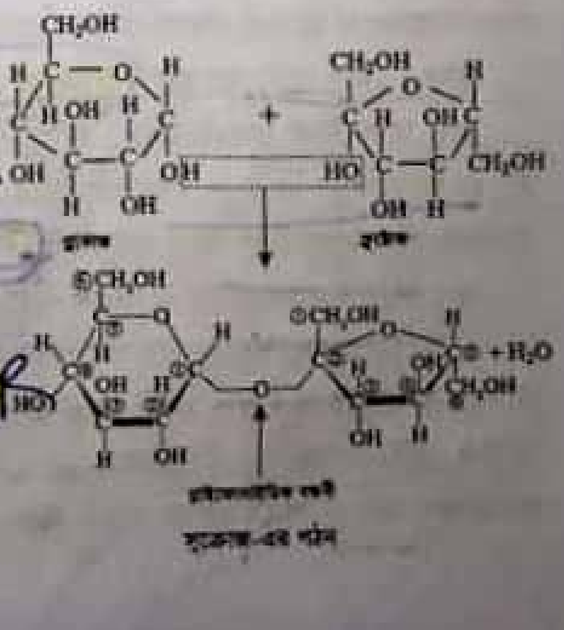

সুক্রোজ-এর গঠন

(i) সুক্রোজ (Sucrose) : উদ্ভিদের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো সুক্রোজ। এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু ফ্রুক্টোজ এক সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুকরোজ। এতে এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে যায়। চিনি হলো একটি সাধারণ সুকরোজ। ইক্ষু এবং বীট থেকে চিনি পাওয়া যায়। গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ উভয়ই রিডিউসিং শ্যুগার, কিন্তু সুক্রোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়। কারণ সুকরোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইডের মুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং এর বিজারণ ক্ষমতা লুপ্ত হয়। সেজন্য এটিকে বিজারণ ক্ষমতাহীন

চিনি বলে। সুকরোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইড তথা α-D-গ্লুকোজের ১নং কার্বনের –OH এবং β-D-ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের –OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়। ফলে কার্বন দুটির মধ্যে একটি গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) গঠিত হয়ে সুকরোজ সৃষ্টি হয়। সবুজ উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুকরোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। মধুর প্রধান কাঁচামাল হলো সুকরোজ। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

উৎপাদন প্রণালি : ইক্ষুর রসে প্রায় ১৫% সুকরোজ, কিছু পরিমাণ জৈব অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফসফেট জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সংগৃহীত রসকে পরিস্রুত করার পর তার সাথে কলিচুন মিশানো হয়। তার ফলে দ্রবণ থেকে অ্যাসিড প্রশমিত হয়, ফসফেট অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়। অতঃপর রসকে উত্তপ্ত করলে বেশির ভাগ ভেজাল ফেনা ও অধঃক্ষেপ আকারে আলাদা হয়ে যায়। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিষ্কার রসকে নিম্নচাপে ঘনীভূত করলে সুকরোজ এর স্ফটিক (চিনি) পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম : সুকরোজ সাদা দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত কঠিন পদার্থ। স্বাদে গ্লুকোজ থেকে দ্বিগুণ মিষ্টি, পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও ইথারে অদ্রবণীয়। এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সেলসিয়াস। লঘু অ্যাসিডে সুকরোজের জলীয় দ্রবণ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ অণু গঠন করে।

$$\underset{\text{সুক্রোজ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

কাজ : শ্বসনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। কোষের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার : বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহার হয়। কনফেকশনারিতে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে অক্সালিক অ্যাসিড প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ii) সেলোবায়োজ (Cellobiose) : দুই অণু β-D গ্লুকোজ β-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ তৈরি করে। কাজেই সেলোবায়োজ একটি ডাইস্যাকারাইড। সাধারণত সেলুলোজ বা লিগনিন-এর আংশিক ভাঙনের ফলে সেলোবায়োজ তৈরি হয়। দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ গঠিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সেলোবায়োজ একটি বিজারণক্ষম চিনি (রিডিউসিং শ্যুগার)। কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান সেলোবায়োজ। সেলুলোজকে আংশিকভাবে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক (ইউনিট) গঠিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম যৌগ হলো সেলোবায়োজ। ইমালসিন এনজাইম ও অ্যাসিডের প্রভাবে সেলোবায়োজ ভেঙে দুই অণু গ্লুকোজে পরিণত হয়। আবার ব্রোমিন পানি দিয়ে সেলোবায়োজকে জারিত করলে সেলোবায়োনিক অ্যাসিড তৈরি হয়।

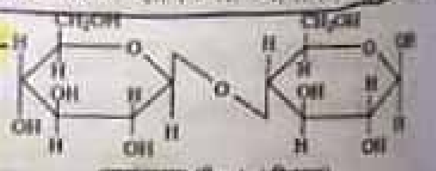

সেলোবায়োজ (β – 1, 4 লিংকেজ)

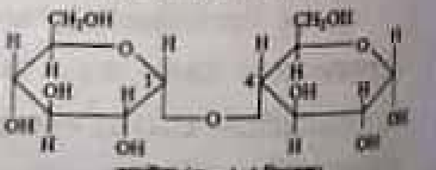

ম্যালটোজ (α – 1, 4 লিংকেজ)

কাজ : কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

(iii) ম্যালটোজ (Maltose) : ম্যালটোজ আর একটি ডাইস্যাকারাইড। দুই অণু α-D গ্লুকোজ α-1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু ম্যালটোজ গঠন করে। সাধারণত স্টার্চ-এর আংশিক ভাঙনের ফলে ম্যালটোজ তৈরি হয়। এটি আংশিক রিডিউসিং শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$।

৩। অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides) : যে সব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদেরকে অলিগোস্যাকারাইড বলে (গ্রিক *oligo* = few বা স্বল্প, saccharin = sugar বা চিনি)। সাধারণত ৩ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড এক একটি অলিগোস্যাকারাইড গঠন করে। একাধিক মনোস্যাকারাইড তাদের গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ (glycosidic linkage) দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সংযুক্তিকে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ বলে।

...স্যাকারাইডগুলোকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান মনোস্যাকারাইডের সংখ্যা দিয়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়; যেমন- তিনটি ...স্যাকারাইড থাকলে ট্রাইস্যাকারাইড বলে, চারটি থাকলে টেট্রাস্যাকারাইড বলে ইত্যাদি।

• ট্রাইস্যাকারাইড : যে সকল অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে তিন অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়। ...র্যাফিনোজ ($C_{18}H_{32}O_{16}$)। একে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ এবং এক ...গ্যালাক্টোজ।

$$\underset{\text{র্যাফিনোজ}}{C_{18}H_{32}O_{16}} + 2H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{গ্যালাক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

• টেট্রাস্যাকারাইড : যে সকল অলিগোস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চার অণু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়। ...স্টাকিওজ (এটি ১ অণু গ্লুকোজ, ১ অণু ফ্রুক্টোজ ও ২ অণু গ্যালাক্টোজ নিয়ে গঠিত)।

...পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides) : অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড একত্রে পলিমারযুক্ত (polymerised) হয়ে ...হয় পলিস্যাকারাইড (গ্রিক *Poly* = many)। অন্যভাবে বলা যায়, যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ...অনেকগুলো (দশের অধিক) মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। এরা উচ্চ আণবিক ওজন (molecular weight) বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ। পলিস্যাকারাইড সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয় এবং এরা মিষ্টি ...স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি হলো গুরুত্বপূর্ণ পলিস্যাকারাইড। সেলুলোজ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া ...স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে। প্রকৃতিতে কাজের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইড দু'প্রকার :

...গাঠনিক পলিস্যাকারাইড : এরা জীবদেহে কাঠামো নির্মাণ বা গঠনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন-সেলুলোজ, ...হেমিসেলুলোজ, পেকটিন প্রভৃতি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠন করে।

...সঞ্চয়ী পলিস্যাকারাইড : এরা জীবদেহে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে থাকে, যা পরে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যয় হয়ে ...যেমন-স্টার্চ, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি শ্বসন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

...নিচে কয়েকটি পরিচিত পলিস্যাকারাইড-এর বর্ণনা দেয়া হলো।

$$\underset{\text{স্টার্চ}}{(C_6H_{10}O_5)_n} + \underset{\text{পানি}}{H_2O} \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ (অনেক অণু)}}{C_6H_{12}O_6}$$

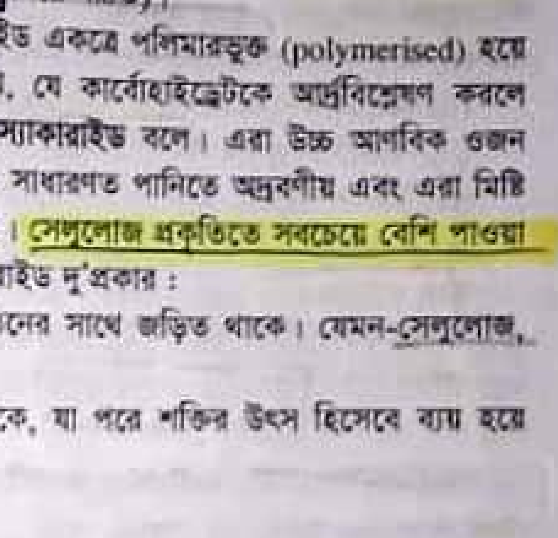

স্টার্চ-এর গঠন।

■ স্টার্চ (Starch) : অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপেকটিন নামক ...পলিস্যাকারাইডের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থই হলো স্টার্চ। উদ্ভিদে স্টার্চ ...(শ্বেতসার) সঞ্চিত পদার্থরূপে বিরাজ করে। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ...গ্লুকোজের অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে স্টার্চ-এ পরিণত হয়। স্টার্চ সাধারণত ঘনীভূত দানা হিসেবে (starch grain) উদ্ভিদ কোষে বিরাজ করে এবং এদের দানার আকার ও আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। বীজ, ফল, কন্দ (tuber) প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে। ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উৎস। সালোকসংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজই স্টার্চে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন স্টার্চের আকার-আকৃতিতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করে। স্টার্চ হাইড্রোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয়।

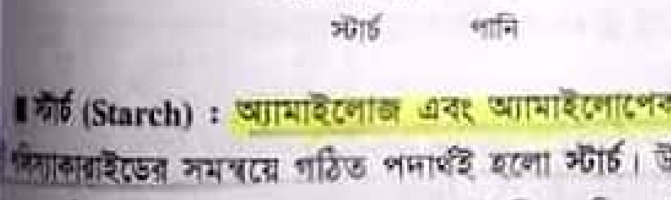

অ্যামাইলোজ-এর গঠন

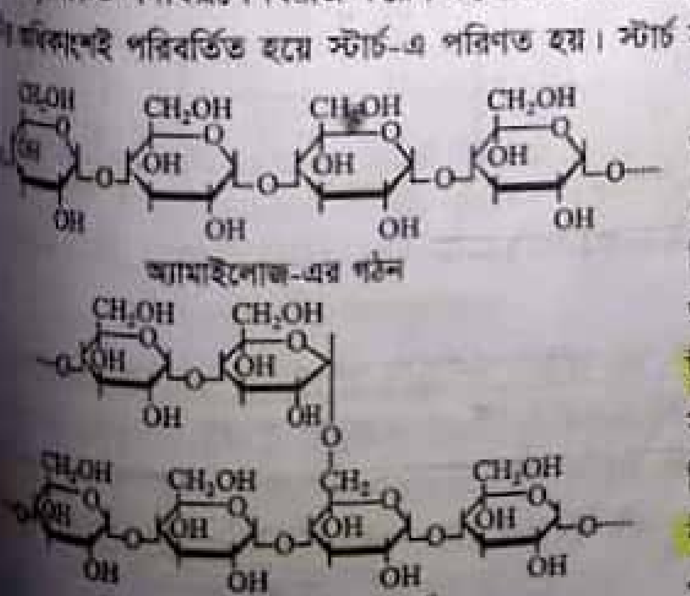

অ্যামাইলোপেকটিন-এর গঠন

অসংখ্য গ্লুকোজ অণু নিয়ে স্টার্চ গঠিত। অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অণুগুলো পরস্পর কার্বনের 1-4 স্থানে সংযুক্ত হ[য়ে] সাধারণত 200 থেকে 1000 গ্লুকোজ অণু নিয়ে একটি অ্যামাইলোজ তৈরি হয়। এর অণু-শৃঙ্খল অশা[খ]। অ্যামাইলোপেকটিন সাধারণত 2000 থেকে 2,00,000 গ্লুকোজ অণুবিশিষ্ট হয়। অ্যামাইলোপেকটিনের গ্লুকোজ অণুগু[লো] কার্বনের 1-4 বন্ধন ছাড়াও α-1-6 বন্ধনে যুক্ত থাকে। এর অণু-শৃঙ্খল শাখান্বিত। আলু, ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি স্টার্চে শতকরা ২২ ভাগ অ্যামাইলোজ এবং ৭৮ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন থাকে। অ্যামাইলোজ থাকায় স্টার্চের দ্রব[ণে] আয়োডিন যোগ করলে কালবর্ণ (কাল-নীল) ধারণ করে। কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়োডিন লা[ল] বা পার্পল রং প্রদান করে। স্টার্চের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$ স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের স্টা[র্চ] কণিকা গঠন করে থাকে। স্টার্চ আণুবীক্ষণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে। যেমন- গোল আলু[র] স্টার্চ কণিকা বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা ক্ষুদ্রতম।

স্টার্চের ধর্ম (Properties of starch)

(i) স্টার্চ গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন এবং সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ।

(ii) সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানি, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

(iii) আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে।

(iv) উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙে ডেক্সট্রিন ও ম্যালটোজ হয়ে গ্লুকোজ-এ পরিণত হতে পারে।

(v) ফেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

কাজ : উদ্ভিদদেহে স্টার্চ প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

পরীক্ষা : আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে। কারণ স্টার্চের অ্যামাইলোজ উপাদান আয়োডিন অণুকে আবদ্ধ করে জটিল যৌগ গঠন করে। ফলে আয়োডিন পরমাণুগুলোর ইলেকট্রন অরবিটালের পরিবর্তন ঘটে এবং সূর্যালোক শোষণ করে নীল বর্ণ সৃষ্টি করে।

আর্দ্রবিশ্লেষণ : লঘু অ্যাসিড ও এনজাইম দ্বারা স্টার্চকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, পরে ম্যালটোজ ও শেষে D-গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। যেমন- স্টার্চ $\xrightarrow{H_2O}$ ডেক্সট্রিন $\xrightarrow{H_2O}$ ম্যালটোজ $\xrightarrow{H_2O}$ D-গ্লুকোজ

স্টার্চের ব্যবহার (Uses of starch) : স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেমন–গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও চোলাই মদ তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।। স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীবদেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে থাকে। কাগজ ও আঠা প্রস্তুত করতেও স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।

■ **সেলুলোজ (Cellulose) :** সেলুলোজ উদ্ভিদের একটি প্রধান গাঠনিক পদার্থ। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। অসংখ্য ß-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর ß-1-4 কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ তৈরি করে। উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোনো কঙ্কাল নেই, সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ। তুলায় সেলুলোজের পরিমাণ ৯৪%, লিনেনে ৯০% এবং কাঠে ৬০%। তৃণলতায় ৩০-৪০%

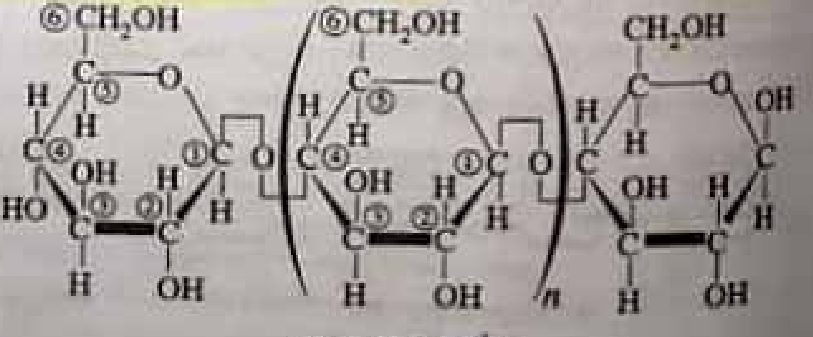

সেলুলোজ-এর গঠন।

আর জৈব বস্তু সমৃদ্ধ মাটিতে ৪০-৭০% থাকে। সেলুলোজ ঘন H_2SO_4 বা HCl বা NaOH দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়। মানুষের পরিপাক নালীর বিভিন্ন অংশে (মুখগহ্বর পাকস্থলী ও অন্ত্র) সেলুলেজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ পদার্থ হজম হয় না; তবে সেলুলোজ গরু-ছাগলে পুষ্টি হিসেবে কাজ করতে পারে। বস্ত্র ও আসবাবপত্র শিল্পের প্রধান উপাদান সেলুলোজ, আর তাই মানব সভ্যতায় এর দান অপরিসীম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিরাজ করে সেলুলোজ।

সেলুলোজের ধর্ম : সেলুলোজ স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা ও কঠিন জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। এটি পানিতে অদ্রবণীয়, অবিজারক পদার্থ, আণবিক ভর দুই লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ। এটি মিষ্টি বিবর্জিত এবং বিজারণ ক্ষমতাহীন। আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে কোনো রং দেয় না। এটি ফাইবার সদৃশ ও শক্ত।

সেলুলোজের কাজ : উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে এবং ভার বহন করে।

সেলুলোজের ব্যবহার : নিম্নে সেলুলোজের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(i) সেলুলোজ দিয়ে তন্তু তৈরি হয়, যা বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

(ii) এটি নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) এটি অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়। ফিল্টার পেপার, টিস্যু পেপার, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, প্যাকেজিং এর দ্রব্যসমূহ সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়।

(iv) নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে সেলুলোজ প্রধান উপাদান হিসেবে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।

(v) কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পৌষ্টিকনালীতে বসবাসকারী এক ধরনের পরজীবী সেলুলেজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্য করে।

(vi) থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে স্টেশনারি ফেজ হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়।

(vii) ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপাদিত সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(viii) গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পার্থক্যের বিষয়	স্টার্চ	সেলুলোজ
১। গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন	স্টার্চ অণুতে প্রায় 1,200 থেকে 6,000 গ্লুকোজ একক α-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	সেলুলোজে প্রায় 300 থেকে 3,000 গ্লুকোজ একক β-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
২। পলিমারের গঠন	স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	সেলুলোজ অণু অশাখান্বিত অর্থাৎ সরল শিকল পলিমার।
৩। সঞ্চিত খাদ্য	উদ্ভিদদেহে এটি সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।	উদ্ভিদদেহে এটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে থাকে।
৪। বর্ণ	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ প্রদান করে।	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো বর্ণ প্রদান করে না।
৫। হজম	এটি গরু-ছাগল ও মানুষ হজম করতে পারে।	এটি গরু-ছাগল হজম করতে পারলেও মানুষ তা পারে না।

■ **গ্লাইকোজেন (Glycogen) :** গ্লাইকোজেন হলো একটি পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড। এটি প্রাণিদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য উপাদান হলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ও কতিপয় ছত্রাকের (ঈস্ট) সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। গ্লাইকোজেনের মূল গাঠনিক একক হলো α-D-গ্লুকোজ। অ্যামাইলোপেকটিনের মতো এর অণু শৃঙ্খলও শাখান্বিত। α-1, 6 লিংকেজের মাধ্যমে শাখার সৃষ্টি হয়। প্রতি শাখায় সাধারণত ১০ থেকে ২০টি গ্লুকোজ অণু থাকে। হাইড্রোলাইসিস শেষে গ্লাইকোজেন হতে কেবল α-D-গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। প্রাণিদেহের যকৃত (লিভার) ও মাংসপেশিতে বেশি করে গ্লাইকোজেন জমা থাকে যা প্রয়োজনে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে কার্বন ও শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য গ্লাইকোজেনকে প্রাণিজ স্টার্চ বলে।

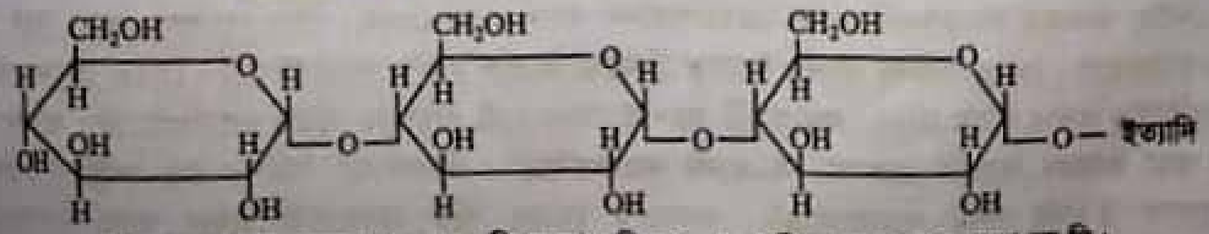

গ্লাইকোজেন অণুর একাংশ (α -1, 4 লিংকেজ)। চিত্রে α -1, 6 লিংকেজ শাখা দেখানো হয় নি।

গ্লাইকোজেনের ধর্ম (Properties of glycogen)

(i) গ্লাইকোজেন পানিতে আংশিক দ্রবণীয়। (ii) এটি সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। (iii) আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। (iv) ঠান্ডা পানিতে এটি কলয়েড সাসপেনশন তৈরি করে। (v) তাপ দিলে এর লাল বর্ণ চলে যায়। (vi) ঠান্ডা অবস্থায় কালো বর্ণ ফিরে আসে। আংশিক আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে ম্যালটোজ, আর পূর্ণ আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে αD-গ্লুকোজ অণু প্রদান করে। (vii) গ্লাইকোজেন গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ অণু সৃষ্টি করে।

গ্লাইকোজেনের ব্যবহার (Uses of glycogen)

(i) পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তি যোগায়। (ii) যকৃতে গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত করে। (iii) এরা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে।

কাজ : গ্লুকোজ, সুক্রোজ এবং স্টার্চ এর গঠন ও কাজ শিক্ষার্থীদের একেক দল এক একটি উপস্থাপন করবে।

(গ) বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে : বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার। যথা-

(i) রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা : যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে **রিডিউসিং শ্যুগার** বা **বিজারক শর্করা** বলে। যেমন-গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ প্রভৃতি। এরা বেনেডিকটস বিকারক এবং ফেহলিং বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে।

(ii) নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা : যেসব কার্বোহাইড্রেটে একটিও মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না তাদেরকে **নন-রিডিউসিং শ্যুগার** বা **অবিজারক শর্করা** বলে। যেমন-সুক্রোজ, ট্রেহালোজ প্রভৃতি। সুক্রোজ α–D গ্লুকোজের ১ নং কার্বনের OH এবং β–D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে একটি অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) তৈরি হয়। এর ফলে এদের মুক্ত –CHO বা C=O গ্রুপ থাকে না। এদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এরপর অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে।

□ **হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose) :** উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন পদার্থ ব্যতীত অন্যান্য পলিস্যাকারাইডকে হেমিসেলুলোজ বলে। যেমন- গ্লুকান, জাইলান ইত্যাদি।

□ **কাইটিন (Chitin) :** এটি নাইট্রোজেনবিশিষ্ট পলিস্যাকারাইড। এটি বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর এবং কাঁকড়া, লোবস্টার ইত্যাদির বহিঃকঙ্কালে কাইটিন থাকে।

কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স (Carbohydrate derivatives)

মূল গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন বা কোনো কার্যকর গ্রুপ (functional group) যুক্ত হয়ে কিছু নতুন ধরনের কার্বোহাইড্রেটের উদ্ভব হয়। এরা হলো কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ্স। ফ্রুক্টোজ এর OH গ্রুপের সাথে ফসফেট যুক্ত হয়ে ফ্রুক্টোজ ১, ৬-বিস ফসফেট (শ্যুগার ফসফেট) হয়ে থাকে (যা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে)। OH গ্রুপ অ্যামিনো ($-NH_2$) গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে **গ্লুকোসামিন** (Glucosamine), **গ্যালাক্টোসামিন** (Galactosamine) হয়ে থাকে। তরুণাস্থির প্রধান দ্রব্য গ্যালাক্টোসামিন। গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে তৈরি করে **কাইটিন** (Chitin) যা পতঙ্গ, কাঁকড়া, লোবস্টার এবং ছত্রাক কোষ প্রাচীরের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড। কাইটিন পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি।

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর ভূমিকা (Role of Carbohydrate)

যে কোনো জীবদেহ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান জৈবরাসায়নিক পদার্থ হলো DNA। কোষ বিভাজন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই এর নিয়ন্ত্রণে। DNA গঠনের একটি উপাদান ডিঅক্সিরাইবোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। DNA থেকে বার্তা নিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় RNA, এর একটি গঠন উপাদান হলো রাইবোজ নামক কার্বোহাইড্রেট। শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত গ্লুকোজ, যা একটি কার্বোহাইড্রেট। জীবদেহের গাঠনিক বস্তু কাইটিন, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি সবই কার্বোহাইড্রেট। আমাদের দেহের শক্তি প্রদানকারী প্রধান খাদ্য উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট। অর্থাৎ জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino Acids)

অ্যামিনো অ্যাসিড হলো প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী Emil Fischer ও Franz Hofmeister, 1902 খ্রিস্টাব্দে প্রোটিন অণুর গাঠনিক একক হিসেবে অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কার করেন। কোনো জৈব অ্যাসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়। প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) এবং একটি কার্বক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) থাকে। এতে অন্যান্য সক্রিয় কার্যকরী গ্রুপও থাকতে পারে। কাজেই অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকরী গ্রুপ কী কী তার উপর নির্ভর করে সেই অ্যাসিডের গুণাবলি। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। এর মধ্যে বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে।

প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন

অ্যামিনো অ্যাসিড এর কার্বক্সিল গ্রুপ এর নিকটবর্তী কার্বন-পরমাণুটিকে α-কার্বন বলা হয় এবং কার্বক্সিল গ্রুপটি α-কার্বনের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে α- অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়।

অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন :

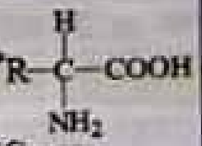

*R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন হয়

অ্যামিনো অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন : অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $R-CH.NH_2.COOH$। এখানে R হলো একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা কার্বনযুক্ত কোনো জৈব যৌগ। অ্যামিনো অ্যাসিডে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) এবং একটি পার্শ্বিক গ্রুপ (R) থাকে। তবে কোনো কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডে ২টি অ্যামিনো গ্রুপ কিংবা ২টি কার্বোক্সিল গ্রুপ একত্রে সাধারণ থাকতে পারে। প্রকৃতিতে বেশির ভাগ অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

R-গ্রুপ H হলে গ্লাইসিন

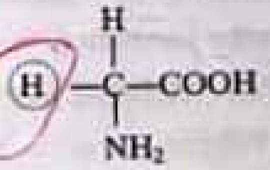

α-কার্বনে সংযুক্ত R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকম হয়, যেমন-

R-গ্রুপ CH_3 হলে অ্যালানিন

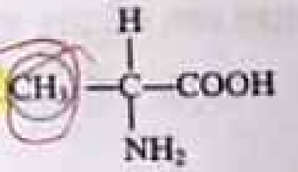

R-গ্রুপ CH_2OH হলে অ্যামিনো অ্যাসিড সিরিন।

R-গ্রুপ CH_2SH হলে অ্যামিনো অ্যাসিড সিস্টিন।

অ্যামিনো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য

১। মানবদেহে বিদ্যমান প্রায় সবগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডই α-অ্যামিনো অ্যাসিড।

২। এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

৩। এরা স্বাদহীন, মিষ্টি বা তিক্ত পদার্থ।

৪। এরা বর্ণহীন, স্ফটিকাকার পদার্থ।

৫। মৃদু অ্যাসিড বা ক্ষারে অ্যামিনো অ্যাসিড লবণ সৃষ্টি করে।

৬। এরা উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট।

৭। বিশুদ্ধ প্রোটিনকে কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা এনজাইম-এর সাহায্যে সম্পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস করলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

৮। এক বা একাধিক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে।

৯। অ্যাসিড ও ক্ষারবিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের মূলককে জুইটার আয়ন (Zuitter Ions; Zuitter = hybrid) বলে।

অ্যামিনো অ্যাসিডের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ মিলে সর্বমোট ২৮টির মতো অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। এগুলোকে মোটামুটি ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-(১) অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড, (২) অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড, (৩) হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড।

১। অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যালিফ্যাটিক যৌগের হ
তাকে অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন-গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন।

২। অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডের পার্শ্বিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যারোমেটিক যৌগের হ
তাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন-ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন।

৩। হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড : অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামিনো অ্যাসি
বিপরীত ধর্ম পরিলক্ষিত হলে তাকে হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। যেমন-ট্রিপটোফ্যান, প্রোলিন, হিস্টিডি

সাধারণত ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন প্রোটিন গঠনে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে বলা হয় প্রোটিন অ্যামি
অ্যাসিড। এছাড়াও অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যেগুলো প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে না। এদেরকে বলা
নন-প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড। অরনিথিন (ornithine), সাইট্রুলিন (citruline), হেমোসেরিন (haemoserine) প্রভৃতি
নন-প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড। এদের কিছু ইউরিয়া (যেমন-অরনিথিন) সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে; আবার কি
(যেমন- হেমোসেরিন) প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিনে হাইড্রক্সিপ্রোপিনের উপস্থিতি খু
সীমিত। এটি বিরল অ্যামিনো অ্যাসিড।

বিশটি অ্যামিনো অ্যাসিড হলো : ১। লিউসিন, ২। আইসোলিউসিন, ৩। লাইসিন, ৪। মেথিওনিন, ৫। ভ্যালিন, ৬।
সেরিন, ৭। প্রোলিন, ৮। থ্রিওনিন, ৯। অ্যালানিন, ১০। টাইরোসিন, ১১। হিস্টিডিন, ১২। অ্যাসপারাজিন, ১৩। সিস্টি
১৪। আরজিনিন, ১৫। গ্লাইসিন, ১৬। ট্রিপ্টোফ্যান, ১৭। গ্লুটামিন, ১৮। গ্লুটামিক অ্যাসিড, ১৯। অ্যাসপার্টিক অ্যাসি
২০। ফিনাইল অ্যালানিন।

অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ : ১। প্রোটিন তৈরি তথা আমিষ সংশ্লেষণ করে। ২। জীবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে।
৩। কিছু ভিটামিন, এনজাইম, ইনডোল হরমোন অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণে সাহায্য করে। ৪। ইউরিয়া সংশ্লেষণে সাহায্য কর
৫। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ৬। দেহে pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ৭। মেলানিন রঞ্জক সৃষ্টিতে সহায়
করে।

প্রোটিন (Protein) বা আমিষ

গ্রিক *'Proteios'* হতে Protein শব্দের উৎপত্তি। *'Proteios'* অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন জীবদেহে
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটি
গঠন করে। প্রোটিন শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন জি. মুল্ডার (G. Mulder) ১৮৩৯ সালে।

প্রোটিন হলো অসংখ্য অ্যামিনো অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত বৃহদাকার যৌগিক জৈব অণু। অন্যভাবে বলা যায়, প্রোটি
হলো উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপ
করে। অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারকে প্রোটিন বা আমিষ বলে। একটি কোষের অভ্যন্তরে সারাক্ষণ শত শত প্রকা
প্রোটিন তৈরি হয়।

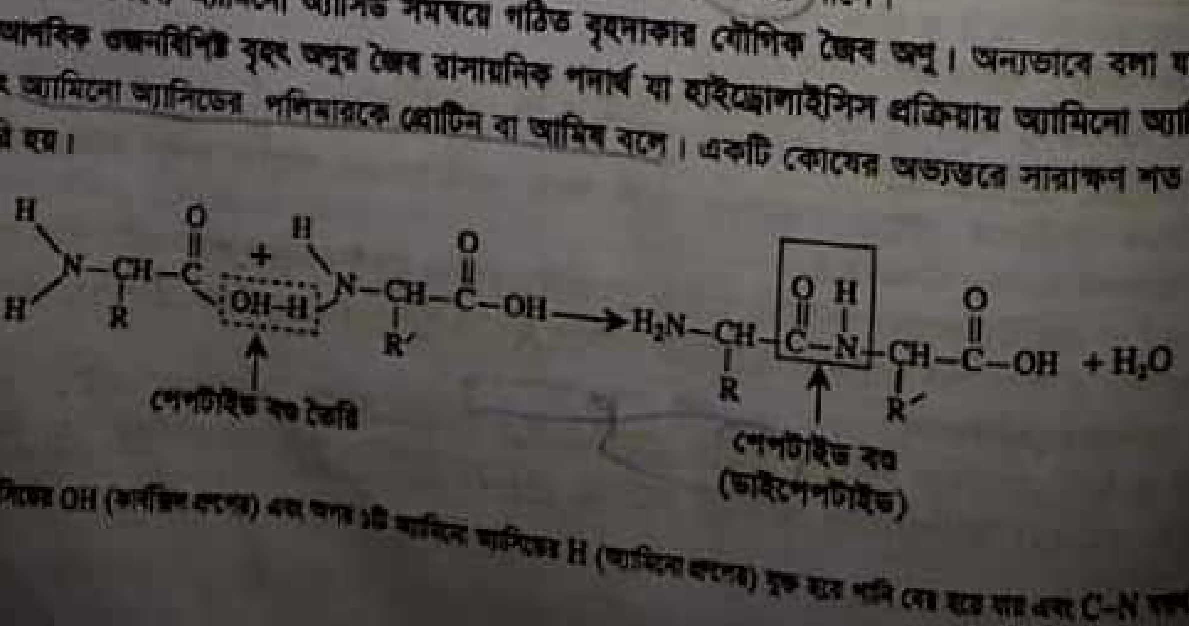

১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের OH (কার্বক্সিল গ্রুপের) এবং অপর ১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের H (অ্যামিনো গ্রুপের) যুক্ত হয়ে পানি বের হয়ে যায় এবং C–N বন্ধন তৈরি হয়।

...বস্থান : জীবদেহের প্রায় সর্বত্র প্রোটিন বিরাজমান। জীবদেহের সব অঙ্গে গাঠনিক বস্তু (structural elements) ...প্রোটিন বিদ্যমান। জৈব-ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম, অ্যান্টিবডি, হরমোন এগুলোও প্রোটিন। সব ...এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়।

...গঠন : বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। একটি অ্যামিনো ...সিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) অপর একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের α-অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে ...বন্ধন বন্ড গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ড (peptide bond) বলে। প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি ...হয়। দুটি ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইপেপটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে ট্রাইপেপটাইড, ...থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে অলিগোপেপটাইড। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন ...যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে। প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ।

...প্রকৃতি : প্রতিটি জীবদেহে অসংখ্য ধরনের প্রোটিন থাকে। একটি জীবদেহে যতটি জিনের প্রকাশ ঘটে ঐ দেহে তত ...প্রোটিন থাকে। কাজেই হাজার হাজার ধরনের প্রোটিন একটি জীবদেহে থাকতে পারে। আবার দুটি প্রজাতির মধ্যে ...জিনগত পার্থক্য থাকে, সেহেতু এদের মধ্যে প্রোটিনের ধরনগত পার্থক্যও থাকে। একই প্রজাতির দুটি জীবের ...পার্থক্য থাকতে পারে, কাজেই একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও প্রোটিনের কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে।

...সংশ্লেষণ স্থান : কোষস্থ রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

...প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য

১। প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত।

২। প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যাসিড, ক্ষার ও এনজাইম সহযোগে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

৩। বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায়।

৪। প্রোটিন পানিতে, লঘু অ্যাসিডে, ক্ষার ও মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

৫। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে সালফার, আয়রন ও তামা থাকতে পারে।

৬। অ্যাসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত (জমাট বাঁধা) হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।

৭। প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।

৮। প্রোটিনের মনোমার অ্যামিনো অ্যাসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ (–COOH) থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে। এজন্য একে অ্যাম্ফোটেরিক (amphoteric) প্রোটিন বলে।

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ (Types of Protein) : *Escherichia coli* এর একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন ...। মানুষের দেহে প্রায় এক লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে যা *E. coli* এর প্রোটিন থেকে আলাদা। প্রোটিনের বিশাল ...শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বিভিন্ন প্রকার।

(ক) জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে : জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে প্রোটিন দু'ধরনের; যথা–

...গাঠনিক প্রোটিন (Structural protein) : এরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। কোষ এবং টিস্যুর গঠনকে ...করে। এ ধরনের প্রোটিন ত্বক, চুল, শিং, ক্ষুর, অন্তঃকঙ্কাল (অস্থি ও তরুণাস্থি), যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে পাওয়া ...। উদাহরণ : কেরাটিন (ত্বক, শিং, নখ, ক্ষুর, পালক ইত্যাদি), কোলাজেন (অস্থি, টেনডন, যোজক টিস্যু ইত্যাদি), ...ফাইব্রোইন (সিল্ক ও মাকড়সার জাল), স্ক্লেরোটিন (পতঙ্গের বহিঃকঙ্কাল), কনড্রিন (তরুণাস্থিতে), ওসেইন (অস্থিতে)।

...কার্যকরি প্রোটিন (Functional protein) : এরা জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে ...ডায়নামিক বা ক্রিয়াকৌশলী প্রোটিনও বলা হয়। যেমন- এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শ্বাসরঞ্জক ইত্যাদি।

(খ) আকৃতি অনুযায়ী : আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন দু'ধরনের; যথা-

(i) তন্তুময় প্রোটিন (Fibrous protein) : যখন পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একটি অক্ষ ... সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন আকৃতির প্রোটিনকে তন্তুময় প্রোটিন বলে। যেমন- কে... কোলাজেন, ফাইব্রাইন ইত্যাদি।

(ii) গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein) : যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদের গ্লোবিউলার প্রো... বলে। যেমন- মায়োগ্লোবিন, ইনস্যুলিন, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি।

(গ) গঠন অনুসারে প্রোটিন চার প্রকার, ১। প্রাইমারি ২। সেকেন্ডারি ৩। টারশিয়ারি এবং কুয়াটারনারি।

(ঘ) ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে : আধুনিক তথ্য অনুসারে ভৌত-রাসায়নিক গুণা... দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) সরল প্রোটিন, (২) যুগ্ম প্রোটিন ও (৩) ... প্রোটিন।

১। সরল প্রোটিন (Simple protein) : যে প্রোটিনকে এনজাইম বা অ্যাসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যা... অ্যাসিড ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তাকে সরল প্রোটিন বলে। দ্রবণীয়তার (solubility) ওপর ভিত্তি করে ... প্রোটিনকে আবার ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা :

(i) অ্যালবিউমিন (Albumin) : যে সব প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে, ... অ্যালবিউমিন বলে। এরা পানিতে এবং লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ দিলে এরা জমাট বাঁধে। যব ও বার্লি... অ্যামাইলোজ, ডিমের সাদা অংশে ওভালবুমিন (১০-১২%), রক্তরস ও লসিকার সিরাম–অ্যালবিউমিন (৪-৫%), দু... ল্যাকটালবুমিন, গম বীজে লিউকোসিন, শিম বীজে লিগুমেলিন, মাংসপেশির মায়ো-অ্যালবিউমিন ইত্যাদি অ্যালবিউ... প্রোটিনের উদাহরণ।

(ii) গ্লোবিউলিন (Globulins) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। ... এরাও জমাট বাঁধে। বীজে এ ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে। যেমন-ডিমের কুসুম (অভোগ্লোবিউলিন), রক্তরস (সি... গ্লোবিউলিন), চোখের লেন্স (ক্রিস্টালিন গ্লোবিউলিন), মাংসপেশি (মায়োসিন গ্লোবিউলিন) ইত্যাদি গ্লোবিউলিন প্রোটি... উদাহরণ। শন, পাট, তুলা ইত্যাদি আঁশে এডেস্টিন, মটর বীজে লেগুলিন, চিনাবাদামে এরাচিন এবং আলুতে টিউ... নামক উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন বিদ্যমান।

(iii) গ্লুটেলিন (Glutelins) : এরা পানি ও লবণে অদ্রবণীয়। লঘু অ্যাসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে ... জমাট বাঁধে না। শস্যদানায় এ জাতীয় প্রোটিন অধিক থাকে। গমের গ্লুটেনিন (glutenin) এবং চালের অরাইজে... (orygenin) গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

(iv) প্রোলামিন (Prolamins) : এরা পানি ও অ্যাবসলুট ইথানলে (১০০%) অদ্রবণীয়, কিন্তু ৭০-৮০% ইথানলে ... দ্রবণীয়। হাইড্রোলাইসিস শেষে যে প্রোটিন প্রচুর প্রোলিন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে তা প্রোলামিন। ভুট্টার জেইন (... গম ও রাইয়ের গ্লিয়াডিন (gliadin) এবং যব ও বার্লির হর্ডিন (hordein) প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ। এরা শুধু ... থাকে। প্রোলামিন তাপে জমাট বাঁধে না।

(v) হিস্টোন (Histones) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়। এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় (... অ্যামিনো অ্যাসিড (যেমন- আরজিনিন, লাইসিন) থাকে। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদেরকে নিউক্লিয়াসে এবং নিউক্লি... অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে নিউক্লিয়োহিস্টোনের নাম বলা যায়।

(vi) প্রোটামিন (Protamines) : এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন। প্রোটামিনগুলো পানি, লঘু অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এ দ্রবণীয়। এতে ক্ষারীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (যেমন- আরজিনিন) বেশি থাকে। এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথেও দেখা যায়। প্রোটামিন-এ কোনো সালফার, টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান থাকে না। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। উদাহরণ : স্যামন মাছের শুক্রাণুতে সালমিন নামক প্রোটামিন থাকে।

(vii) স্ক্লেরোপ্রোটিন (Scleroproteins) : এরা পানি, মৃদু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় নয়। প্রাণিদেহের হাড়, চুল, নখ, ত্বক, প্রাণী টিস্যুতে এই প্রোটিন বেশি থাকে। যেমন-শিং, নখ, খুর ও চুলে কেরাটিন; চামড়ায় কোলাজেন ও হাড়ে টেনডন এ জাতীয় প্রোটিন।

২। যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন (Conjugated proteins) : যে প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ (প্রোসথেটিক গ্রুপ = prosthetic group) যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় কনজুগেটেড প্রোটিন বা যুগ্ম প্রোটিন। কনজুগেটেড প্রোটিনকে আবার নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়; যথা :

(i) নিউক্লিয়োপ্রোটিন (Nucleoproteins) : হাইড্রোলাইসিস করলে যে প্রোটিন থেকে একটি সরল প্রোটিন ও একটি নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায় তা হলো নিউক্লিয়োপ্রোটিন। এরা পানিতে দ্রবণীয় এবং ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়।

(ii) গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন (Glycoproteins or Mucoproteins) : প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট (বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড) যুক্ত হলে তাকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে। সেলমেমব্রেন-এ গ্লাইকোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

(iii) লিপোপ্রোটিন (Lipoproteins) : এটি লিপিড ও সরল প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর লিপিড অংশ গঠিত হয় কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড দিয়ে। লিপিড সরল প্রোটিন অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন মেমব্রেনের (নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্টের ল্যামিলী, ETC) গাঠনিক উপাদান হিসাবে এরা বিরাজ করে। মানুষের রক্তের প্লাজমা প্রোটিনও লিপোপ্রোটিন জাতীয়। লিপোপ্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়।

কাজ : গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে পূর্ণতা দান।

(iv) ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoproteins) : সরল প্রোটিনে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে ক্রোমোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। ফাইকোপ্রোটিন, বিলিপ্রোটিন, ক্যারোটিনয়েড প্রোটিন, ক্লোরোফিল প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন প্রোটিন ইত্যাদি হলো ক্রোমোপ্রোটিন।

(v) মেটালোপ্রোটিন (Metaloproteins) : অনেক এনজাইমে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে কোনো ধাতু বা মেটাল (Fe, Mn, Mg, Zn) থাকে। ধাতু বা মেটাল সম্বলিত এনজাইমগুলো হলো মেটালোপ্রোটিন। যেমন-সিডারোফিলিন ও সেলোপ্লাজমিন।

(vi) ফসফোপ্রোটিন (Phosphoproteins) : যে সকল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক এসিড যুক্ত থাকে তাকে ফসফোপ্রোটিন বলে। দুধের কেসিনোজেন, ডিমের ভাইটেলিন এ জাতীয় প্রোটিন।

(vii) ফ্লাভোপ্রোটিন (Flavoprotiens) : এ ধরনের প্রোটিনগুলো ফ্ল্যাভিন যৌগ তথা FAD (Flavin Adenine Nucleotide) এর সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

(viii) লৌহ-পোরফাইরিন প্রোটিন (Iron-porphyrin proteins) : এ ধরনের প্রোটিন Iron-porphyrin যৌগ তথা সাইটোক্রোম এর সাথে যুক্ত থাকে।

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন (Derived proteins) : এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না। তাদের উপর এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয়। উদাহরণ-পেপটাইড (Peptides), প্রোটিয়োজ (Proteoses), পেপটোন (Peptone) ইত্যাদি। যেমন-মায়োসিন থেকে মায়োসান সৃষ্টি ও অ্যালবুমিন থেকে অ্যালবুসোম সৃষ্টি হয়।

আবার গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোটিন দু'প্রকার : (i) প্রথম শ্রেণির প্রোটিন ও (ii) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন।

(i) প্রথম শ্রেণির প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে সবকয়টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে তাদের প্রথম শ্রেণির প্রোটিন (সম্পূর্ণ প্রোটিন) বলে। যেমন-মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বাদাম, সয়াবিনসহ অধিকাংশ প্রাণিজ প্রোটিন।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন : যেসব প্রোটিনে সবগুলো অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না এদের দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলে। যেমন-সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদ প্রোটিন।

প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান : বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডই প্রোটিনের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এছাড়া প্রোটিনে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি থাকে।

প্রোটিনের কাজ

১। জীবদেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
২। কোষে প্রোটিন সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে এবং প্রয়োজনে শক্তি উৎপাদন করে।
৩। বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং কোষ ঝিল্লি গঠনে কাজ করে।
৪। এনজাইম হিসেবে জীবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তথা জীবদেহকে সচল রাখে।
৫। এ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং দেহকে রোগমুক্ত রাখে।
৬। জীবদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপন্ন করে।
৭। হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে।
৮। কিছু প্রোটিন বিষাক্ত হওয়ায় অনেক জীব তা খেয়ে মারা যায় (সাপের বিষের প্রোটিন)।
৮। যে সকল উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে তারা অনেক পশু পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।
১০। হিমোগ্লোবিন প্রোটিন প্রাণিদেহের সমস্ত কোষে O_2 ও CO_2 পরিবহন করে।
১১। মানবদেহের পেপটাইড থেকে উৎপাদিত প্রোটিন ডিফেনসিভ (defensive) এন্টিবডি হিসেবে কাজ করে।
১২। ইন্টারফেরন (interferon) একটি কোষীয় প্রোটিন। এটি ভাইরাস আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তৈরি হ… ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারফেরন ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যাবে।

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা (Role of Protein)

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি দেহের গঠন উপাদানের একটি বড় অংশ। প্রোটি… ছাড়া দেহাঙ্গ বা অঙ্গাণুর সঠিক গঠন সম্ভব নয়। সজীব দেহ কতগুলো রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র। আর এ… ক্রিয়া-বিক্রিয়া এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সব এনজাইমই প্রোটিন। 'জিন'-এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ঘটে প্রোটিনের মধ্যে… আর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ছাড়া জীবের অস্তিত্ব নেই। জীবদেহের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন হরমোন বিশেষ বিশেষ ভূমি… পালন করে থাকে (যেমন ইনস্যুলিন, হিমোগ্লোবিন)। অধিকাংশ হরমোনই প্রোটিন। দেহের ইমিউন সিস্টে… প্রোটিননির্ভর। প্রোটিন দেহের শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে। কোষচক্র সম্পন্ন করতেও প্রোটিনের প্রয়োজন হ… ট্রান্সক্রিপশন সম্পন্ন করতেও প্রোটিনের প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এর কারণ হিসেবে ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছে। ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন ভাইরা… প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। রোগ জীবাণু ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পোষক দেহে যে অ্যান্টি… তৈরি হয় তা সংশ্লেষ করতে প্রোটিন এর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন জীবের বিপাকীয় বিক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে বিষাক্ত প… উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ জীবের আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ সহায়ক। যেমন-সাপের বিষ। মস্তিষ্কে উৎপন্ন এক… ব্যথানাশক হিসেবে অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুম আনয়নকারী s-factor বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

খাদ্য তালিকায় প্রোটিন

আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখা পরিহার্য, কারণ শরীর গঠনে প্রোটিনের ভূমিকা মুখ্য। বিভি… প্রকার খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। পরিমাণের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন থাকে বিভিন্ন ডাল জাতী… খাবারে কিন্তু এর পরও পুষ্টিবিজ্ঞানিগণ প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

প্রোটিন তৈরি হয় বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। গাঠনিক ইউনিট হিসেবে এই বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসি… অত্যাবশ্যকীয়। মানবদেহের চাহিদা অনুসারে মাত্র আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড (লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, থিওনিন, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান)কে অত্যাবশ্যকীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসি…

...এর কারণ হলো অন্য ১২টি অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে কিন্তু উক্ত ৮টি অ্যামিনো ...দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের মাধ্যমে দেহে গ্রহণ করা হয়। শিশুদের জন্য আরজিনিন এবং হিস্টিডিন ...অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ১০টি।

...সব প্রোটিনে সব অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না, তাই যে সব প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে ...তালিকায় সেগুলোই প্রাধান্য দেয়া উচিত। এদিক থেকে প্রাণিজ প্রোটিনই (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি) অগ্রগামী ...এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন ডাল) অনুগামী।

...প্রকৃতপক্ষে প্রোটিনের মান বিচারে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের উপস্থিতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। ...অত্যাবশ্যকীয় ৮টি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটিও যদি মিনিমাম আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তা হলেই এর মান কমে ...কারণ দেহ সঠিক পরিমাণে তা শোষণ করতে পারে না। মানের দিক থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পিছনে থাকার এটিই ...। আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার। চালের প্রোটিন এবং ডালের প্রোটিন এক ...হলে একটির অভাব অপরটি কিছুটা পূরণ করে, তাই চাল-ডালের খিচুড়ির পুষ্টিমান ভাত এবং ডালের চেয়ে উপরে।

আদর্শ প্রোটিন : প্রতি ১০০ গ্রাম আদর্শ প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ (গ্রাম)

	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	ফিনাইল অ্যালানিন	মেথিওনিন	থ্রিওনিন	ট্রিপ্টোফ্যান	ভ্যালিন
আদর্শ প্রোটিন	৪.৩	৪.৯	৪.৩	২.৯	২.৩	২.৯	১.৪	৪.৩
ডিম	৬.৮	৯.০	৬.৩	৬.০	৩.১	৫.০	১.৭	৭.৪
গরুর দুধ	৬.৪	৯.৯	৭.৮	৪.৯	২.৪	৪.৬	১.৪	৬.৯
...চাল	৫.২	৬.৯	৬.১	৪.১	০.৬	৩.৬	০.৮	৫.৫
...ম	৬.৫	৯.৫	৯.০	৪.৪	৩.২	৪.৭	১.২	৬.০
ডাল	৫.২	৭.৮	৮.৬	৩.৯	২.৭	৪.৪	১.০	৫.১

...ডিম এবং দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংসে ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। ডালে মেথিওনিন ও ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ ...মাত্রার চেয়ে কম। কাজেই মাছ-মাংস প্রকৃত আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরো নিম্নমানের।

লিপিড (Lipids) বা স্নেহজাতীয় পদার্থ

...উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিদ্যমান একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিড। কার্বোহাইড্রেটের মতো ...এটাও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত হয়। উদ্ভিদদেহে বিশেষ করে ফল ও বীজে অধিক পরিমাণ লিপিড ...জমা থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে লিপিড বলা হয়। অন্যভাবে, ...রাসায়নিকভাবে অ্যালকোহল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে লিপিড বলে। লিপিড প্রধানত স্নেহ ও তেলরূপে বিদ্যমান ...। সাধারণ তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড শক্ত থাকে এবং ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড তরল ...। শক্ত ও কঠিন লিপিডকে স্নেহ বা চর্বি (fat) এবং তরল লিপিডকে তেল (oil) বলা হয়। লিপিডের নির্দিষ্ট কোনো ...রূপ নেই।

লিপিডের বৈশিষ্ট্য

১। লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়।
২। এরা ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়।
৩। এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে (actual or potential) বিরাজ করে।
৪। লিপিড পানির চেয়ে হালকা; তাই পানিতে ভাসে।
৫। হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোলে পরিণত হয়।
৬। লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৭। লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে।

৮। সাধারণ উষ্ণতায় (20°C) কিছু লিপিড (যেমন-তেল) তরল এবং কিছু লিপিড (যেমন চর্বি) কঠিন অবস্থায় থাকে।

লিপিড-এর গঠন

সাধারণভাবে গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত হয়। ফসফোলিপিড-এ গ্লিসারোল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন বেস থাকে। গ্লাইকোলিপিড-এ ফ্যাটি অ্যাসিড, শ্যুগার (হেক্সোজ) নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। মোমজাতীয় লিপিড-এ গ্লিসারোল-এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরোল থাকে।

লিপিড-এর কাজ

১। চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।

২। ফসফোলিপিড বিভিন্ন মেমব্রেন গঠনে উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৩। মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।

৪। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়ন বাহক হিসবেও কাজ করে।

৫। সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬। প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

লিপিড-এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Lipids)

(ক) রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি অনুসারে লিপিড প্রধানত তিন প্রকার; (Bloor 1943) যথা-

১। সরল লিপিড, যেমন- চর্বি, তেল, মোম ইত্যাদি;

২। যৌগিক লিপিড, যেমন- ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, সালফোলিপিড ইত্যাদি;

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড, যেমন- স্টেরয়েড, টারপিনস, রাবার ইত্যাদি।

(খ) আণবিক গঠন অনুযায়ী লিপিড প্রধানত পাঁচ প্রকার; যথা-

(i) নিউট্রাল লিপিড, (ii) ফসফোলিপিড, (iii) গ্লাইকোলিপিড, (vi) টারপিনয়েডস এবং (v) মোম।

নিচে কয়েক প্রকার লিপিডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো :

১। সরল লিপিড (Simple lipids) : যেসব লিপিডের বিশ্লেষণে স্নেহ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না তাকে সরল লিপিড বলে। সরল লিপিড দু প্রকার : (i) স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) ও (ii) মোম।

(i) স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) : ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারোল এস্টারকে বলা হয় স্নেহদ্রব্য। এতে তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে এক অণু গ্লিসারোল যুক্ত হয়। একে ট্রাইগ্লিসারাইড বা নিউট্রাল লিপিডও বলা হয়। ট্রাইগ্লিসারাইড দু'রকম; যথা- চর্বি ও তেল।

চর্বি (Fat) : যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) কঠিন বা অর্ধকঠিন অবস্থায় বিরাজ করে তাকে চর্বি বলে। যেমন- উদ্ভিজ্জ চর্বি ও পাম অয়েল। এর গলনাঙ্ক বেশি। নারিকেল তেলও চর্বি জাতীয়, নিম্ন তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে।

তেল (Oil) : যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে তাকে তেল বলে। যেমন- সাধারণ ভোজ্য তেল। এর গলনাঙ্ক খুব কম।

চর্বি ও তেলের কাজ : ১। ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। ২। বীজের অঙ্কুরোদগমকালে কার্বোহাইড্রেট-এ পরিবর্তিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়।

ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride)

এক অণু গ্লিসারোল-এর সাথে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় এক অণু ট্রাইগ্লিসারাইড। এ সময় তিন অণু পানি তৈরি হয়, কাজেই এটি হলো একটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া। গ্লিসারোল হলো একটি ক্ষুদ্র অণুর অ্যালকোহল,

যেখানে ৩টি কার্বন ও ৩টি হাইড্রোক্সি পার্শ্বগ্রুপ থাকে। ফ্যাটি অ্যাসিড হলো একটি হাইড্রোকার্বন চেইন ... মাথায় একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ থাকে। কার্বোক্সিল গ্রুপের ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে OH সাইড গ্রুপের ... বলা হয় এস্টার লিংকেজ (ester linkage)। ফ্যাটি অ্যাসিড চেইন-এ কোনো ডাবল বন্ড না থাকলে তাকে ... স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন- স্টিয়ারিক অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের হাইড্রোকার্বন চেইন-এ এক বা একাধিক ... বন্ড থাকলে তাকে বলা হয় আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন- লিনোলিক (linoleic) অ্যাসিড, লিনো... (linolenic) অ্যাসিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (যা প্রাণী চর্বিতে থাকে) আর্টারিগাত্রে জমা হয়ে রক্ত চলাচলে ... করে দেয়, তাই হৃদরোগ হয়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডে তা হয় না।

মানুষ (এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী) ফ্যাটি অ্যাসিডের নবম কার্বনের পর কোনো ডাবল বন্ড তৈরি করতে পা... তাই আমাদের খাদ্যে সামান্য আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যোগ করতে হয়। এ জন্যই linoleic এবং lino... অ্যাসিডদ্বয়কে আবশ্যকীয় (essential) ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয়। আমাদের খাদ্যে সাধারণত যথেষ্ট আনস্যাচুরেটেড ... অ্যাসিড থাকে, তাই পুষ্টিজনিত অসুবিধা দেখা দেয় না।

(ii) মোম (Wax) : ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহলের পরিবর্তে মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলে... উপাদানের সাথে এস্টারীভূত হলে তাকে মোম বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে প্রাপ্ত মোম ২৪ থেকে ৩৬ ... পরমাণুবিশিষ্ট। মৌচাক থেকেও প্রাকৃতিক মোম পাওয়া যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন থাকে। মোম পা... অদ্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, কারণ এদের হাইড্রোকার্বন চেইন-এ কোনো ডবল বন্ড থাকে না। এদের ... অত্যন্ত দীর্ঘকায়। ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিসর C_{14} থেকে C_{36}। আর অ্যালকোহলের পরিসর C_{16} থেকে C_{36}।

মোম-এর কাজ : ১। উদ্ভিদ অঙ্গের উপরিতলে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। ২। মোম সাধারণত কাণ্ড, ... পাতা ও ফলের ওপর প্রতিরোধক স্তর হিসেবে অবস্থান করে। ৩। মোম থেকে মোমবাতি তৈরি হয়। ৪। বিভিন্ন ... শিল্পেও মোম ব্যবহৃত হয়।

২। **যৌগিক লিপিড (Compound lipids) :** যে লিপিড সরল লিপিডের সাথে কিছু জৈব ও অজৈব পদা... সংমিশ্রণে তৈরি হয় তাকে যৌগিক লিপিড বলে। এটি স্নেহ ও অস্নেহ জাতীয় পদার্থের যৌগ। তিন রকম যৌগিক লি... নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

(i) ফসফোলিপিড (Phospholipids) : গ্লিসারোল, ফ্যাটি অ্যাসিড ও ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে বলা... ফসফোলিপিড। লেসিথিন (lecithin), সেফালিন (cephaline), প্লাজমালোজেন (plasmalogen) ইত্যাদি কয়ে... ফসফোলিপিডের নাম। ফসফোলিপিড-এর বিশেষ উপাদান হলো ফসফাটাইডিক অ্যাসিড। সেল মেমব্রেন, মাইটোকন্ড্রি... টনোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, নিউক্লিয়ার এনভেলপ ইত্যাদি ফসফোলিপিড সমন্বিত।

কাজ : ১। কোষ ঝিল্লি, বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর ঝিল্লির গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। ২। আয়ন বাহক হি... কাজ করে। ৩। কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। ৪। ফসফোলিপিড রক্ত জমাট বাঁধতে সা... করে। ৫। কোষের ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(ii) গ্লাইকোলিপিড (Glycolipids) : সরল লিপিডের সাথে যখন কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে তখন তা... গ্লাইকোলিপিড বলে। এতে ফসফেটের পরিবর্তে গ্যালাকটোজ বা গ্লুকোজ থাকে। উদ্ভিদের ফটোসিনথেটিক ... ফসফোলিপিড অপেক্ষা গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনে গ্লাইকোলিপিড অধিক থাকে। ... গ্যালাকটোজ থাকলে তাকে গ্যালাকটোলিপিড বলে। সূর্যমুখী ও তুলার বীজ থেকে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা ... গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিডকে মিলিতভাবে গ্লাইকোক্যালিক্স বলা হয়।

কাজ : ১। ফটোসিনথেটিক অঙ্গাণু গঠনে ভূমিকা রাখা। ২। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

(iii) সালফোলিপিড (Sulpholipids) : যে গ্লাইকোলিপিডে সালফার থাকে তাকে সালফোলিপিড বলে। উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণ এই জৈব যৌগটি পাওয়া যায়। ক্লোরোপ্লাস্টে এর উপস্থিতি সীমাবদ্ধ থাকে।

৩। উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড (Derived lipids) : যৌগিক লিপিডের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উদ্ভূত হয় তাকে উদ্ভূত লিপিড বলে। আবার যেসব যৌগ আইসোপ্রিন এককের (C_5H_8) পলিমার দিয়ে গঠিত তাকে টারপিনয়েড লিপিড বলে। আইসোপ্রিন হলো ৫ কার্বনবিশিষ্ট যৌগ। স্টেরয়েড, টারপিন্স, রাবার ইত্যাদি টারপিনয়েড লিপিডের উদাহরণ। নিম্নে এদের বর্ণনা করা হলো-

(i) স্টেরয়েড (Steroids) : চারটি ভিন্নতর কার্বন রিং-এর শিরদাঁড়া (backbone) এবং তাতে কার্বনের পার্শ্বশিকল দিয়ে গঠিত লিপিড হলো স্টেরয়েড। যে সব স্টেরয়েড-এ হাইড্রক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে, তাদেরকে বলা হয় স্টেরল (sterol)। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান। এরা উদ্ভিদে মুক্ত অবস্থায় অথবা গ্লুকোসাইড হিসেবে বিরাজমান থাকে। কোলেস্টেরল (cholesterol), স্টিগমাস্টেরল (stigmasterol), আর্গস্টেরল (ergosterol), β-সিটোস্টেরল (β-sitosterol), ডিজিট্যালিন প্রভৃতি স্টেরয়েডস্ এর উদাহরণ। হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় ডিজিটালিন ব্যবহৃত হয়। নিউরোস্পোরা ও ঈস্ট এ আর্গস্টেরল পাওয়া যায়। আলু, চুপরিআলুতে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল প্রাণিদেহে পাওয়া যায়।

কোলেস্টেরল : কোলেস্টেরল হলো সকল প্রাণীর চর্বিতে বিদ্যমান একটি সাধারণ স্টেরল যা প্লাজমামেমব্রেনের প্রয়োজনীয় উপাদান, পিত্তের প্রধান উপাদান এবং ভিটামিন-ডি এর পূর্বসূচক।

কোলেস্টেরল দুই প্রকার; যথা- (i) লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা LDL এবং (ii) হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা HDL। মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকা ক্ষতিকর (স্বাভাবিক মাত্রা ০.১৫-১.২০%)। রক্তে HDL বেশি থাকা মন্দ নয় তবে LDL বেশি থাকা খুবই ক্ষতিকর। স্ত্রীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য পুরুষ লোক অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদরোগ কম হয়। কোলেস্টেরল বেশি থাকলে রক্তনালি সরু হয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে যায় ফলে করোনারি থ্রম্বোসিস নামক হৃদরোগ হয়। মানুষের রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (40 <mg/dl) থাকা ভালো। তবে LDL এর মাত্রা কম (<100 mg/dl) থাকা ভালো।

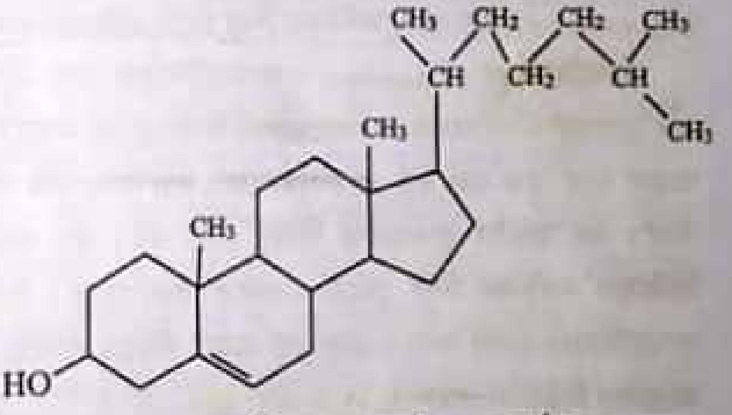

চিত্র : কোলেস্টেরল এর গঠন।

কাজ : বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসায় স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়। কিছু স্টেরয়েড হরমোন প্রাণীর যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন হজম, চর্বি হজম, পানির ভারসাম্য রক্ষা, কোষ পর্দা গঠন প্রভৃতি কাজ বিভিন্ন প্রকার স্টেরয়েড করে থাকে।

(ii) টারপিন্স (Terpenes) : ১০ থেকে ৪০টি কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগকে টারপিন্স বলে। এর সাধারণ সংকেত হলো $(C_5H_8)n$। পুদিনা, তুলসী ইত্যাদিতে উদ্বায়ী তেল হিসেবে টারপিন্স পাওয়া যায়।

কাজ : সুগন্ধী প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে ও বার্নিশের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(iii) রাবার (Rubber) : প্রায় ৩০০০-৬০০০ হাজার আইসোপ্রেন একক যুক্ত হয়ে রাবার তৈরি হয়। *Hevea brasiliensis* (Euphorbiaceae) থেকে প্রাকৃতিক রাবার (প্যারা রাবার) পাওয়া যায়। এছাড়া *Ficus elastica*, *Palaquium gutta*, *Castilla elastica* ইত্যাদি বৃক্ষের কষ থেকেও সামান্য পরিমাণ রাবার সংগ্রহ করা যায়। প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে রাবার উৎপাদন করা হয়। এদেরকে গাম রাবার বলে।

কাজ : ট্রাক, বাস, মোটরগাড়ি, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদির টায়ার তৈরি করার জন্য রাবার ব্যবহৃত হয়।

লিপিড-এর রাসায়নিক উপাদান

লিপিড সাধারণত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। এতে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারোল ছাড়া কখনো নাইট্রোজেন ফসফরাসও থাকতে পারে। মোমে গ্লিসারোল থাকেনা - এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে। গ্লাইকোলিপিডে ফ্যাটি অ্যাসিড, হেক্সোজ শুগার ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে।

ভিন্নধর্মী লিপিড

কিছু লিপিডের রাসায়নিক গঠন ট্রাইগ্লিসারাইড্স ও ফসফোলিপিড থেকে আলাদা। নিচে কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

• **ক্যারোটিনয়েড্স (Carotenoids) :** এরা আলোক শোষণকারী পিগমেন্ট। বিটা-ক্যারোটিন পাতায় আলোকশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে। এছাড়া বিটা-ক্যারোটিন আলোক অনুধাবন করে ফটোট্রপিজম ঘটায়। মানবদেহে বিটা-ক্যারোটিন ভেঙে দুই অণু ভিটামিন-এ তৈরি করে যা থেকে পরে রডোপসিন (rhodopsin) তৈরি হয়। রডোপসিন দৃষ্টিশক্তি (vision) দান করে। ডিমের কুসুম, গাজর, টমেটো ইত্যাদি থেকে বিটা ক্যারোটিন পাওয়া যায়।

• **স্টেরয়েড্স (Steroids) :** Testosterone এবং estrogens হলো স্টেরয়েড হরমোন যা মেরুদণ্ডী প্রাণীতে যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। Cortisol কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন হজম, লবণ ভারসাম্য, পানি ভারসাম্য এবং যৌন বিকাশে অবদান রাখে। Cholesterol লিভারে তৈরি হয় এবং কোষীয় ঝিল্লির গঠনে সাহায্য করে, testosterone এবং অন্যান্য স্টেরয়েড হরমোন সৃষ্টির সূচনা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে। বাইল (bile) সল্ট তৈরিতেও সাহায্য করে যা খাদ্যের চর্বি হজমে অবদান রাখে। রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনীর লুমেন বন্ধ করে দিতে পারে। রক্তে LDL (Low Density Lipoprotein) বেশি থাকা ক্ষতিকর কিন্তু HDL (High Density Lipoprotein) বেশি থাকা মঙ্গলজনক।

ভিটামিনসমূহ (Vitamins) : ক্যারোটিনয়েড এবং স্টেরয়েড-এর মতো কতক ভিটামিনও আইসোপ্রেন (isoprene)-এর রাসায়নিক পরিবর্তন ও কোভেলেন্ট লিংকিং-এর মাধ্যমে তৈরি হয়। ক্যারোটিনয়েড থেকে **ভিটামিন-A** তৈরি হয়। এর অভাব হলে ত্বক শুষ্ক হয়, রাতকানা রোগ হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়। **ভিটামিন-D** অন্ত্রকর্তৃক ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত বিভিন্ন রোগ হয়। এক দল লিপিড **ভিটামিন-E** হিসেবে পরিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে। **ভিটামিন-K** সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায়। আবার অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়াও তৈরি করে। এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো **B ও C** এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো **A, D, E এবং K**।

জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা (Role of Lipids)

জীবদেহে লিপিডের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সেলমেমব্রেন থেকে শুরু করে অধিকাংশ অঙ্গাণুর আবরণী ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত। ফসফোলিপিড কেবল এদের গঠন উপাদান হিসেবেই কাজ করে না, দ্রব্যের আদান-প্রদানেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। লিপিডের অভাবে যদি মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গাণুটি অকার্যকর হয়ে যায় তবে বায়বীয় জীব বেঁচে থাকার শক্তি যোগাবে কে? লিপিডঘটিত **ক্যারোটিনয়েডস্, স্টেরয়েড হরমোন** বা **ভিটামিন A, D, E, K** প্রভৃতি জীবদেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের খাদ্য তালিকায় লিপিডের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ থেকে অধিক শক্তি পাওয়া যায়। লিপিড ত্বকের শুষ্কতা দূর করে এবং ত্বক মসৃণ রাখে। গ্লাইকোলিপিড সালোকসংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে। ফসফোলিপিড কোষের আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে। টারপিনস জাতীয় লিপিড উদ্ভিদে সুগন্ধি সৃষ্টি করে।

এনজাইম (Enzyme) বা উৎসেচক

এনজাইম হলো প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। জীবকোষে এনজাইম অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এনজাইম বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিতভাবে মুক্ত হয়ে যায়। বস্তুত জীবনতন্ত্রের (living system) গতিময় প্রাণরাসায়নিক অবস্থা বহুলাংশে এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানী কুন (F. H.

...১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম এনজাইম শব্দটি ব্যবহার করেন। ঈস্ট কোষে জাইমেজ আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে। ...James Sumner, 1926) প্রথম ইউরিয়েজ (urease) নামক এনজাইমটি কোষ হতে পৃথক করেন এবং বলেন যে, ...es are proteins"। যে প্রোটিন জীবদেহে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু ...শেষে নিজেরা অপরিবর্তিত (শর্ত সাপেক্ষে) থাকে, সে প্রোটিনই এনজাইম। এনজাইমকে জৈব অনুঘটকও ...catalyst) বলা হয়ে থাকে। এনজাইম কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার মৌলে গঠিত। ...এনজাইমে ফসফরাস, তামা, দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি মৌল থাকে বলে জানা গেছে।

...জাইমের ভৌত বৈশিষ্ট্য বা এনজাইমের ধর্ম

- ...এনজাইম হলো প্রধানত প্রোটিনধর্মী।
- ...জীবকোষে এনজাইম কলয়েড (colloid) রূপে অবস্থান করে।
- ...এর কার্যকারিতা pH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সকল এনজাইমই pH 6-9 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল।
- ...এরা তাপ প্রবণ (heat sensitive) অর্থাৎ সাধারণত 35°C – 40°C তাপমাত্রায় অধিক ক্রিয়াশীল। অধিক তাপে ...এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কম তাপে নষ্ট হয় না।
- ...এনজাইম খুব অল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে।
- ...এনজাইম কেবলমাত্র বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার (state of equilibrium) ...পরিবর্তন করে না।
- ...এনজাইমের কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট এনজাইম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া গ্রুপকে প্রভাবিত করে, অন্য বিক্রিয়াকে নয়।

...জাইমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য : সব এনজাইমই প্রোটিন জাতীয়, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো অ্যাসিডই ...সমূহের মূল গাঠনিক উপাদান। একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিড সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। ভিন্ন ...জাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এনজাইম অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় ...শেই ক্রিয়াশীল। কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এনজাইম ...পানি, গ্লিসারল ও লঘু অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব প্রোটিনই এনজাইম নয়।

...জাইমের নামকরণ : সাধারণত তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যথা- ...স্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে ২। বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে এবং ৩। সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

...। **সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে :** এনজাইম যার ওপর ক্রিয়া করে তাকে বলা হয় সাবস্ট্রেট (substrate)। যে ...টি হয় যে পদার্থের ওপর এনজাইম ক্রিয়া করে তার শেষে- 'এজ' (ase) যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা ...য়।

সাবস্ট্রেট		এনজাইম
...সুক্রোজ-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	সুক্রেজ
...ইউরিয়া-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	ইউরিয়েজ
...আরজিনিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	আরজিনেজ
...টাইরোসিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	টাইরোসিনেজ
...লিপিড-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	লাইপেজ
...প্রোটিন-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	প্রোটিয়েজ

২। বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে : এনজাইম যে ধরনের বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা প্রভাবিত করে সেই বিক্রিয়ার নামের প্রথমাংশের সাথে 'এজ' যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। একটি ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো।

বিক্রিয়ার নাম	+ এজ	এনজাইমের নাম
হাইড্রোলাইসিস	+ এজ	= হাইড্রোলেজ
অক্সিডেশন	+ এজ	= অক্সিডেজ
রিডাকশন	+ এজ	= রিডাকটেজ

৩। সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে : সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের নাম যোগ করে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। সাধারণত বিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। যেমন সাবস্ট্রেট হেক্সোজ (গ্লুকোজ) এবং এনজাইম কাইনেজ, তাই যুক্ত নাম দেয়া হয়েছে **হেক্সোকাইনেজ**। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট সৃষ্টিকালে এ এনজাইম কার্যকরী হয়। ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরির বিক্রিয়ার এনজাইমের নাম **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ**। এমনইভাবে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ ইত্যাদি।

প্রোসথেটিক গ্রুপ; কো-ফ্যাক্টর, কো-এনজাইম

- সব এনজাইমই প্রোটিন। যে এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় **সরল এনজাইম**।
- কোনো কোনো এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের এনজাইমকে (তথা প্রোটিনকে) বলা হয় **কনজুগেটেড প্রোটিন** (conjugated proteins).
- কনজুগেটেড প্রোটিন এর প্রোটিন অংশকে **অ্যাপোএনজাইম** (apoenzyme) বলে।
- কনজুগেটেড প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশকে **প্রোসথেটিক গ্রুপ** বলে।
- প্রোসথেটিক গ্রুপ কোনো ধাতুর আয়ন মেটাল (metal) হলে তাকে কো-ফ্যাক্টর (co-factor) বলা হয়। পূর্বে একে অ্যাক্টিভেটর বলা হতো, যেমন- Fe^{2+}, Mg^{2+}, Zn^{2+}

কো-এনজাইম

এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপটি কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলে (organic compound) তাকে কো-এনজাইম (co-enzyme) বলা হয়; যেমন- FAD, NAD ইত্যাদি।

এনজাইমেটিক ক্রিয়াকালে কো-এনজাইম সাধারণত সাবস্ট্রেট হতে যে এটম বিয়োজন হয় তার গ্রহীতা (acceptor) হিসেবে বা সাবস্ট্রেট-এর সাথে যে এটম যোগ হয় তার দাতা (donor) হিসেবে কাজ করে। এনজাইম হতে কো-এনজাইম অংশ পৃথক করে নিলে এনজাইমের কার্যক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম হলো-

(i) FAD. = Flavin Adenine Dinucleotide
$FADH_2$ = Reduced Flavin Adenine Dinucleotide
(ii) FMN = Flavin Mononucleotide (ভিটামিন B_2-মনোফসফেট)
(iii) NAD = Nicotinamide Adenine Dinucleotide
$NADH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide
(iv) NADP = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
$NADPH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
(v) CoA = Co-enzyme A
(vi) ATP = Adenosine Triphosphate

এনজাইমের কাজের কৌশল (Mechanism of enzyme action) বা ক্রিয়ার প্রকৃতি

কোনো নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান (active site) থাকে। জার্মান রসায়নবিদ Emil Fischer (১৮৯৪) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট প্রস্তাব করেন। পলিপেপটাইড চেইনের ফলডিং-এর মাধ্যমে অ্যাকটিভ সাইট সৃষ্টি

অ্যাকটিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো তালা-চাবির মতো সুনির্দিষ্ট। (১) প্রথমে সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের নির্দিষ্ট স্থান তথা 'অ্যাকটিভ সাইট'-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়।

এনজাইম + সাবস্ট্রেট (A এবং B) ⟶ এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ⟶ এনজাইম + প্রোডাক্ট (C এবং D)

সুক্রেজ + সুক্রোজ ⟶ সুক্রেজ – সুক্রোজ যৌগ ⟶ সুক্রেজ + গ্লুকোজ (C) + ফ্রুক্টোজ (D)

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট অ্যাকটিভ সাইট-এ সংযুক্ত হলে পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে অ্যাকটিভ সাইট-এ 'fit' করে নেয়। একে বলা হয় **'induced fit'**। এ কারণে তালা-চাবি মতবাদ পরিত্যাজ্য বলে মনে করা হয়।

কিছু কিছু পদার্থ এনজাইমের কাজে বাধাদান করে বা বিঘ্ন ঘটায়। এদেরকে **ইনহিবিটর** বলে। **ইনহিবিটর** (inhibitor) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ আগেই সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে সাবস্ট্রেট ঐ অ্যাকটিভ সাইট-এ আর যুক্ত হতে পারে না। ফলে এনজাইম কাজ করতে পারে না। আবার কতক ইনহিবিটর (বাধাদানকারী) অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যুক্ত হয়ে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট নষ্ট করে ফেলে, কাজেই সাবস্ট্রেট সেখানে যুক্ত হতে পারে না। কিছু কিছু

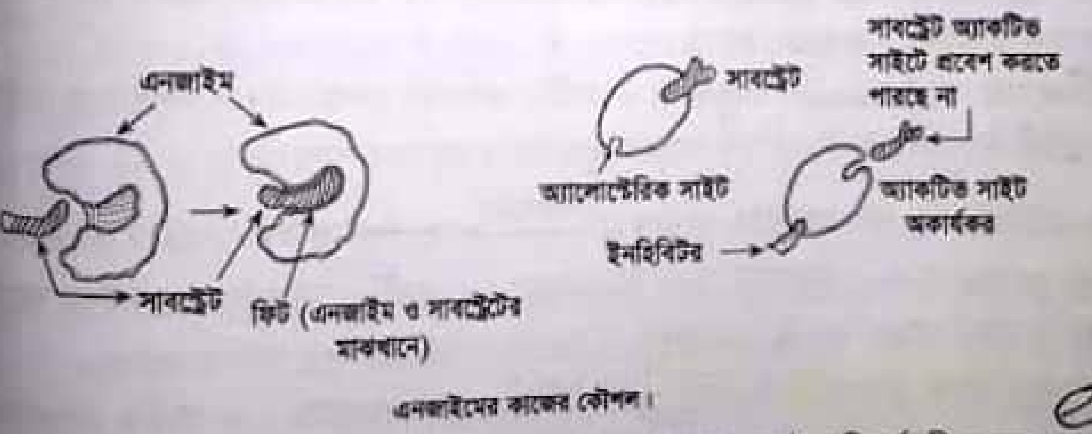

এনজাইমের কাজের কৌশল।

এনজাইম আছে যাদের একাধিক সাবইউনিট থাকে। এদের আকৃতি ও কাজ সহজেই পরিবর্তনশীল হতে পারে। এ ধরনের এনজাইমকে বলা হয় **Allosteric enzymes**। অ্যালোস্টেরিক এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে **effector** নামক অণু। ইফেক্টর, এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অ্যালোস্টেরিক সাইট-এ সংযুক্ত হয়ে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে অথবা ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করে।

যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয়। এই অতিরিক্ত শক্তিকে কার্যকরী শক্তি বলে। এনজাইম-সাবস্ট্রেট এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।

কাজ: শিক্ষার্থীগণ এনজাইমের কাজের কৌশল বিষয়টি বোর্ডে উপস্থাপন করবে এবং ব্যাখ্যা করবে।

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস : গঠন প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়। আবার কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর ভিত্তি করেও এনজাইমসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়।

(ক) গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস : গঠন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক এনজাইম দু'প্রকার। যথা-

১। সরল এনজাইম (Simple enzyme) : যে এনজাইমের সম্পূর্ণ অংশই শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে সরল এনজাইম বলে। যেমন-সুকরেজ, অক্সিডেজ।

২। যৌগিক বা সংযুক্ত এনজাইম (Complex বা conjugated enzyme) : যে এনজাইমের প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে তাকে যৌগিক এনজাইম বা কনজুগেটেড এনজাইম বলা হয়। যেমন-FAD, NAD।

(খ) কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার ওপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

১। অক্সিডোরিডাকটেজ (Oxido-reductase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা ইলেকট্রন সংযুক্ত করে অথবা কোনো পদার্থ থেকে এগুলো বিযুক্ত করে। অক্সিজেন সংযোগ, হাইড্রোজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন অপসারণকে বলা হয় **অক্সিডেশন** (oxidation) বা **জারণ**। আবার হাইড্রোজেন সংযোগ বা অক্সিজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন যোগ হলো **রিডাকশন** (reduction) বা **বিজারণ**। বাংলায় এদেরকে জারণ (oxidation) **বিজারণ** (reduction) এনজাইম বলা হয়। যেমন- সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ।

ফসফোগ্লিসারালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ

৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড + ফসফেট ⇌ ১, ৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড

NAD → NADH + H^+

এখানে NAD **বিজারিত** হয়ে (হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে) NADH + H^+ তে পরিণত হয়েছে এবং ৩-ফসফোগ্লিসারালডিহাইড হাইড্রোজেন হারিয়ে **জারিত** (oxidized) হয়েছে।

২। ট্রান্সফারেজ (Transferase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে (যেমন NH_2) অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে।

গ্লুটামিক অ্যাসিড + অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড $\xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}}$ α- কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিড + অ্যাসপারটিক অ্যাসিড

এক্ষেত্রে গ্লুটামিক অ্যাসিড হতে NH_2 গ্রুপ অপসারিত হয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে পরিণত করেছে এবং নিজে α- কিটোগ্লুটামিক অ্যাসিডে পরিণত হয়েছে।

৩। হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেজ (Hydrolase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস করতে সহায়তা করে। সুকরেজ, প্রোটিন ফসফেটেজ, এস্টারেজ ইত্যাদি এ জাতীয় এনজাইম।

সুক্রোজ + পানি $\xrightarrow{\text{সুকরেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

৪। লাইয়েজ (Lyase) এনজাইম : এ শ্রেণির এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ও জারণ-বিজারণ ছাড়াই অন্য কোনো সাবস্ট্রেটের মূলককে ট্রান্সফার করে থাকে। এরা কার্বন-কার্বন, কার্বন-অক্সিজেন, কার্বন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি বন্ধনের ওপর কাজ করে। উদাহরণ- অ্যালডোলেজ, আইসোসাইট্রেট লাইয়েজ।

L-ম্যালেট $\xrightarrow{\text{L- ম্যালেট হাইড্রোলাইয়েজ}}$ ফিউমারেট + পানি

...মারেজ (Isomerase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম অ্যালডোজ (aldose) এবং কিটোজ (ketose) ...আইসোমেরিক পরিবর্তন সাধন করে।

$$\text{গ্লুকোজ-৬-ফসফেট} \xrightleftharpoons{\text{ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ}} \text{ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট}$$

...গেজ (Lygase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম ATP-এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্ত ...যৌগ সৃষ্টি করে। যেমন-

$$\text{গ্লুটামিক অ্যাসিড} + NH_3 + ATP \xrightleftharpoons{\text{গ্লুটামিক সিনথেটেজ}} \text{গ্লুটামিন} + ADP + Pi$$

...বক্সিলেজ (Carboxylase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে CO_2 অণু যুক্ত করতে ...পদার্থ হতে CO_2 বিযুক্ত করতে সহায়তা করে।

$$\text{অক্সালো সাকসিনিক অ্যাসিড} \xrightleftharpoons{\text{কার্বোক্সিলেজ}} \alpha\text{- কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড} + CO_2$$

...পিমারেজ (Apimerase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইমসমূহ কোনো পদার্থকে এর এপিমারে পরিণত করতে ...করে। এপিমার অণুগুলো কেবলমাত্র একটি কার্বন এটমের কনফিগারেশন দিয়ে পার্থক্যমণ্ডিত।

...ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত ...কোনো পদার্থ হতে ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে।

$$\text{গ্লুকোজ} + ATP \xrightarrow{\text{ফসফোরাইলেজ (হেক্সোকাইনেজ)}} \text{গ্লুকোজ-৬-ফসফেট} + ADP$$

(...IUB অনুসারে এনজাইম প্রধান ৬ প্রকার।)

...মের কার্যকারিতার প্রভাবকসমূহ

...তাপমাত্রা : 40° সে. এর উপরে এবং 0° সে. বা তার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা দারুণভাবে কমে ...°C – 40° C তাপমাত্রায় এনজাইমের বিক্রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি। তাই এই তাপমাত্রাকে পরম তাপমাত্রা (...temperature) বলা হয়।

...pH : অতিরিক্ত অম্ল বা অতিরিক্ত ক্ষার-এ এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। এক একটি এনজাইমের এক একটি ...অপটিমাম pH থাকে।

এনজাইম	অপটিমাম pH
পেপসিন	২.০
ইনভারটেজ	৪.৫
সেলুলায়েজ	৫.০
ইউরিয়েজ	৭.০
ট্রিপসিন	৮.০

...পানি : কোষে পরিমিত পানির উপস্থিতিতে এনজাইমের কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে। শুকনো বীজে পানি না ...এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে।

...ধাতু : কোনো কোনো ধাতুর (যেমন- Mg^{++}, Mn^{++}) উপস্থিতি এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আবার ...ধাতুর (যেমন- Ag, Zn, Cu) উপস্থিতি এনজাইমের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

...সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্ব : সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্বের ওপরও এনজাইমের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল। সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব ...এনজাইমের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং ঘনত্ব কমলে কর্মক্ষমতা কমে।

...এনজাইমের ঘনত্ব : এনজাইমের ঘনত্বের ওপরও এদের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল।

৭। প্রোডাক্ট-এর ঘনত্ব : প্রোডাক্ট-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বিক্রিয়ার হার কমে যেতে পারে।

৮। অ্যাকটিভেটর : অ্যাকটিভেটরের উপস্থিতিতে এনজাইমের বিক্রিয়ার হার বাড়ে।

৯। প্রতিরোধক (ইনহিবিটর) : এর দ্বারা এনজাইমের কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এনজাইমের কাজ : এনজাইমের প্রধান কাজ হলো জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে জীবদেহকে কর্মক্ষম রাখা। জীবদেহের গঠন ও বৃদ্ধি সবই নিয়ন্ত্রিত হয় এনজাইমের কার্যক্রম দিয়ে। জীবদেহে শক্তি সঞ্চয়ের পেছনে এনজাইম ক্রিয়াশীল, আবার শক্তি নির্গমনের পেছনেও এনজাইম ক্রিয়াশীল। এটি বিক্রিয়ার গতিকে বাড়ায় এবং বিক্রিয়ার পরে অপরিবর্তিত থাকে। স্বল্প পরিমাণ এনজাইম প্রচুর পরিমাণ সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে পরিণত করে। বিভিন্ন জটিল যৌগকে সরল যৌগে পরিণত করে। দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষ করে।

জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার

১। সেলুলেজ (Cellulase) : যে এনজাইম সেলুলোজকে হাইড্রোলাইসিস করে সেলুবায়োজ-উৎপন্ন করে তাকে সেলুলেজ বলে। উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক পদার্থ হলো সেলুলোজ। মৃত উদ্ভিদদেহ পচে না গেলে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মৃত উদ্ভিদ দিয়ে ভরা থাকত। সেলুলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এরা ক্রমান্বয়ে পচে মাটির সাথে মিশে যায়। তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় বলে তারা কাঁচা উদ্ভিদ পরিপাক করতে পারে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় না।

$$\text{সেলুলোজ} \xrightarrow{\text{সেলুলেজ}} \text{সেলুবায়োজ} \xrightarrow{\text{সেলুবায়েজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

২। প্রোটিয়েজ (Protease) : যে এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে তাকে প্রোটিয়েজ বলে। বীজের সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ভেঙে যায় এবং তা দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে প্রয়োজনানুযায়ী নতুন প্রোটিন তৈরি করে। আমরা যে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই তাও প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় হজম হয়; ফলে আমাদের দেহ গঠিত হয়। প্রোটিয়েজভুক্ত এনজাইমগুলো হচ্ছে- পেপসিন, ট্রিপসিন ও প্যাপেইন।

৩। অ্যামাইলেজ (Amylase) : স্টার্চ-এর প্রধান উপাদান হলো অ্যামাইলোজ। কোনো কোনো স্টার্চ-এর সবটুকুই অ্যামাইলোজ দিয়ে তৈরি। গ্লুকোজ একক সোজা চেইন-এর পলিমার সৃষ্টি করে স্টার্চ গঠন করে। যে এনজাইম অ্যামাইলোজের ওপর কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাকে **অ্যামাইলেজ** বলে। অ্যামাইলেজ দু'ধরনের : যথা- আলফা অ্যামাইলেজ ও বিটা অ্যামাইলেজ। α-অ্যামাইলেজ সাবস্ট্রেটকে ভেঙে প্রথমে ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। β-অ্যামাইলেজ পরে ডেক্সট্রিনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

৪। ক্যাটালেজ (Catalase) : প্রায় প্রতিটি জীবকোষেই ক্যাটালেজ এনজাইম পাওয়া যায়। এরা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) কে ভেঙে পানি (H_2O) এবং অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ H_2O_2 অণুকে বিজারিত করে পানি ও অক্সিজেন-এ রূপান্তরিত করতে পারে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$

৫। জাইমেজ (Zymase) : কতক ছত্রাক, বিশেষ করে ইস্ট (yeast) জাতীয় ছত্রাক কোষে জাইমেজ এনজাইম বিদ্যমান। জাইমেজ এনজাইম একটু জটিল প্রকৃতির। ইস্ট জাতীয় ছত্রাকে বিদ্যমান যে এনজাইম শর্করাকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2-এ পরিণত করে তাকে **জাইমেজ** বলে। অ্যালকোহল উৎপাদন ও বেকারি শিল্পে জাইমেজ এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{2C_2H_5\text{–}OH} + 2CO_2$$

দৈনন্দিন জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এনজাইমের ব্যবহার বহুবিধ। নিম্নে এনজাইমের কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

১। ফলের রস তৈরি (Preparing fruit juice) : আম, কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রস তৈরিতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এসব ফলের রস তৈরিকালে পেকটিন নামক এনজাইম ব্যবহার করলে রসের ঘোলাটে অবস্থা দূর হয় এবং রস পরিষ্কার ও স্বাদযুক্ত হয়।

২। পনির তৈরি (Making cheese) : পনির তৈরিতে এনজাইম রেনিন ব্যবহৃত হয়। রেনিন দুধের ননীকে জমাট বাঁধতে সহায়তা করে এবং পরে ননী থেকে পনির তৈরি করা হয়।

৩। কাপড়ে দাগ মোচন (Destaining of fabrics) : কাপড়ের দাগ উঠাতে আজকাল এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এতে দাগ একেবারে উঠে যায় কিন্তু কাপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না।

৪। চামড়া লোমমুক্তকরণ (Dehairing of hide) : ট্যানারিতে লেদার তৈরি করার সময় কাঁচা চামড়া থেকে লোম মুক্ত করতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫। ক্ষত নিরাময় (Wound healing) : চামড়ায় সৃষ্ট পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এক ধরনের এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৬। হজম সংশোধন (Correcting digestion) : শরীরে এনজাইমের পরিমাণ কমে গেলে হজমে সমস্যা দেখা যায়। এনজাইমের এই ঘাটতি পূরণ হলে হজমে অনিয়ম দূরীভূত হয়। পেপসিন, অ্যামাইলেজ, পেপেইন ইত্যাদি এনজাইম হজমে সহায়তা করে।

৭। জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Analyzing biochemicals) : বর্তমানে ক্লিনিক্যাল বিশ্লেষণে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। রক্তে ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড শনাক্তকরণে ইউরিয়েজ ও ইউরিকেজ নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৮। চোখের ছানির অস্ত্রোপচার (Cataract surgery) : আমেরিকার চক্ষু চিকিৎসক ড. যোসেফ স্পিনা ১৯৮০ সালে এনজাইম ট্রিপসিন প্রয়োগ করে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। ড. যোসেফ স্পিনার অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম সুঁচ দিয়ে ০.০২৫ সেমি প্রশস্ত ছিদ্র করে অন্য একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সুঁচের সাহায্যে অতি সামান্য পরিমাণ ট্রিপসিন চোখের লেন্সে প্রবেশ করেন। ট্রিপসিন চোখের অন্যান্য অংশের কোনো ক্ষতি না করে লেন্সের ঘোলা অংশ গলিয়ে ফেলে। এরপর এই সুঁচ দিয়ে টেনে ঘোলা অংশ বের করে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

৯। জমাট রক্ত গলানো (Dissolving blood clod) : মস্তিষ্ক ও ধমনীর জমাট রক্ত গলাতে ইউরোকাইনেজ নামক এনজাইমের ব্যবহারে জাপানে সফলতা পেয়েছে।

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম	কো-এনজাইম
১। প্রকৃতি	এনজাইম একটি বড় প্রোটিন অণু। অর্থাৎ প্রোটিনধর্মী।	কো-এনজাইম প্রোটিন অণুর একটি অপ্রোটিন অংশ (জৈব রাসায়নিক যৌগ)।
২। আণবিক ওজন	এনজাইমের আণবিক ওজন ১২০০০-১০,০০,০০০০ ডাল্টন।	কো-এনজাইম অংশের আণবিক ওজন অনেক কম (৫০০ ডাল্টন-এর কাছাকাছি)।
৩। কাজ	এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।	কো-এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রোটিন অংশ ব্যতীত কাজ করতে পারে না।
৪। তাপের প্রভাব	50°C–60°C তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা থাকে না। অর্থাৎ তাপে নষ্ট হয়।	কো-এনজাইমের তাপমাত্রা সহন ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই ঐ তাপমাত্রায় কো-এনজাইম অকেজো হয় না।
৫। ডায়ালাইসিস	এটি ডায়ালাইসিস করা যায় না।	এটি ডায়ালাইসিস করা যায়।
৬। ভিটামিন	কোন ভিটামিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।	অনেক ভিটামিন কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।
৭। উদাহরণ	প্রোটিয়েজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	ATP, NAD, FAD ইত্যাদি।

সার-সংক্ষেপ

কার্বোহাইড্রেট : কার্বোহাইড্রেট হলো জীবদেহের উল্লেখযোগ্য জৈব রাসায়নিক পদার্থ। কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সি... সহযোগে কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয়। কার্বোহাইড্রেটকে বাংলায় শর্করা বলা হয়। জীবদেহে শক্তির প্রধান উৎস ... কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট, যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুকরোজ (চিনি), আবার কতক কার্বোহাই... মিষ্টি নয়, যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ। কার্বোহাইড্রেটকে মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড হিসেবে ভাগ করা যায়। DNA, RNA গঠনকারী পেন্টোজ শ্যুগারও কার্বোহাইড্রেট। কোষপ্রাচীর গঠনকারী সেলুলোজও কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেট আমাদের প্রধান খাদ্য উপাদান। চাল, গম, আলু এসবই কার্বোহাইড্রেট-এর প্রধান উৎস।

অ্যামিনো অ্যাসিড : প্রোটিন (আমিষ) গঠনকারী একক হলো অ্যামিনো অ্যাসিড। অ্যামিনো অ্যাসিডে, অ্যামিনো গ্রুপ NH_2 এবং কার্বোক্সিল গ্রুপ -COOH অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। প্রধানত বিশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন অনুক্রমে সজ্জিত হয়ে জীবদেহের সকল প্রোটিন (সকল এনজাইমসহ) গঠন করে থাকে। এই প্রোটিনের মাধ্যমেই জিন ক... নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য জীবদেহে প্রকাশিত ও স্থানান্তরিত হয়।

প্রোটিন : প্রোটিনের বাংলা করা হয়েছে আমিষ। আমাদের খাদ্য তালিকায় মাছ, মাংস, ডাল রাখা হয়েছে প্রোটিনের উৎস হিসেবে, কারণ জীবদেহে প্রোটিনের উপস্থিতি অপরিহার্য। জীবদেহের DNA গঠনেও প্রোটিন প্রয়োজনীয়, সকল এনজাইমই প্রোটিন। এনজাইম না থাকলে জীবকোষের সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, প্রোটিন না থাকলে জিনের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে।

সুকরোজ : চিনি হলো সুকরোজ-এর উদাহরণ। এটি একটি ডাইস্যাকারাইড কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদদেহের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো সুকরোজ। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ মিলিতভাবে গঠন করে সুকরোজ। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ রিডিউসিং শ্যুগার হলেও সুকরোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়। পাতায় প্রস্তুত কার্বোহাইড্রেট সুকরোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$ মধুর প্রধান কাচামাল

এনজাইম : এনজাইম হলো জৈব-অনুঘটক যা জীবদেহে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজে অপরিবর্তিত থাকে। সকল এনজাইমই প্রোটিন। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এনজাইম জীবদেহে কোনো নির্দিষ্ট বিক্রিয়া বা বিক্রিয়া গ্রুপকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট। সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে বা বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে বা সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় গঠন বৈশিষ্ট্য অথবা বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে। এনজাইমের কার্যকারিতা তাপমাত্রা, pH ইত্যাদি পরিবেশীয় প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। নিচের কোনটি রিডিউসিং শ্যুগার ?

(ক) গ্লুকোজ (খ) স্টার্চ (গ) সেলুলোজ (ঘ) গ্লাইকোজেন

২। লিপিডের বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) পানির চেয়ে হালকা

(ii) হাড়ের সন্ধিস্থলে লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে

(iii) ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল দ্বারা গঠিত

প্রধান শব্দসমূহ : ভাইরাস, T₂ ফায়, ব্যাকটেরিয়া, কক্কাস, দ্বি-ভাজন, মেরোজাইগোট

চতুর্থ অধ্যায়

অণুজীব

MICRO-ORGANISM / MICROBE

যে সব জীব খুবই ক্ষুদ্রাকায় এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ভালো দেখা যায় না তাদেরকে **অণুজীব** (Microbes) বলা হয়। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, সে শাখাকে **অণুজীবতত্ত্ব বা মাইক্রোবায়োলজি** (Microbiology) বলা হয়। ব্যাক্টেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত। অণুজীববিদগণ ভাইরাসকেও অণুজীব বলতে চান। মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছ। এ অধ্যায়ে তোমরা অতি-আণুবীক্ষণিক ভাইরাস এবং আণুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
২. ব্যাকটেরিওফায ভাইরাসের সচিত্র জীবন চক্র বর্ণনা করতে পারবে।
৩. ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. কোষের আকারের ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারবে।
৫. ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
৬. ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৭. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে।
৮. **ব্যবহারিক**
১০ ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
৯. *Plasmodium vivax* (ম্যালেরিয়ার পরজীবী) এর জীবন চক্র চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
১০. মানবদেহে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর সংক্রমণ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ভাইরাস (Virus)

সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জলাতঙ্ক, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, বার্ড ফ্লু, ভাইরাল হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের কথা প্রায়ই শুনে থাকি; কখনো নিজেরাই আক্রান্ত হই। এগুলো সবই ভাইরাসঘটিত রোগ অর্থাৎ ভাইরাস দ্বারা এ রোগগুলো হয়ে থাকে। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুর (গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, ইঁদুর, মুরগি), এমনকি গাছপালারও ভাইরাসঘটিত রোগ হয়। **তাহলে ভাইরাস কী?** ভাইরাস হলো রোগসৃষ্টিকারী বস্তু। ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ হলো বিষ। ভাইরাস আকারে এতোই ছোট যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না। তাই ভাইরাসকে বলা হয় **অতি-আণুবীক্ষণিক** (ultra-microscopic); অর্থাৎ ভাইরাস হলো রোগসৃষ্টিকারী অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু। ভাইরাসের দেহ বাইরের প্রোটিন আবরণ এবং অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA অথবা RNA) এই দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। কাজেই **ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত রোগসৃষ্টিকারী অতি-আণুবীক্ষণিক সত্তা।** ভাইরাস জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় অংশ) ও প্রোটিন (আবরণ) দিয়ে গঠিত অকোষীয়, অতি-আণুবীক্ষণিক সত্তা, বাধ্যতামূলক পরজীবী জৈবকণা যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে।

ভাইরাসকে জীবাণু (বা অণুজীব) না বলে 'সত্তা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো কেন? কারণ, আমরা জানি জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত, কিন্তু ভাইরাস অকোষীয়। তাছাড়া এরা জীবদেহের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারলেও জীবদেহের বাইরে একেবারেই নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে। সত্যিকার অর্থে এরা অণুজীব নয়, অণুজীবের মতো। ভাইরাস দেহে কোষীয় বৈশিষ্ট্য তথা কোষ প্রাচীর, কোষঝিল্লি ও সাইটোপ্লাজম নেই, তাই ভাইরাসকে **অকোষীয়** বলা হয়।

আবিষ্কার : গুটিবসন্ত, পীত জ্বর ইত্যাদি ভাইরাসঘটিত রোগ পৃথিবীতে বহু আগে থেকেই ছিল কিন্তু ভাইরাস সম্বন্ধে কোনো ধারণাই মানুষের ছিল না। বিজ্ঞানী **Edward Jenner** (এডওয়ার্ড জেনার) ১৭৯৬ সালে প্রথম ভাইরাসঘটিত বসন্ত রোগের কথা উল্লেখ করেন। এরপর সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস হলো টোবাকো মোজাইক ভাইরাস অর্থাৎ TMV. হল্যান্ডের বিজ্ঞানী **Adolf Mayer** ১৮৮৬ সালে তামাক গাছের পাতার ছোপ ছোপ দাগবিশিষ্ট রোগকে টোবাকো মোজাইক রোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। পরে ১৮৯২ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী **Dmitri Ivanovsky** (দিমিত্রি আইভানোভস্কি) প্রমাণ করেন যে, রোগাক্রান্ত তামাক পাতার রস ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টার দিয়ে ফিল্টার করার পরও সুস্থ তামাক গাছে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই তিনি বলেন যে, তামাক গাছের মোজাইক রোগজীবাণু ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্ষুদ্র এবং এই রোগ-বিষকে ভাইরাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন কিন্তু কোনো ভাইরাস শনাক্ত করতে পারেননি। **তবুও তাঁকেই ভাইরাসের আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।** তারও পরে ১৮৯৮ সালে আরেক হল্যান্ড বিজ্ঞানী **Martinus Beijerinck** (মার্টিনাস বিজারিঙ্ক) তামাকের মোজাইক রোগের ভাইরাসকে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV হিসেবে উল্লেখ করেন। **Walter Reed** (ওয়াল্টার রিড) ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম মানবদেহের পীত জ্বর (yellow fever) সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী **Wendel Meredith Stanley TMV** কে পৃথক করে কেলাসিত করেন, যে কারণে তিনি ১৯৪৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। **Stanley** মোজাইক আক্রান্ত ১ টন তামাক পাতা থেকে মাত্র এক চামুচ পরিমাণ ভাইরাস কৃস্টাল সংগ্রহ করেন। ১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডের দুজন বিজ্ঞানী **F. C. Bawden** (ব্যাডেন) এবং **N. W. Pirie** (পিরি) বলেন যে, TMV নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। ১৯৫১ সালে **R. S. Shafferman** (শেফারম্যান) এবং **M. E. Morris** (মরিস) নীলাভ-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া) ধ্বংসকারী ভাইরাস সায়ানোফায আবিষ্কার করেন। ভাইরাস জড় না জীব এর সঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। কারণ ভাইরাসের দেহে জড় ও জীব উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ভাইরাসের দেহে জড় ও জীবের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী **A. M. Lwoff ১৯৫২ সালে ভাইরাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন, ভাইরাস ভাইরাসই।** এটি জীবীয় বস্তুও নয় আবার জড় রাসায়নিক বস্তুও নয়। **জীবীয় ও জড় বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো একটি কিছু।** ১৯৮৪ সালে **Gallow** (গ্যালো) মানুষের মরণব্যাধি এইডস রোগের ভাইরাস HIV আবিষ্কার করেন। ১৯৮৯ সালে **Hervey J. Alter** (হারভে জে. অল্টার) মানুষের নীরব ঘাতকব্যাধি হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস আবিষ্কার করেন। **F. C. Bawden এবং N. W. Pirie ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন।** এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ ধরনের ভাইরাসের বর্ণনা করা হয়েছে।

আবাসস্থল : উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি জীবদেহের সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করতে পারে। আবার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি প্রায় সব জড় মাধ্যমে ভাইরাস অবস্থান করে। কাজেই বলা যায়, জীব ও জড় পরিবেশ উভয়ই ভাইরাসের আবাস। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে ১ চামচ সমুদ্রের পানিতে ১ মিলিয়ন ভাইরাস থাকে। **ভাইরোলজি (Virology)** বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে ভাইরাসের আকার, গঠন, বংশবিস্তার, রোগতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। **W. M. Stanley-কে ভাইরোলজির জনক বলা হয়ে থাকে।**

আয়তন (Size) : ভাইরাস অতি-আণুবীক্ষণিক এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে দেখা যায় না। ভাইরাসের গড় ব্যাস 8–300 nm (ন্যানোমিটার)। ভাইরাস সাধারণত ১২ nm (যেমন- পোলিও ভাইরাস) হতে ৩০০ nm (যেমন-তামাকের মোজাইক ভাইরাস) পর্যন্ত হয়ে থাকে। গবাদী পশুর ফুট অ্যান্ড মাউথ রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্র (৮-১২ nm)। ভ্যাকসিনিয়া ও ভেরিওলা ভাইরাস (২৮০–৩০০ nm)। গোলআলুর মোজাইক ভাইরাস, গো-বসন্তের ভাইরাস আরও বৃহদাকৃতির হয়।

আকৃতি (Shape) : ভাইরাস সাধারণত নিম্নলিখিত আকৃতির হয়ে থাকে। দণ্ডাকার, বর্তুলাকার, ব্যাঙাচি আকার, সূত্রাকার (সিলিন্ড্রিক্যাল), গোলাকার, ডিম্বাকার, পাউরুটি আকার, বহুভুজাকৃতি প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট।

---

১ মিটার (m) = ১০০০ মিলিমিটার (mm)
১ মিলিমিটার (mm) = ১০০০ মাইক্রোমিটার (µm) বা মাইক্রন
১ মাইক্রোমিটার (µm) = ১০০০ ন্যানোমিটার (nm) বা মিলিমাইক্রন (mµ)
১ মাইক্রোমিটার (µm) = ১ মাইক্রন (µ)
১ ন্যানোমিটার (nm) = ১ মিলিমাইক্রন (mµ)

চিত্র ৪.১ : বিভিন্ন আকৃতির ভাইরাস।

ভাইরাসের প্রকৃতি (Nature of virus) : ভাইরাসের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো দ্বিধাবিভক্ত। বিজ্ঞানী Lwoff ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন- **ভাইরাস জীবও নয়, জড়বস্তুও নয়; ভাইরাস ভাইরাসই**। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়- ভাইরাস সজীব ও জড়বস্তুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের কোনো একটি সত্তা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী Stanley ও Valens বলেন- ভাইরাস এমনিতেই জড়বস্তুর ন্যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে ভাইরাস কোনো সজীব কোষকে আক্রমণ করার সুযোগ পায় সে মুহূর্তে এতে প্রাণের সঞ্চার হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী Salle বলেন–**ভাইরাস রাসায়নিক অণু ও সজীব কোষের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক প্রকার বস্তু**।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of virus) : ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-
(ক) জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং (খ) জীবীয় বৈশিষ্ট্য।

(ক) ভাইরাসের জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

১। ভাইরাস অকোষীয় ও অতি আণুবীক্ষণিক। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লি, কোষপ্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এসব নেই।
২। এদের নিজস্ব কোনো বিপাকীয় এনজাইম নেই এবং খাদ্য গ্রহণ করে না ফলে পুষ্টি ক্রিয়াও নেই।
৩। ভাইরাস জীবকোষের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজননক্ষম নয়।
৪। ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টারে ভাইরাস ফিল্টারযোগ্য নয়।
৫। ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায়, তলানিকরণ করা যায়।
৬। জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার মতো নিষ্ক্রিয়।
৭। ভাইরাসের দৈহিক বৃদ্ধি নেই এবং পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না।
৮। ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমাহার মাত্র।
৯। ভাইরাস অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ প্রতিরোধে সক্ষম এবং অ্যান্টিবায়োটিক এদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

(খ) ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য

১। পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি (multiplication) করতে পারে।
২। নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মাতৃ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস জন্ম দিতে পারে।
৩। ভাইরাসের দেহ জেনেটিক বস্তু DNA বা RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

৪। ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।

৫। ভাইরাস পরিব্যক্তি (mutation) ঘটাতে এবং প্রকরণ (variation) তৈরি করতে সক্ষম।

৬। এদের অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে।

৭। এদের জিনগত পুনর্বিন্যাস (genetic recombination) ঘটতে দেখা যায়।

প্রাণ-রসায়নবিদগণ ভাইরাসের জড়-বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন, আর অণুজীব বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসের জীব-বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রাধান্য দেন। এজন্য ভাইরাসকে জীব ও জড়ের সেতুবন্ধন বলে।

ভাইরাসের গঠন (Structure of virus) : ভাইরাসের গঠন বৈশিষ্ট্যকে ভৌত ও রাসায়নিক গঠন হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে।

ভাইরাসের ভৌত গঠন : ভাইরাসের ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

১। কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বস্তু তথা নিউক্লিক অ্যাসিড যা DNA অথবা RNA দিয়ে গঠিত (একসাথে উভয়টি নয়)।

২। কেন্দ্রীয় বস্তুকে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড তথা প্রোটিন আবরণ। ক্যাপসিডের প্রোটিন অণুর বিন্যাসই ভাইরাসের আকার-আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রোটিন অণু সজ্জিত হয়ে দণ্ডাকৃতির হেলিক্স এবং গোলাকৃতির পলিহেড্রন কাঠামো গঠন করে। ক্যাপসিড কতগুলো সাবইউনিট নিয়ে গঠিত। সাবইউনিটকে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার (capsomere)। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ও ধরন বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ক্যাপসিডের বহিস্থ আবরণ মসৃণ, কখনো কণ্টকিতও হতে পারে।

৩। কোনো কোনো ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে ক্যাপসিডকে ঘিরে অপর একটি আবরণ থাকে।

ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে ভাইরাস প্রধানত দুই প্রকার বস্তু দিয়ে গঠিত, যথা : নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) এবং প্রোটিন (ক্যাপসিড)।

১। **নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) :** ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। নির্দিষ্ট ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড DNA অথবা RNA এর যে কোনো এক ধরনের হয়। কখনো একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে না। অন্যান্য জীবদেহে একই সাথে DNA ও RNA অবস্থান করে। সাধারণত অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA এবং অধিকাংশ প্রাণী ভাইরাসে DNA থাকে।

২। **প্রোটিন (ক্যাপসিড) :** প্রোটিন অণু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। ক্যাপসিডের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করা, তবে এরা পোষক দেহে সংক্রমণেও সহায়তা করে। ক্ষেত্র বিশেষে ক্যাপসিডে প্রোটিনের সাথে লিপিড ও স্টার্চ থাকে। ক্যাপসিড ভেতরের বস্তুকে (DNA বা RNA) সুরক্ষা করে এবং এটি অ্যান্টিজেন হিসেবেও কাজ করে। সর্দিজ্বরে এটি হাঁচির উদ্রেক করে।

৩। **বহিস্থ আবরণ :** কোনো কোনো ভাইরাসে (যেমন-ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস, HIV ইত্যাদি) ক্যাপসিডের বাইরে জৈব পদার্থের একটি আবরণ থাকে। এটি রাসায়নিকভাবে সাধারণত লিপিড, লিপোপ্রোটিন, শর্করা বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত। **লিপিড বা লিপোপ্রোটিন স্তরের একককে পেপলোমিয়ার বলা হয়। লিপোপ্রোটিন আবরণবিশিষ্ট ভাইরাসকে লিপোভাইরাস বলা হয়।**

ভাইরাসের প্রকারভেদ : গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাইরাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১। **আকৃতি অনুযায়ী :** আকৃতি অনুযায়ী ভাইরাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

(i) **দণ্ডাকার (Rod-shaped) :** এদের আকার অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ- টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস।

(ii) **গোলাকার (Spherical) :** এদের আকার অনেকটা গোলাকার। উদাহরণ– পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেঙ্গু ভাইরাস।

(iii) **ঘনক্ষেত্রাকার/বহুভুজাকার (Cubical/Polygonal) :** এসব ভাইরাস দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো। যেমন- হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস।

(iv) **ব্যাঙাচি আকার (Tadpole shaped) :** এরা মাথা ও লেজ– এ দুই অংশে বিভক্ত। উদাহরণ- T_2, T_4, T_6 ইত্যাদি।

(v) **সিলিন্ড্রিক্যাল/সূত্রাকার (Cylindrical/Thread shaped) :** এদের আকার লম্বা সিলিন্ডারের মতো। যেমন- Ebola virus ও মটরের স্ট্রিক ভাইরাস।

(vi) **ডিম্বাকার (Oval shaped) :** এরা অনেকটা ডিম্বাকার। উদাহরণ- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

২। **নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী** : নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরন অনুযায়ী ভাইরাস দু' প্রকার; যথা : (i) DNA ভাইরাস এবং (ii) RNA ভাইরাস।

(i) **DNA ভাইরাস** : যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে DNA থাকে তাদেরকে **DNA ভাইরাস** বলা হয়। উদাহরণ- T_2 ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridiscent Virus), এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস। **Parvoviridae** গোত্রের (ϕX_{174} ও M_{13} কলিফায) ভাইরাসের DNA একসূত্রক।

(ii) **RNA ভাইরাস** : যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে RNA থাকে তাদেরকে **RNA ভাইরাস** বলা হয়। উদাহরণ- TMV, HIV, ডেঙ্গু, পোলিও, মাম্পস, র‍্যাবিস ইত্যাদি ভাইরাস। **Reoviridae** গোত্রের (রিওভাইরাস, ধানের বামন রোগের ভাইরাস) ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।

৩। **বহিস্থ আবরণ অনুযায়ী** ভাইরাস দুই প্রকার; যথা : (i) বহিস্থ আবরণহীন ভাইরাস; যেমন– TMV, T_2 ভাইরাস; (ii) বহিস্থ আবরণী ভাইরাস; যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস, HIV ভাইরাস।

৪। পোষকদেহ অনুসারে ভাইরাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে :

(i) **উদ্ভিদ ভাইরাস** : উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে **উদ্ভিদ ভাইরাস** বলে। যেমন– TMV, Bean Yellow Virus (BYV)। ব্যতিক্রম–ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস (DNA)।

(ii) **প্রাণী ভাইরাস** : প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে **প্রাণী ভাইরাস** বলে। যেমন–HIV, ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস।

(iii) **ব্যাকটেরিওফায বা ফায ভাইরাস** : ভাইরাস যখন ব্যাক্টেরিয়ার উপর পরজীবী হয় এবং ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে তখন তাকে ব্যাকটেরিওফায বলে। যেমন- T_2 , T_4, T_6 ব্যাকটেরিওফায।

(iv) **সায়ানোফায** : সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ধ্বংসকারী ভাইরাসকে সায়ানোফায বলে। যেমন–LPP_1, LPP_2 (*Lyngbya, Plectonema* ও *Phormidium* নামক সায়ানোব্যাকটেরিয়ার প্রথম অক্ষর দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে।)

৫। পোষক দেহে কীভাবে সংক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি করে তার উপর ভিত্তি করেও ভাগ করা হয়। যেমন-সাধারণ ভাইরাস ও রিট্রোভাইরাস। HIV একটি রিট্রোভাইরাস। এখানে ভাইরাল RNA থেকে DNA তৈরি হয়।

৬। **অন্যান্য ধরন** : যে সব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে থাকে তাদের মাইকোফায (Mycophage) বলে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে Holmes ব্যাক্টেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phaginae, উদ্ভিদ আক্রমণকারী ভাইরাসকে Phytophaginae এবং প্রাণী আক্রমণকারী ভাইরাসকে Zoophaginae নামকরণ করেন।

RNA ভাইরাস ও DNA ভাইরাস এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	RNA ভাইরাস	DNA ভাইরাস
১। আকৃতি	এরা সাধারণত দণ্ডাকার বা সূত্রাকার।	এরা সাধারণত গোলাকার, ব্যাঙাচি আকার ও পাউরুটি আকৃতি।
২। নিউক্লিক অ্যাসিড	এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কোর RNA	এদের নিউক্লিক অ্যাসিড কোর DNA
৩। আক্রান্ত জীব	অধিকাংশে উদ্ভিদ ভাইরাস ও সায়ানোফাযগুলো RNA ভাইরাস।	অধিকাংশে প্রাণী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিও-ফাযগুলো DNA ভাইরাস।
৪। সূত্রক	অধিকাংশে ভাইরাসের RNA একসূত্রক; ধানের বামন রোগ ও রিও ভাইরাসের RNA দ্বিসূত্রক।	অধিকাংশে ভাইরাসের DNA দ্বিসূত্রক; ϕX_{174} ও M_{13} কলিফায ভাইরাসের DNA একসূত্রক।
৫। রোগ সৃষ্টি	অধিকাংশে RNA ভাইরাস উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি করে।	অধিকাংশে DNA ভাইরাস প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টি করে।
৬। এনভেলপ	সাধারণত এনভেলপ থাকে না।	ক্যাপসিডের বাইরে সাধারণত এনভেলপ থাকে।
৭। উদাহরণ	টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, (TMV), পটেটো X ভাইরাস, সুগারকেন মোজাইক, টারনিপ মোজাইক, আলফা-আলফা মোজাইক, রেবিস, মানুষের পোলিও, ডেঙ্গু, পীত জ্বর, মাম্পস, মিজল্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা-B, এনসেফালাইটিস ইত্যাদি ভাইরাস RNA ভাইরাস।	T_2 ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV (Tipula Iridescent Virus), এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি ভাইরাস DNA ভাইরাস।

ভাইরাসের পরজীবিতা (Parasitism of virus) : পরজীবী হিসেবে বেঁচে থাকার চরিত্রকে পরজীবিতা বলে। ভাইরাস বাধ্যতামূলক পরজীবী (obligate parasite)। এটি একটি আদি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ভাইরাস তার বংশবৃদ্ধি তথা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যজীবের সজীব কোষের ওপর নির্ভরশীল। অন্য কোনো জীবের (মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ইত্যাদি) সজীব কোষ ছাড়া কোনো ভাইরাসই জীবের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে না, বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কোনো আবাদ মাধ্যমে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি করা বিজ্ঞানীদের পক্ষেও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

ভাইরাসের পরজীবিতা সাধারণত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রকারের ভাইরাস কোনো সুনির্দিষ্ট জীবদেহে পরজীবী হয়। যে সব ভাইরাস আদি কোষকে আক্রমণ করে, আর যে সব ভাইরাস প্রকৃত কোষকে আক্রমণ করে তারা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাইরাসের প্রোটিন আবরণটিই নির্ণয় করে তার আক্রমণের সুনির্দিষ্টতা (specificity)। পোষক কোষে কোনো ভাইরাস- প্রোটিনের জন্য **রিসেপ্টর সাইট** (receptor site) থাকলে তবেই ঐ ভাইরাস ঐ পোষক কোষকে আক্রমণ করতে পারবে। এ জন্যই ঠান্ডা লাগার ভাইরাস (cold virus) শ্বাসতন্ত্রের মিউকাস মেমব্রেন কোষকে আক্রমণ করতে পারে, চিকেন পক্স ভাইরাস ত্বক কোষকে আক্রমণ করতে পারে, পোলিও ভাইরাস উর্ধ্বতন শ্বাসনালী ও অন্ত্রের আবরণ কোষ, কখনো স্নায়ু কোষকে আক্রমণ করতে পারে। চিকেন পক্স ভাইরাস শ্বাসনালীকে আক্রমণ করতে পারবে না। কারণ শ্বাসনালী কোষে এর জন্য কোনো রিসেপ্টর সাইট নেই, ঠান্ডা লাগার ভাইরাস ত্বক কোষকে আক্রমণ করতে পারবে না, কারণ ত্বক কোষে এই ভাইরাসের জন্য কোনো রিসেপ্টর সাইট নেই।

ফায ভাইরাস কেবল ব্যাকটেরিয়া কোষকেই আক্রমণ করে। ফায ভাইরাসের মধ্যে T_2-ব্যাকটেরিওফায *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকেই আক্রমণ করে। TMV ভাইরাস কেবল তামাক গাছকেই আক্রমণ করে। এমনই ভাবে সুনির্দিষ্ট ভাইরাস সুনির্দিষ্ট প্রকার পোষক কোষকেই আক্রমণ করে থাকে।

ইমার্জিং ভাইরাস (Emerging virus) : ভাইরাসের পরজীবীতা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কিন্তু কিছু কিছু ভাইরাস কখনো কখনো স্বাভাবিক পোষক প্রজাতি থেকে সম্পর্কহীন অন্য পোষক প্রজাতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফ্লু (Flu) বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকৃত পোষক ছিল পাখি যা পরবর্তীতে সরাসরি মানুষে রোগ বিস্তার করে। ১৯১৮-১৯১৯ সালে পৃথিবীতে ২১ মিলিয়নের বেশি মানুষ এই ফ্লুতে মারা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা HIV-এর প্রকৃত পোষক বানর, যা পরে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। **আদি পোষক থেকে পরে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টিকারী এসব ভাইরাসকে বলা হয় ইমার্জিং ভাইরাস** (emerging virus)। উদাহরণ– HIV, SARS, Nile virus, Ebola.

ভিরিয়ন (Virion) : নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে ভিরিয়ন বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিয়োক্যাপসিড। প্রতিটি ভিরিয়নে সর্বোচ্চ ২০০০ হতে ২১৩০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে।

ভিরয়েডস (Viroids) : ভিরয়েডস হলো সংক্রামক RNA। Theodore Diener (US এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট) এবং W. S. Rayner ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভিরয়েডস আবিষ্কার করেন। **ভিরয়েডস হলো এক সূত্রক বৃত্তাকার RNA অণু যা কয়েক শত নিউক্লিয়োটাইড নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকেও বহুগুণে ক্ষুদ্র।** কেবলমাত্র উদ্ভিদেই ভিরয়েডস পাওয়া যায়। এরা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদে এবং মাতৃ উদ্ভিদ থেকে সন্তান সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ পোষকের এনজাইম ব্যবহার করে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানীগণ এখন ধারণা করছেন হেপাটাইটিস-ডি এর কারণ ভিরয়েডস। ভিরয়েড নারিকেল গাছে ক্যাডাং রোগ তৈরি করে।

প্রিয়নস (Prions) : সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল হলো প্রিয়নস। এটি নিউক্লিক অ্যাসিডবিহীন প্রোটিন আবরণ মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের Kuru এবং Creutzfeldt রোগ; ভেড়া ও ছাগলের Scrapie রোগ প্রিয়নস দিয়ে হয়ে থাকে। বহুল আলোচিত 'ম্যাড কাউ' রোগ সৃষ্টির সাথে প্রিয়নস-এর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। ১৯৮২ সালে প্রথম Stanley B. Prusiner অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির প্রিয়নস এর অস্তিত্বের কথা বলেন এবং ভেড়ার স্ক্র্যাপি (Scrapie) রোগে প্রথম পর্যবেক্ষণ (study) করা হয়। এজন্য তাকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ভাইরাসের গঠন

১। **টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা TMV (Tobacco Mosaic Virus)** : এটি দণ্ডাকৃতির ভাইরাস। এটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রায় ১৭ গুণ। TMV এর দৈর্ঘ্য ২৮০ nm–৩০০ nm এবং প্রস্থ ১৫ nm–১৮ nm। RNA এবং প্রোটিন দিয়ে TMV গঠিত। এর বাইরে একটি পুরু প্রোটিন আবরণ আছে। প্রোটিন আবরণকে ক্যাপসিড বলে। ক্যাপসিড বহু উপ-

একক দ্বারা গঠিত। উপ একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে। ক্যাপসোমিয়ার কতগুলো আঙ্গুরের থোকার ন্যায় পরপর সজ্জিত থাকে। TMV-তে প্রায় ২১৩০–২২০০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে। প্রতিটি ক্যাপসোমিয়ারে ১৫৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ক্যাপসিডের অভ্যন্তরে একসূত্রক RNA কোর (core) আছে। RNA সূত্রটি ৬৫০০টি নিউক্লিয়োটাইড দ্বারা গঠিত। ওজন হিসেবে এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন। TMV এর আণবিক ওজন ৩৭ মিলিয়ন ডাল্টন এবং RNA এর আণবিক ওজন ২.৪ মিলিয়ন ডাল্টন। প্রত্যেকটি প্রোটিন সাবইউনিটের আণবিক ওজন ১৭০০০ ডাল্টন।

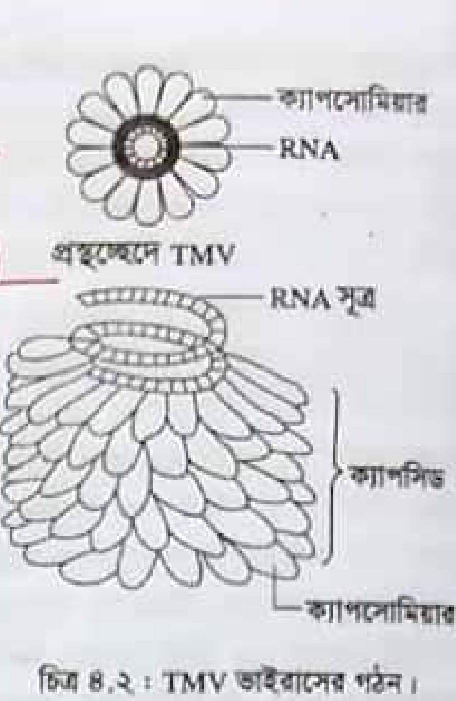

চিত্র ৪.২ : TMV ভাইরাসের গঠন।

ফায কী? ফায (Phage) একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো 'to eat' বা ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায হলো ঐ সব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। ফায-এর জেনেটিক বস্তু ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং একসময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। **যে সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায বলে।** ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী দ্য হেরেলি ফেলিক্স (d' Herelle Felix) এ ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফায বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফায নামে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানী Twort ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস তথা T_2 আবিষ্কার করেন।

২। **T_2 ব্যাকটেরিওফায (T_2 Bacteriophage) :** এটি একটি সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। এর গঠন সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানা গেছে। T_2 ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা চলে, যথা : মাথা এবং লেজ।

মাথা: মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির প্রিজমের ন্যায় এবং প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০nm এবং প্রস্থ ৬৫nm। থলি আকৃতির এ স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে এই DNA গঠিত। এতে প্রায় ১৫০টি জিন থাকে। মাথার অধিকাংশ স্থানই ফাঁপা বলে মনে হয়। T_2 ফাযের DNA দ্বিসূত্রক এবং মোট ওজনের প্রায় ৫০%।

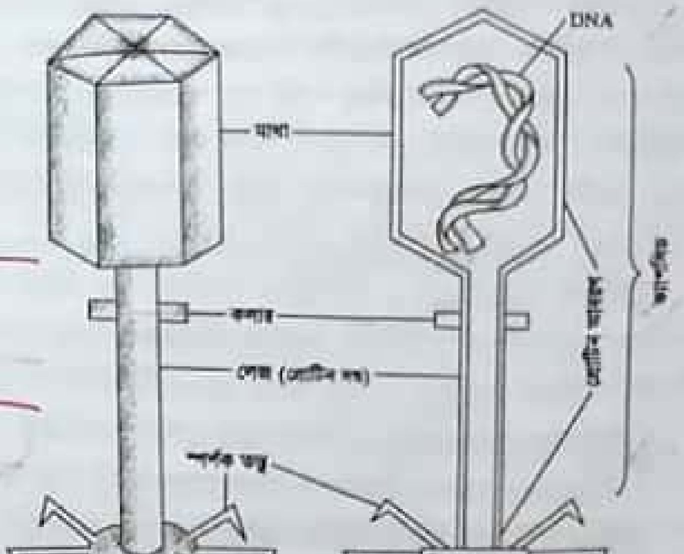

চিত্র ৪.৩ : T_2 ব্যাকটেরিওফায এর গঠন। (ক) পূর্ণাঙ্গ গঠন, (খ) লম্বচ্ছেদ।

লেজ : মাথার পেছনে সরু অংশটির নাম লেজ। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে এবং লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের মতো। এর অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে ১টি বেসপ্লেট, কাঁটার মতো কয়েকটি স্পাইক এবং ছয়টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। এতে নিউক্লিয়াস, কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম, কোষ প্রাচীর ও অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ, ইত্যাদি নেই।

ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (Replication of virus) : বিশেষ উপায়ে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে থাকে এবং প্রতিটি নতুন ভাইরাস দেখতে হুবহু একই রকম হয়। একটি পরিপূর্ণ ভাইরাস কখনো পূর্বস্থিত (Pre existing) কোনো ভাইরাস থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয় না। এছাড়া ভাইরাস অকোষীয় অর্থাৎ এরা সত্যিকার অর্থে জীব নয়। তাই নতুন ভাইরাস সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে জীবন চক্র বলা হয় না, বলা হয় সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া। ব্যাকটেরিওফায-এর সংখ্যাবৃদ্ধি দু'ভাবে ঘটে থাকে; যথা (ক) লাইটিক চক্র বা ভাইরুলেন্ট চক্র এবং (খ) লাইসোজেনিক চক্র বা টেমপারেট দশা। T-সিরিজভুক্ত ফাযে অর্থাৎ T_2, T_4, T_6 ইত্যাদিতে লাইটিক চক্র ঘটে এবং ল্যামডা ফায (λ-Phage)-এ লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন হয়। নিচে এ দু'ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(ক) লাইটিক চক্র (Lytic cycle) : যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো পোষক দেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তাকে **লাইটিক চক্র** বা **বিগলনকারী চক্র** বলে। *Escherichia coli (E. coli)* নামক ব্যাকটেরিয়া কোষে T_2 ব্যাকটেরিওফাযের লাইটিক চক্র নিম্নলিখিত ধাপসমূহে সংঘটিত হয়।

ধাপ-১ : সংযুক্তি বা পৃষ্ঠলগ্নীভবন (Attachment / Landing) : T_2-ব্যাকটেরিওফায সাধারণত *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে থাকে। *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরে ফাযপ্রোটিনের জন্য **রিসেপ্টর সাইট** (receptor site) থাকে। রিসেপ্টর সাইটের প্রোটিনের সাথে ফায ক্যাপসিডের স্পর্শক তন্তুর প্রোটিনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে T_2-ফায দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হলো আক্রমণের সূচনা।

চিত্র ৪.৪ : T_2 ব্যাকটেরিওফায-এর লাইটিক চক্র।

ধাপ-২ : ফায DNA অণু প্রবেশ (Penetration) : ব্যাকটেরিওফাযের দণ্ডাকৃতি লেজটি সংকুচিত হয়ে বিশেষ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংযোগ স্থানের প্রাচীরে ছিদ্র তৈরি করে এবং ফায-DNA কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ মেমব্রেন ভেদ করে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করিয়ে দেয়। শূন্য প্রোটিন আবরণটি বাইরেই থেকে যায়। [আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী অনেক ভাইরাসের সম্পূর্ণ দেহটিই পোষক কোষে প্রবেশ করে। পরে পোষক কোষের এনজাইম প্রোটিন আবরণটিকে বিগলিত করে ফেলে এবং ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) মুক্ত হয়। এসব ক্ষেত্রে লাইটিক চক্র ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।]

ধাপ-৩ : অনুলিপন (Replication) : ফায DNA পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর তার নিজস্ব প্রোমোটার সিকুয়েন্স দ্বারা পোষক কোষের RNA পলিমারেজকে আকৃষ্ট করে। পোষক কোষের RNA পলিমারেজ ব্যবহার করে ফায mRNA তৈরি করে। ফায mRNA পরে প্রোটিন তৈরি করে এবং একটি বিশেষ প্রোটিন (প্রকৃতপক্ষে এনজাইম) *E. coli* DNA-কে খণ্ড বিখণ্ড করে নষ্ট করে দেয়। কাজেই পোষক কোষে ফায DNA-এর কোনো প্রতিযোগী থাকে না। ফায DNA নিউক্লিয়োটাইড (*E. coli* কোষের বিগলিত DNA থেকে মুক্ত হওয়া) কোষের রাইবোসোম, tRNA, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং নিজের ইচ্ছেমতো নতুন ফায DNA প্রতিলিপন করে নেয় এবং ফায কোটি

স্পর্শক তন্তু, স্পাইক ইত্যাদি অংশ হিসেবে পৃথক
প্রোটিন (coat protein) তৈরি করে। কোট প্রোটিন মাথা, লম্বা লেজ, পৃথকভাবে তৈরি হয়।

ধাপ-৪ : বিভিন্ন দেহাংশে একত্রিত হওয়া (Assemble) : পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রতিটি ফায DNA এক কোট প্রোটিনের মাথার অংশে প্রবেশ করে। পরে ক্রমান্বয়ে মাথার অংশের সাথে লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে স্পর্শক তন্তু স্পাইক ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিওফায হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ধাপ-৫ : নতুন ভাইরাস মুক্তি (Release) : পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যক ব্যাকটেরিওফায তৈরি হওয়ার পর ফায একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইম তৈরি করে যার কার্যকারিতায় পোষক কোষের প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং নতুন ব্যাকটেরিওফাযসমূহ মুক্তভাবে বেরিয়ে আসে। মুক্ত হওয়া প্রতিটি ফায একটি নতুন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামকে আক্রমণ করতে সক্ষম। পোষক কোষে বংশগতীয় বস্তু প্রবেশের পর ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং পোষক কোষ থেকে অনেকগুলো ভিরিয়ন মুক্ত হয়। ভাইরাসের এ ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে **লাইটিক চক্র** বলে। যেমন-*E. coli* আক্রমণকারী T_2- ফায। এমন প্রকৃতির ফাযকে **লাইটিক ফায বা ভিরুলেন্ট ফায** (virulent phage) বলে। কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ হওয়াকে **লাইসিস** (Lysis) বা বিগলন বলে। লাইটিক চক্রের মাধ্যমে মাত্র ৩০ মিনিটে প্রায় ৩০০টি নতুন ফায সৃষ্টি হয়ে থাকে। নির্গত নতুন ফায নতুন পোষক কোষে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

পোষক ব্যাক্টেরিয়াকে আক্রমণ করার পর থেকে যে সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ অপত্য ভাইরাস সৃষ্টি না হয় সেই সময় কালকেই **ইকলিপস কাল** বলে।

চিত্র ৪.৫ : লাইসোজেনিক চক্র

(খ) লাইসোজেনিক চক্র (Lysogenic cycle) : যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশের পর ভাইরাল DNA-টি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ব্যাকটেরিয়াল DNA-র সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ বা লাইসিস ঘটিয়ে মুক্ত হয় না তাকে **লাইসোজেনিক চক্র** বলে। ল্যামডা ফায (λ-ফায), P_1 ফায, M_{13} ফায ইত্যাদি ভাইরাস *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া কোষে লাইসোজেনিক চক্র সম্পন্ন করে। এ ধরনের চক্রে ফায ভাইরাস পোষক কোষকে ধ্বংস না করেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। লাইসোজেনিক চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১। পোষক ব্যাকটেরিয়ায় সংযুক্তি এবং ফায DNA-এর অনুপ্রবেশ : লাইটিক চক্রের মতোই প্রথমে ফায ভাইরাস পোষক কোষপ্রাচীরকে ছিদ্র করে DNA অণুকে পোষক কোষে প্রবিষ্ট করায় এবং শূন্য প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরে থেকে যায়।

২। ব্যাকটেরিয়া DNA এর সঙ্গে ভাইরাস DNA এর সংযুক্তি : এ পর্যায়ে **নিউক্লিয়েজ** এনজাইম ব্যাকটেরিয়া DNA-কে একটি জায়গায় কেটে ফেলে। এই কাটা স্থানে ফায DNA-টি গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ ধরনের সংযুক্তিতে ইন্টি... এনজাইম বিশেষ ভূমিকা রাখে। ব্যাকটেরিয়ার DNA-র সঙ্গে সংযুক্ত ভাইরাস DNA-টিকে **প্রোফায** (prophage) ... এটি ব্যাকটেরিয়ায় সুপ্তাবস্থায় থাকে। ফায DNAসহ *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার **জিনোম** একসাথে একটি নতুন জিনোম তৈরি ... প্রত্যেকবার সংখ্যাবৃদ্ধির সময় ব্যাকটেরিয়াল DNA-এর অনুরূপ ভাইরাল DNA অণুটিরও প্রতিলিপি গঠিত হবে ... এভাবে প্রতিটি অপত্য ব্যাকটেরিয়ায় ভাইরাস DNA-র একটি কপি সংযুক্ত হতে থাকে। তবে প্রয়োজন হলে ... DNA থেকে ফায DNA পৃথক হয়ে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
১। গঠনগত	এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ও ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটিয়ে থাকে।	এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA অণুটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে অনুলিপি গঠন করে।
২। বিদারণ	পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয়।	পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদারিত হয় না।
৩। বিভিন্ন সিরিজ	T-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইটিক চক্র দেখা যায়।	λ (ল্যামডা)-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইসোজেনিক চক্র দেখা যায়।
৪। সৃষ্টি	লাইটিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয়।	লাইসোজেনিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে মাত্র দুটি ভাইরাস জিনোমযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।
৫। নিয়ন্ত্রণ	এ চক্রে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ভাইরাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	এ চক্রে ভাইরাসের DNA এর সংখ্যাবৃদ্ধি পোষক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৬। প্রোফাজ গঠন	গঠিত হয় না।	গঠিত হয়।
৭। আক্রমণের তীব্রতা	আক্রমণের প্রকৃতি তীব্র বা ভিরুলেন্ট	পোষক কোষের মৃত্যু ঘটে না তাই আক্রমণ মৃদু বা টেম্পারেট।

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Viruses) : মানবকুলের জন্য ভাইরাস যত না উপকারী তার চেয়ে বেশি অপকারী। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ভাইরাসের অপকারিতা : ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। যেমন–

১। ভাইরাস মানবদেহে বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস, ক্যাপোসি সার্কোমা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২। বিভিন্ন উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিতে যেমন-সিমের মোজাইক রোগ, আলুর লিফরোল (পাতা কুঁচকাইয়া যাওয়া), পেঁপের লিফকার্ল, ক্লোরোসিস, ধানের টুংরো রোগসহ প্রায় ৩০০ উদ্ভিদ রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে। এতে ফসলের উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পায়।

৩। গরুর বসন্ত; গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর 'ফুট এ্যান্ড মাউথ' রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ (খুরারোগ) এবং মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের দেহে জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগ ভাইরাস দিয়েই সৃষ্টি হয়।

৪। ফায ভাইরাস মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও ধ্বংস করে থাকে।

৫। বহুল আলোচিত 'এইডস্' রোগের কারণ হিসেবেও বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসকে দায়ী করেছেন। HIV (Human Immunodeficiency Virus) দিয়ে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome বা Acquired Immuno Deficiency Syndrome) রোগ হয়। AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (হ্রাস) Syndrome (অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। **অর্থাৎ বিশেষ কোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস বা কমে যাওয়াকে এইড্স (AIDS) বলে।** HIV দিয়ে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে রোগীর অকাল মৃত্যু অবধারিত। বাংলাদেশে ক্রমেই এইডস্ রোগীর সংখ্যা এবং এ রোগে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

৬। **ইবোলা ভাইরাস (Ebola virus) :** ইবোলা ভাইরাস একসূত্রক RNA দ্বারা গঠিত। আফ্রিকার জায়ার-এ Ebola virus-এর আক্রমণে মহামারী দেখা দেয়। Ebola ভাইরাসের আক্রমণে দেহের কোষ ফেটে যায়। Ebola একটি মারাত্মক মারণ ভাইরাস। এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে আফ্রিকার কঙ্গোর ইবোলা নদীর তীরে প্রথম এক কৃষক মারা

যায়। উক্ত রোগী মারা গিয়েছিল চোখ, নাক, কান ও গলায় রক্তক্ষরণ হয়ে। তখন উক্ত নদীর নামানুসারে ঐ ভাইরাসের নামকরণ করা হয়েছিল ইবোলা ভাইরাস। স্পর্শের মাধ্যমেই নতুন ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত হওয়ার ২-২১ দিনের মধ্যে রোগীতে লক্ষণ প্রকাশ পায়। ২০১৪ সালের শেষ এবং ২০১৫ সালের ১ম প্রান্তে পশ্চিম আফ্রিকার গিনি, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মহামারী আকারে ইবোলা ছড়িয়ে পরে এবং ২৫০ স্বাস্থ্যকর্মীসহ প্রায় এগারো হাজার লোক মারা যায়। এর ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

৭। **জিকা ভাইরাস (Zika virus) :** জিকা ভাইরাস একটি ফ্লাভিভাইরাস। এটি Flaviviridae গোত্রের একটি RNA ভাইরাস যা ১৯৫২ সালে বানরের রক্ত এবং ১৯৫৪ সালে নাইজেরিয়ায় মানুষের দেহ থেকে পৃথক করা হয়।। ১৯৪৭ সালে উগান্ডার Zika Forest-এ বসবাসকারী রেসাস বানরের দেহে এ ভাইরাস প্রথম ধরা পরে। উগান্ডার ভাষায় Zika অর্থ Overgrown। বর্তমানে *Aedes aegypti, A. albopictus* মশকীর মাধ্যমে এই ভাইরাস সম্প্রতি ব্রাজিলসহ লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে মৃত্যু হার কম কারণ এর দ্বারা সাধারণত মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি আক্রান্ত হয় না। এটি ছোঁয়াচে রোগ নয়। জিকাবাহী মশকী উড়ে একদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেতে পারে, তাই এটি একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকার-প্রতিরোধ ডেঙ্গুর মতোই। এ ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে সামান্য জ্বর, র‍্যাশ, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, চক্ষু লাল হওয়া, মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, দেহে ফুসকুড়ি ওঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। গর্ভবতী নারীদের দেহে জিকার সংক্রমণ হলে নবজাতক শিশু অপেক্ষাকৃত ছোট আর অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়। চিকিৎসকের ভাষায় এ ত্রুটিকে মাইক্রোসেফালি বলা হয়। ব্রাজিলে সম্প্রতি এ ত্রুটিযুক্ত নবজাতক জন্মানোর তথ্য সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে।

জিকার সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো। এই অঞ্চলে এরই মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাসটি। এছাড়া আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অধিবাসীরাও সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় ৬৭ বছর বয়সী এক মহিলার রক্তে জিকা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পুয়ের্তো রিকো অঞ্চলে জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০ জন রোগীর মধ্যে প্রথম একজন রোগী ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৮। **নিপা ভাইরাস (Nipah virus) :** নিপা ভাইরাস Paramyxoviridae পরিবারভুক্ত একটি RNA ভাইরাস যার গণ নাম *Henipavirus*. ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় শূকরের খামারে প্রথম ধরা পড়লেও দ্রুত দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পরে। বাদুর এই ভাইরাসটির বাহক এবং কাঁচা খেজুরের রসের মাধ্যমে এ ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত (অনুপ্রবেশ) হয়। এ ভাইরাসের আক্রমণে শ্বসন জটিলতায় মানুষসহ গৃহপালিত পশুপাখির মৃত্যু ঘটে।

৯। সম্প্রতি SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ভাইরাসের কারণে চীন, তাইওয়ান, কানাডা প্রভৃতি দেশে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। MERS (Middle East Respiratory Syndrome) ভাইরাসও একটি মারাত্মক ভাইরাস।

১০। বার্ড ফ্লু-একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বার্ড ফ্লু মহামারী আকারে হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছরই হাজার হাজার মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা H_5N_1 (Hemaglutinin types-5–Neuraminidase type-1) ভাইরাসের আক্রমণে হাঁস-মুরগিতে বার্ড ফ্লু নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় যা পোল্ট্রি শিল্পকে ধ্বংস করে।

১১। সোয়াইন ফ্লু- Swine Influenza virus (SIV) দ্বারা সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সোয়াইন ফ্লু শনাক্ত করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের Subtype H_5N_1 ও H_1N_1 (Hemaglutinin type-1–Neuraminidase type-1)-এর কারণে এই ফ্লু ঘটে থাকে। এ ভাইরাস দ্বারা মানুষ ও শূকর আক্রান্ত হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ভারতে বহু লোক (২১০০) মারা যায় এবং ৩৪,০০০ মানুষ আক্রান্ত হয়। বিশ্বায়নের যুগে এ রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটেছে মেক্সিকো থেকে সারা বিশ্বে।

১২। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দিয়ে মানুষের লিভার ক্যান্সার, পেপিলোমা ভাইরাস দিয়ে এনোজেনিটাল (জরায়ুর মুখ) ক্যান্সার, হার্পিস সিমপ্লেক্স দিয়ে ক্যাপোসি সার্কোমা ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৩। মানুষের অসুস্থ হওয়ার একটি সাধারণ কারণ হলো সর্দিজ্বর (common cold)। **বিভিন্ন প্রকৃতির অনেকগুলো ভাইরাস এর জন্য দায়ী; তাই এর জন্য কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।**

১৪। চিকুনগুনিয়া (Chikungunya) : এটি এক প্রকার RNA ভাইরাসজনিত জ্বর। এ ভাইরাস α গোত্রভুক্ত। *Aedes aegypti* এবং *A. albopictus* মশকী দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে এ রোগ ছড়ায়। এ ভাইরাসটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৫২ সালে আফ্রিকার তানজানিয়ায়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। ২০১৭ সালে এপ্রিল-মে মাসে বাংলাদেশে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা যায়। এ রোগে উচ্চ জ্বর, জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, শরীরে র‍্যাশ ওঠা, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অনেকের জ্বর কমে গেলেও ব্যথা ৩–৪ মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

১৫। হিউম্যান হার্পিস ভাইরাসেস : এটি *Rhadino* গণের এবং DNA ভাইরাস। এর দ্বারা ক্যাপোসি সারকোমা (HIV সম্পর্কীত রোগীদের ত্বক ক্যান্সার) রোগ হয়।

ভাইরাসের উপকারিতা : বিজ্ঞানিগণ ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন :

১। বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।

২। ভাইরাস হতে 'জন্ডিস' রোগের টিকা তৈরি করা হয়।

৩। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।

৪। ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত 'জেনেটিক প্রকৌশল'-এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫। ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।

৬। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। যুক্তরাষ্ট্রে NPV (Nuclear Polyhydrosis Virus) কে কীট পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

৭। ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে।

৮। **টিউলিপ ফুল :** লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়ে। একে **ব্রোকেন টিউলিপ** বলে। এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ফুলের মূল্য বেড়ে যায়।

৯। অস্ট্রেলিয়ার খরগোসের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ফসলের চরম ক্ষতি হচ্ছিল। Myxovirus-এর সাহায্যে খরগোস নিধন করে তাদের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণ : ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণের দুটি উপায় আছে, যথা (১) ভ্যাক্সিনেশন বা টিকা প্রদান। এর মাধ্যমে মানব দেহের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করা হয়। টিকা প্রদান হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা (prevention), (২) অ্যান্টিভাইরাল ঔষধ যা দিয়ে রোগের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়। ইন্টারফেরন একটি অ্যান্টিভাইরাস ড্রাগ। অনেক উদ্ভিদেও অ্যান্টিভাইরাল উপাদান আছে। **ইন্টারফেরন ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে।**

ভাইরাস দেহে কোনো মেটাবলিজমের ব্যবস্থা নেই, তাই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এটি প্রতিরোধ করা যায় না। কিছু ভাইরাল এনজাইমকে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

কয়েকটি উদ্ভিদ ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম

সৃষ্ট রোগের নাম	পোষকদেহ	ভাইরাসের নাম
তামাকের মোজাইক রোগ	তামাক	টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus)
সিমের মোজাইক রোগ	সিম	বীন মোজাইক ভাইরাস (Bean Mosaic Virus)
টমেটোর বুশিস্টান্ট রোগ	টমেটো	বুশিস্টান্ট ভাইরাস (Bushystant Virus)
ধানের টুংরো রোগ	ধান	টুংরো ভাইরাস (Tungro Virus)
কলার বানচি টপ রোগ	কলা	বানচি টপ ভাইরাস (Banchy Top Virus)
গোলআলুর মোজাইক রোগ	গোলআলু	পটাটো মোজাইক ভাইরাস (Potato Mosaic Virus)

কয়েকটি প্রাণী ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম

পশু রোগের নাম	পোষকদেহ	ভাইরাসের নাম
AIDS (রোগের নয়, লক্ষণ সমষ্টি)	মানুষ	HIV ভাইরাস
ডেঙ্গু/ডেঙ্গী জ্বর	মানুষ	ফ্লাভি ভাইরাস (Flavi virus)
বার্ড ফ্লু	হাঁস-মুরগি, পাখি	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_5N_1) ভাইরাস
চিকুনগুনিয়া	মানুষ	চিকুনগুনিয়া ভাইরাস
Swine flue	মানুষ, শূকর	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_1N_1) ভাইরাস
SARS	মানুষ	Nipah virus
জলাতঙ্ক	মানুষ	র‍্যাবিস ভাইরাস (Rabis virus)
গুটি বসন্ত (small pox)	মানুষ	ভেরিওলা ভাইরাস (Variola virus)
জলবসন্ত (chicken pox)	মানুষ, পশুপাখি	Varicella-Zoster virus
ভাইরাল নিউমোনিয়া	মানুষ	Adeno virus
কোষের লাইসিস (lysis)	মানুষ	Ebola virus
সাধারণ সর্দি	মানুষ	Rhino virus
হাম	মানুষ	রুবিওলা ভাইরাস (Rubeola virus)
পোলিওমাইলাইটিস	মানুষ	পোলিও ভাইরাস (Polio virus)
ইনফ্লুয়েঞ্জা	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus)
হার্পিস	মানুষ	হার্পিস ভাইরাস (Herpes virus)
যকৃত/লিভার ক্যান্সার	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B)
পীত জ্বর	মানুষ	ইয়েলো ফিভার ভাইরাস (Yellow Fever virus)
গো-বসন্ত	গরু	ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস (Vaccinia virus)
পা ও মুখের ক্ষত (ফুট অ্যান্ড মাউথ)	গরু/ভেড়া/ছাগল/মহিষ	'ফুট অ্যান্ড মাউথ' ভাইরাস (Foot and Mouth virus)
ইঁদুরের টিউমার	ইঁদুর	পলিওমা ভাইরাস (Polioma virus)
ক্যাপোসি সারকোমা	মানুষ	হার্পিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex)
এনোজেনিটাল ক্যান্সার	মানুষ	পেপিলোমা ভাইরাস (Pepiloma virus)

কাজ: T_2 ফাজ-এর গঠন চিত্রের একটি পোস্টার অঙ্কন কর এবং ক্লাসে উপস্থাপন কর।
উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, ইরেজার, রং পেন্সিল ইত্যাদি।

ভাইরাসঘটিত রোগসমূহ (Viral diseases)

ভাইরাস বলতেই রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু বোঝায়। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখির বহু রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। এখানে কয়েকটি ভাইরাসঘটিত রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো।

(ক) ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis) : সাধারণত লিভার প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বা সংক্ষেপে হেপাটাইটিস বলা হয়। এটি জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫% এবং বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারে স্থায়ী আক্রমণ গড়ে তোলে, যা ১০-১৫ বছরের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়।

রোগের কারণ : হেপাটাইটিস রোগের কারণ হেপাটাইটিস-B ভাইরাস (HBV)। এছাড়া হেপাটাইটিস-A ভাইরাস (HAV) হেপাটাইটিস-C ভাইরাস (HCV) যাকে বলা হয় 'ঘুমের আড়ালে' নীরব ঘাতক এবং আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ সময় মারা যায়; হেপাটাইটিস-D ভাইরাস (HDV) ও হেপাটাইটিস-E ভাইরাস (HEV) দিয়েও লিভার প্রদাহ হয়ে থাকে। অধিকাংশ হেপাটাইটিসই হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের আক্রমণে ঘটে থাকে। হেপাটাইটিস-C অবশ্য হেপাটাইটিস-B অপেক্ষা অধিক মারাত্মক।

হেপাটাইটিস-B ভাইরাস একটি DNA ভাইরাস। এর DNA দ্বিসূত্রক এবং বৃত্তাকার। এই ভাইরাসে প্রোটিন আবরণের ওপর আর একটি আবরণ থাকে। এ ভাইরাস বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন–

- আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধপানের মাধ্যমে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে।
- অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমেও এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।

এছাড়া সাইটোমেগালো ভাইরাস, এপিস্টেইন বার ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, হার্পিস জোস্টার ভাইরাস কোনো সময় শিশুর হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। নিম্নে হেপাটাইটিস ভাইরাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো।

বৈশিষ্ট্য	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
ভাইরাস গ্রুপ	এন্টারো ভাইরাস	হেপাডিএনএ ভাইরাস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	অসম্পূর্ণ ভাইরাস	ক্যালিসি ভাইরাস
নিউক্লিক অ্যাসিড	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA
আয়তন	২৭ nm	৪২ nm	৩০-৩৮ nm	৩৫ nm	২৭ nm
সুপ্তিকাল	১৪-২৮ দিন	৪৫-১৮০ দিন	১৪-১৮০ দিন	২১-৪৯ দিন	২১-৫৬ দিন

রোগের লক্ষণ : রক্তের মাধ্যমে এই রোগ দেহে প্রবেশ করে এবং লিভারে নীত হয় ও লিভারকে আক্রমণ করে। এই ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিকে কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড **(সুপ্তিকাল)** ৪৫-১৮০ দিন। ক্রমশ জ্বর, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব, দুর্বল বোধ, পাতলা পায়খানা, হাড়ের গিঁটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে প্রস্রাব হলুদ হয়, চোখের সাদা অংশ এবং সমস্ত শরীর হলুদ বর্ণ দেখায়, পেটে ও পায়ে পানি জমা হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় অস্বস্তি অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস B ও C ভাইরাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। রক্তে বিলিরুবিনের এবং SGPT এর মাত্রা বৃদ্ধি। এ দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। হেপাটাইটিস B নির্ণয়ের জন্য রক্তের এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পরীক্ষা করতে হয়।

নিয়ন্ত্রণ/প্রতিকার : রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া দরকার। সাধারণত এর কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। নিয়মিত চিকিৎসায় সুস্থ থাকা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া যায় না। এর মূল চিকিৎসা হলো রোগীকে ১০-১২ দিন পূর্ণ বিশ্রামে রাখা। গ্লুকোজের সরবত খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। অড়হড় পাতা, ভুঁই আমলার পাতা ইত্যাদির রস খাওয়ায়ে উপকার পেয়েছেন বলেও অনেকে দাবি করেছেন। Amoxycillin, Metronidazole, ভিটামিন-সি প্রভৃতি ওষুধ খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ : প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো প্যান্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। হেপাটাইটিস-B-এর ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম ৩টি একমাস পরপর এবং ৪র্থটি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ নিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রক্ত পরীক্ষা করে এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পজিটিভ হলে B-ভাইরাস আক্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয় এবং তাকে ভ্যাকসিন দেয়া যায় না। মা থেকে শিশুতে এই রোগ ছড়াতে পারে, তাই সাবধান হতে হবে। রক্ত দেওয়া-নেওয়ায় সাবধান হতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন করা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা। সেলুনে সেভ করা পরিহার করতে হবে। প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তিগত টয়লেট্রিজ দ্রব্য যেমন টুথব্রাশ, রেজার, নেইল কাটার ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কেউ ব্যবহার না করা।

(খ) ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever)

রোগের কারণ: ডেঙ্গু (প্রকৃত উচ্চারণ ডেঙ্গী) একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এই ভাইরাসের জীবাণুর নাম ফ্ল্যাভিভাইরাস বা ডেঙ্গী ভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের বাহক হলো *Aedes aegypti* L. ও *Aedes albopictus* নামক মশকী (স্ত্রী মশা) আর এর পোষক দেহ হলো মানুষ। প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ : (i) সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর : প্রথমে শীত শীত ভাব হয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর দেখা দেয়। জ্বর ১০৩-১০৫° (ডিগ্রি) ফারেনহাইট হয়ে থাকে। সাধারণত স্ত্রী ডেঙ্গু মশা কামড়ানোর ২-৭ দিন পর জ্বর দেখা দেয়। ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর তীব্র মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেট ব্যথা, কপাল ব্যথা ও গলা ব্যথা হয়। রোগীর সমস্ত শরীরে (মাংসপেশি, পিঠ, কোমর, ঘাড়, হাড়ের জোড়ায় জোড়ায়) ব্যথা হয়। মেরুদণ্ডের ব্যথাসহ কোমরে ব্যথা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। একে হাড়ভাঙ্গা জ্বর বলে। শরীরে লালচে রঙের র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) দেখা দিতে পারে। বমি বমি ভাব ও খাবারে অরুচি হতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছালে রক্তক্ষরণ (bleeding) হয়।

(ii) হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর : সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরে জটিলতা থেকে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখের কোণে রক্ত জমাট হতে পারে। রক্তে প্লেটিলেট (অণুচক্রিকা) ভীষণ হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

(iii) ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম : হেমোকনসেনট্রেশন ঘটতে দেখা যায়।

তিন ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম অত্যন্ত মারাত্মক।

রোগ নির্ণয় : সেরোলজি : রক্ত পরীক্ষায় IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রামিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্লেটিলেট পরীক্ষা : রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ১৫০০০০/mm^3 এর অনেক নিচে নেমে আসে।

সেল কালচার : রক্ত কণিকা কালচার করেও ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

প্রতিকার/চিকিৎসা : ডেঙ্গু জ্বরে রোগীকে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিলে মারাত্মক পরিণতি দেখা দিতে পারে, তাই এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে। রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করে দেয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়। দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া গর্ভবতী মায়েদের ডেঙ্গু হলে অন্যান্য রোগীর মতোই যত্ন নিতে হবে। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

প্রতিরোধ : ডেঙ্গু মশা নিধন করাই প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এই মশা দিনের বেলায় কামড়ায়, কাজেই দিনের বেলায় মশার কামড় থেকে বাঁচতে হবে। রোগ প্রতিরোধে দিনের বেলায় মশারী টানিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল অথবা ইলেকট্রিক ভ্যাপার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে, যাতে মশা কামড়াতে না পারে। এই মশা ময়লা পানিতে জন্মায় না, বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন কনটেইনারে (ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি পাতিল, ডাবের খোসা, ড্রাম ইত্যাদি) রক্ষিত বা সঞ্চিত পরিষ্কার পানিতে জন্মায়, তাই পানির এসব উৎস ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ পানি জমতে না দেয়া। পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনের জন্য নিয়মিত পতঙ্গনাশক স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডাতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে পতঙ্গনাশক ছাড়াই ডেঙ্গু মশা নিধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

(গ) পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ (**Ringspot or mosaic disease of Papaya**) : পৃথিবীর অনেক দেশেই একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ শুরু হয়েছে। পেঁপের রোগ-বালাই অপেক্ষাকৃত কম হলেও কখনো কখনো ক্ষেতের পুরো ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো ভাইরাসঘটিত রিংস্পট রোগ। বাংলাদেশসহ ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও টেক্সাসসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে পেঁপে গাছে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ জেনসন ১৯৪৯ সালে এ রোগের নামকরণ করেন রিংস্পট (Ringspot)।

রোগের কারণ : একটি ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়। ভাইরাসটি সাধারণভাবে Papaya ringspot virus বা PRSV নামে পরিচিত। এর গণ *Potyvirus*, গোত্র Potyviridae. PRSV কতকটা দণ্ডাকৃতির, এটি ৭৬০-৮০০ nm

রোগের লক্ষণ : (i) **সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর :** প্রথমে শীত শীত ভাব হয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর দেখা দেয়। জ্বর ১০৩-১০৫° (ডিগ্রি) ফারেনহাইট হয়ে থাকে। সাধারণত স্ত্রী ডেঙ্গু মশা কামড়ানোর ২-৭ দিন পর জ্বর দেখা দেয়। ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর তীব্র মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেট ব্যথা, কপাল ব্যথা ও গলা ব্যথা হয়। রোগীর সমস্ত শরীরে (মাংসপেশি, পিঠ, কোমর, ঘাড়, হাড়ের জোড়ায় জোড়ায়) ব্যথা হয়। মেরুদণ্ডের ব্যথাসহ কোমরে ব্যথা **এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।** একে **হাড়ভাঙা জ্বর** বলে। শরীরে লালচে রঙের র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) দেখা দিতে পারে। বমি বমি ভাব ও খাবারে অরুচি হতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছালে রক্তক্ষরণ (bleeding) হয়।

(ii) **হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর :** সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরে জটিলতা থেকে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখের কোণে রক্ত জমাট হতে পারে। রক্তে প্লেটিলেট (অণুচক্রিকা) ভীষণ হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

(iii) **ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম :** হেমোকনসেনট্রেশন ঘটতে দেখা যায়।

তিন ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম অত্যন্ত মারাত্মক।

রোগ নির্ণয় : সেরোলজি : রক্ত পরীক্ষায় IgM অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রমিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্লেটিলেট পরীক্ষা : রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ১৫০০০০/mm³ এর অনেক নিচে নেমে আসে।

সেল কালচার : রক্ত কণিকা কালচার করেও ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

প্রতিকার/চিকিৎসা : ডেঙ্গু জ্বরে রোগীকে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিলে মারাত্মক পরিণতি দেখা দিতে পারে, তাই এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবে না। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে। রক্তের সাম্যতা রক্ষায় জন্য প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করে দেয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়। দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া গর্ভবতী মায়েদের ডেঙ্গু হলে অন্যান্য রোগীর মতোই যত্ন নিতে হবে। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

প্রতিরোধ : ডেঙ্গু মশা নিধন করাই প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এই মশা দিনের বেলায় কামড়ায়, কাজেই দিনের বেলায় মশার কামড় থেকে বাঁচতে হবে। রোগ প্রতিরোধে দিনের বেলায় মশারী টানিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল অথবা ইলেকট্রিক ভ্যাপার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে, যাতে মশা কামড়াতে না পারে। এই মশা ময়লা পানিতে জন্মায় না, বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন কনটেইনারে (ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি পাতিল, ডাবের খোসা, ড্রাম ইত্যাদি) রক্ষিত বা সঞ্চিত পরিষ্কার পানিতে জন্মায়, তাই পানির এসব উৎস ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ পানি জমতে না দেয়া। পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনের জন্য নিয়মিত পতঙ্গনাশক স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডাতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে পতঙ্গনাশক ছাড়াই ডেঙ্গু মশা নিধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

(গ) **পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ (Ringspot or mosaic disease of Papaya) :** পৃথিবীর অনেক দেশেই একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে পেঁপের চাষ শুরু হয়েছে। পেঁপের রোগ-বালাই অপেক্ষাকৃত কম হলেও কখনো কখনো ক্ষেতের পুরো ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো ভাইরাসঘটিত রিংস্পট রোগ। বাংলাদেশসহ ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও টেক্সাসসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে পেঁপে গাছে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ জেনসন ১৯৪৯ সালে এ রোগের নামকরণ করেন রিংস্পট (Ringspot)।

রোগের কারণ : একটি ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়। ভাইরাসটি সাধারণভাবে Papaya ringspot virus বা PRSV নামে পরিচিত। এর গণ *Potyvirus*, গোত্র Potyviridae. PRSV কতকটা দণ্ডাকৃতির, এটি ৭৬০-৮০০ nm

লম্বা এবং এর ব্যাস ১২ nm। পেঁপে ছাড়াও এ ভাইরাস কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদে মোজাইক রোগের সৃষ্টি করে। ক্যাপসিডের বাইরে এর কোনো আবরণ নেই। এটি একটি RNA ভাইরাস। PRSV এর দুটি প্রকরণের (PRSV-p এবং PRSV-w) মধ্যে PRSV-p দিয়ে পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়।

সংক্রমণ : জাব পোকা ও সাদা মাছি (Melon Aphid- *Aphis gossypii* and Peach Aphid- *Myzus persicae*) দ্বারা পেঁপে গাছে পেঁপের রিংস্পট রোগের ভাইরাস সংক্রমিত হয়। কোনো আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে জাব পোকা খাদ্যগ্রহণ করলে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ভাইরাস পোকার দেহে চলে আসে এবং সাথে সাথে কোনো সুস্থ উদ্ভিদে বসলে উহা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। পোকার দেহে এ ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। যদি পেঁপে বাগানের গাছগুলো পোকার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং বাগানে জাব পোকার সংখ্যা খুব বেশি থাকে তাহলে এ রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় এবং ৪ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগান এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ ছাঁটার সময় যান্ত্রিকভাবে এ রোগ বিস্তার ঘটতে পারে।

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : রোগের নাম থেকেই লক্ষণ অনুমান করা যায়। Ring = বৃত্ত, Spot = দাগ অর্থাৎ বৃত্তাকার দাগ প্রকাশ পায়। বৃত্তাকার দাগের প্রকৃতি হলো কেন্দ্রাভিমুখী (Concentric)। রোগাক্রান্ত গাছে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(i) উদ্ভিদ জন্মের সাথে সাথে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। সংক্রমণের ৩০–৪০ দিনের মধ্যে প্রথম রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।
(ii) ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় হলদে-সবুজ মোজাইকের মতো দাগ পড়ে।
(iii) কাণ্ড, পাতার বোঁটা ও ফলে তৈলাক্ত বা পানি-সিক্ত গাঢ় সবুজ দাগ, স্পট বা রিং সৃষ্টি হয়।
(iv) অপেক্ষাকৃত কম বয়সের পাতায়ই রোগ লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়।
(v) আক্রমণ প্রকট হলে পাতায় বহুল পরিমাণে মোজাইক সৃষ্টি হয়, পাতা আকৃতিতে ছোট ও কুকড়ে যায়, গাছের মাথায় বিকৃত আকৃতির ক্ষুদ্রাকায় কিছু পাতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য পাতা ঝরে পড়ে। কখনো কখনো পাতার কেবল শিরাগুলো থাকে।
(vi) আক্রান্ত ফলের উপর পানি ভেজা গোলাকার দাগ পড়ে এবং দাগের মধ্যবর্তী স্থান শক্ত হয়ে যায়।
(vii) পেঁপে হলুদ হয়ে যায়, রিংস্পট লক্ষণ প্রকাশিত হয়, আকার ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় পুষ্ট হবার আগেই ঝরে যায়।
(viii) পেঁপের মিষ্টতা ও পেপেইন হ্রাস পায়।
(ix) ফলন শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

প্রতিকার/নিয়ন্ত্রণ

১। জমিতে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২। জাল (net) দিয়ে পুরো জমি (পেঁপের গাছসহ) ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড নামক পতঙ্গ দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত না হতে পারে।
৩। এফিড নামক পতঙ্গ নিধনের জন্য পেস্টিসাইড স্প্রে (রগর বা রক্সিয়ন বা পারফেকথিয়ন 40 ইসি অথবা মেটাসিসটক্স 25 ইসি কীটনাশক 2 মিলিলিটার/1লিটার পানিতে মিশিয়ে) করা যেতে পারে।
৪। চারা লাগানোর প্রথম থেকেই নিয়মিত পেস্টিসাইড স্প্রে করলে এফিড পতঙ্গ দ্বারা রোগ ছড়ায় না।
৫। রোগাক্রান্ত জমিতে পেঁপে গাছের প্রুনিং (পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি) বন্ধ রাখতে হবে, কারণ কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগাক্রমণ ঘটে থাকে।
৬। বাংলাদেশি বিজ্ঞানি ড. মাকসুদুল আলম কর্তৃক জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিস্কৃত নতুন জাতের ক্রস প্রোটেকশন করে আবাদ করলে রোগমুক্ত ফল উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ড. মাকসুদুল আলম আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেঁপের জিনরহস্য উন্মোচন করেছেন। (এখন তিনি প্রয়াত।)

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১। যে এলাকাতে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সে এলাকায় পেঁপের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে এবং দূরে নতুন এলাকায় রোগমুক্ত চারা দিয়ে চাষ শুরু করতে হবে।

২। ক্রস-প্রোটেকশন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত চারাগাছ থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। মৃদু প্রকৃতির PRSV জীবাণুকে প্রাণিদেহে ভাইরাল টিকাদানের মতো পোষক উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে গাছকে ভাইরাস প্রতিরোধী করা।

৩। PRSV সাধারণত বীজের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় না, তবে প্রকটভাবে আক্রান্ত পেঁপের বীজ ব্যবহার করলে তা ইনোকুলামের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজেই ঐ ধরনের বীজ ব্যবহার না করা।

৪। ট্রান্সজেনিক জাত ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ। জিনগান পদ্ধতি ব্যবহার করে PRSV'S Coat protein জিনকে ভ্রূণ টিস্যুতে সংযুক্ত করে নতুন ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে ১৯৯৮ সালে। ট্রান্সজেনিক জাত দুটি হলো PRSV মুক্ত রেইনবো (Rainbow) ও সানআপ (Sunup)। এই ট্রান্সজেনিক জাত (GMO) PRSV দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria, একবচনে Bacterium)

গ্রিক শব্দ *Bakterion* = little rod থেকে ব্যাকটেরিয়া শব্দটির উৎপত্তি। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে ব্যাকটেরিয়াম) এক ধরনের ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী (হল্যান্ড) অ্যান্টনি ভ্যান লীউয়েনহুক (Antony Van Leeuwenhoek, 1632–1723) ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এগুলোর নাম দেন animalcule বা ক্ষুদ্র প্রাণী। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর লন্ডন রয়্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত তার অঙ্কিত ছবিতে তিন আকৃতির ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি দেখা যায়। সর্ব প্রথম আণুবীক্ষণিক সমীক্ষায় আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তাকে **ব্যাকটেরিওলজি ও প্রোটোজুওলজির জনক** বলা হয়ে থাকে। জার্মান বিজ্ঞানী এরেনবার্গ (Christian Gottfried Ehrenberg) ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এসব ক্ষুদ্রজীবদের ব্যাকটেরিয়া নামকরণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur) ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাকটেরিয়ার ওপর ব্যাপক গবেষণা এবং ব্যাকটেরিয়া তত্ত্বকে (germ theory of disease) প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে লুই পাস্তুরকে অনেকেই আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক বলতে চান। জার্মান ডাক্তার **রবার্ট কক** (Robert Koch) অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, প্রাণীর বহু রোগের কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া। তিনি যক্ষ্মা রোগের জন্য দায়ী *Mycobacterium tuberculosis* ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন এবং এজন্য তাঁকে ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানুষের দেহে যতগুলো কোষ আছে তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া আছে। মানুষের অন্ত্র ও ত্বকে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া থাকে। এদের বেশিরভাগই কোনো ক্ষতি করে না। মানুষের দেহে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বেশি ভয়ানক এবং এ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে AIDS সংক্রমণে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে।

বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যাকটেরিয়ার গঠন, আবাস, রোগতত্ত্ব, বংশবিস্তার ইত্যাদি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয় তাকে **ব্যাকটেরিওলজি** বলে।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী (Prokaryotic) জীব। আদিকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে কোনো ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না, যেমন নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি কমপ্লেক্স, লাইসোজোম, সাইটোস্কেলেটন নেই। কেবলমাত্র রাইবোসোম থাকে। কোষে একটি দ্বিসূত্রক অখণ্ড, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যা ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত। এতে হিস্টোন-প্রোটিন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকায়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। **এদের কোষে জড় কোষ প্রাচীর থাকে। তাই এরা উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন।**

ব্যাপক অর্থে ব্যাকটেরিয়া বলতে আর্কিব্যাকটেরিয়া (গ্রিক *archaios* = ancient বা আদি), ইউব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রুপকে বোঝায়। বর্তমানে **Mycoplasma**-কেও ব্যাকটেরিয়া হিসেবে ধরা হয়। এর মধ্যে আর্কিব্যাকটেরিয়া অন্যান্য গ্রুপ থেকে আলাদা হয়েছে। ১৯৭০ সালের আগে আর্কিব্যাকটেরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়ার তেমন পার্থক্য জানা সম্ভব হয়নি, ১৯৯৬ সালে একটি আর্কিব্যাকটেরিয়ার জিনোম সিকুয়েন্সিং করার পর এদের মধ্যকার প্রকট পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দেখা যায় মোট ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকের বেশি জিন ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য সকল জীব গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে এদের rRNA-এর বেস সিকুয়েন্সেস ব্যাকটেরিয়ার সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা সূচিত করে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানী জীবরাজ্যকে তিনটি Domain বা অধিরাজ্যে ভাগ করতে চান।

অধিরাজ্য-১ : Archaea : রাজ্য Archaebacteria

অধিরাজ্য-২ : Bacteria : রাজ্য Eubacteria

অধিরাজ্য-৩ : Eukarya : রাজ্য Protista, Fungi, Plantae, Animalia

বৈশিষ্ট্য	আর্কিব্যাকটেরিয়া	ব্যাকটেরিয়া
১। কোষপ্রাচীর	পেপটিডো গ্লাইকান নেই	প্রধান বস্তু পেপটিডোগ্লাইকান
২। মেমব্রেন লিপিড	ইথার লিংকেড, শাখান্বিত	এস্টার লিংকেড, অশাখ
৩। ইনিশিয়েটর tRNA	মেথিওনিন	ফরমাইল মেথিওনিন
৪। RNA পলিমারেজ	একাধিক	এক ধরনের
৫। ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট	Bacterio rhodopsin	Bacterial chlorophyll, chlorophyll-a

আর্কিব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে। এদের কতক Salt lover (Halophiles), কতক Heat lover (Thermophiles) কতক Heat and acid lover (Thermoacidophiles) এবং কতক Methane generater (Methanogens).

Methanopyrus ১১০° সে. তাপমাত্রায়ও টিকে থাকে, ভালো বৃদ্ধি ঘটে ৯৮° সে. তাপমাত্রায়, কিন্তু তাপমাত্রা ৮৪° সে. এর কম হলে মরে যায়। Methanogens প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে দুই বিলিয়ন টন মিথেন গ্যাস মুক্ত করে।

যাইহোক, এ পুস্তকে কেবলমাত্র প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh পুস্তকে বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ৪৭২ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০০ প্রজাতির সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ৬০ প্রজাতির প্রোটিওব্যাকটেরিয়া, ৪২ প্রজাতির ফিরমিকিউট্‌স এবং ৭০ প্রজাতির অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া।

ব্যাকটেরিয়া হলো জড় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট, এককোষী, আণুবীক্ষণিক, আদিকেন্দ্রিক অণুজীব যা সাধারণত ক্লোরোফিল বিহীন এবং প্রধানত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। ৩৬০ কোটি বছর পূর্বে আর্কিওজোইক যুগে আদি কোষী জীবের উৎপত্তি ঘটেছিল। নিচে ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো।

ব্যাকটেরিয়ার সাধারন বৈশিষ্ট্য

১। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট আকারের জীব, সাধারণত ০.২–৫.০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে, অর্থাৎ এরা আণুবীক্ষণিক (microscopic)।

২। এরা এককোষী জীব, তবে একসাথে অনেকগুলো কলোনি করে বা দল বেঁধে থাকতে পারে।

৩। ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক (প্রাককেন্দ্রিক = Prokaryotic)। কোষে 70S রাইবোসোম থাকে; অন্য কোনো ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না।

৪। ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপ্রোটিন, সাথে মুরামিক অ্যাসিড (Muramic acid) এবং টিকোয়িক অ্যাসিড (Teichoic acid) থাকে।

৫। এদের বংশগতীয় উপাদান (genetic material) হলো একটি দ্বিসূত্রক, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু, যা ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত। এটি সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত, এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন-প্রোটিন থাকে না। ব্যাকটেরিয়া কোষে DNA অবস্থানের অঞ্চলকে নিউক্লিয়য়েড বলা হয়।

৬। এদের বংশবৃদ্ধির প্রধান প্রক্রিয়া দ্বি-ভাজন (binary fission)। ব্যাক্টেরিয়ার দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৩০ মিনিট সময় লাগে।

৭। এদের কতক পরজীবী ও রোগ উৎপাদনকারী, অধিকাংশই মৃতজীবী এবং কিছু স্বনির্ভর (autophytic)।

৮। এরা সাধারণত বেসিক রং ধারণ করতে পারে (গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ)।

৯। ফায ভাইরাসের প্রতি এরা খুবই সংবেদনশীল।

১০। এদের অধিকাংশই অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে।

১১। ব্যাক্টেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু গঠন করে। এ অবস্থায় এরা ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে।

১২। এরা -১৭ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাঁচে।

১৩। ক্রোমোসোম না থাকায় মাইটোসিস ও মায়োসিস ঘটে না।

১৪। এদের কতক বাধ্যতামূলক অবায়বীয় (obligate anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন থাকলে বাঁচতে পারে না। উদা: *Clostridium*। কতক সুবিধাবাদী অবায়বীয় (facultative anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও বাঁচতে পারে। কতক বাধ্যতামূলক বায়বীয় (obligate aerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। উদা: *Azotobacter beijerinckia*।

ব্যাকটেরিয়ার বিস্তৃতি ও আবাসস্থল : ব্যাকটেরিয়া মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান। মানুষের অন্ত্রেও ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এর মধ্যে *Escherichia coli (E. coli)* আমাদেরকে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স সরবরাহ করে থাকে। প্রকৃতিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অর্থাৎ –17°C তাপমাত্রা থেকে শুরু করে 80°C তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। মাটি বা পানিতে যেখানে জৈব পদার্থ বেশি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও সেখানে বেশি। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ আবাদি মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাটির যত গভীরে যাওয়া যাবে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণও তত কমতে থাকে এবং সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও কমতে থাকে। জৈব পদার্থসমৃদ্ধ জলাশয়েও বিপুল সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া বাস করে। বায়ুতেও ব্যাকটেরিয়া আছে তবে বায়ুস্তরের অনেক উঁচুতে ব্যাকটেরিয়া থাকে না। এক গ্রাম মাটিতে প্রায় ৪০ মিলিয়ন এবং এক মিলিলিটার মিঠা পানিতে প্রায় ১ মিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া থাকে। অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পরজীবী হিসেবে বাস করে। আবার অনেকে প্রাণীর অন্ত্রে মিথোজীবী হিসেবে বাস করে।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়াকে তাদের কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির তারতম্য, ফ্ল্যাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহণের ক্ষমতা, স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। নিম্নে এদের মধ্য থেকে তিন প্রকার শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো :

(ক) কোষের আকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ

কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, যথা- ১। কক্কাস, ২। ব্যাসিলাস, ৩। কমাকৃতি, ৪। স্পাইরিলাম, ৫। বহুরূপি, ৬। স্টিলেট বা তারকাকার এবং ৭। বর্গাকৃতির।

১। **কক্কাস (Coccus)** [বহুবচনে কক্কাই, Pl. Cocci] : যে সব ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি প্রায় গোলাকার তাদেরকে কক্কাস বলে। কক্কাসকে আবার ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(ক) মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস (Micrococcus) : যেসব ব্যাকটেরিয়া গোলাকার এবং একা একা থাকে তাদেরকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস বলে; উদাহরণ- *Micrococcus denitrificans*.

(খ) ডিপ্লোকক্কাস (Diplococcus) : দেখতে গোলাকার এবং এ ব্যাকটেরিয়াসমূহ জোড়ায় জোড়ায় থাকে; উদাহরণ- *Diplococcus pneumoniae*.

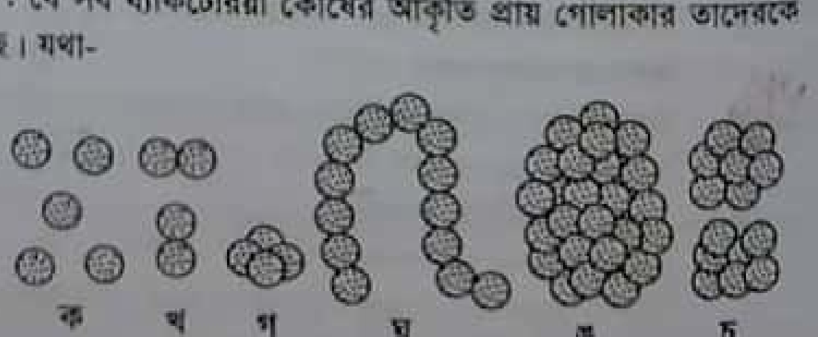

ক খ গ ঘ ঙ চ

চিত্র ৪.৬ : বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া (ক) মাইক্রোকক্কাস, (খ) ডিপ্লোকক্কাস, (গ) টেট্রাকক্কাস, (ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস, (ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং (চ) সারসিনা।

(গ) টেট্রাকক্কাস (Tetracoccus) : যখন চারটি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া একই তলে একত্রে বাস করে; উদাহরণ- *Gaffkya tetragena*.

(ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus) : এরাও দেখতে গোলাকার এবং চেইন (chain) বা মালার মতো সাজানো থাকে; উদাহরণ- *Streptococcus lactis.*

(ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) : এগুলো গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া এবং অনিয়মিত গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে, যা দেখতে অনেকটা আঙ্গুরের থোকার ন্যায় দেখায়; উদাহরণ- *Staphylococcus aureus.*

(চ) সারসিনা (Sarcina) : এগুলো দেখতে গোলাকার। কক্কাস জাতীয় ব্যাক্টেরিয়াগুলো একত্রে সমান সমান দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় একটি ঘনতলের মতো গঠন তৈরি করে তখন তাকে সারসিনা বলে; উদাহরণ- *Sarcina lutea.*

২। ব্যাসিলাস (Bacillus) [বহুবচনে ব্যাসিলি Pl. bacilli] : দণ্ডাকৃতির ব্যাক্টেরিয়াকে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া বলে; উদাহরণ- *Bacillus albus, Clostridium botulinum, Pseudomonas tabaci* ইত্যাদি। ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া নিম্নলিখিত ধরনের-

- মনোব্যাসিলাস (Monobacillus) : যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া এককভাবে থাকে তখন তাকে মনোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Bacillus albus, Escherichia coli.*
- ডিপ্লোব্যাসিলাস (Diplobacillus) : দুটি ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত অবস্থায় থাকলে তাকে ডিপ্লোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Moraxella lacunata.*

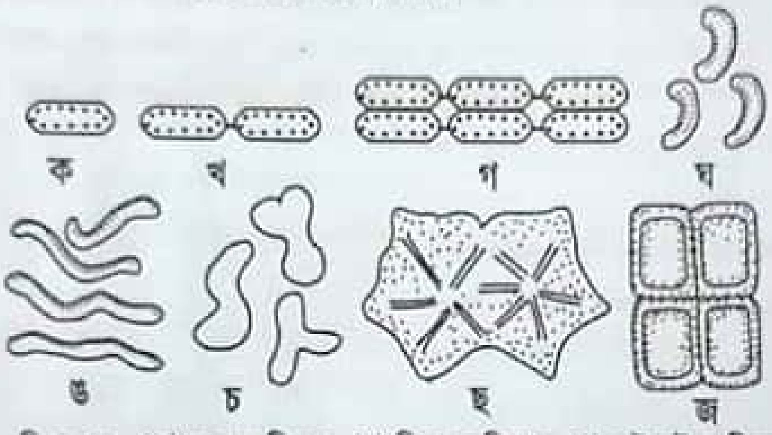

চিত্র ৪.৭ : (ক) মনোব্যাসিলাস, (খ) ডিপ্লোব্যাসিলাস, (গ) স্ট্রেপটোব্যাসিলাস, (ঘ) কমাকৃতি, (ঙ) স্পাইরিলাম, (চ) বহুরূপি, (ছ) তারকাকার এবং (জ) বর্গাকৃতির।

- স্ট্রেপটোব্যাসিলাস (Streptobacillus) : দুইয়ের অধিক ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত হয়ে লম্বা সূত্রাকার গঠন তৈরি করে তখন তাকে স্ট্রেপটোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- *Streptobacillus moniliformis.*
- কক্কোব্যাসিলাস (Coccobacillus) : যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো সামান্য লম্বা বা কতকটা ডিম্বাকার হয় তখন তাকে কক্কোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Salmonella, Mycobacterium.*
- প্যালিসেড ব্যাসিলাস (Palisade bacillus) : কখনো কখনো ব্যাসিলাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে অলীক টিস্যুর ন্যায় গঠন তৈরি করে তখন তাকে প্যালিসেড ব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Lampropedia* sp.

৩। কমাকৃতি বা ভিব্রিও (Comma or Vibrio) : যেসব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কমা চিহ্নের ন্যায় তাদের কমা ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদাহরণ- *Vibrio cholerae.*

৪। স্পাইরিলাম (Spirillum) [বহুবচনে স্পাইরিলা Pl. spirilla] বা সর্পিলাকার : প্যাঁচানো বা সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম বলে; উদাহরণ- *Spirillum minus.*

৫। বহুরূপি (Pleomorphic) : সুনির্দিষ্ট আকারবিহীন ব্যাকটেরিয়াকে বহুরূপি ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদা. *Rhizobium* sp.

৬। স্টিলেট বা তারকাকার (Stellate or Star shaped) : এরা দেখতে অনেকটা তারকার ন্যায়; যেমন-*Stella* sp.

৭। বর্গাকৃতির (Square shaped) : চার বাহুবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকেই বর্গাকৃতির ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; যেমন- *Haloquadratum walsbyi.*

৮। ফিলামেন্টাস (Filamentus) : এদের গঠন যখন সূত্রাকার হয় তখন তাকে ফিলামেন্টাস বলে, যেমন-*Candidatus savagella*।

(খ) রঞ্জনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (সিলেবাস বহির্ভূত কিন্তু জানা জরুরি)
১৮৮৪ সালে ড্যানিশ চিকিৎসক Hans Christian Gram ব্যাকটেরিয়ার জন্য একটি রঞ্জন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যাকে বলা হয় Gram staining বা গ্রাম রঞ্জন পদ্ধতি।

স্লাইডে ব্যাকটেরিয়া স্মিয়ার (Smear) নিয়ে তাতে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং দিতে হবে, এরপর আয়োডিন দিতে হবে। এরপর এটি অ্যালকোহলে ধুয়ে স্যাফ্রানিন-এর লাল রং-এ কাউন্টার স্টেইন করতে হবে। যে সব ব্যাকটেরিয়া ভায়োলেট রং ধরে রাখবে তারা হলো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (দেখতে ব্লু থেকে পারপল হবে); যেমন-*Bacillus subtilis*. যে সব ব্যাকটেরিয়াতে ভায়োলেট রং ধুয়ে চলে যাবে এবং স্যাফ্রানিনের লাল রং ধরে রাখবে তারা হলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া (দেখতে পিঙ্ক থেকে লাল হবে); যেমন-*Salmonella typhi*. ব্যাকটেরিয়ার চিকিৎসা ক্ষেত্রে গ্রাম স্টেইনিং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পেনিসিলিন বা পেনিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, ফলে নতুন সৃষ্ট কোষ টিকে থাকতে পারে না। আবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন জাতীয় ওষুধ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয়, তাই নতুন সৃষ্ট কোষ টিকে থাকতে পারে না। এভাবে রোগী আরোগ্য হয়।

ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, ক্লসট্রিডিয়াম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রাম পজিটিভ। এন্টেরোব্যাকটেরিয়া, সকল সায়ানোব্যাকটেরিয়া, শিগেলা, সালমোনেলা, রাইজোবিয়াম, ভিব্রিও, ই. কোলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ।

আমাদের নিজস্ব গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে বহু গাছপালা আছে যাদের নির্যাস গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের পরিবর্তে এসব উদ্ভিদ নির্যাস ব্যবহার করা যায়। *Polygonum lapathifolium* এমন একটি আগাছা। প্রয়োজন ছাড়া কোনো একটি আগাছাও যেন আমরা নষ্ট না করি।

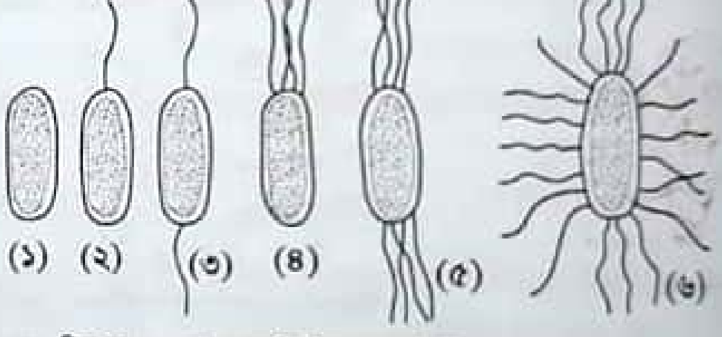

চিত্র ৪.৮ : ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদ।
(১) অ্যাট্রিকাস (২) মনোট্রিকাস (৩) অ্যাম্ফিট্রিকাস
(৪) সেফালোট্রিকাস(৫) লফোট্রিকাস (৬) পেরিট্রিকাস।

(গ) ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়)

১। অ্যাট্রিকাস (atrichous) : এদের কোষে কোনো ফ্ল্যাজেলা থাকে না; উদাহরণ-*Corynebacterium diptheriae*.

২। মনোট্রিকাস (monotrichous) : এদের কোষের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Vibrio cholerae*.

৩। অ্যাম্ফিট্রিকাস (amphitrichous) : এদের কোষের দুই প্রান্তে একটি করে ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Spirillum minus*।

৪। সেফালোট্রিকাস (cephalotrichous) : এদের কোষের এক প্রান্তে একগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে ; যেমন-*Pseudomonas fluorescens*।

৫। লফোট্রিকাস (lophotrichous) : এদের কোষের দুই প্রান্তে দুইগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন-*Spirillum volutans*।

৬। পেরিট্রিকাস (peritrichous) : এদের দেহের সবদিকেই ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন- *Salmonella typhi*।

একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন (Structure of a Typical Bacterium)

ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও প্রকৃতিতে যেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে, এদের কোষীয় গঠন বৈশিষ্ট্যেও তেমনই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে একত্র করে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন হিসেবে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

১। কোষ প্রাচীর : প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান মিউকোপ্রোটিন জাতীয় যাকে মিউরিন বা পেপটিডোগ্লাইকান বলে। পেপটিডোগ্লাইকান একটি কার্বোহাইড্রেট পলিমার। পেপটিডোগ্লাইকানের সাথে কিছু পরিমাণ মুরামিক অ্যাসিড এবং টিকোয়িক অ্যাসিডও থাকে। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াতে পেপটিডোগ্লাইকান স্তরটি বেশ পুরু থাকে যা ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে পেপটিডোগ্লাইকান স্তরটি পাতলা থাকে এবং এর উপর ফসফোলিপিড বা লিপোপলিসেকারাইড-এর একটি

পাতলা স্তর থাকে। এজন্য এরা ভায়োলেট রং ধরে রাখতে পারে না। মাইকোপ্লাজমাতে জড় প্রাচীর নেই বললেই চলে। এরা ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া। লাইসোজাইম এনজাইম দ্বারা এর কোষ প্রাচীর বিগলিত হয়।

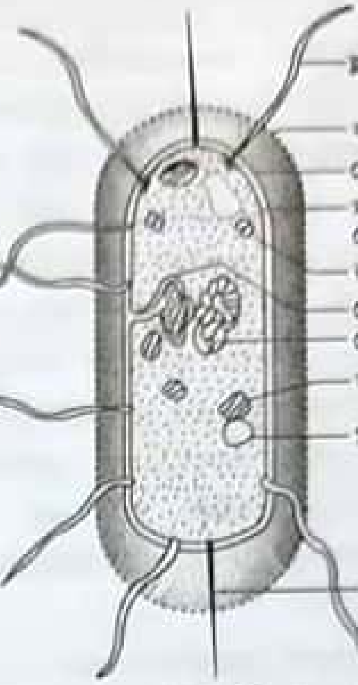

চিত্র ৪.৯ : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ (আণবিক গঠনিক রূপ)।

২। ক্যাপসিউল : বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কার্বোহাইড্রেট বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। একে স্লাইম স্তরও বলা হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ।

৩। ফ্ল্যাজেলা : অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা নলাকার রডবিশেষ। ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে ফ্ল্যাজেলা গঠিত। প্রতিটি ফ্ল্যাজেলামের তিনটি অংশ থাকে। যথা- (i) সূত্র (ii) সংক্ষিপ্ত হুক এবং (iii) ব্যাসাল বডি। ব্যাসাল বডি ফ্ল্যাজেলামকে কোষের প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত রাখে। ফ্ল্যাজেলা ব্যাকটেরিয়ার চলনে অংশগ্রহণ করে।

৪। পিলি : কতগুলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংখ্যায় অধিক লোম সদৃশ অঙ্গ থাকে যাকে পিলি বলে। পিলি, পিলিন (Pilin) নামক এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরি। পোষক কোষের সাথে সংযুক্তির কাজ করে থাকে পিলি। গনোরিয়া ব্যাকটেরিয়া পিলি দ্বারা পোষক কোষের সাথে সংযুক্ত হয়।

৫। প্লাজমামেমব্রেন : সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। এটি সরল শৃঙ্খলের ফসফোলিপিড বাইলেয়ার হিসেবে অবস্থিত, এর সাথে মাঝে মাঝে প্রোটিন থাকে। এতে কোলেস্টেরল থাকে না। ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেন অনেক মেটাবলিক কাজ করে থাকে। বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেন বহু শ্বসনিক ও ফসফোরাইলেটিক এনজাইম ধারণ করে (মাইটোকন্ড্রিয়ার অনুরূপ)। ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমামেমব্রেন ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাইলাকয়েড সদৃশ গঠন সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়াতে মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, তবুও কিছু ATP তৈরি হয় সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায়, কারণ ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমামেমব্রেনে ফসফোরাইলেটিক এনজাইম থাকে।

৬। মেসোসোম : ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে মেসোসোম বলে। অনেকের মতে মেসোসোম কোষ বিভাজনে সাহায্য করে থাকে।

৭। সাইটোপ্লাজম : সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ (লৌহ, ফসফরাস, গন্ধক ইত্যাদি)। গহ্বরগুলো কোষরস দিয়ে পূর্ণ থাকে। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অণুগুলো হলো মুক্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্রোমাটোফোর থাকে। তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে ভলিউটিন থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এসব দানা কোষ গহ্বরে স্থানান্তরিত হয়।

৮। ক্রোমোসোম : কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু। এটি কার্যত বৃত্তাকার এবং নগ্ন অর্থাৎ এতে ক্রোমোসোমাল হিস্টোন প্রোটিন থাকে না। ক্রোমোসোমকে ঘিরে কোনো নিউক্লিয়ার আবরণ থাকে না। সাইটোপ্লাজমস্থ DNA সমৃদ্ধ অঞ্চলকে নিউক্লিয়য়েড (nucleoid) বলে।

৯। প্লাসমিড : বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকায় ও প্রকৃত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যাকে বলা হয় প্লাসমিড। প্লাসমিড স্ববিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এতে স্বল্প সংখ্যক জিন থাকে। ভেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কাজ : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ অঙ্কন কর এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
উপকরণ : পোস্টার পেপার, পেন্সিল, রংপেন্সিল, ইরেজার ইত্যাদি।

ব্যাকটেরিয়ার জনন (Reproduction of Bacteria) : ব্যাকটেরিয়ার প্রধান জনন পদ্ধতি হলো দ্বি-ভাজন পদ্ধতি। এটি একটি অযৌন পদ্ধতি। কুঁড়ি তথা মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে সংখ্যাবৃদ্ধি হতে পারে। কুঁড়ি সৃষ্টি পদ্ধতিকে অঙ্গজ জনন পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

□ **দ্বি-ভাজন (Binary fission) :** একটি কোষ সমান দুই ভাগে ভাগ হওয়ার নাম দ্বি-ভাজন। অন্যভাবে বলা যায় দ্বি-ভাজন হলো আদি কোষের অযৌন জনন প্রক্রিয়া যেখানে নিউক্লিয়ার বস্তু (DNA) সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। দ্বি-ভাজন পদ্ধতিই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি তথা প্রজননের প্রধান উপায়। এ প্রক্রিয়ায় একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ বিভক্ত হয়ে সমআকারের দুটিতে পরিণত হয় এবং এভাবেই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হয়।

১। ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম তথা DNA ব্যাকটেরিয়া কোষের দুই প্রান্তের মাঝামাঝি অবস্থান নেয় এবং প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত হয়।

২। প্লাজমামেমব্রেনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় DNA-অণুর প্রতিলিপন হয়।

৩। এ অবস্থায় কোষটি লম্বায় বৃদ্ধি পায়। কোষপ্রাচীর এবং প্লাজমামেমব্রেনের বৃদ্ধি কোষের দুই প্রান্তের মাঝখানে ঘটে থাকে।

৪। কোষপ্রাচীর ও প্লাজমামেমব্রেন লম্বায় বৃদ্ধির কারণে DNA রেপ্লিকা দুটি দুই দিকে পৃথক হয়ে যায়।

৫। লম্বায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষের মাঝখানে প্লাজমামেমব্রেন ক্রমশ ভেতরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং একই সাথে ঐ অংশে কোষপ্রাচীর সংশ্লেষিত হতে থাকে। এক সময় একটি কোষ দুটি কোষে পরিণত হয়।

৬। শেষ পর্যায়ে টার্গার প্রেসারের কারণে নতুন সৃষ্ট অপত্য কোষ দুটি পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায়।

৭। পৃথক অপত্য কোষ দুটি বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃকোষের সমান আকারের হয় এবং পুনরায় দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

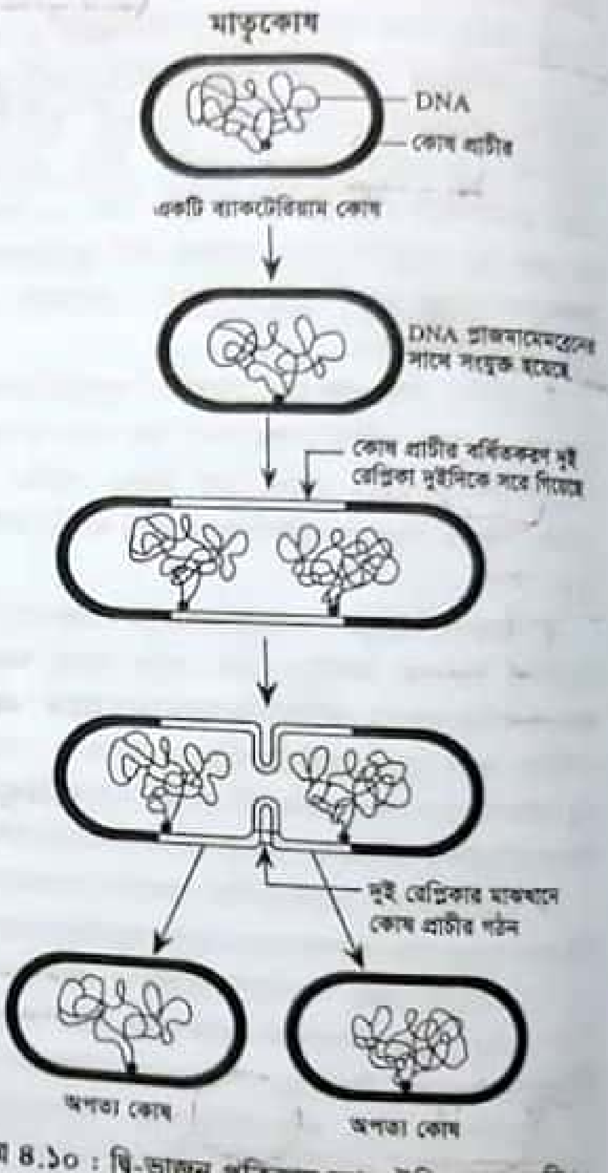

চিত্র ৪.১০ : দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি।

পরিবেশ উপযুক্ত হলে আমাদের অন্ত্রের *E. coli* ব্যাকটেরিয়া প্রতি বিশ মিনিটে সংখ্যা দ্বিগুণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এক দিনে *E. coli*-এর ৭২টি জেনারেশন সৃষ্টি হতে পারে (৪.৭ সেপ্টিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া, যার ওজন এক লক্ষ পাউন্ড)। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, কারণ কয়েক জেনারেশন বৃদ্ধির পরই এদের খাবার ঘাটতি দেখা দেয় এবং এদের বর্জ্য পরিবেশকে বিষাক্ত করে ফেলে, তাই দ্বিভাজন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে পোষক দেহের ইমিউন সিস্টেম দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার অব্যাহত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রয়োজনে ওষুধও দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারে, ফলে রোগ আরোগ্য হয়।

কাজ : মাতৃকোষ থেকে নতুন দুটি কোষ সৃষ্টির ধাপসমূহ নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

কিছু প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া অনুকূল পরিবেশে মুকুলোদগম প্রক্রিয়ায় অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে।

❑ **মুকুলোদগম (Budding) :** (i) কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়াতে মুকুলোদগম তথা কুঁড়ি সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। প্রথমে এক পাশে একটি ছোট কুঁড়ি বের হয়। (ii) পরে একদিকে কুঁড়িটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং অপর দিকে মূল ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়য়েড বস্তুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। (iii) নিউক্লিয়য়েড বস্তুর একটি খণ্ড মুকুলে প্রবেশ করে। (iv) মুকুলটি মাতৃকোষের প্রায় সমান হলে পৃথক হয়ে যায়।

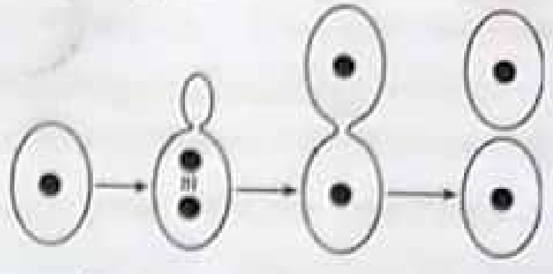

চিত্র ৪.১১ : ব্যাকটেরিয়ার মুকুলোদগম

❑ **অযৌন জনন (Asexual reproduction) :** প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া গনিডিয়া বা এন্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতিকে অযৌন জনন পদ্ধতি বলা হয়।

(i) **গনিডিয়া :** *Leucothris* জাতীয় সূত্রাকার ব্যাকটেরিয়ার অগ্রভাগ হতে গনিডিয়া নামক অযৌন একক সৃষ্টি হয় যা একসময় পৃথক হয়ে যায় এবং অনুকূল পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

(ii) **এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু উৎপাদন :** সাধারণত Bacillaceae গোত্রের ব্যাকটেরিয়া অন্তরেণু উৎপন্ন করে থাকে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম হতে একটি অন্তরেণু উৎপন্ন হয় তাই এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে না, প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মাত্র। অন্তরেণু গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং অত্যন্ত পুরু প্রাচীরে আবৃত থাকে। অনুকূল পরিবেশে অন্তরেণু অঙ্কুরিত হয়ে একটি মাত্র ব্যাক্টেরিয়া কোষ সৃষ্টি করে। এটি প্রকৃতপক্ষে জনন প্রক্রিয়া নয়।

চিত্র ৪.১২ : ব্যাক্টেরিয়ার অন্তরেণু

❑ **যৌন জনন (Sexual reproduction) :** প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়াতে কোনো যৌন জনন ঘটে না। এখানে কোনো গ্যামিট সৃষ্টি হয় না, কোনো মায়োসিস বিভাজন হয় না, কোনো ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় না, কোনো জাইগোটও তৈরি হয় না। তবে **বংশগতীয় বস্তু** (genetic material) **স্থানান্তর হয়।** বংশগতীয় বস্তু (ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম বা DNA) তিনভাগে স্থানান্তরিত হতে পারে।

(i) **কনজুগেশন নালিপথে :** একটি দাতা কোষ ও একটি গ্রহীতা কোষের মধ্যে একটি ফাঁপা নলের মতো কনজুগেশন নালি সৃষ্টি হয়। এই নালিপথে দাতা কোষ থেকে সাধারণত প্লাসমিড গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে প্লাসমিড অনুলিপিত হয়, একটি দাতা কোষে থেকে যায়, অপরটি নালিপথে গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হয়। **বহু ব্যাকটেরিয়া এভাবে প্রচলিত ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে।**

অতি বিরল ক্ষেত্রে দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমও এই নালিপথে গ্রহীতা কোষে স্থানান্তরিত হতে পারে। সাধারণত ক্রোমোসোমের কিয়দংশ গ্রহীতা কোষে প্রবেশের পর নালির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রহীতা কোষের ক্রোমোসোমের সাথে দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমের রিকম্বিনেশন ঘটে। অতিরিক্ত অংশ বিগলিত হয়ে যায়। গবেষণাগারে এটা ঘটানো সম্ভব হলেও প্রকৃতিতে খুবই কম ঘটে থাকে।

চিত্র ৪.১৩ : ব্যাকটেরিয়ার বংশগতীয় বস্তুর স্থানান্তর (ক) প্লাসমিড স্থানান্তর, (খ) মূল ক্রোমোসোমের আংশিক স্থানান্তর ও রিকম্বিনেশন

(ii) পরিবেশ থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ার (সাধারণত মৃত ব্যাকটেরিয়ার) DNA গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে ট্রান্সফরমেশন (Transformation)।

(iii) কখন ভাইরাসের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়ার জিনোম, কখনও তার জিনোম, অন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে ট্রান্সডাকশন (Transduction)।

উল্লেখ্য যে, Joshua Lederberg এবং Edward Tatum বিজ্ঞানীদ্বয় 1958 সালে *Escherichia coli* নামক ব্যাকটেরিয়ার যৌন প্রবণতা আবিষ্কার করার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ সালে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Bacteria) : ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার এবং অপকার দুই-ই করে থাকে। উভয় কারণের জন্য ব্যাকটেরিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা

(ক) চিকিৎসা ক্ষেত্রে :

১। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে : ব্যাকটেরিয়া হতে সাবটিলিন (*Bacillus subtilis* হতে), পলিমিক্সিন (*Bacillus polymyxa* হতে) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

২। প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে : ব্যাকটেরিয়া হতে কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়। ডি.পি.টি. (ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি ও ধনুষ্টংকার) রোগের টিকা বা প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। *Corynebacterium diptheriae* (D), *Bordetella pertussis* (P) এবং *Clostridium tetani* (T) হতে **DPT** (D= Diphtheria, P= Pertussis, T= Tetanus) নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) কৃষি ক্ষেত্রে :

৩। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে : মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়ার অবদান অনেক। মাটির জৈব পদার্থ সমূহে ব্যাকটেরিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। ব্যাকটেরিয়া মাটির উপাদান হিসেবেও কাজ করে। নানাবিধ আবর্জনা হতে পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার ও জৈব গ্যাস প্রস্তুত করে থাকে।

৪। নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : *Azotobacter, Pseudomonas, Clostridium* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু হতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রোজেন যৌগ পদার্থ হিসেবে মাটিতে স্থাপন করে, ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নডিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে থাকে। বাংলাদেশে মসুর ডালের মূলে নডিউল তৈরি করে *Rhizobium* গণের তিনটি প্রজাতি। এগুলো হলো *R. bangladeshense*, *R. bine* এবং *R. lentis*। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-এর তরুণ বিজ্ঞানী ড. মোঃ হারুন-অর রশিদ এই নতুন ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারক।

৫। নাইট্রিফিকেশন : অ্যামোনিয়াকে (NH_3) নাইট্রেট-এ (NO_3^-) পরিণত করাকে বলা হয় নাইট্রিফিকেশন। সাধারণত দুটি উপধাপে এটি সম্পন্ন হয়। প্রথম উপধাপে *Nitrosomonas*, *Nitrococcus* ইত্যাদি স্থলজ ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইট-এ (NO_2^-) পরিণত করে এবং দ্বিতীয় উপধাপে *Nitrobacter* নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে (NO_3^-) পরিণত করে। এদেরকে নাইট্রিফাইং (nitrifying) ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। [$NH_3 \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$]

৬। পতঙ্গনাশক হিসেবে : কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন-*Bacillus thuringiensis*) বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

৭। পশু খাদ্য বা সাইলেজ তৈরি : কৃষিক্ষেত্রে এবং দুগ্ধ শিল্পে পশুর অবদান উল্লেখযোগ্য। পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ঘাস জাতীয় পদার্থকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পানি মিশ্রিত করে *Lactobacillus* sp. এর কার্যকারিতায় পশুখাদ্য বা সাইলেজ তৈরি হয়। Yeast মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে গাভীর দুধের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৮। ফলন বৃদ্ধিতে : কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং গমের উৎপাদন শতকরা ২০৮ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

(গ) শিল্প ক্ষেত্রে :

৯। চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে : চা, কফি, তামাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াজাতকরণে *Bacillus megaterium* নামক ব্যাকটেরিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০। দুগ্ধজাত শিল্পে : *Streptococcus lactis, Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুধ হতে মাখন, দই, পনির, ঘোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

১১। পাট শিল্পে : ব্যাকটেরিয়ার পচনক্রিয়ার ফলেই পাটের আঁশগুলো পৃথক হয়ে যায় এবং আমরা সহজেই পাটের কাণ্ড থেকে আঁশ ছাড়াতে পারি। কাজেই আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা তুলনাহীন। এ ব্যাপারে *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট।

১২। চামড়া শিল্পে : চামড়া হতে লোম ছাড়ানোর ব্যাপারে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে *Bacillus* এর বিভিন্ন প্রজাতি চামড়ার লোম ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৩। বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস তৈরিতে : জৈব গ্যাস তৈরিতে এবং হেভী মেটাল (ভারী ধাতু) পৃথকীকরণেও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪। টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতিতে : টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করতে এ সল্ট ব্যবহৃত হয়।

১৫। রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকরণে : ভিনেগার (*Acetobacter xylinum* দিয়ে), ল্যাকটিক অ্যাসিড (*Bacillus lacticacidi* দিয়ে), অ্যাসিটোন (*Clostridium acetobutylicum* দিয়ে) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের জন্য শিল্পক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) মানব জীবনে :

১৬। সেলুলোজ হজমে : গবাদি পশু ঘাস, খড় প্রভৃতি খেয়ে থাকে। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে অবস্থিত এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ হজম করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই পশুপালন সহজ হয়।

১৭। ভিটামিন তৈরিতে : মানুষের অন্ত্রের *Escherichia coli (E. coli)* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-$বি_{১২}$, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

১৮। জিন প্রকৌশলে : জিন প্রকৌশলে অনেক ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli, Agrobacterium* প্রভৃতি) বাহক হিসেবে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়নে :

১৯। আবর্জনা পচনে : উদ্ভিদ ও প্রাণীর যাবতীয় মৃতদেহ, বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য জঞ্জাল পচন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বের জন্য ব্যাক্টেরিয়াকে 'প্রকৃতির ঝাড়ুদার' বলে।

২০। পয়ঃনিষ্কাশনে : জৈব বর্জ্য পদার্থকে দ্রুত রূপান্তরিত করে ব্যাকটেরিয়া পয়ঃপ্রণালিকে সুষ্ঠু ও চালু রাখে; যেমন—*Zooglea ramigera*।

২১। তেল অপসারণে : সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল-খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়; যেমন—*Pseudomonas aeruginosa*।

২২। বায়োগ্যাস উৎপাদন : *Bacillus, E. coli, Clostridium, Methanococcus*।

ব্যাকটেরিয়ার অপকারিতা

১। মানুষের রোগ সৃষ্টি : মানুষের অধিকাংশ মারাত্মক রোগগুলোই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে। মানুষের যক্ষ্মা (*Mycobacterium tuberculosis* দিয়ে), নিউমোনিয়া (*Diplococcus pneumoniae* দিয়ে), টাইফয়েড (*Salmonella typhi* দিয়ে), কলেরা (*Vibrio cholerae* দিয়ে), ডিপথেরিয়া (*Corynebacterium diptheriae* দিয়ে), আমাশয় (*Bacillus dysenteri* দিয়ে), ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস (*Clostridium tetani* দিয়ে), হুপিংকাশি (*Bordetella pertussis* দিয়ে) ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। এ ছাড়াও এনথ্রাক্স, মেনিনজাইটিস, লেপরসি (কুষ্ঠ রোগ), আনডিউলেন্ট জ্বর ইত্যাদি রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

যৌনবাহিত রোগ (**Sexually Transmitted Diseases = STD**) : যেসব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সেসব রোগকে যৌনবাহিত রোগ বলে। যেমন- গনোরিয়া ও

সিফিলিস : *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে গনোরিয়া (Gonorrhea) বলে। দীর্ঘকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। *Treponema pallidum* নামক ব্যাকটেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে সিফিলিস (Syphilis) বলে। এ রোগে দেহে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মৃত্যুও হতে পারে।

২। **অন্যান্য প্রাণীর রোগ সৃষ্টি :** গরু-মহিষের যক্ষা (*Mycobacterium bovis*), আনডিউলেটেড ফিভার, ভেড়ার এনথ্রাক্স (*Bacillus anthracis*), ইঁদুরের প্লেগ, হাঁস-মুরগির কলেরা (*Bacillus avisepticus*), গলাফোলা রোগ (*Pasteurella multocida*) ইত্যাদি রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে।

৩। **উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি :** বিভিন্ন ফসলী উদ্ভিদের অনেক রোগ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে। এতে ফসলের ফলন অনেক কমে যায়। গমের টুন্ডুরোগ (*Agrobacterium tritici* দিয়ে), ধানের পাতা ধ্বসা (leaf blight) রোগ (*Xanthomonas oryzae* দিয়ে), আখের আঠাঝরা রোগ (*Xanthomonas vasculorum* দিয়ে) ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া লেবুর ক্যাংকার (*Xanthomonas citri*), আলুর স্ক্যাব (*Streptomyces scabies*), টমেটোর ক্যাংকার *Corynebacterium michiganese*), আপেলের ফায়ার ব্লাইট (*Erwinia amylovora*), তামাকের ব্লাইট (*Pseudomonas tabacci*), শিমের লিফ স্পট (*Xanthomonas malvacearum*) রোগও ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়।

৪। **খাদ্যদ্রব্যের পচন ও বিষাক্তকরণ :** ব্যাকটেরিয়া নানা রকম টাটকা ও সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে পচন ঘটিয়ে আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। *Clostridium botulinum* নামক ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে **botulin** নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে থাকে। এতে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে যাকে **বটুলিজম** (botulism) বলে।

৫। **পানি দূষণ :** কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া (সাধারণত মল দিয়ে দূষিত) পানিকে পানের অযোগ্য করে।

৬। **মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্টকরণ :** নাইট্রেট জাতীয় উপাদান মাটিকে উর্বর করে থাকে। কিন্তু কতিপয় ব্যাকটেরিয়া (যেমন-*Bacillus denitrificans*) নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ায় মাটিস্থ নাইট্রেটকে ভেঙে মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়।

৭। **নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষতি সাধন :** ব্যাকটেরিয়া কাপড়-চোপড়, লোহা, কাঠের আসবাবপত্রসহ অনেক দ্রব্যের ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন-*Desulfovibrio sp.* লোহার পাইপে ক্ষতের সৃষ্টি করে পানি সরবরাহে বিঘ্ন।

৮। **ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বা জৈব সন্ত্রাস :** ক্ষতিকারক জীবাণুকে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে বায়োটেররিজম বলে।

৯। **যানবাহনের দুর্ঘটনা :** *Clostridium sp.* বিমানের জ্বালানিতে জন্মালে বিমান দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
১। আকৃতি	এরা অকোষীয়। এতে নিউক্লিয়াস নেই।	এরা কোষীয়। আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
২। আকার	এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, ০.০১ হতে ০.৩ মাইক্রোমিটার।	এরা আণুবীক্ষণিক, ০.২ হতে ৫.০ মাইক্রোমিটার।
৩। বংশবৃদ্ধি	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
৪। কেলাসিতকরণ (তরল দ্রবণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা)	কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে।	কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
৫। অঙ্গাণুর উপস্থিতি	এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন অঙ্গাণু নেই এবং বিপাক ক্রিয়াও দেখা যায় না।	এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন অঙ্গাণু আছে এবং বিপাক ক্রিয়া ঘটে।
৬। নিউক্লিক অ্যাসিডের অবস্থান	ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে।	ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।
৭। নিউক্লিক অ্যাসিডের প্রকৃতি	কোষে DNA বা RNA যে কোনো একপ্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	কোষে DNA বা RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।
৮। এনজাইমের উপস্থিতি	এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	এদের দেহে এনজাইম থাকে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

ব্যাকটেরিয়া দিয়ে মানুষ, পশু এবং গাছপালার অসংখ্য রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর মধ্যে কতিপয় রোগ ফসল ও মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে, দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উদ্ভিদে সাধারণত ব্লাইট, উইল্ট, গল ও রট (blight, wilt, gall, rot) রোগ হয়ে থাকে। এখানে ব্যাকটেরিয়াজনিত ধানের ব্লাইট রোগ এবং মানুষের কলেরা রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ব্লাইট (Blight) : গাছের ফুল, পাতা ও কাণ্ডের টিস্যুর ক্ষয়প্রাপ্তি (মরে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া) হওয়াকে ব্লাইট বলা হয়। এখানে ধান গাছের ব্লাইট (ধ্বসা) রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

(ক) ধান গাছের ব্লাইট রোগ (Blight disease of rice) : ধানের মারাত্মক রোগগুলোর মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অন্যতম। প্রায় পৃথিবীব্যাপীই এর বিস্তৃতি। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণটি (strain) শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। জাপানের কৃষকেরা সর্বপ্রথম এ রোগের সন্ধান পান বলে ধারণা করা হয়। Takaeshi ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগটি হয়।

রোগজীবাণু (Pathogen/Causal organism) : ধান গাছের ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট নামক রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings *et al.* এটি দণ্ডাকৃতির, ১.২ × ০.৩ - ০.৫ µm. অপেক্ষাকৃত মোটা ও খাটো। এরা সাধারণত এককভাবে থাকে, কখনো দুটি এক সাথে থাকতে পারে, তবে চেইন সৃষ্টি করে না। এরা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং স্পোর তৈরি করে না। এদের কোনো ক্যাপসিউল নেই, তবে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে। আগার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া গোলাকার, মসৃণ, মোমের ন্যায় হলুদাভ ও চকচকে কলোনি উৎপন্ন করে। এরা বিভিন্ন ঘাস (*Leersia oryzoides*, *Leptochloa dubia*, *Cyperus rotundus*, *C. difformis*) ও বন্য ধানকে (*Oryza rufipogon*, *O. australiensis*) বিকল্প পোষক হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

রোগাক্রমণ (Infection) : একাধিক উৎস থেকে রোগাক্রমণ ঘটতে পারে, যেমন- রোগাক্রান্ত বীজ, রোগাক্রান্ত খড়, জমিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। পাতার ক্ষত স্থান, কাটা স্থান (লাগানোর আগে অনেক সময় চারার লম্বা পাতার আগা কেটে দেয়া হয়), হাইডাথোড বা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে জীবাণু গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। পরে জীবাণু শিরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং গাছ নেতিয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা (২৫–৩০° সে.), উচ্চ জলীয় বাষ্প, বৃষ্টি, জমিতে অধিক পানি রোগাক্রমণে সহায়তা করে। অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগও রোগ বিস্তারের অনুকূল হয়। কড়া বাতাস পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে থাকে, তবে ঐ ক্ষত স্থান দিয়ে রোগজীবাণু ভেতরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে।

রোগ লক্ষণ (Sign and Symptoms) : সাধারণত রোগ লক্ষণ পাতায়ই সীমিত থাকে। লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

১। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়।

২। পাতায় ভেজা (Water-soaked), অর্ধস্বচ্ছ ও লম্বা লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগ পাতার শীর্ষে শুরু হয়।

৩। দাগ ক্রমশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় হতে থাকে এবং ঢেউ খেলানো প্রান্ত বিশিষ্ট হয়।

৪। দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা ধূসর বর্ণের হয়।

৫। সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস আক্রান্ত স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়।

৬। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।

৭। আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মরে যায়।

৮। লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাও প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে চারা ঢলে পড়ে।

৯। ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

১০। ধানের শীষে কোনো ফলন হয় না।

১১। আক্রান্ত গাছের অধিকাংশে ধান চিটায় পরিণত হয়।

রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ

১। সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ চাষ করা।
২। বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহক। ব্লিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।
৩। কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
৪। জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ধানের খড়, বীজ থেকে গজানো চারা সরাতে হবে।
৫। বীজতলায় পানি কম রাখতে হবে, অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।
৬। বীজ বুনা বা চারা লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে, পরিত্যক্ত খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
৭। রোপণের সময় চারাগাছের পাতা ছাঁটাই করা যাবে না।
৮। নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করা যাবে না।
৯। ধান আক্রান্ত হলে ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
১০। ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেট এম, ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
১১। বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

(খ) কলেরা (Cholera)

রোগজীবাণু : *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি একটু বাঁকা, কমার মতো। এর দৈর্ঘ্য ১-৫ মাইক্রন এবং প্রস্থ ০.৪-০.৬ মাইক্রন। এর একপ্রান্তে একটি ফ্ল্যাজেলাম থাকে। কলেরা একটি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। রবার্ট কচ সর্বপ্রথম কলেরা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। কলেরা রোগের জীবাণু দেহে ক্ষুদ্রান্ত্রে মিউকাসের সাথে লেগে যায় এবং কলেরাজেন (Choleragen) নামক টক্সিন নিঃসৃত করে। কলেরাজেন একটি এন্টারোটক্সিন। বিভিন্ন কলেরার মধ্যে এশিয়াটিক কলেরা সবচেয়ে মারাত্মক।

রোগ লক্ষণ : কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ হলো প্রবল উদরাময় (ডায়রিয়া)। পায়খানার প্রথম দিকে মল থাকে, পরে চালধোয়া পানির মতো নির্গত হয়। রোগীর দেহে জ্বর থাকে এবং বমি হতে পারে। নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ হয়। শরীর টান (cramp) এ রোগের একটি প্রধান লক্ষণ। রক্ত প্রবাহ কমে মস্তিষ্কে O_2 এর ঘাটতি দেখা দেয় ও রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। দেহে মাংসপেশীর সংকোচন দিতে পারে। বমি এবং ঘন ঘন পানির ন্যায় পায়খানার ফলে রোগীর দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে, একই কারণে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা, খিঁচুনি দেখা দেয়, রক্তচাপ কমে যায়, দেহ ঠান্ডা হয়ে আসে। রোগের প্রচণ্ডতায় রোগীর চোখ বসে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়ে যায়। চামড়া কুঁচকে যায়। বেশি পরিমাণে শরীর থেকে পানি ও ইলেকট্রোলাইট হারানোর ফলে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রোগী মারা যেতে পারে। এছাড়া রক্ত সংবহনতন্ত্র অচল হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

প্রতিকার : কলেরা রোগীর দেহ থেকে অতিমাত্রায় পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, তাই পানি ও লবণ সমন্বয়ের জন্য শিরায় স্যালাইন দেয়া হলো উত্তম চিকিৎসা। সাথে ডাবের পানি ও খাবার স্যালাইন ORS (Oral Rehydration Saline) দেয়া যেতে পারে। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। মোট কথা রোগীর দেহে যেন পানিশূন্যতা দেখা না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ : কলেরা একটি পানিবাহিত রোগ, তাই বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা করতে হবে। দূষিত পানি, বাসি খাবার, রাস্তার উন্মুক্ত খাবার ও পানীয় বর্জন করতে হবে। রোগীর ভেদ-বমি থেকে মাছির সাহায্যে গৌণ সংক্রমণ ঘটে, তাই খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। রোগীর পরিধেয় কাপড়, বিছানা-পত্র পুকুর বা নদী নালায় না ধুয়ে সিদ্ধ করে রোদে শুকাতে হবে। সম্ভব হলে রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। কোনো এলাকায় কলেরা দেখা দিলে সবার কলেরা ভ্যাকসিন (টিকা) দিতে হবে। কলেরা রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের পানি ও কলেরা স্যালাইন খাওয়াতে হবে যাতে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি দ্রুত পূরণ হয়।

ব্যবহারিক : টক দই থেকে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্কন।

তত্ত্ব : কতিপয় ব্যাকটেরিয়ার জৈব ক্রিয়াকলাপের ফলে দুধ, দই-এ পরিণত হয়, তাই দই-এ প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে।

উপকরণ : কিছু পরিমাণ টক দই সাসপেনশন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, কাচের পরিষ্কার শুকনো স্লাইড, পাতিত পানি (পরিস্রুত পানি), ড্রপার, নিডল, তুলি, স্যাফ্রানিন রং, স্পিরিট ল্যাম্প, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, একটি টেস্টটিউব।

কার্যপদ্ধতি : ১। প্রথমে একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে সামান্য পরিমাণ টক দই নিতে হবে এবং তাতে পরিমাণ মতো পরিস্রুত পানি মিশিয়ে ভালোভাবে কিছুক্ষণ ঝাঁকাতে হবে।

২। এবার ফ্লাস্কটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর কিছুক্ষণ ধরে রেখে হালকা গরম করতে হবে এবং ঠান্ডা হওয়ার জন্য ১০-১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। ১০-১৫ মিনিট পর দেখা যাবে দই-এর ঘন অংশ তলানি হিসেবে নিচে জমা হয়েছে আর জলীয় অংশ ওপরে রয়েছে। জলীয় অংশটুকু একটি টেস্টটিউবে ঢেলে নিতে হবে। এই জলীয় অংশেই ব্যাকটেরিয়ার নমুনা।

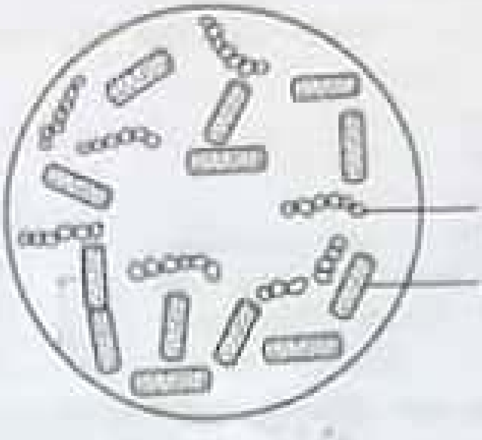

চিত্র ৪.১৪ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট টক দই-এ ব্যাকটেরিয়া।

৩। টেস্টটিউব থেকে ড্রপার দিয়ে এক ড্রপ নমুনা একটি পরিষ্কার স্লাইডের মাঝখানে রাখতে হবে এবং নিডলের সাহায্যে তরল নমুনাটুকু স্লাইডে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৪। নমুনাটুকু বাতাসে শুকিয়ে গেলে স্লাইডকে স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনের ওপর দিয়ে কয়েকবার আনা-নেওয়া করলে নমুনার আস্তরটি স্লাইডের সাথে ভালোভাবে লেগে যাবে।

৫। এবার স্লাইডের ওপর শুকনা নমুনাতে স্যাফ্রানিন দ্রবণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং ২/৩ মিনিট পর হালকা করে পরিষ্কার পানি ঢেলে দিলে অতিরিক্ত রং পানির সাথে চলে যাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে স্লাইডটি শুকিয়ে যাবে। স্লাইডটি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

পর্যবেক্ষণ : স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন অবজেকটিভ-এর নিচে রেখে নিরীক্ষণ করলে লাল রং-এ রঞ্জিত দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষুদ্র পুঁতির মালার মতো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া দেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত : সরবরাহকৃত টক দই-এ গোলাকার *(Streptococcus)* ও দণ্ডাকার *(Lactobacillus)* ব্যাকটেরিয়া থাকে। (টক দই-এর ব্যাকটেরিয়া মানুষের জন্য উপকারী, অপকারী নয়। কাজেই টক দই খেতে অসুবিধা নেই।)

অঙ্কন : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা দৃশ্যটি ব্যবহারিক খাতায় যথাযথভাবে আঁকতে হবে।

ম্যালেরিয়া পরজীবী (Malarial Parasite)

ম্যালেরিয়া বিশ্বের প্রাচীনতম রোগগুলোর অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের শুরুতে চীন দেশে এটি **'অনুপম পর্যাবৃত্ত জ্বর'** (unique periodic fever) হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য এ রোগের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে একে **'রোমান জ্বর'** বলা হতো। মধ্যযুগে একে **'জলা জ্বর'** (marsh fever) বলা হতো। **"Malaria"** শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী **Torti** (1753)। দুটি ইতালিয় শব্দ *Mal* (অর্থ-দূষিত) ও *aria* (অর্থ-বায়ু) হতে Malaria শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে, যার আভিধানিক অর্থ দূষিত বায়ু। তখনকার দিনে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে "দূষিত বায়ু সেবনে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়।" ফরাসি ডাক্তার **Charles Laveron** (1880) ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত রক্ত কণিকা থেকে ম্যালেরিয়ার পরজীবী আবিষ্কার করলে প্রায় শতবছরের এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। এজন্য তাঁকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কর্মরত বৃটিশ সেনাবাহিনীর ডাক্তার **Sir Ronald Ross** আবিষ্কার করেন যে *Anopheles* গণভুক্ত মশকীরা এ রোগের জীবাণু একদেহ হতে অন্যদেহে বিস্তার ঘটায়। এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাকে ১৯০২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। মূলতঃ ম্যালেরিয়া হচ্ছে *Anopheles* মশকীবাহিত (মশা নয়) এক ধরনের জ্বররোগ। এ রোগে রক্তের লোহিত কণিকা

ধ্বংস হয়, তাই রক্তস্বল্পতাসহ (anaemia) বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। *Plasmodium* গণের প্রায় ৬০টি প্রজাতি মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এ রোগ সৃষ্টি করে। মানবদেহে এ পর্যন্ত রোগ সৃষ্টিকারী ৪টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান :

Levin *et al.* (১৯৮০) অনুসরণে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

Kingdom : Protista
Subkingdom : Protozoa
Phylum : Apicomplexa
Class : Sporozoa
Order : Haemosporidia
Family : Plasmodiidae
Genus : *Plasmodium*
Species : *P. vivax*

মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীগুলোর নাম, সৃষ্ট রোগের নাম ও জ্বরের প্রকৃতি নিম্নরূপ :

ম্যালেরিয়ার পরজীবীর নাম	রোগের নাম	জ্বরের প্রকৃতি
১. *Plasmodium vivax*	বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	48 ঘণ্টা পর পর জ্বর আসে
২. *Plasmodium malariae*	কোয়ারটার্ন ম্যালেরিয়া	72 ঘণ্টা পর পর জ্বর আসে
৩. *Plasmodium ovale*	মৃদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	48 ঘণ্টা পর পর জ্বর আসে
৪. *Plasmodium falciparum*	ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	36–48 ঘণ্টা পর পর জ্বর আসে

জীবন চক্র (Life Cycle)

কোন জীব তার অনুরূপ সৃষ্টি করতে যে সকল ধাপসমূহ অতিক্রম করে, তাদের সমষ্টিকে জীবন চক্র বলে। *Plasmodium vivax* এর জীবন চক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়, যথা-মানুষ ও মশকী। প্রাণির সংজ্ঞানুযায়ী মানুষ ম্যালেরিয়া পরজীবীর মাধ্যমিক (intermediate) বা গৌণ (secondary) পোষক (host), কারণ মানবদেহে এ পরজীবীর যৌন জনন হয় না। অপরদিকে মশকী এ পরজীবীর নির্দিষ্ট (definite) বা মুখ্য (primary) পোষক, কারণ মশকীর দেহে এ পরজীবীর যৌন পরিপক্বতা তৈরি হয় ও যৌন জনন সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রোটোজোয়া–পতঙ্গ–মেরুদণ্ডী সম্পর্কিত পরজীবী পোষক চক্রে প্রজননের গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পোষক নির্ধারণ করা হয়। তাই মানুষকে এ পরজীবীর মুখ্য পোষক ও মশকীকে গৌণ পোষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

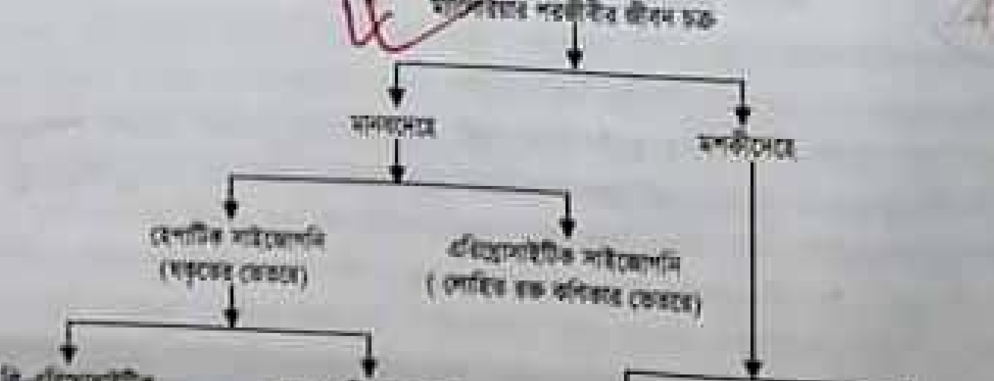

[বি. দ্র. (i) দুটি পোষক কেন প্রয়োজন- নিম্নশ্রেণির জীবেরা বার বার অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের কারণে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাই তারা মাঝে মাঝে যৌন জননে অংশ নিয়ে জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করে। এটি নিম্নশ্রেণির জীবদের Evolutionary অভিযোজন। *Plasmodium* এর জীবনেও একই ঘটনা ঘটে। তাই তারা একটি পোষকের মাধ্যমে (যেহেতু যৌন জনন মশকীতে ও অযৌন জনন মানবদেহে) জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারে না।

(ii) কেবলমাত্র স্ত্রী *Anopheles* ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় কেননা স্ত্রী মশকীর ডিম্বাণু পরিস্ফুটনের জন্য উচ্চ প্রোটিনযুক্ত প্রাণীর রক্ত প্রয়োজন। তাই কেবলমাত্র মশকীরাই (মশা নয়) রক্ত পান করে এবং জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। পুরুষ মশারা ফুলের মধু বা অন্যান্য উৎস হতে খাবার গ্রহণ করে মানুষকে দংশন করে না।

অন্যদিকে *Culex* বা *Aedes* প্রভৃতি মশকীর পরিপাকনালিতে বিশেষ ধরনের এনজাইম আছে, যা জীবাণুর গ্যামিটোসাইটগুলোকে নষ্ট করতে সক্ষম। তাই এরা এ জীবাণুর বিস্তার ঘটাতে পারে না। কিন্তু *Anopheles* এর দেহে এরূপ এনজাইম না থাকায় গ্যামিটোসাইটগুলো সক্রিয় থাকে ও রোগের বিস্তার ঘটায়।]

মানবদেহে জীবন চক্র

মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্ত কণিকায় ম্যালেরিয়ার পরজীবী অযৌন পদ্ধতিতে জীবন চক্র সম্পন্ন করে। এ জীবন চক্রে সাইজন্ট নামক বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট একটি বিশেষ দশা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের জীবন চক্রকে **সাইজোগনি** বলে। মানবদেহে সংঘটিত সাইজোগনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) হেপাটিক সাইজোগনি (Hepatic schizogony) বা যকৃত সাইজোগনি এবং (২) এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Erythrocytic schizogony) বা লোহিত রক্ত কণিকায় সাইজোগনি।

হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনি

বিজ্ঞানী Shortt এবং Garnham (1948) মানুষের যকৃতে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্রের বর্ণনা দেন। হেপাটিক সাইজোগনি নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়- (ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি, (খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি।

(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি (Pre-erythrocytic hepatic schizogony) : এ চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ-

১। *Anopheles* মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থিত *Plasmodium*-এর স্পোরোজয়েট (দৈর্ঘ্য 10–14 µm এবং প্রস্থ 0.05–1 µm) দশার পরিণত জীবাণু মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতের মাধ্যমে বাহিত হয়ে কেমোট্যাক্সিস এর কারণে যকৃতে এসে আশ্রয় নেয়। মানবদেহে প্রবেশের প্রায় ৩০-৪৫ মিনিটের মধ্যে জীবাণুগুলো যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে মাকুআকৃতির স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিপ্টোজয়েটে পরিণত হয়।

৩। প্রতিটি ক্রিপ্টোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস (প্রজাতিভেদে প্রায় ১০০০-১২০০) বিশিষ্ট দশায় পরিণত হয়। পরজীবীর এ দশাকে সাইজন্ট বলে।

৪। পরবর্তী পর্যায়ে সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে কিছু পরিমাণ সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেন সৃষ্টি হয়। পরজীবীর এ দশাকে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে।

৫। চক্রের শেষ পর্যায়ে হেপাটোসাইট ভেঙে যায় এবং ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো যকৃতের সাইনুসয়েডে আশ্রয় নেয় এবং এখান থেকে পরবর্তী চক্র শুরু করে।

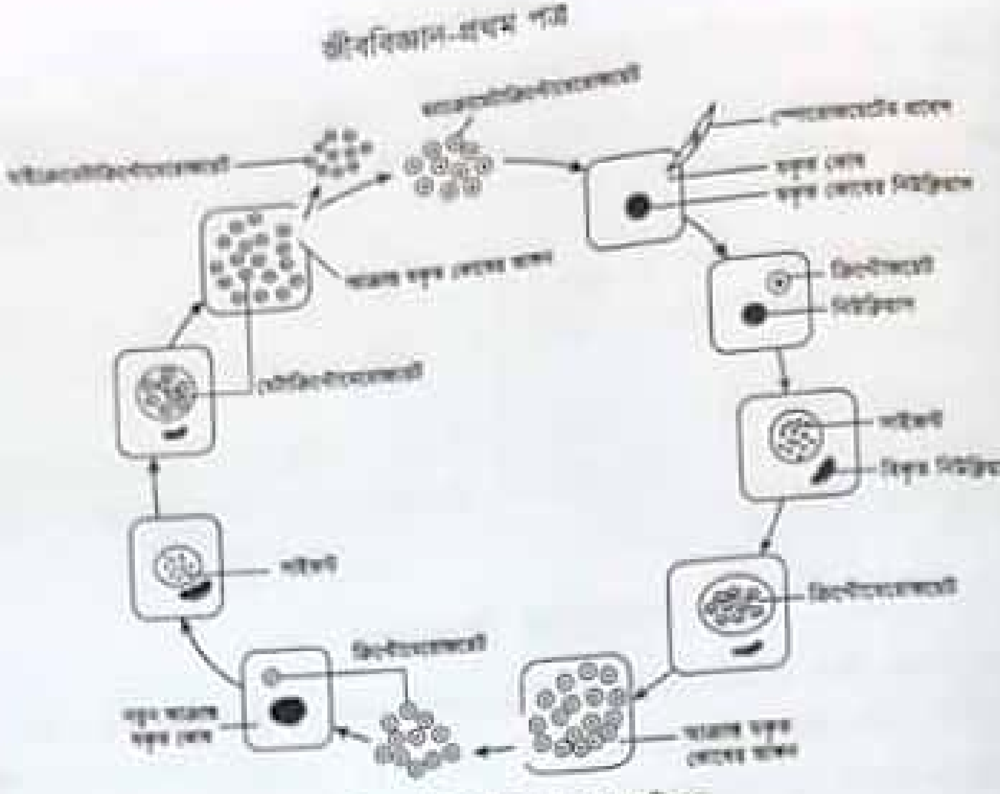

ম্যালেরিয়া পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্র

চিত্র ৪.১৫ : হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনি (duration ৭-১০ দিন)।

(খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি (Exo-erythrocytic hepatic schizogony) : এ চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রে উৎপন্ন ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন হেপাটোসাইটকে আক্রমণের মাধ্যমে এ চক্রের সূচনা করে।

২। সাইজন্ট : পরিণত ক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বারবার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পরিণত হয়।

৩। মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট : সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসের চারপাশে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে যেসব নতুন কোষ সৃষ্টি করে তাদেরকে মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট বলে।

৪। আক্রান্ত যকৃত কোষের ভাঙন : মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো পরিণত হলে আক্রান্ত যকৃত কোষ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে এবং নতুন নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এ চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ অবস্থায় মানুষের যকৃতে মেরোজয়েট পাওয়া যায়। আকারের ভিত্তিতে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (১) মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (২) ম্যাক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট। প্রথমোক্তগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং শেষোক্তগুলো অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির। বড় আকৃতির মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং ছোট মেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষকে আক্রমণের পরিবর্তে রক্তস্রোতে চলে আসে এবং মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে। স্পোরোজয়েট থেকে এ অবস্থায় পৌঁছতে পরজীবীর প্রায় ৭-১০ দিন সময় লাগে। মেরোজয়েটগুলো ম্যালেরিয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করা ছাড়াই বছর পর বছর ধরে যকৃত কোষে সাইজোগনি চালিয়ে যেতে পারে।

এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্ত কণিকায় সংঘটিত সাইজোগনি

প্রি-প্যাটেন্টকাল (রক্তে আত্মপ্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়) অতিক্রমের পর পরজীবী লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করার মাধ্যমে এ চক্রের সূচনা করে।

১। মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষ থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট দশা বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে ক্ষুদ্র একটি কোষ গহ্বর ও ছোট একটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এটি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী দশা।

২। কোষ গহ্বরটি ধীরে ধীরে বড় হয় ও নিউক্লিয়াসটি একপাশে সরে যায়, ফলে জীবাণুটি একটি আংটি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনেট রিং বলা হয়।

৩। প্রায় ৮ ঘণ্টার মধ্যে পরজীবীর অভ্যন্তরস্থ গহ্বর অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরজীবীটি ক্ষণপদবিশিষ্ট *Amoeba* এর আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাই এ দশাকে অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত রক্ত কণিকাটি আকারে স্ফীত হয় এবং এর সাইটোপ্লাজমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা দেখা যায়। এ গুলোকে সাফনার্স দানা (কণা) বলে। রক্ত কণিকায় সাফনার্স দানার উপস্থিতি দেখে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়।

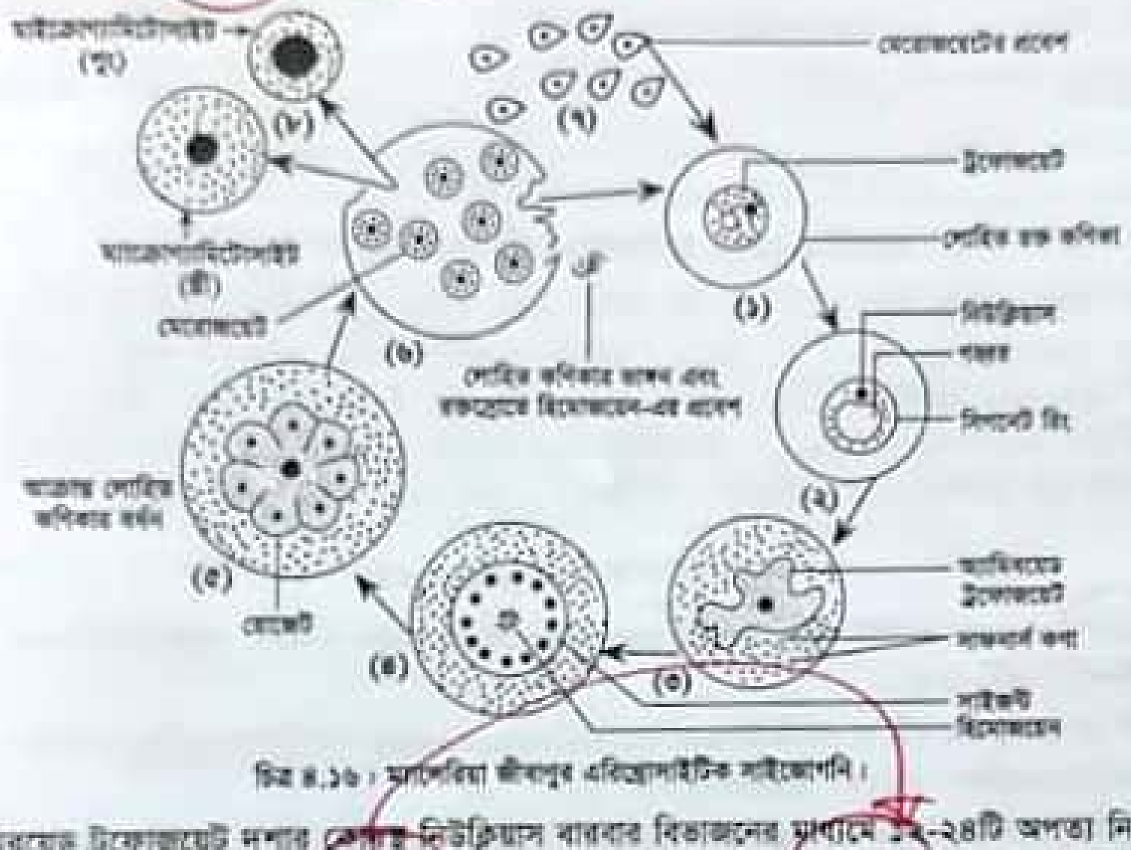

চিত্র ৪.১৬ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি।

৪। অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট দশার কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে ১২-২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এ অবস্থাকে সাইজন্ট বলা হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়।

৫। সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস প্রায় 45 ঘণ্টা পর সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেনসহ বিভক্ত হয়ে ১২-১৮টি মেরোজয়েট-এ পরিণত হয়। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাপড়ির ন্যায় দুই স্তরে সজ্জিত হয়। এ দশাকে রোজেট বলে।

৬। পরবর্তী অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্লাজমায় বের হয়ে আসে। মেরোজয়েট প্লাজমায় ঢুকে গেলে রক্তের শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এসময় রক্তে প্রচুর পরিমাণে পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় এবং এর প্রভাবেই দেহে জ্বর আসে। সমগ্র এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৪৮-৭২ ঘণ্টা সময় লাগে।

৭। মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

৮। কতিপয় মেরোজয়েট গ্যামিটোসাইটে পরিণত হয়। গ্যামিটোসাইট দুই প্রকার। পুং গ্যামিটোসাইট বা মাইক্রোগ্যামিটোসাইট এবং স্ত্রী গ্যামিটোসাইট বা ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট। পুং গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে ছোট কিন্তু এর নিউক্লিয়াস বড় এবং স্ত্রী গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে বড় কিন্তু এর নিউক্লিয়াস ছোট হয়। স্ত্রী ও পুং গ্যামিটোসাইটগুলো পোষক দেহের প্রান্তীয় রক্তনালীতে অবস্থান করে। মানুষের রক্তে গ্যামিটোসাইটগুলোর আর কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। পরবর্তী ধাপগুলো সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা কেবলমাত্র স্ত্রী *Anopheles* মশকীর দেহেই বিদ্যমান। গ্যামিটোসাইট ৭ দিনের মধ্যে। ৭ দিনের মধ্যে মশকী কর্তৃক শোষিত না হলে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের রক্তে গ্যামিটোসাইট ৭ দিনের বেশি বাঁচে না।

প্রি-এরিথ্রোসাইটিক (হেপাটিক) এবং এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	হেপাটিক সাইজোগনি	এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
১. কোথায় ঘটে	মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়।	মানুষের লোহিত কণিকায় ঘটে।
২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ	ক্রিপ্টোজয়েট, ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট নামক ধাপসমূহ পাওয়া যায়।	ট্রফোজয়েট, সিগনেট রিং, সাইজন্ট ও মেরোজয়েট ধাপসমূহ দেখা যায়।
৩. হিমোজয়েন	উৎপন্ন হয় না।	শেষ দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়।
৪. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া	এ চক্র চলাকালে মানুষের জ্বর হয় না।	এ চক্র চলাকালে মানবদেহে কাঁপুনিসহ জ্বর হয়।
৫. সাফনার-এর দানা	দেখা যায় না।	সাইজন্টের বাইরে সাফনার-এর দানা পাওয়া যায়।
৬. জ্বর	জ্বর হয় না।	কাঁপুনিসহকারে জ্বর হয়।

মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্র

ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত কোনো মানুষের রক্ত মশকী কর্তৃক গৃহীত হলে গ্যামিটোসাইটসহ বিভিন্ন দশার জীবাণু মশকীর ক্রপের লুমেনে প্রবেশ করে। *Anopheles* ব্যতীত অন্যান্য মশকীর পরিপাকতন্ত্রের এনজাইম সব দশার জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে ফেললেও, *Anopheles* মশকীর পৌষ্টিকতন্ত্রে গ্যামিটোসাইটগুলো ধ্বংস করার এনজাইম না থাকায় এগুলো বেঁচে থাকে। বরং *Anopheles* এর ক্রপে উপস্থিত এনজাইমের উদ্দীপনায় গ্যামিটোসাইটগুলো পরবর্তী ধাপ শুরু করতে উদ্দীপ্ত হয়। মশকীর দেহে এ জীবাণুর গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি পর্যায় সম্পন্ন হয়।

গ্যামিটোগনি (Gametogony)

মশকীর ক্রপের অভ্যন্তরে গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন জননকে গ্যামিটোগনি বলে। গ্যামিটোগনি কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে ঘটে। যথা :

১। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি বা গ্যামিটোজেনেসিস (Gametogenesis): গ্যামিটোজেনেসিস দু'প্রকার। যথা–
(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস এবং (খ) উওজেনেসিস।

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis–sperm = শুক্রাণু, gen = গঠন, sis = পদ্ধতি) : মাইক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণু বা পুংজনন কোষ গঠন প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা :

(i) প্রথমে মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে ৪ – ৮টি ক্ষুদ্রাকার হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় জীবাণু কয়েকটি কোণা (৪ – ৮টা) বিশিষ্ট হয়।

(ii) প্রতিটি কোণার মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এদেরকে সাইটোপ্লাজমীয় অভিক্ষেপ বলে।

(iii) এর পরপরই জীবাণুর দেহটি কতগুলো ফ্লাজেলা আকৃতির সরু মাকুর মতো মাইক্রোগ্যামিটে বা শুক্রাণুতে পরিণত হয়। [ক্রপের গহ্বরে তাপের তারতম্যের দরুন এই প্রক্রিয়া ঘটে]। ক্রপে গহ্বরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পার্মাটোজেনেসিসের এ বিশেষ প্রক্রিয়াকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন (Exflagellation) বলে।

(iv) মাইক্রোগ্যামিটগুলো প্রথমে একসাথে থাকে, পরে এরা মাতৃকোষ থেকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য সাঁতার কাটতে থাকে।

(খ) উওজেনেসিস (Oogenesis -Oo = ডিম্বাণু , gen = গঠন, sis = পদ্ধতি) : ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে ম্যাক্রোগ্যামিট বা ডিম্বাণু বা স্ত্রীজননকোষ গঠন প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা–

(i) প্রথমে প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট-এর হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয় ও একটি করে সক্রিয় গোলাকার ম্যাক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। এ ছাড়া পোলার বডি নামক আর একটি কোষের আবির্ভাব ঘটলেও শীঘ্রই তা নষ্ট হয়ে যায়।

(ii) এর পরপরই ম্যাক্রোগ্যামিটের একপ্রান্ত কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলকে নিষেক শঙ্কু/কোন (Fertilization cone) বা আকর্ষণা শঙ্কু (Reception cone) বলে। ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস এ শঙ্কুর কাছে অবস্থান করে।

২। নিষেক ও জাইগোট গঠন (Fertilization and the formation of zygote) : মুক্ত মাইক্রোগ্যামিটগুলো এরপর পৃথক পৃথকভাবে ম্যাক্রোগ্যামিটের বা ডিম্বাণুর নিষেক শঙ্কুর দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রতিটা ডিম্বাণুতে একটি করে শুক্রাণু প্রবেশ করে এবং নিষেক সম্পন্ন করে। নিষিক্ত ডিম্বাণু হতে পরে গোলাকার জাইগোট (ডিপ্লয়েড) গঠিত হয়।

৩। উওকিনেট গঠন : মশকী রক্ত শোষণের ১২-১৪ ঘণ্টা পর গোল ও নিশ্চল জাইগোটটি সচল হয় এবং কিছুটা লম্বাকৃতি ধারণ করে উওকিনেট-এ পরিণত হয়। এগুলো লম্বায় ১৮-২৪ মাইক্রোমিটার এবং প্রস্থে ৩-৫ মাইক্রোমিটার। উওকিনেট 24 ঘণ্টার ভেতরেই মশকীর ক্রপের অন্তঃপ্রাচীর ভেদ করে বহিঃপ্রাচীরের নিচে এসে পৌঁছায় এবং 40 ঘণ্টার মধ্যে সিস্ট আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে গোলাকার উওসিস্টে (Oocyst) পরিণত হয়। আক্রান্ত একটি মশকীর ক্রপে ৫০-৫০০টি পর্যন্ত উওসিস্ট দেখা যায়। উওসিস্ট পরিণত হতে ১০-২০ দিন সময় লাগে।

স্পোরোগনি (Sporogony)

মশকীর ক্রপের দুই স্তরের মাঝে সংলগ্ন থাকা অবস্থায় উওসিস্ট দশার জীবাণু যে জননের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট দশার জীবাণু সৃষ্টি করে তাকে স্পোরোগনি বলে। স্পোরোগনিকে অনেকে অযৌন জনন বলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি যৌন জননেরই পরবর্তী অবস্থা যার মাধ্যমে জীবাণুটি সক্রিয় স্পোরোজয়েট দশায় পরিণত হয়।

১। উওসিস্টের নিউক্লিয়াস বিভাজন : ক্রপের গায়ে সংলগ্ন অবস্থায় প্রতিটি উওসিস্টের (2n) নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস পদ্ধতিতে ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। | ক্রপের প্রাচীরে একই সাথে ৫০–৫০০টি উওসিস্ট থাকতে পারে। উওসিস্টের এই মায়োসিসকে পোস্ট জাইগোটিক মায়োসিস (Post zygotic meiosis) বলে। | পরিণত উওসিস্টের আকার প্রথম অবস্থা থেকে ৪–৫ গুণ বড় হয়। উওসিস্ট পরিণত হতে প্রায় ১০–২০ দিন সময় লাগে।

চিত্র ৪.১৭ : মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন চক্র।

২। পরিস্ফুটনরত উওসিস্ট : সিস্ট প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম জমা হয় ও পরে তার চারদিকে কোষঝিল্লি গঠিত হয়ে বহু সংখ্যক গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি হয়।

৩। স্পোরোজয়েট গঠন : এরপর কোষগুলো আকৃতি পরিবর্তন করে মাকু আকৃতির স্পোরোজয়েটে (Sporozoite) পরিণত হয়। স্পোরোজয়েটগুলো এরপর সিস্ট প্রাচীর ভেঙে মশকীর হিমোসিলে মুক্ত হয়। একটি উওসিস্টে প্রায় দশ হাজার স্পোরোজয়েট থাকতে পারে। স্পোরোজয়েটগুলো হিমোসিল থেকে মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকে। একটি মশকীর লালাগ্রন্থিতে প্রায় ৩,২৬,০০০ স্পোরোজয়েট থাকতে পারে। রক্তপিপাসু মশকী

কোনো মানুষের রক্ত পান করলে জীবাণুগুলোর শতকরা ১০% লালারসের সাথে মানবদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। মশকীর লালাগ্রন্থিতে স্পোরোজয়েটগুলো প্রায় ২ মাস অবস্থান করে।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রে জনুক্রম ব্যাখ্যা

কোনো জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম (alternation of generation) বলে। ম্যালেরিয়া জীবাণু একটি অন্তঃপরজীবী প্রোটোজোয়া প্রাণী। এদের জীবন চক্রে জনুক্রম ঘটে।

হ্যাপ্লয়েড (n) দশা :

স্পোরোজয়েট দশা (n) : মশকীর দেহে স্পোরোগনির ফলে সৃষ্টি হয় স্পোরোজয়েট দশা (n)। এই স্পোরোজয়েটধারী মশকী মানুষকে দংশন করার সময় লালা নিঃসরণ করে। এ লালা এন্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করে, জায়গাটিকে অবশ ও পিচ্ছিল করে। আর এ লালার সাথে জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n) : স্পোরোজয়েট (n) মানুষের যকৃতকে আক্রমণ করে সেখানে হেপাটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। হেপাটিক সাইজোগনির ফলে সৃষ্টি হয় মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n)। মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্র সম্পন্ন করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় মাইক্রোগ্যামিটোসাইট (n) ও ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট (n)।

ডিপ্লয়েড (2n) দশা :

জাইগোট দশা (2n) : মশকীর দেহে গ্যামিটোগনির ফলে সৃষ্টি হয় স্ত্রী গ্যামিট ও পুং গ্যামিট। স্ত্রী ও পুং গ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট (2n) সৃষ্টি হয়।

উওকিনেট (2n) : জাইগোট রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করে উওকিনেট (2n)। পরে উওকিনেট উওসিস্ট (2n)-এ পরিণত হয়। ডিপ্লয়েড (2n) উওসিস্ট মায়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোরোজয়েট সৃষ্টি করে। এ হ্যাপ্লয়েড স্পোরোজয়েট দশা মশকীর লালার মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশা পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তিত হয়। সুতরাং ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম বিদ্যমান।

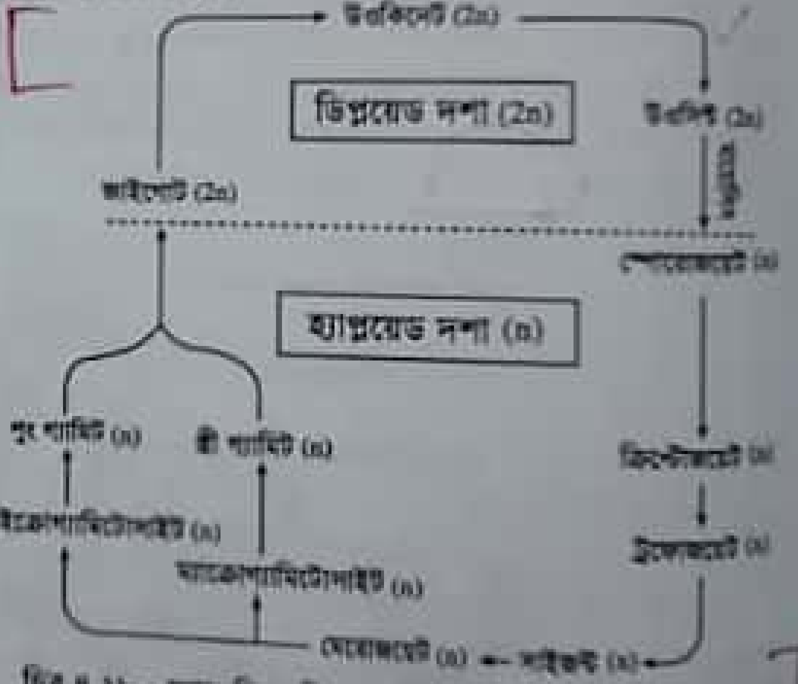

চিত্র ৪.১৮ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রে জনুক্রমের রেখাচিত্র।

জনুক্রমের তাৎপর্য (Significance of Alternation of Generation)

১। জনুক্রমে জীবাণুর প্রজাতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে।
২। জনুক্রম জীবাণুর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।
৩। জনুক্রম জীবাণুর বিস্তৃতিতে সহায়তা করে।
৪। জনুক্রম জীবাণুর জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে।
৫। জনুক্রম প্রজাতিতে বৈচিত্র্য আনে ফলে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন ও যৌন চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অযৌন চক্র (সাইজোগনি)	যৌন চক্র (স্পোরোগনি)
১. পোষকের যে স্থানে ঘটে	মানুষের যকৃত ও লোহিত কণিকায়।	মশকীর ক্রপের মধ্যে এবং হিমোসিলে।
২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ	মেরোজয়েট, ট্রফোজয়েট, সাইজন্ট, সিগনেট রিং ও মেরোজয়েট এ চক্রের মধ্যবর্তী ধাপ।	এ চক্রে গ্যামিট, জাইগোট, উওকিনেট, উওসিস্ট ও স্পোরোজয়েট দেখা যায়।
৩. অন্তিম ধাপ	গ্যামিটোসাইট।	স্পোরোজয়েট।
৪. হিমোজয়েন	এ চক্রের শেষের দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়।	কখনোই হিমোজয়েন সৃষ্টি হয় না।
৫. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া	কাঁপুনিসহ জ্বর, সে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ।	তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।
৬. চক্রের পুনরাবৃত্তি	ঘটে।	ঘটে না।
৭. গ্যামিট	সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্টি হয়।
৮. জাইগোট	যেহেতু গ্যামিট সৃষ্টি হয় না তাই জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।	পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলন ঘটিয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর সুপ্তাবস্থাকাল বা সুপ্তিকাল (Incubation period)

কোনো পোষক দেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশের সময় থেকে সেই পোষকের দেহে উক্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে রোগের সুপ্তাবস্থাকাল বলে। যেমন : ম্যালেরিয়া জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করার সাথে সাথে মানবদেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করার কয়েকদিন পর মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করার সময় থেকে মানুষে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণগুলো প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে ম্যালেরিয়া রোগের **সুপ্তাবস্থাকাল** (Latent period or Incubation period) বা সুপ্তিকাল বলে। কোনো রোগের জন্য সুপ্তিকাল সাধারণভাবে নির্দিষ্ট।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির সুপ্তাবস্থার সময়কাল :

(i) *Plasmodium vivax* ১২–২০ দিন
(ii) *Plasmodium falciparum* ৮–১৫ দিন
(iii) *Plasmodium ovale* ১১–১৬ দিন
(iv) *Plasmodium malariae* ১৮–৪০ দিন

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ : ম্যালেরিয়া জ্বর-এর লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

(i) প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধরা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

(ii) দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত অনুভূত হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর ১০৫°–১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পর জ্বর কমে যায়। **৪৮ ঘণ্টা পর পর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসাই *Plasmodium. vivax* জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ।**

(iii) তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্রুত রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংস হতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, প্লীহা, যকৃত ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ (Transmission of Malaria)

স্ত্রী *Anopheles* মশকীই ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটানোর একমাত্র মাধ্যম। পৃথিবীতে প্রায় দু'শত প্রজাতির *Anopheles* মশকী থাকলেও মূলত ৬টি প্রজাতিই এ রোগের ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটায় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো হলো- *Anopheles culicifacies, A. stephensi, A. fluviatilis, A. dirus, A. sundaicus, A. minimus*। মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশের পর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে একসময় গ্যামিটোসাইট গঠন করে। *Plasmodium vivax* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো মানুষের রক্তে [illegible] দিন, কিন্তু *Plasmodium falciparum* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো ৩০- ৬০ দিন, এমনকি ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ হতে এরা মশকীর দেহে প্রবেশের সুযোগ পেলে পরবর্তী চক্র সম্পন্ন করতে শুরু করে। মশকীর প্রতিবার দংশনে *Plasmodium vivax* এর অন্তত ৬টি, এবং *Plasmodium falciparum* এর অন্তত ১২টি গ্যামিটোসাইট মশকীর দেহে প্রবেশ করে। রক্তপান করার সময় মশকীর দেহে বিভিন্ন দশার জীবাণু প্রবেশ করলেও একমাত্র গ্যামিটোসাইটগুলো বেঁচে থাকে, অন্যান্য দশার জীবাণুগুলো মশকীর এনজাইমের ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। গ্যামিটোসাইটগুলো গ্যামিটোগনি ও স্পোরোগনি

ধাপের মাধ্যমে অবশেষে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। এ মশকী কোনো মানুষকে দংশন করলে মানুষ এ জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। এভাবে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে এবং ম্যালেরিয়া জন-জনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Prevention & Control of Malaria)

ম্যালেরিয়া যেহেতু মশকী বাহিত একটি রোগ তাই মশকী প্রতিরোধের মাধ্যমে এ রোগ হতে মুক্ত থাকা সম্ভব। ম্যালেরিয়া প্রতিকার তিনভাবে হতে পারে; যথা- (ক) মশকী নিধন, (খ) মশকী হতে আত্মরক্ষা এবং (গ) চিকিৎসা।

(ক) মশকী নিধন : মশককুলের বংশ পরিবেশ হতে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করে এদের বিস্তার রোধ করা যায়-

(i) প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস : মশকীরা বদ্ধ পচা পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাড়ির আশেপাশের পরিত্যক্ত ডোবা, নালা পরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে পানি জমতে না দেয়া, বাড়ির আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে মশকীর বসবাস ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা সম্ভব।

(ii) লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা : পচা পানিতে ডিম ফুটে মশকীর লার্ভা ও পিউপা দশা সৃষ্টি হয়। পানিতে কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিলে এরা অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। এছাড়া বিএইচসি (BHC), ডায়েলড্রিন (dieldrin) ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। পানিতে জুভেনাইল হরমোন ছিটিয়ে দিলে, লার্ভাগুলোর রূপান্তর ব্যাহত হয় ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে রূপান্তরিত হতে পারে না।

উপরোক্ত সবগুলো পদ্ধতিই কমবেশি পানি তথা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। তাই যে সকল জলাশয়ে লার্ভা বা পিউপা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঐ সকল জলাশয়ে গাপ্পি, কই, শিং, খলসে, তেলাপিয়া, পুঁটি, টাকি ইত্যাদি জাতীয় লার্ভিভোরাস মাছ চাষ করলে এরা মশকীর লার্ভা ও পিউপাগুলোকে ভক্ষণ করে। এতে মশকী নিধনের পাশাপাশি পরিবেশও থাকে দূষণমুক্ত।

(iii) পূর্ণাঙ্গ মশককুল নিধন : ফগিং মেশিনের মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া সৃষ্টি করে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বা রেডিয়েশন এর মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে মশকীকুলকে ধ্বংস করা যায়।

(iv) অধিকাংশ শহর এলাকাতে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

(খ) মশকীর দংশনের হাত হতে আত্মরক্ষা : ঘরের দরজা-জানালায় মাশকীরোধী ঘন তারের নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আত্মরক্ষা করা যায়। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা যায়। শয়নের সময় মশারি ব্যবহার এবং সন্ধ্যায় ধূপের ধোঁয়া প্রয়োগ করা।

(গ) ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর চিকিৎসা (Treatment) : ম্যালেরিয়া রোগীকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা আবশ্যক। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ওষুধ। এ কুইনাইন দ্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি হয়েছে। যেমন-ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোক্লোর, ম্যাপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক, নতুবা দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

বি. দ্র. সুস্থদেহে সিনকোণা রস কম্পজ্বর সৃষ্টি করে। কম্প জ্বরে (ম্যালেরিয়া) সিনকোণা রস সেবনে রোগ আরোগ্য হয়। এ থেকে হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে।

ম্যালেরিয়ার টিকা (Malarial Vaccine) : দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর গবেষণার পর অবশেষে আবিস্কৃত হয়েছে বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা "Mosquirix" যা RTS,S নামেও পরিচিত। European Medicine Agency (EMA)

ইতোমধ্যেই এ Vaccine-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন ও PATH Malaria নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় এ যুগান্তকারী আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছে। চার ডোজের এ টিকা *Plasmodium falciparum* জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম। উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলের শিশুরা এ পরজীবী কর্তৃক সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং এতে এদের মৃত্যুর হারও বেশি। তবে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার প্রভৃতি সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলের দেশগুলো এ রোগের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে পরিগণিত।

দলগত কাজ : ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্রটি অঙ্কন করে ক্লাসে উপস্থাপন কর।

সার-সংক্ষেপ

ভাইরাস : ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA অথবা RNA) ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত রোগসৃষ্টিকারী অতি অণুবীক্ষণিক অকোষীয় বস্তু। এরা জীবকোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে, আবার জীবকোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় জড় বস্তুর অবস্থায় বিরাজ করে। ভাইরাস দণ্ডাকার, গোলাকার, ঘনক্ষেত্রাকার, ব্যাঙাচি আকার বা ডিম্বাকার হতে পারে। TMV ভাইরাস দণ্ডাকার, HIV ভাইরাস গোলাকার, T_2 ভাইরাস ব্যাঙাচি আকার। কতক ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড RNA যেমন- TMV, মানুষের পোলিও ভাইরাস, ডেঙ্গু ভাইরাস। কতক ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড DNA যেমন- T_2 ভাইরাস, HIV, এডিনোহার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি। উদ্ভিদ, প্রাণী (মানুষসহ), পশুপাখির বহু রোগের কারণ ভাইরাস। HIV দিয়ে মানুষে AIDS রোগ, ফ্ল্যাভি-ভাইরাস দিয়ে ডেঙ্গুজ্বর, র‍্যাবিস ভাইরাস দিয়ে জলাতঙ্ক, ভেরিওলা ভাইরাস দিয়ে গুটিবসন্ত রোগ হয়।

T_2-ফায : T_2 ব্যাকটেরিওফায সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। মাথা ও লেজ নামক দুটি অংশ নিয়ে T_2-ফায-এর দেহ গঠিত। এর নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বিসূত্রক DNA যা ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে গঠিত। এরা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে বলে এদের নাম হয়েছে ব্যাকটেরিওফায।

ব্যাকটেরিয়া : এক বচনে ব্যাকটেরিয়াম। এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক এবং আদিকোষী। এরা দলবেঁধে থাকতে পারে, তবে এককোষী। ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া। মাটিতে, পানিতে, বাতাসে, জীবদেহের বাইরে এবং ভেতরে এদের আবাসস্থল। এদের দেহে ফ্ল্যাজেলা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, তবে জড় কোষ প্রাচীর আছে। ব্যাকটেরিয়া বহু রোগের কারণ, যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, প্রতিষেধক টিকা। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে, দুধ থেকে দই তৈরি, পনির তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

কক্কাস : গোলাকার ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় কক্কাস। একা একা থাকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস, জোড়ায় জোড়ায় থাকে ডিপ্লোকক্কাস, চেইনের মতো থাকে স্ট্রেপ্টোকক্কাস।

দ্বি-ভাজন : দ্বি-ভাজন কোষ বিভাজনের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি কোষের নিউক্লিয়ার বস্তু এবং সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং একটি কোষ থেকে দুটি কোষের সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো দ্বি-ভাজন। এটি একটি অযৌন জনন প্রক্রিয়া।

মেরোজাইগোট : স্ত্রী এবং পুং জনন কোষের যৌন মিলনের ফলে যে কোষের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় জাইগোট। জাইগোটে স্ত্রী ও পুং জনন কোষের পূর্ণাঙ্গ অংশ মিলিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দাতা কোষের (পুং জনন কোষ) আংশিক ক্রোমোসোম গ্রহীতা কোষে (স্ত্রী জনন কোষ) প্রবেশ করে, তাই গ্রহীতা কোষ দাতা কোষের পূর্ণ বংশগতীয় বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। আংশিক ক্রোমোসোম গ্রহণের মাধ্যমে যে জাইগোট তৈরি হয় তাকে বলা হয় মেরোজাইগোট। এটি যৌন জনন প্রক্রিয়া, তবে এতে কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।

পঞ্চম অধ্যায়

শৈবাল ও ছত্রাক

ALGAE AND FUNGI

> প্রধান শব্দসমূহ : শৈবাল, ছত্রাক, লাইকেন

পাশের চিত্র দু'টির প্রতি লক্ষ্য কর। এমন চিত্র কোথাও দেখেছ কি? মাধ্যমিক শ্রেণিতে এ সম্বন্ধে তোমরা কিছুটা জেনেছ। এর কোনটি শৈবাল আর কোনটি ছত্রাক বলতে পার কি?

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা *Spirogyra* শৈবাল এবং *Agaricus* ছত্রাক সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছ। এরা উভয়ই অপুষ্পক উদ্ভিদ, তবে এদের মধ্যে অমিলও কম নয়। শৈবাল উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তাই এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম এবং স্বভোজী। ছত্রাক-উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, তাই কোনো প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না এবং এরা মৃতজীবী বা পরজীবী। নিচে শৈবাল ও ছত্রাক সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

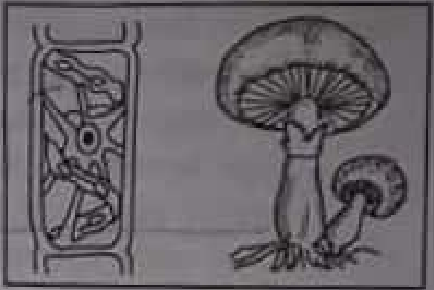

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. শৈবালের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও জনন বর্ণনা করতে পারবে।
২. *Ulothrix* এর আবাস, গঠন ও জনন বর্ণনা করতে পারবে।
৩. ব্যবহারিক
   - *Ulothrix* এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে শনাক্ত ও অঙ্কন করতে পারবে।
৪. ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য, গঠন, প্রজনন ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৫. *Agaricus* এর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
৬. ব্যবহারিক
   - *Agaricus* এর ফ্রুটবডি শনাক্ত করতে পারবে।
৭. ছত্রাকঘটিত রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে।
৮. শৈবাল ও ছত্রাকের সহাবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবে।

শৈবাল (Algae)

পৃথিবীতে বহু প্রকার শৈবাল জন্মে থাকে। এদের কতক এককোষী, কতক বহুকোষী। এদের মধ্যে কতক স্থলজ, কতক অর্ধবায়বীয় এবং অধিকাংশই জলজ। এরা মিঠা পানিতে এবং লোনা পানিতে জন্মাতে পারে। শৈবালের হাজার হাজার প্রজাতির মধ্যে আকার, আকৃতি, গঠন ও স্বভাবে প্রচুর পার্থক্য আছে। আকার, আকৃতি ও গঠনে বহু পার্থক্য থাকলেও কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যে এরা সবাই একই রকম, তাই এরা সবাই শৈবাল বা শেওলা নামে পরিচিত। সম্পূর্ণ ভাসমান শৈবালকে ফাইটোপ্লাংকটন বলে। জলাশয়ে পানির নিচে মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যে শৈবাল জন্মায় তাদেরকে বেনথিক শৈবাল বলে। পাথরের গায়ে জন্মানো শৈবালকে লিথোফাইট বলে। উচ্চ শ্রেণির জীবের টিস্যুভান্তরে জন্মানো শৈবালকে এন্ডোফাইট বলে। এপিফাইট হিসেবে এরা অন্য শৈবালের গায়েও জন্মায়। শৈবাল বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও গবেষণা করাকে বলা হয় ফাইকোলজি (phycology)। গ্রিক *Phykos* অর্থ seaweed। seaweed ও শৈবাল। শৈবালবিদ্যাকে অ্যালগোলজি (Algology) ও বলা হয়। সারা বিশ্বে প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতির শৈবাল আছে বলে ধারণা করা হয়।

শৈবালের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Algae)

১। শৈবাল সালোকসংশ্লেষণকারী স্বভোজী অপুষ্পক উদ্ভিদ।

২। এরা সুকেন্দ্রিক, এককোষী বা বহুকোষী। শৈবালে কখনও সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতা সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ এরা সমাঙ্গদেহী (থ্যালয়েড)।

৩। এদের দেহে ভাস্কুলার টিস্যু নেই। এদের জননাঙ্গ এককোষী, বহুকোষী হলে তা কোনো বন্ধ্যা কোষাবরণ দিয়ে বেষ্টিত নয়।

৪। এদের স্পোরাঞ্জিয়া (রেণুথলি) সর্বদাই এককোষী।
৫। এদের জাইগোট স্ত্রীজননাঙ্গে থাকা অবস্থায় কখনও বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না।
৬। শৈবালের কোষ প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ নির্মিত।
৭। শৈবালের যৌন জনন আইসোগ্যামাস, অ্যানাইসোগ্যামাস অথবা উগ্যামাস।
৮। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য শর্করা।

শৈবালের দৈহিক গঠন (Structure of Algae) : পৃথিবীতে বহুধরনের শৈবাল আছে। এদের আকার, আকৃতি গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান। এরা হতে পারে–

১। আণুবীক্ষণিক (যেমন- *Prochlorococcus*) থেকে দীর্ঘদেহী (যেমন- *Macrocystis*, প্রায় ৬০ মিটার পর্যন্ত হয়)।
২। সচল এককোষী, যেমন- *Chlamydomonas* । এদের ফ্ল্যাজেলা থাকে।
৩। সচল কলোনিয়্যাল, যেমন- *Volvox, Pandorina, Eudorina* । এরা সিনোবিয়াম। বিশেষভাবে সজ্জিত নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষের কলোনি হলো সিনোবিয়াম।
৪। নিশ্চল এককোষী, যেমন- *Chlorococcum, Chlorella* । এদের ফ্ল্যাজেলা নেই।
৫। বহুকোষী এবং পাতার মতো, যেমন- *Ulva*

বহুকোষী এবং ফিলামেন্টাস, অশাখ, যেমন- *Ulothrix, Spirogyra*
বহুকোষী এবং ফিলামেন্টাস, শাখান্বিত, যেমন- *Chladophora, Chaetophora*
বহুকোষী এবং হেটেরোট্রাইকাস (শয়ান ও খাড়া অংশে বিভক্ত), যেমন- *Chaetophora*.

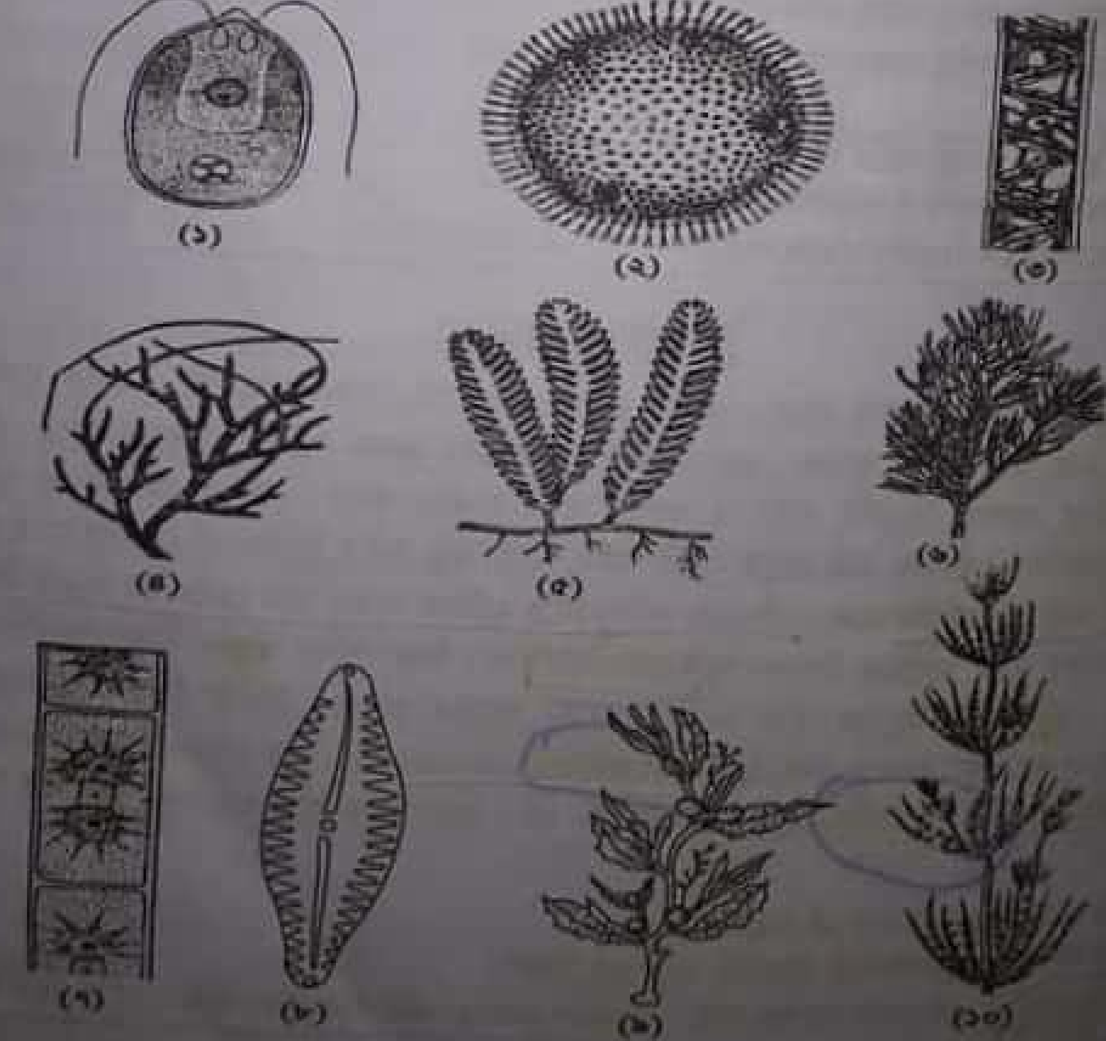

চিত্র ৫.১ : কয়েকটি শৈবাল : (১) *Chlamydomonas*; (২) *Volvox*; (৩) *Spirogyra*; (৪) *Chaetophora*; (৫) *Caulerpa*; (৬) *Polysiphonia* (লোহিত শৈবাল); (৭) *Zygnema*; (৮) *Navicula* (বাদামি-সোনালী শৈবাল); (৯) *Sargassum* (বাদামী শৈবাল); (১০) *Chara* (৬, ৮ ও ৯নং ছাড়া অন্যগুলো সবুজ শৈবাল)।

৭। সাইফনের মতো (নলাকার), যেমন- *Vaucheria*. এরা সিনোসাইটিক অর্থাৎ কোষে অসংখ্য নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট।

৮। জালের মতো, যেমন- *Hydrodictyon*

৮। দেহ পর্ব-মধ্যপর্ব সাদৃশ্য, যেমন- *Chara*

৯। দেহ বাহ্যত মূল, কাণ্ড ও পাতার ন্যায়, যেমন- *Sargassum*

১০। এদের ক্লোরোপ্লাস্ট হতে পারে সর্পিলাকার (*Spirogyra*), পেয়ালার ন্যায় (*Chlamydomonas*), থালার মতো (*Caulerpa*), জালিকাকার (*Oedogonium*), গার্ডল আকৃতির (*Ulothrix*), তারকার মতো (*Zygnema*)।

শৈবালের কোষীয় গঠন (Cell structure) : সব শৈবালই সুকেন্দ্রিক (eukaryotic)। (আদিকেন্দ্রিক নীলাভ-সবুজ শৈবালকে বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়।) শৈবাল কোষের গঠন মোটামুটিভাবে উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদকোষের মতোই। কোষের বাইরে সেলুলোজ (প্রধান বস্তু) নির্মিত জড় কোষপ্রাচীর, কোষপ্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় কোষঝিল্লি, কোষঝিল্লি দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম থাকে। সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান আছে সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, বৃহৎ ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, পাইরিনয়েড, রাইবোসোম ইত্যাদি অঙ্গাণু এবং সঞ্চিত খাদ্য। কোনো কোনো শৈবালের দেহ নলাকার, শাখান্বিত, প্রস্থ প্রাচীরবিহীন এবং কোষে বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত থাকে। এরূপ শৈবাল দেহকে সিনোসাইটিক (coenocytic) শৈবাল বলে; যেমন- *Vaucheria, Botrydium.*

শৈবালের একটি বড় অংশই এককোষী। *Pyrrhophyta, Euglenophyta, Chrysophyta* এবং বহু *Chlorophyta* এককোষী। *Rhodophyta*-এর অধিকাংশই বহুকোষী, *Phaeophyta* বহুকোষী বৃহৎ শৈবাল নিয়ে গঠিত।

কতিপয় শৈবাল শ্রেণির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

শ্রেণি	পিগমেন্ট	সঞ্চিত খাদ্য
Chlorophyta (সবুজ শৈবাল) উদাহরণ- *Ulothrix*	ক্লোরোফিল এ, বি এবং ক্যারোটিনয়েড	স্টার্চ
Chrysophyta (গোল্ডেন ব্রাউন শৈবাল) উদাহরণ- *Navicula*	ক্লোরোফিল এ, সি এবং অতিমাত্রায় ক্যারোটিনয়েড	ক্রাইসোল্যামিনারিন
Pyrrhophyta (অগ্নি শৈবাল) উদাহরণ- *Gymnodinium*	ক্লোরোফিল এ, সি ও ক্যারোটিনয়েড	প্যারামাইলন
Phaeophyta (বাদামী শৈবাল) উদাহরণ- *Sargassum*	ক্লোরোফিল এ, সি এবং ফিউকোজ্যান্থিন	ল্যামিনারিন, ম্যানিটল, এলগিন
Rhodophyta (লোহিত শৈবাল) উদাহরণ- *Polysiphonia*	ক্লোরোফিল এ, ফাইকোসায়ানিন, ফাইকোইরেথ্রিন	ফ্লোরিডিয়ান স্টার্চ, এগার-এগার, ক্যারাজীনান

শৈবাল পৃথিবীর মোট ফটোসিনথেসিস-এর প্রায় ৬০ ভাগ করে থাকে, বাকি ৪০ ভাগ উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ করে থাকে। সবুজ শৈবাল থেকে উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করা হয়।

> গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সাগরের পানিকে আলোড়িত করলে আগুন জ্বলতে দেখা যায় যাকে **'Bioluminescence'** বলে। *Pyrrophyta* শৈবালের জন্য এমন হয়ে থাকে। এদের দ্বারাই রেড টাইড (red tide) হয়ে থাকে। এসব শৈবালে উপস্থিত luciferin, ATP দ্বারা ফসফোরাইলেটেড হয়, সৃষ্ট বস্তু luciferase এনজাইমের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে আলোকশক্তি সৃষ্টি করে। Pyrrhophyta শৈবাল একটু ব্যতিক্রমধর্মী। এদের বেশকিছু হেটেরোট্রোফ। এদের ক্রোমোসোমে প্রোটিন কম থাকে, নিউক্লিয়ার এনভেলপের সাথে ক্রোমোসোম যুক্ত থাকে, মাইটোসিস এর সময় নিউক্লিয়ার এনভেলপ বিলুপ্ত হয় না, এমন কি স্পিন্ডল যন্ত্রও সৃষ্টি হয় না।

শৈবালের জনন (Reproduction of Algae) : বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শৈবালের প্রজনন হয়ে থাকে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) : দৈহিক অঙ্গের মাধ্যমে এ প্রকার জনন হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্পোর (spore) বা গ্যামিট (gamete) সৃষ্টি ব্যতিরেকে যে জনন প্রক্রিয়ায় জীবের দৈহিক অঙ্গ থেকে নতুন জীবের সৃষ্টি হয় তাকে অঙ্গজ জনন বলা হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে অঙ্গজ জনন হতে পারে।

(i) কোষের বিভাজন (Cell division) : এককোষী শৈবালে মাতৃকোষটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'টি অপত্য কোষ (daughter cell) তৈরি করে এবং প্রতিটি অপত্য কোষ এক একটি পূর্ণাঙ্গ শৈবাল কোষে পরিণত হয়। উদা.- *Euglena.*

(ii) খণ্ডায়ন (Fragmentation) : বহুকোষী ফিলামেন্টাস শৈবালে যে কোনো কারণে বা যে কোনো ভাবে ফিলামেন্টটি ভেঙ্গে গেলে প্রতিটি খণ্ড ক্রমে একটি পূর্ণ শৈবালে পরিণত হয়। উদা- *Nostoc, Ocillatoria* ।

(iii) টিউবার সৃষ্টির মাধ্যমে (By formation of tuber) : কোনো কোনো শৈবালের রাইজয়েড বা মাটির নিচের অংশে টিউবার তৈরি হয়, যা পরে পৃথক হয়ে পূর্ণাঙ্গ শৈবালে পরিণত হয়। *Chara* শৈবালে এরূপ হয়।

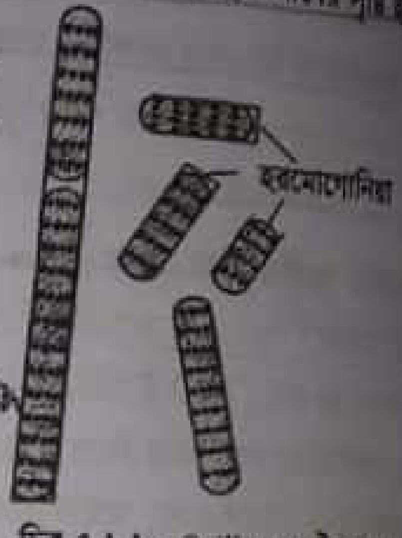

চিত্র ৫.১.১ : *Ocillatoria* শৈবালে খণ্ডন

(iv) কুঁড়ি সৃষ্টি (Budding) : কুঁড়ি (bud) সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো কোনো শৈবালে (যেমন-*Protosiphon*) নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গ শৈবাল দেহ সৃষ্টি হয়।

(v) হরমোগোনিয়া (Hormogonia) : সূত্রাকার নীলাভ-সবুজ শৈবালের ট্রাইকোম খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ডকে হরমোগোনিয়া বলা হয়। আঘাত, সেপারেশন ডিস্ক বা হেটারোসিস্ট তৈরির ফলে হরমোগোনিয়া তৈরি হয়। হরমোগোনিয়া অঙ্কুরিত হয়ে নতুন সূত্র তৈরি হয়; যেমন- *Nostoc, Ocillatoria*। বর্তমানে এরা সায়ানোব্যাকটেরিয়া হিসেবে পরিচিত।

২। অযৌন জনন (Asexual reproduction) : স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে থাকে। অযৌন জননের একক হলো রেণু বা স্পোর। বিভিন্ন ধরনের রেণু তৈরির মাধ্যমে যে জনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে অযৌন জনন বলা হয়। যে কোনো একটি অঙ্গজ কোষ স্পোরাঞ্জিয়াম (sporangium) হিসেবে কাজ করে এবং এক থেকে অসংখ্য স্পোর তৈরি করে। স্পোর ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট ও সচল হলে তাকে চলরেণু বা জুস্পোর (zoospore) বলে; যেমন- *Ulothrix*। জুস্পোরগুলো সাধারণত ২-৪ ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক ফ্ল্যাজেলা থাকতে পারে। স্পোর ফ্ল্যাজেলাবিহীন নিশ্চল হলে তাকে অচলরেণু বা অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (aplanospore) বলে; যেমন- *Microspora*। চরম প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ দীর্ঘ শুষ্ক পরিবেশে অ্যাপ্ল্যানোস্পোর পুরু প্রাচীরবেষ্টিত হলে তাকে হিপনোস্পোর (hypnospore) বলে। মাতৃকোষের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অচল রেণুকে অটোস্পোর (autospore) বলে; যেমন- *Chlorella*। কতক শৈবালে কোষের পুরো প্রোটোপ্লাস্ট খাদ্য সঞ্চয় করে এবং পুরু প্রাচীর বেষ্টিত হয়, তখন তাকে অ্যাকাইনিটি বলে। অনুকূল পরিবেশে অ্যাকাইনিটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন শৈবালে পরিণত হয়, যেমন-*Pithophora, Cladophora*। ডায়াটম জাতীয় শৈবালে বিশেষ ধরনের রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এদেরকে অক্সোস্পোর বলে; যেমন- *Navicula*।

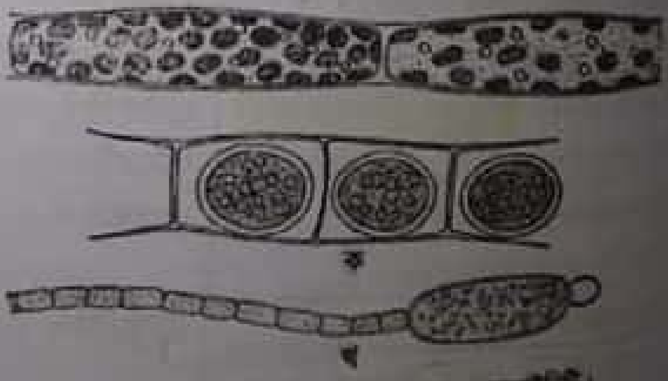

চিত্র ৫.১.২ : শৈবালে অ্যাপ্লানোস্পোর ও অ্যাকাইনিটি।
(ক) অ্যাপ্লানোস্পোর, (খ) অ্যাকাইনিটি।

৩। যৌন জনন (Sexual reproduction) : গ্যামিট সৃষ্টি ও দু'টি গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে যে জনন ঘটে তাকে যৌন জনন বলে। শৈবালের যৌন জননের সক্ষমতা অনুসারে এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা-

(ক) হোমোথ্যালিক (Homothalic) : একই দেহে বিপরীত যৌনধর্মী জননকোষ উৎপন্ন হয় এবং মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে তাকে হোমোথ্যালিক শৈবাল বলে। যেমন- *Spirogyra*-র কতক প্রজাতি।

(খ) হেটারোথ্যালিক (Heterothalic) : পুং ও স্ত্রী জননকোষ ভিন্ন ভিন্ন দেহে উৎপন্ন হলে তাদেরকে ভিন্নবাসী বা হেটারোথ্যালিক শৈবাল বলে। জনন কোষের ভিত্তিতে শৈবালে তিন ধরনের যৌন জনন ঘটে থাকে।

(i) আইসোগ্যামি (Isogamy) : এ ক্ষেত্রে দু'টি গ্যামিট (স্ত্রী-পুরুষ বা +, −) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে হুবহু একই রকম হয়। এ ধরনের গ্যামিটকে আইসোগ্যামিট্স বলে; উদা- *Ulothrix*।

(ii) অ্যানাইসোগ্যামি (Anisogamy) : এক্ষেত্রে একটি গ্যামিট (পুং গ্যামিট) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হয় এবং একটি গ্যামিট (স্ত্রী গ্যামিট) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। এ ধরনের গ্যামিটকে অ্যানাইসোগ্যামিট্স বলে; উদা- *Pandorina*।

চিত্র ৫.২ : শৈবালের বিভিন্ন প্রকার যৌন জনন।

(iii) উগ্যামি (Oogamy) : এক্ষেত্রে স্ত্রী গ্যামিটটি বড় ও নিশ্চল হয় এবং সাধারণত স্ত্রী যৌনাঙ্গে অবস্থান করে। পুং গ্যামিট অপেক্ষাকৃত ছোট ও সচল হয় এবং স্ত্রী জননাঙ্গে স্ত্রী গ্যামিটকে নিষিক্ত করে। এরা হেটেরোগ্যামিট্স; উদা- *Fucus*।

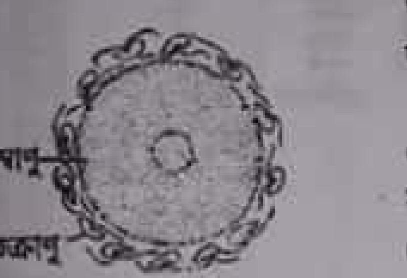

চিত্র ৫.২.১ : *Fucus*-এর উগ্যামাস জনন।

এ তিন প্রকার যৌন জননের মধ্যে আইসোগ্যামি আদি প্রকৃতির এবং উগ্যামি উন্নত প্রকৃতির।

Genus :*Ulothrix* (ইউলোথ্রিক্স)

শ্রেণিবিন্যাস
Division : Chlorophyta
Class : Chlorophyceae
Order : Ulotrichales
Family : Ulotrichaceae
Genus : *Ulothrix*

বাসস্থান : *Ulothrix* সাধারণতঃ মিঠা পানির পুকুর, খাল, বিল, হাওড়, নদী-নালা প্রভৃতি জলাশয়ে জন্মে থাকে। খাড়া পাহাড় বা অনুরূপ স্থান যেখানে সর্বদাই পানি পড়ে সেখানেও এরা জন্মে থাকে। *Ulothrix* শৈবালের ৬০টি প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশই মিঠা পানিতে জন্মে থাকে, তবে কতক প্রজাতি সামুদ্রিক।

দৈহিক গঠন : *Ulothrix* একটি ফিলামেন্টাস (সূত্রময়) এবং অশাখ সবুজ শৈবাল। ইহা অসীম বৃদ্ধি সম্পন্ন। এর দেহ এক সারি খর্ব ও বেলনাকার কোষ দ্বারা গঠিত। এর গোড়ার কোষটি লম্বাকৃতির, বর্ণহীন এবং নিচের দিকে ক্রমশ সরু, একে হোল্ডফাস্ট বলে। হোল্ডফাস্ট দ্বারা শৈবালটি (বিশেষ করে কচি অবস্থায়) কোনো বস্তুর সাথে আবদ্ধ থাকে। ফিলামেন্টের প্রতিটি কোষের একটি সুনির্দিষ্ট কোষপ্রাচীর আছে। হোল্ডফাস্ট ছাড়া প্রত্যেক কোষে একটি নিউক্লিয়াস আছে, একটি বেল্ট বা ফিতা আকৃতির (girdle shaped) বা আংটি আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট আছে এবং ক্লোরোপ্লাস্টে এক বা একাধিক পাইরিনয়েড আছে। পাইরিনয়েড হলো প্রোটিনজাতীয় পদার্থের চকচকে দানা, যার চারদিকে অনেক সময় স্টার্চ থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টটি কোষকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করে রাখে। হোল্ডফাস্ট ছাড়া অন্য যে কোনো কোষ প্রস্থে বিভক্ত হতে পারে, ফলে ফিলামেন্ট দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

চিত্র ৫.৩ : *Ulothrix* শৈবাল।
(অসীম বৃদ্ধি দেখানোর জন্য মাথাকার কোষটি দেখা হয়েছে।)

বাংলাদেশ থেকে *U. simplex*, *U. tenerrima* এবং *U. variabilis* নামক তিনটি প্রজাতি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে *U. simplex* এর আবিষ্কারক প্রফেসর এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম (১৯৬৯)। এটি সম্ভবত বাংলাদেশে এন্ডেমিক।

জনন : *Ulothrix* অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি : খণ্ডায়নের মাধ্যমে এর অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। দৈবক্রমে ফিলামেন্টটি ভেঙে কয়েকটি খণ্ডে পরিণত হলে প্রত্যেক খণ্ড কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এক একটি নতুন *Ulothrix* রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অযৌন জনন : জুস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে *Ulothrix*-এর অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। কখনো কখনো অ্যাপ্ল্যানোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমেও অযৌন জনন হয়ে থাকে। জুস্পোরগুলো সাধারণত চার ফ্ল্যাজেলা যুক্ত। যে কোষ হতে জুস্পোর উৎপন্ন হয় তাকে জুস্পোরাঞ্জিয়াম বলে। হোল্ডফাস্ট ছাড়া অন্য যে কোনো কোষ হতে জুস্পোর সৃষ্টি হতে পারে। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে ১- ৩২টি জুস্পোর সৃষ্টি হয়। একটি মাত্র জুস্পোর সৃষ্টি হলে কোষের সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাস্টই একটি জুস্পোরে রূপান্তরিত হয়। একাধিক জুস্পোর উৎপন্ন হলে জুস্পোরাঞ্জিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট একটু সংকুচিত হয় এবং লম্বালম্বিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়। প্রজাতির ওপর নির্ভর করে ৩২টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিভাজন চলতে পারে। প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট তখন চার ফ্ল্যাজেলা যুক্ত জুস্পোরে রূপান্তরিত হয়। সরু কোষের প্রজাতি হতে সৃষ্ট সকল জুস্পোর একই প্রকার হয় কিন্তু মোটা কোষের প্রজাতি হতে দুই প্রকার জুস্পোর উৎপন্ন হয়- (১) ক্ষুদ্রাকৃতির বা মাইক্রোজুস্পোর-এর আইস্পট মধ্যখানে থাকে এবং একটি জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে ৮–৩২টি জুস্পোর উৎপন্ন হয়; (২) বৃহদাকৃতির বা মেগাজুস্পোর-এর আইস্পট সম্মুখভাগে থাকে এবং একটি জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে ১–৪টি জুস্পোর উৎপন্ন হয়। জুস্পোরগুলো নাসপাতি আকৃতির। একটি ভেসিকল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় জুস্পোরগুলো জুস্পোরাঞ্জিয়াম প্রাচীরের গায়ে উৎপন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে এবং ভেসিকলের অবলুপ্তির পর এরা মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায়। ২–৬ দিন সন্তরণের (সাঁতার কাটার) পর জুস্পোরের ফ্ল্যাজেলাযুক্ত মাথাটি কোনো জলজ বস্তুর সাথে আবদ্ধ হয়। আবদ্ধ হওয়ার পর এরা আস্তে আস্তে ফ্ল্যাজেলাবিহীন হয়, এর চারদিকে একটি প্রাচীর গঠন করে এবং ক্রমে দীর্ঘ হয় ও বিভাজনের মাধমে নতুন *Ulothrix* ফিলামেন্ট সৃষ্টি করে।

চিত্র ৫.৪ : *Ulothrix*-এর অযৌন জনন।

প্রতিকূল পরিবেশে জুস্পোরগুলো জুস্পোরাঞ্জিয়াম হতে নির্গত হয় না, অধিকন্তু এদের চারদিকে একটি প্রাচীর গঠন করে অ্যাপ্ল্যানোস্পোরে পরিণত হয়। কখনো কখনো কোনো একটি কোষের সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাস্ট গোলাকার হয় এবং চারপাশে একটি পুরু প্রাচীর গঠন করে অ্যাকাইনিটিতে পরিণত হয়। একে হিপনোস্পোরও বলা হয়। প্রচুর সঞ্চিত খাদ্য সম্বলিত যে স্পোরের মাধ্যমে জীব তার প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে তাকে রেস্টিং স্পোর বলে। অনুকূল পরিবেশে এরা এদের পুরু প্রাচীর বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে এবং অঙ্কুরায়ন ও বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ফিলামেন্টে পরিণত হয়।

যৌন জনন : *Ulothrix* একটি ভিন্নবাসী বা হেটেরোথ্যালিক শৈবাল (স্ত্রী ও পুরুষ জননকোষ আলাদা দেহে উৎপন্ন হয়)। *Ulothrix* শৈবাল এর যৌন মিলন আইসোগ্যামাস। হোল্ডফাস্ট ছাড়া যে কোনো একটি কোষের প্রোটোপ্লাস্ট বিভাজনের মাধ্যমে ৮–৬৪টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট সৃষ্টি করে। প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট একটি নাসপাতি আকৃতির বাইফ্ল্যাজিলেট গ্যামিটে রূপান্তরিত হয়। গ্যামিটগুলো জুস্পোর হতে ক্ষুদ্রাকৃতির। এদের আইস্পট অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি ভেসিকল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় এরা জননকোষাধার বা গ্যামিটেঞ্জিয়াম (যে কোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টি হয়)-এর প্রাচীরে সৃষ্ট ছিদ্রপথে বের হয়ে আসে এবং ভেসিকলের অবলুপ্তির পর মুক্তভাবে সাঁতরে বেড়ায়। দু'টি ভিন্ন ফিলামেন্ট হতে দুটি ভিন্নধর্মী (+, –) গ্যামিট দেহের বাইরে এসে যৌন মিলন সম্পন্ন করে এবং একটি চার ফ্ল্যাজেলাযুক্ত ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট সৃষ্টি করে। জাইগোট কিছুকাল সচল থাকে, পরে ফ্ল্যাজেলাবিহীন হয়ে পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট হয় এবং পরে বিশ্রামকাল (resting stage) কাটায়। বিশ্রামের পূর্বে এরা প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে এবং চারদিকে একটি প্রাচীর সৃষ্টি করে। বিশ্রামকাল শেষে এতে মায়োসিস বিভাজন হয় এবং ৪–১৬টি হ্যাপ্লয়েড (n) জুস্পোর (প্রতিকূল অবস্থায় অ্যাপ্ল্যানোস্পোর)

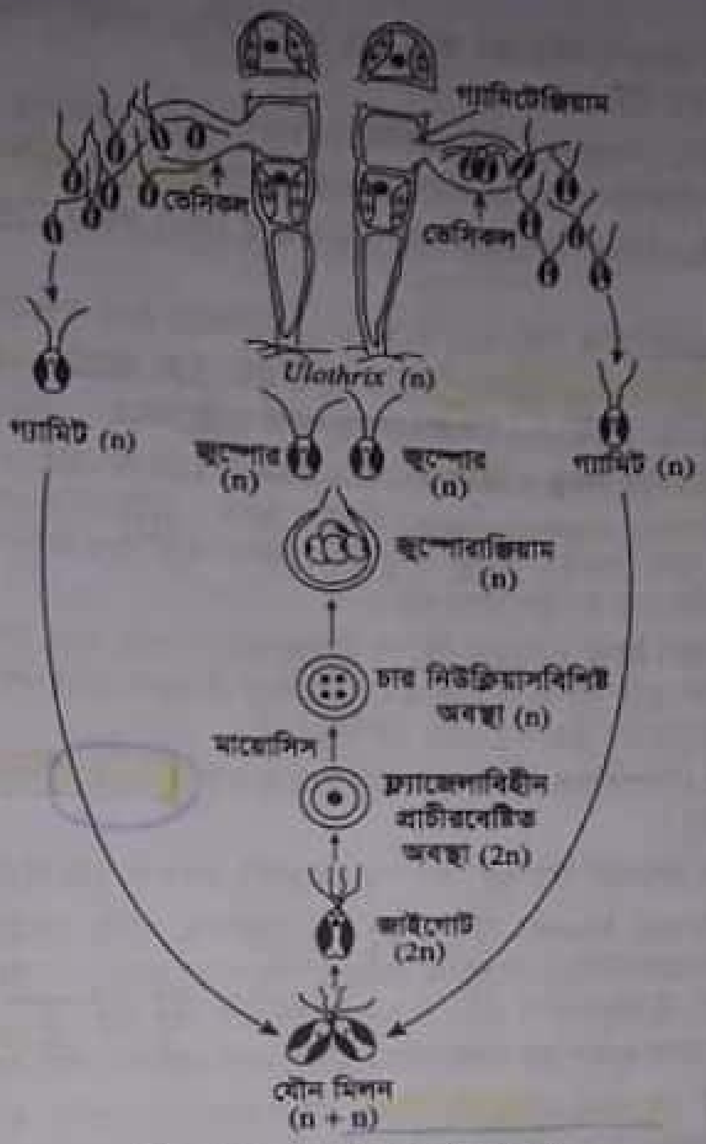

চিত্র ৫.৫ : *Ulothrix*-এর যৌন জনন।

সৃষ্টি করে। জাইগোট প্রাচীর বিদীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জুস্পোরগুলো (অথবা অ্যাপ্লানোস্পোর) বের হয়ে আসে এবং অঙ্কুরায়ন ও বিভাজনের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয়। *Ulothrix* এর জীবন চক্র Haplontic অর্থাৎ বহুকোষী গ্যামিটোফাইটিক জনুর সাথে এককোষী স্পোরোফাইটিক জনুর জনুক্রম ঘটে।

পামেলা দশা (Palmella Stage) : Palmella নামক একটি সবুজ শৈবাল একটি জেলাটিনের সাধারণ আবরণ দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় ফ্ল্যাজেলাবিহীন অসংখ্য কোষের কলোনি নিয়ে গঠিত। অন্য যে কোনো শৈবালে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে তাকে পামেলা দশা বলা হয়। সাধারণত *Chlamydomonas* শৈবালে এ অবস্থা দেখা যায়। আবাসস্থলে পানির অভাব দেখা দিলে স্পোর ফ্ল্যাজেলা তৈরি না করে অ্যাপ্লানোস্পোর-এ পরিণত হয়। একটি জেলাটিনের সাধারণ আবরণী দ্বারা আবৃত অবস্থায় উপর্যুপরি বিভাজনের ফলে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। আবাসস্থলে পানির প্রবাহ ফিরে এলে জেলাটিনের আবরণটি গলে যায় এবং প্রতিটি কোষ ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি করে শৈবালে পরিণত হয়। *Ulothrix*-এ পামেলা দশা হতে পারে। এটি একটি অস্বাভাবিক অযৌন জনন প্রক্রিয়া। জুস্পোর গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নতুন শৈবালে পরিণত হয়। বহুকোষী ডিপ্লয়েড জনুর সাথে এককোষী হ্যাপ্লয়েড (গ্যামিট) জনুর অনুক্রম ঘটলে তাকে Diplontic জীবন চক্র বলে: উদাহরণ *Fucus, Sargassum*।

***Ulothrix*-এর গুরুত্ব :** এরা পরিবেশতন্ত্রে উৎপাদক হিসেবে কাজ করে, বায়ুমণ্ডলে O_2 যোগ করে এবং CO_2 শোষণ করে।

শৈবালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : শৈবালের উপকারী দিক বেশি, কিন্তু অপকারী দিকও আছে।

উপকারিতা : শৈবালের উপকারী দিক বেশি। কয়েকটি উপকারী ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন যোগ :** শৈবালের সবচেয়ে উপকারী দিক হলো বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন সংযোগ। লক্ষ লক্ষ বছর আগে বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। নীলাভ-সবুজ শৈবাল প্রথম সালোকসংশ্লেষণ শুরু করে এবং লক্ষ লক্ষ বছরের

সালোকসংশ্লেষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমা হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে (প্রায় ২০ ভাগ) আসে। এর পরই পর্যায়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ঘটে।

২। **পরিবেশ দূষণ রোধ :** সমুদ্রের বিপুল পরিমাণ শৈবাল সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে O_2 ত্যাগ করে। মোট সালোকসংশ্লেষণের শতকরা ৬০ ভাগই শৈবালে ঘটে থাকে।

৩। **উৎপাদক হিসেবে :** বিভিন্ন জলাশয়ে (স্বাদু পানি এবং লোনা পানি) শৈবাল ফুড চেইন-এর প্রথম উৎপাদক হিসেবে কাজ করে।

৪। **বায়োফুয়েল (Biofuel) তৈরি :** Biofuel বা Biodiesel তৈরির জন্য বর্তমানে শৈবালকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাই শৈবালকে second generation biofuel নামে অভিহিত করা হয়েছে। *Botryococcus braunii* এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। *Chlorella*, *Scenedesmus* কেও ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

৫। **গোয়েন্দা সাবমেরিন-এর অবস্থান নির্ণয় :** নীলাভ সবুজ শৈবালে অবস্থিত phycobilin protein নামে রঞ্জক কণিকা (C-phycoerythrin, C-phycocyanin) দৃশ্যমান আলোর বাইরের আলোকরশ্মি শোষণ করতে পারে। পানির নিচে গোয়েন্দা সাবমেরিন হতে বিকিরিত বিভিন্ন রশ্মি এরা শোষণ করে নেয় এবং এই শোষিত রশ্মির পরিমাণ থেকে আশপাশে গোয়েন্দা সাবমেরিন-এর অবস্থান জানা যায়।

৬। **সমুদ্রে মাছের অবস্থান নির্ণয় :** সমুদ্রের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সময় সময় শৈবালের অধিক বৃদ্ধি ঘটে এবং খাদ্য প্রাপ্তির আশায় মাছ ঐ অঞ্চলে ছুটে আসে। স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণে ঐ অঞ্চলগুলো নির্ণয় করে মাছ ধরার ট্রলারকে তথ্য নির্দেশ করা হয়, ফলে প্রচুর পরিমাণ মাছ অল্পসময়ে ধরা সম্ভব হয়।

৭। **মাটির বয়স নির্ণয় :** জলাশয়ের তলদেশে মাটির স্তরে জমাকৃত ডায়াটম খোলস এর কার্বন ডেটিং করে ঐ মাটির উৎপত্তির বয়স নির্ণয় করা হয়।

অপকারিতা : শৈবালের অপকারী দিক খুব বেশি নয়। কয়েকটি অপকারী ভূমিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **ওয়াটার ব্লুম ((Water bloom) সৃষ্টি :** পুকুর বা জলাধারে পুষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেলে কিছু নীলাভ সবুজ শৈবালের (বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া) সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, যাকে ওয়াটার ব্লুম বলে। এতে জলাধারের পানি দূষিত হয়, খাবার ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। ঐ জলাধারের মাছ মরে যায়। *Ocillatoria*, *Nostoc*, *Myxocystis* এ ধরনের শৈবাল। অবশ্য বর্তমানে এগুলোকে সায়ানোব্যাকটেরিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

২। **উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি :** *Cephaleuros virescens* নামক প্রজাতি চা, কফি, ম্যাগনোলিয়া গাছে রোগ সৃষ্টি করে। এতে চা এবং কফির ফলন কমে যায়।

৩। **মাছের রোগ সৃষ্টি :** কোনো কোনো শৈবাল (যেমন- *Oedogonium*) মাছের ফুলকা রোগ সৃষ্টি করে।

৪। **স্থাপনার ক্ষতি :** দেয়ালে শৈবালের অতিবৃদ্ধি দালানের বেশ ক্ষতি করে থাকে।

৫। **রাস্তাঘাট পিচ্ছিলকরণ :** পাকা নদীর ঘাট, পুকুর ঘাট, বাথরুমের মেঝে, পায়ে হাঁটার রাস্তায় জন্মানো নীলাভ সবুজ শৈবালের মিউসিলেজ আবরণ অত্যন্ত বিপদজনক হতে পারে। এতে পা পিছলে পড়ে অস্থিভাঙ্গা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ব্যবহারিক : *Ulothrix* এর স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : *Ulothrix* এর তাজা নমুনা অথবা স্থায়ী স্লাইড, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, কাচের বাটি, গ্লিসারিন, স্লাইড, কাভার স্লিপ, ড্রপার, পানি, ব্যবহারিক সিট, পেন্সিল ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : তাজা নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হলে শিক্ষক কাচের স্লাইডে গ্লিসারিনে নমুনা স্থাপন করে তাতে কাভার স্লিপ দিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্থাপন করে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় আঁকতে বলবেন।

তাজা নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে স্থায়ী স্লাইড কিনে নিতে হবে। ব্যবহারিক ক্লাসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্থায়ী স্লাইড স্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীগণ স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারিক সিটে পেন্সিল দিয়ে সঠিক চিত্র আঁকবে। চিত্রটি অবশ্যই চিহ্নিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ :

(i) এটি অশাখ, লম্বা সূত্রাকার ও সবুজ বর্ণের, (ii) কোষগুলো পিপাকৃতির, দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থে বড়, (iii) ক্লোরোপ্লাস্ট ঘুর্ণি পেয়ালা বা আংটি আকৃতির, (iv) ক্লোরোপ্লাস্টে একাধিক পাইরিনয়েড বিদ্যমান, (v) সূত্রের নিচের কোষটি বর্ণহীন, লম্বা ও কাইসদৃশ যাকে হোল্ডফাস্ট বলে।

শনাক্তকরণ : উপরিউল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে প্রদত্ত নমুনাটি ক্লোরোফাইসি শ্রেণির *Ulothrix* শৈবাল।

ছত্রাক (Fungi)

প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে ছত্রাক থ্যালোফাইটার অন্তর্গত কিন্তু পঞ্চ রাজ্য (five kingdom) শ্রেণিবিন্যাসে ছত্রাক প্রজাতিসমূহ পৃথক fungi রাজ্যের অন্তর্গত। Fungi (একবচনে fungus)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ছত্রাক। পরিষ্কার ছত্রাক হলো বহুকোষী, অভাস্কুলার, হাইফিসমৃদ্ধ মাইসেলিয়াম গঠিত হেটেরোট্রফিক সুকেন্দ্রিক জীব যারা শোষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে। ছত্রাক সম্বন্ধে স্টাডি করাকে বলা হয় মাইকোলজি (Mycology) বা ছত্রাকতত্ত্ব (Gk. Mykes = fungus = ছত্রাক, *logos* = knowledge = জ্ঞান)। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৯০,০০০ প্রজাতির ছত্রাক পাওয়া গিয়েছে। ছত্রাকের জন্য সন্তোষজনক পরিবেশ হলো আর্দ্রতা, উষ্ণতা,অর্গানিক খাদ্যসমৃদ্ধ ছায়াযুক্ত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য

১। ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন, অসবুজ, সালোকসংশ্লেষণে অক্ষম অপুষ্পক উদ্ভিদ।

২। এরা মৃতজীবী, পরজীবী বা মিথোজীবী হিসেবে বাস করে।

৩। এরা সুকেন্দ্রিক অর্থাৎ এদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও বিভিন্ন অঙ্গাণু বিদ্যমান।

৪। ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন (এক প্রকার জটিল পলিস্যাকারাইড) নির্মিত।

৫। ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য প্রধানত গ্লাইকোজেন, তেলবিন্দু, কখনো কখনো কিছু পরিমাণ ভলিউটিন ও চর্বি থাকতে পারে।

৬। ছত্রাকদেহে ভাস্কুলার টিস্যু নেই।

৭। এদের জননাঙ্গ এককোষী।

৮। স্ত্রী জননাঙ্গে থাকা অবস্থায় জাইগোট বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না।

৯। হ্যাপ্লয়েড স্পোর দিয়ে বংশবিস্তার হয়।

১০। জাইগোট-এ মায়োসিস হয়।

১১। অধিকাংশ ছত্রাক সদস্যই শোষণের মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করে।

১২। তীব্র অভিযোজন ক্ষমতা (কতক 5°C নিম্নতাপমাত্রায় এবং কতক 50°C এর উপর তাপমাত্রায় জন্মাতে পারে)।

মার্গুলিস কিংডম ফানজাইকে পাঁচটি ফাইলামে বিভক্ত করেছেন। ফাইলাম পাঁচটি হলো : ১। Zygomycota, ২। Ascomycota, ৩। Basidiomycota, ৪। Deuteromycota এবং ৫। Mycophycophyta.

ছত্রাকের দৈহিক গঠন (Vegetative structure) : অধিকাংশে ছত্রাকই বহুকোষী। এদের দেহ সূত্রাকার (filamentous), শাখান্বিত এবং আণুবীক্ষণিক। ছত্রাকের সূত্রাকার শাখাকে একবচনে হাইফা (hypha) এবং বহুবচনে হাইফি (hyphae) বলা হয়। এক একটি হাইফা সরু, স্বচ্ছ ও নলাকার। কোনো কোনো ছত্রাকে হাইফা প্রস্থপ্রাচীর বিশিষ্ট। হাইফার প্রস্থপ্রাচীরকে সেপ্টা (septa) বলে। সেপ্টাতে ছিদ্র থাকে। কোনো কোনো ছত্রাকে হাইফা প্রস্থপ্রাচীরবিহীন হয়। ছত্রাকের যে দৈহিক অংশ যা অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট সূত্রাকার হাইফি দ্বারা গঠিত তাকে মাইসেলিয়াম (mycelium) বলে। মাইসেলিয়ামে অবস্থিত অনেকগুলো হাইফি যখন প্রস্থপ্রাচীরবিহীন এবং বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয় তখন তাকে সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম বলে; যেমন-*Saprolegnia* sp। কোষে বা হাইফাতে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকলে তাকে সিনোসাইট বলে। পরজীবী ছত্রাক পোষক দেহের ভেতরে বিশেষ ধরনের হাইফা প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকে খাদ্য শোষণ করে নেয়। পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে হস্টোরিয়াম বলে; যেমন-*Phytophthora*। পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে রাইজয়েড বলে। কোনো কোনো উচ্চশ্রেণির ছত্রাকে মাইসেলিয়াম শক্ত রশির মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে রাইজোমর্ফ (rhizomorph) বলে; যেমন-*Agaricus*। উদ্ভিদের সরু মূল বা মূলরোমের চারদিকে বা অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট ছত্রাক জালের মতো বেষ্টন করে রাখে। এদেরকে মাইকোরাইজাল ছত্রাক

বলে; যেমন- *Saprolegnia* sp। উদ্ভিদ মূল ও ছত্রাকের মধ্যকার এই এসোসিয়েশনকে বলা হয় মাইকো... (Mycorrhiza, pl. Mycorrhizae)। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের জন্য এই মাইকোরাইজাল এসোসিয়েশন খুবই গুরু... উদ্ভিদের জন্য এরা খনিজ লবণ, বিশেষ করে ফসফরাস সরবরাহ করে এবং মূল থেকে খাদ্য শোষণ করে। এদের ... মিথোজীবী। এর উপর ভিত্তি করেই স্থলজ উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটেছে।

ছত্রাকের কোষীয় গঠন (Cell Structure) : কিছু নিম্নশ্রেণির ছত্রাক ছাড়া অধিকাংশ ছত্রাকের কোষ দুটি ... বিভক্ত—কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাস্ট।

১। কোষপ্রাচীর : বিভিন্ন শ্রেণির ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ ছত্রাক কোষের কোষপ্রাচীরের ... উপাদান কাইটিন জাতীয় পদার্থ। কাইটিন হলো এক প্রকার জটিল পলিস্যাকারাইড। প্রোটোপ্লাস্টকে সংরক্ষণ করা ... প্রধান কাজ। এটি পানি ও অন্যান্য দ্রবণের জন্য ভেদ্য।

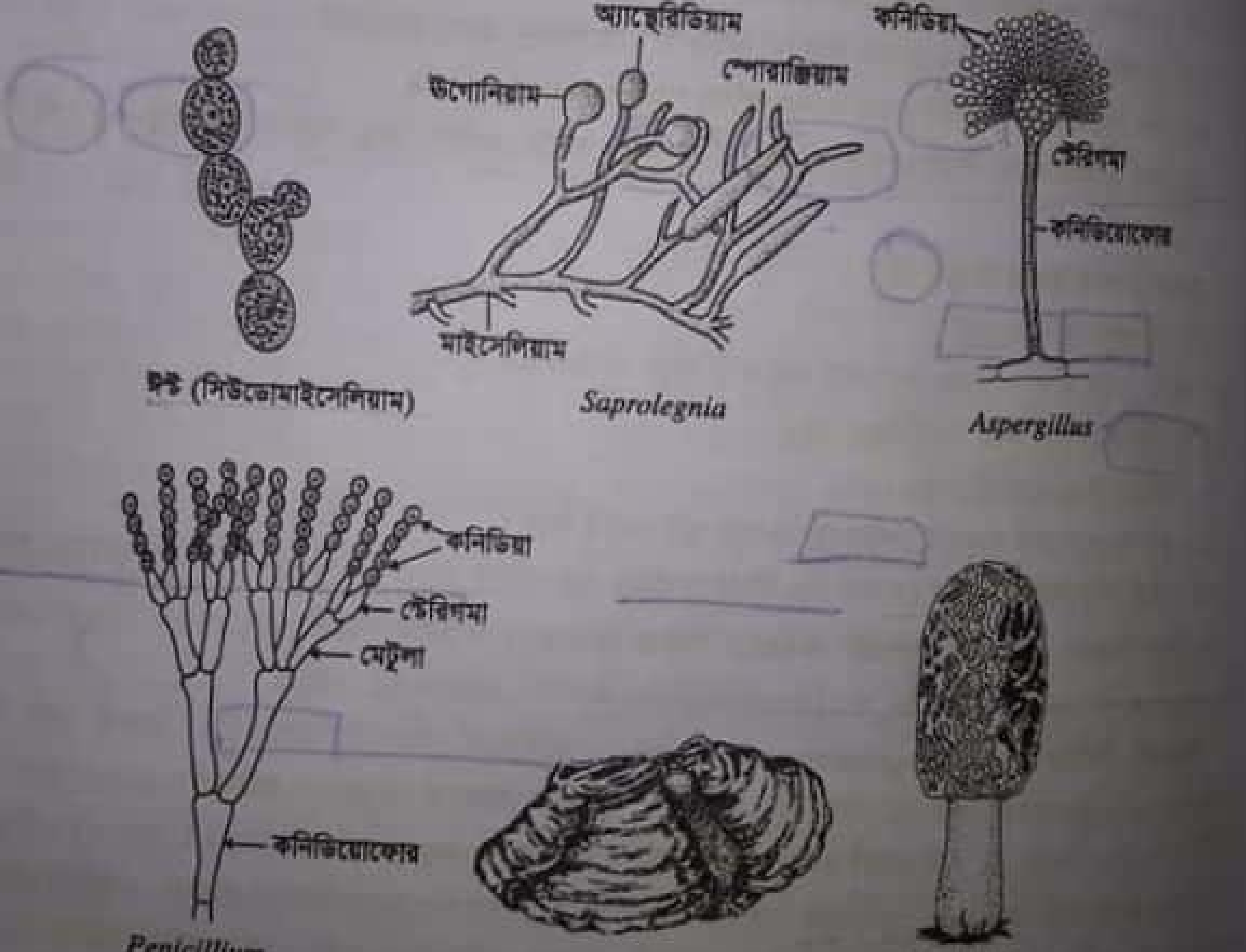

চিত্র ৫.৬ : কয়েকটি ছত্রাক। এর মধ্যে ইস্ট আণুবীক্ষণিক, *Polyporus* ও *Morchella* খালি চোখে ভালো দেখা যায়; অন্য তিনটি সেমি আণুবীক্ষণিক।

২। প্রোটোপ্লাস্ট : কোষপ্রাচীরের ভেতরের সমুদয় জীবিত পদার্থই প্রোটোপ্লাস্ট নামে পরিচিত। কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস নিয়ে ছত্রাকের প্রোটোপ্লাস্ট গঠিত হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

(ক) কোষঝিল্লি : কোষপ্রাচীরের ভেতরে দিকে অবস্থিত এটি একটি পাতলা পর্দা যা কোষপ্রাচীরের সাথে নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। ছত্রাকের কোষঝিল্লির প্রধান উপাদান ergosterol। কোষঝিল্লিটি কোনো কোনো স্থানে খুব পকেটের আকারে ভাঁজ হয়ে লোমাজোম গঠন করে থাকে।

(ঘ) সাইটোপ্লাজম : কোষঝিল্লির ভেতরের দিকে জেলির ন্যায় পদার্থটির নাম সাইটোপ্লাজম। তরুণ মাইসেলিয়াম ও হাইফার শীর্ষদেশে সাইটোপ্লাজম ঘন দানাদার ও সমসত্ত্ব। কিন্তু পরিণত মাইসেলিয়ামে সাইটোপ্লাজম অপেক্ষাকৃত পাতলা ও গহ্বরযুক্ত থাকে। সাইটোপ্লাজমের ভেতরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষ গহ্বর প্রভৃতি থাকে, তবে প্লাস্টিড থাকে না। সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে গ্লাইকোজেন, ভলিউটিন, তৈলবিন্দু ও চর্বি প্রভৃতি বিদ্যমান।

(ঙ) নিউক্লিয়াস : ছত্রাকের সাইটোপ্লাজমে এক বা একাধিক গোলাকার বা উপবৃত্তাকার নিউক্লিয়াস থাকে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে একটি নির্দিষ্ট ও সছিদ্র নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে। নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত ঘন থাকে। কোনো কোনো ছত্রাকবিদ এ কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিকে নিউক্লিয়োলাস হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

ছত্রাকে ডাইমর্ফিজম (Dimorphism) : ভিন্নতর পরিবেশের কারণে নিজের আকৃতি পরিবর্তনের যোগ্যতাকে ডাইমর্ফিজম বলে। *Histoplasma capsulatum* মাটিতে সূত্রাকার এবং মানুষের ফুসফুসে কোষপিণ্ড হিসেবে অবস্থান করে। এটি হিস্টোপ্লাজমোসিস রোগ সৃষ্টি করে।

ছত্রাকের খাদ্যগ্রহণ : শোষণ (absorption) প্রক্রিয়ায় ছত্রাক খাদ্য গ্রহণ করে। হাইফি তার চারপাশে খাদ্যদ্রব্যে পরিপাকীয় এনজাইম নিঃসরণ করে খাদ্য পরিপাক করে। এই পরিপাককৃত খাদ্য হাইফির অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হয় অথবা সক্রিয়ভাবে কোষাভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়। এই কার্যটি সাধারণত হাইফির শীর্ষের দিকেই হয়ে থাকে। খাদ্যদ্রব্য পরে সাইটোপ্লাজমিক প্রবাহের (cytoplasmic streaming) মাধ্যমে দেহের পুরাতন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। পরজীবী ছত্রাক পোষক কোষের অভ্যন্তর থেকে হস্টোরিয়ার মাধ্যমে খাদ্য শোষণ করে। শর্করা, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, খনিজ লবণ ও ভিটামিন ছত্রাকের প্রধান খাদ্য।

ছত্রাকের বৃদ্ধি : বৃদ্ধিকালে অধিকাংশ বিকাশীয় কার্যাবলি হাইফির শীর্ষে ঘটে থাকে। অধিকাংশ নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, অন্যান্য অঙ্গাণু বর্ধিষ্ণু শীর্ষের পেছনেই জড় হয়। হাইফির মাথাকে ডোম (dome) বলা হয়। ডোম অঞ্চলে নতুন সৃষ্ট ভেসিকল (vesicle) জড় হয় যা কোষঝিল্লি ও কোষ প্রাচীর তৈরির উপাদান ও এনজাইম বহন করে থাকে।

ছত্রাকের জনন (Reproduction of fungi) : ছত্রাক প্রজাতি সাধারণত অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন উপায়ে জননকার্য সম্পন্ন করে থাকে। কোনো কোনো ছত্রাক প্রজাতির সমস্ত দেহকোষটিই জনন কাজে ব্যবহৃত হয়, ফলে এ ধরনের ছত্রাকের দৈহিক ও জনন অঙ্গের কোনো পার্থক্য থাকে না। এরূপ ছত্রাককে বলা হয় হলোকারপিক ছত্রাক; যেমন- *Synchytrium*। আবার অধিকাংশ ছত্রাকের দেহের অংশবিশেষ হতে জননযন্ত্রের সৃষ্টি হয়, অন্য অংশ স্বাভাবিক থাকে। এরূপ ছত্রাককে বলা হয় ইউকারপিক ছত্রাক; যেমন- *Saprolegnia*। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১। অঙ্গজ জনন : দেহাঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে ছত্রাকের অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে।

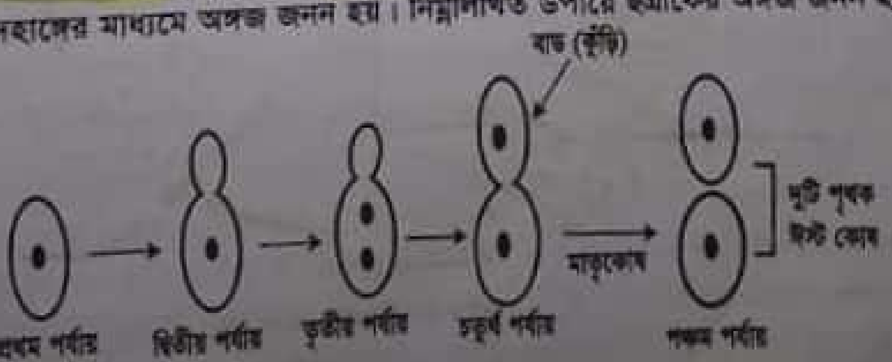

চিত্র ৫.৭ : ইস্টের বাডিং।

(i) দৈহিক খণ্ডায়ন (Fragmentation) : ছত্রাক দেহটি একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি খণ্ড একটি স্বতন্ত্র ছত্রাক দেহে পরিণত হয়, যেমন- *Rhizopus*, *Penicillium*।

(ii) দ্বি-ভাজন (Binary fission) : দৈহিক কোষটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় দু'টি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি অপত্য কোষ একটি স্বতন্ত্র ছত্রাক কোষে পরিণত হয়। ইস্ট (*Saccharomyces*) ছত্রাকে এরূপ দেখা যায়।

(iii) **কুঁড়ি সৃষ্টি (Budding)** : কোনো কোনো ছত্রাকের দেহ থেকে কুঁড়ি সৃষ্টি হয় এবং কুঁড়িটি পৃথক হয়ে একটি নতুন ছত্রাকের সৃষ্টি করে। ইস্ট (*Saccharomyces*) ছত্রাকে এরূপ দেখা যায়।

২। **অযৌন জনন** : ছত্রাকের অযৌন জননের প্রধান প্রক্রিয়া হলো স্পোর উৎপাদন প্রক্রিয়া। ছত্রাকের স্পোর উৎপাদন অঙ্গকে স্পোরাঞ্জিয়াম (বহুবচনে স্পোরাঞ্জিয়া) বলে। স্পোরাঞ্জিয়ামের ভেতরে একাধিক নিশ্চল অ্যাপ্লানোস্পোর বা সচল জুস্পোর উৎপন্ন হয়। আবার হাইফার মাথায়ও স্পোর উৎপন্ন হতে পারে, এরূপ স্পোরকে কনিডিয়া বলে। স্পোর পুরু আবরণ দিয়ে আবৃত থাকলে তাকে ক্ল্যামাইডোস্পোর বলে। স্পোরগুলো উপযুক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে স্বতন্ত্র ছত্রাক উদ্ভিদের জন্ম দেয় (চিত্র ৫.৬ এ *Penicillium* এবং *Aspergillus* এ কনিডিয়া উৎপাদন দেখানো হয়েছে)। *Saprolegnia*-তে জুস্পোরের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়। ছত্রাকের হাইফাগুলো প্রস্থপ্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়। ঐ সকল খণ্ডকে অয়ডিয়া (oidia) বলে। অয়ডিয়া স্পোরের ন্যায় আবরণ তৈরি করে অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে নতুন ছত্রাক দেহ গঠন করে; যেমন *Coprinus togopus*।

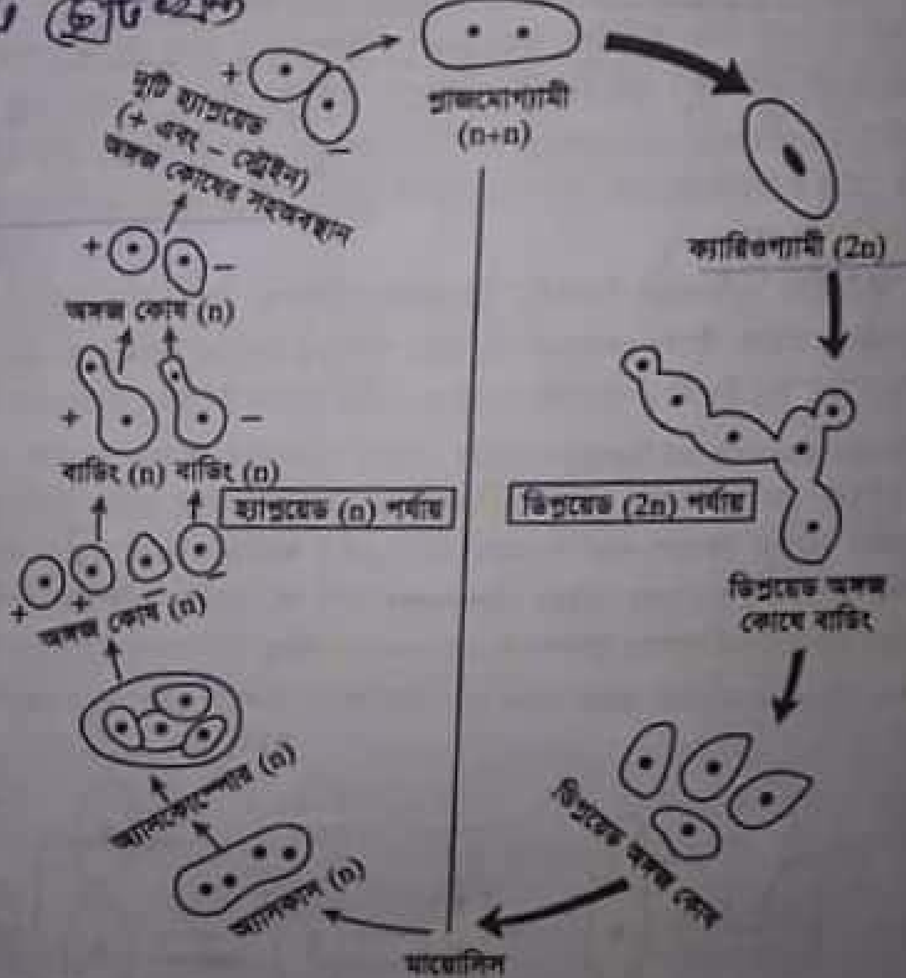

চিত্র ৫.৮ : ছত্রাকের জীবন চক্র।

৩। **যৌন জনন** : দু'টি গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন ঘটে থাকে। ছত্রাকের জননাঙ্গকে গ্যামিট্যাঞ্জিয়াম (বহুবচনে- গ্যামিট্যাঞ্জিয়া) বলা হয়। গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামে গ্যামিট সৃষ্টি হয়। পুং এবং স্ত্রী (বা +,−) গ্যামিট একই রকম (কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না) হলে তাকে আইসোগ্যামিট বলে। পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট পৃথক বোধ্য হলে সাধারণত পুং গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামকে অ্যানথেরিডিয়াম এবং স্ত্রী গ্যামিট্যাঞ্জিয়ামকে উগোনিয়াম বলা হয়। একই রকম জনন কোষের মিলনকে আইসোগ্যামি এবং দুই ধরনের জনন কোষের মিলনকে হেটারোগ্যামি বা উগ্যামি বলে। প্রাথমিকভাবে দু'টি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজমের মিলন ঘটে থাকে বলা হয় প্লাজমোগ্যামী (plasmogamy) এবং পরে নিউক্লিয়াস দু'টির মিলন ঘটে থাকে

বলা হয় ক্যারিওগ্যামী। ক্যারিওগ্যামীর মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি হয়। গ্যামিট সৃষ্টি, প্লাজমোগ্যামী ও ক্যারিওগ্যামী এই তিনটি পর্যায় শেষে ছত্রাকের যৌন জনন সম্পন্ন হয়। জাইগোটের মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে ছত্রাকটি পুনরায় হ্যাপ্লয়েড (n) অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। (চিত্র ৫.৬ এ *Saprolegnia*-তে উগোনিয়াম ও অ্যান্থেরিডিয়াম দেখানো হয়েছে।)

অ্যাসকোমাইকোটা বা স্যাক ফানজাই-তে অ্যাসকাস নামক থলের ভেতরে ৪-৮টি অ্যাসকোস্পোর তৈরি হয়। ব্যাসিডিওমাইকোটা বা ক্লাব ফানজাই-তে ব্যাসিডিওকার্প-এ সৃষ্ট ব্যাসিডিয়ামের মাথায় ব্যাসিডিওস্পোর উৎপন্ন হয়। কতক ছত্রাকের যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দুটি mating type-এর (+ এবং -) সাইটোপ্লাজম প্রথম একসাথে মিশে যায় কিন্তু নিউক্লিয়াস দুটি বহু পরে মিলিত হয়। কাজেই নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হওয়ার (ক্যারিওগ্যামী) পূর্ব পর্যন্ত এই হাইফার ভেতরে বংশগতীয়ভাবে দুই প্রকার দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিরাজ করে। বংশগতীয়ভাবে দুই প্রকার দুটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ বা হাইফাকে **dikaryotic** কোষ বা হাইফা বলা হয়। পুরো মাইসেলিয়াম এরূপ হলে তাকে dikaryotic মাইসেলিয়াম বলা হয়। দুটি নিউক্লিয়াস থাকে বলে এটি ডাইক্যারিয়ন (dikaryon), আবার দুই প্রকার (+, -) নিউক্লিয়াস থাকে বলে এটি হেটেরোক্যারিয়ন।

ছত্রাকের গুরুত্ব (Importance of fungi) : ছত্রাকের গুরুত্ব অপরিসীম। ছত্রাক আমাদের জীবন ও কার্যাবলির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও এদের উপকারিতার বিষয়ে আমরা যেমন অনুভব করি না তেমনি অপকারিতার বিষয় সম্পর্কেও আমরা সচেতন নই।

ছত্রাকের উপকারিতা

১। **খাদ্য হিসেবে ছত্রাক :** মাশরুম (mushrooms–*Agaricus, Volvariella*), মোরেল (morels–*Morchella*, ট্রাফল (truffles-*Tuber*) প্রভৃতি নামে পরিচিত বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়। *Agaricus bisporus* এবং *A. campestris* প্রজাতির মাশরুম সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর পুষ্টিগুণও উচ্চমানের।

২। **ওষুধ তৈরিতে :** পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন *Penicillium chrysogenum* গণের ছত্রাক থেকে তৈরি হয়। *Claviceps purpurea* ছত্রাক থেকে **ergot** তৈরি হয় যা ওষুধ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে। মৃত্তিকাবাসী ছত্রাক থেকে (*Tolypocladium inflatum*) সাইক্লোস্পোরিন (cyclosporine) ওষুধ তৈরি হয় যা মানুষের যে কোনো অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। **জৈব অ্যাসিড ও উৎসেচক তৈরিতে :** বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক থেকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড ও উৎসেচক তৈরি করা হয়। যেমন-*Saccharomyces cerevisiae* ছত্রাক থেকে ইনভারটেজ নামক উৎসেচক পাওয়া যায়। ডায়াস্টেজ ও জৈব অ্যাসিড তৈরি করতে *Aspergillus* ছত্রাক ব্যবহার করা হয়।

৪। **পরিবেশ সংরক্ষণে :** ছত্রাক পরিবেশ থেকে বিষাক্ত দূষক পদার্থ বিশ্লিষ্ট (decompose) করে পরিবেশকে বিষাক্ত পদার্থ থেকে দূষণমুক্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে বায়োরিমেডিয়েশন (bioremediation) বলে। বর্জ্য পদার্থ বিশ্লিষ্ট করে ছত্রাক পরিবেশে কার্বন ও অন্যান্য মৌল ফিরিয়ে দেয় যা পরবর্তীতে উদ্ভিদ পুনরায় ব্যবহার করতে পারে।

৫। **হরমোন :** *Gibberella fujikuroi* নামক ছত্রাক থেকে জিবেরেলিন নামক উদ্ভিদের বৃদ্ধি হরমোন পাওয়া যায়।

৬। **কৃষিতে ব্যবহার :** ছত্রাকের বহুমুখী ব্যবহার কৃষিতে লক্ষ্য করা যায়। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও ছত্রাকের অবদান আছে। এক একর উর্বর জমির উপরের ৮ ইঞ্চি মাটিতে এক টন পরিমাণ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে। মৃত জীবদেহ ও জৈব বর্জ্য পচনের মাধ্যমে জৈব সার তৈরিতে ছত্রাকের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

৭। **মৌলিক গবেষণায় :** আণবিক জীববিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার কাজে *Saccharomyces cerevisiae* এর AH 109, PJ 69-4 alpha, Y187 ইত্যাদি জাত ব্যবহার করা হয়।

জন্য কোষপ্রাচীর, নিশ্চলতা, খাদ্যগ্রহণ ও স্পোর উৎপাদন সংক্রান্ত মিলের কারণে ছত্রাক এক সময় উদ্ভিদরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন ছত্রাক পৃথক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ–

(i) মাইটোসিস-এর সময় নিউক্লিয়াসের এনভেলপ বিলুপ্ত হয় না।
(ii) মাইটোটিক স্পিন্ডল নিউক্লিয়াসের ভেতরে হয়।
(iii) ক্রোমোসোমে খুব অল্প পরিমাণে হিস্টোন প্রোটিন থাকে।
(iv) কোনো সেন্ট্রিয়োল থাকে না।
(iv) কোষপ্রাচীর কাইটিন নির্মিত, সেলুলোজ নির্মিত নয়।

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় ছত্রাক প্রাণিজগতের সাথে অধিক মিলসম্পন্ন, যেমন–
১। দেহ ক্লোরোফিলবিহীন।
২। এরা মৃতভোজী বা পরভোজী অর্থাৎ পরনির্ভর।
৩। সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন।
৪। কোষঝিল্লি ergosterol সমৃদ্ধ।
৫। কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত যা পতঙ্গ গ্রুপের বহিঃকঙ্কালের সাথে মিল সম্পন্ন।

অধিকৃত জায়গা (আয়তন) হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রজাতি *Armillaria ostoyae* যা যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন বনে আছে। এর দখলকৃত জায়গার পরিমাণ ১৬৬৫ টি ফুটবল খেলার মাঠের চেয়েও বেশি।

Genus : *Agaricus* (এগারিকাস)

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Fungi
Division : Basidiomycota
Class : Basidiomycetes
Order : Agaricales
Family : Agaricaceae
Genus : *Agaricus*

বাংলাদেশ থেকে নথিভুক্ত প্রজাতি হলো *A. bisporus* (Leg.) Sing. এটি হোয়াইট বাটন মাশরুম নামে পরিচিত।

বর্ষাকালে বাড়ির আশপাশ বা মাঠে ময়দানে পাশের চিত্রটির ন্যায় কোন বস্তু কখনও দেখেছ কি? সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো 'ব্যাঙের ছাতা' নামে পরিচিত। আসলে এটি এক ধরনের ছত্রাক, যার সাধারণ নাম মাশরুম, আর বৈজ্ঞানিক নাম *Agaricus*। এখানে *Agaricus* ছত্রাক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

আবাসস্থল : *Agaricus* ভেজা মাটিতে, মাঠে-ময়দানে বা গোবর, খড় ইত্যাদি পচনশীল জৈব পদার্থের উপর জন্মায়। এরা মৃতজীবী (saprophytic)। সাধারণত এদের বায়বীয় অংশ খাড়া হয়ে উপরে বৃদ্ধি পায় এবং পরিণত অবস্থায় অনেকটা ছাতার মতো দেখায়। তাই এদেরকে **'ব্যাঙের ছাতা'** বলা হয়। মাইসেলিয়াম থেকে ছাতার ন্যায় বায়বীয় অংশ সৃষ্টিকে ফ্রুকটিফিকেশন (fructification) বলা হয় এবং ঐ বায়বীয় অংশকে *Agaricus* উদ্ভিদের ফ্রুট বডি (fruit body বা fruiting body) বলা হয়। এরা **'মাশরুম'** (mushroom) নামেও পরিচিত। অনেক সময় লনে (Lawn-খালি জায়গা) অনেকগুলো মাশরুম বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে অবস্থান করতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থাকে পরীচক্র (fairy ring) বলা হয়।

দৈহিক গঠন : একটি পূর্ণাঙ্গ *Agaricus* ছত্রাকের দেহকে দু'টি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। দৈহিক অংশ তথা মাইসেলিয়াম (mycelium) এবং জনন অংশ তথা ফ্রুট বডি। মাইসেলিয়াম অত্যন্ত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ও সূত্রাকার; মাটি বা জৈব বস্তুর একটু ভেতরে অবস্থান করে। হাইফিগুলো প্রস্থপ্রাচীর দিয়ে বিভক্ত। হাইফিগুলো সাদা বর্ণের, এরা আবাসস্থল থেকে খাদ্য শোষণ করে। হাইফার কোষগুলোতে দানাদার প্রোটোপ্লাজম, একাধিক নিউক্লিয়াস, ছোট ছোট কোষ গহ্বর, সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে তেল বিন্দু থাকে। হাইফিগুলো পৃথক থাকতে পারে, বা বহু সংখ্যক একসাথে জড়াজড়ি করে দড়ির মতো তৈরি করে। *Agaricus*-এর দড়ির মতো হাইফাল অংশকে রাইজোমরফ (rhizomorph) বলা হয়। একদিনে একটি মাশরুম এক কিলোমিটার দীর্ঘ হাইফি তৈরি করতে পারে।

চিত্র ৫.৯ : *Agaricus* ছত্রাক-এর ফ্রুট বডি এবং অন্যান্য অংশ।

জনন অংশ তথা ফ্রুটবডি (fruiting body) মাটি বা আবাদ মাধ্যম থেকে উপরে বাড়তে থাকে। পরিণত অবস্থায় দুটি অংশ থাকে। গোড়ার দিকে কাণ্ডের ন্যায় অংশকে স্টাইপ (stipe) বলা হয় এবং উপরের দিকে ছাতার ন্যায় অংশকে পাইলিয়াস (pileus) বলা হয়। পাইলিয়াসের নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পর্দার ন্যায় অংশকে গিল (gills) বা ল্যামেলি (lamellae) বলে। স্টাইপের মাথায় একটি চক্রাকার অংশ থাকে যাকে অ্যানুলাস (annulus) বলে। ল্যামিলীতে অসংখ্য ব্যাসিডিয়া (basidia) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ব্যাসিডিয়াম উর্বর এবং ব্যাসিডিয়ামের শীর্ষে আঙুলের ন্যায় চারটি অংশের মাথায় একটি করে ব্যাসিডিয়োস্পোর (basidiospore) উৎপন্ন হয়। স্পোরগুলো অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন মাইসেলিয়াম তৈরি করে।

গিলের অন্তর্গঠন : গিল পাতলা পাতের মতো। গিলের অন্তর্গঠন বেশ জটিল প্রকৃতির। প্রস্থচ্ছেদ করলে একে তিনস্তরে দেখা যায়, যথা-ট্রমা, সাবহাইমেনিয়াম ও হাইমেনিয়াম।

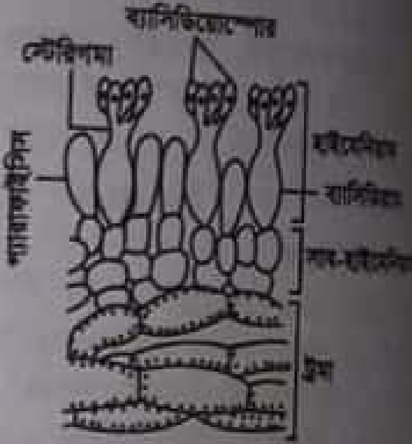

চিত্র ৫.১০ : গিলের তিনটি স্তর (ট্রমার এক পাশের অংশ দেখানো হয়েছে)।

(i) ট্রমা (Trama) : গিলের কেন্দ্রীয় বন্ধ্যা অংশকে ট্রমা বলে। ঢিলাভাবে জড়াজড়ি করে সজ্জিত গৌণ মাইসেলিয়াম দিয়ে ট্রমা অংশ গঠিত। এর কোষগুলো ডাইক্যারিওটিক।

(ii) সাবহাইমেনিয়াম (Subhymenium) : ট্রমার উভয় দিকের অংশকে সাবহাইমেনিয়াম বলে। কোষগুলো আকারে ছোট, গোলাকার এবং ২-৩ নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। এরূপ কোষবিন্যাসকে প্রোজেনকাইমা বলে। এ অঞ্চল থেকে ব্যাসিডিয়াম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

(iii) হাইমেনিয়াম (Hymenium) : গিলের উভয় পাশের বহিস্থ স্তরকে হাইমেনিয়াম বলে। উর্বর এ স্তরের কোষগুলো সাবহাইমেনিয়াম হতে উত্থিত এবং তলের সাথে লম্বভাবে সাজানো থাকে। এ স্তরেই গদাকার ব্যাসিডিয়াম উৎপন্ন হয়।

ব্যাসিডিওকার্প (Basidiocarp) : ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির ছত্রাকের ফ্রুট বডিকে ব্যাসিডিওকার্প বলে। কাজেই *Agaricus*-এর ফ্রুট বডিকেও ব্যাসিডিওকার্প বলা হয়। *Agaricus*-এর ব্যাসিডিওকার্প গোড়ায় দণ্ডের ন্যায় স্টাইপ, স্টাইপের মাথার দিকে অ্যানুলাস এবং মাথায় ছাতার ন্যায় পাইলিয়াস নিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে আছে গিল বা ল্যামিলী, গিলে অসংখ্য ব্যাসিডিয়া এবং প্রতিটি ব্যাসিডিয়ামের মাথায় ৪টি করে ব্যাসিডিওস্পোর। ভূনিম্নস্থ মাইসেলিয়াম অংশ বাদে উপরে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অংশটুকুই *Agaricus*-এর ব্যাসিডিওকার্প।

পুষ্টি : জৈব পদার্থ শোষণ করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে।

জনন : *Agaricus* প্রধানত যৌন জনন প্রক্রিয়ায় জনন কার্য সম্পন্ন করে। যৌন স্পোর উৎপাদনকারী অঙ্গের নাম ব্যাসিডিয়াম (basidium) এবং স্পোর এর নাম ব্যাসিডিয়োস্পোর।

মাশরুম ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

উপকারিতা :

১। খাদ্য হিসেবে : 'মাশরুম' বিভিন্ন ভিটামিন সমৃদ্ধ হওয়ায় পৃথিবীর বহুদেশে এটি সুপ্রিয় খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এজন্য পৃথিবীর বহুদেশে এর চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও এর ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে। এটি টাটকা ও শুকানো উভয় অবস্থায় বাজারে বিক্রি হয়। বাংলাদেশের বড় বড় হোটেলগুলোতে খাদ্য হিসেবে, বিশেষ করে স্যুপ তৈরিতে মাশরুম ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আমাদের গ্রামীণ সমাজেও মাশরুম ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খাদ্য হিসাবে বাংলাদেশে *Agaricus*, *Volvariella* ও *Pleurotus* গণভুক্ত কয়েকটি মাশরুম প্রজাতির চাষ হচ্ছে এবং আমেরিকা ও ইউরোপে *Agaricus*

brunnescens (= *A. bisporus*) মাশরুম প্রজাতির ব্যাপক চাষ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৭৮০ মিলিয়ন পাউন্ড mushroom উৎপাদিত হয়।

২। মৃত্তিকার পুষ্টি বৃদ্ধিতে : মাশরুম (*Agaricus*) মৃতজীবী তাই বিভিন্ন ধরনের জটিল দ্রব্যকে ভেঙে মৃত্তিকার পুষ্টি বৃদ্ধি করে থাকে।

৩। শিল্প ও বাণিজ্যে : 'মাশরুম' এর চাষ বেশ লাভজনক কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে।

৪। ওষুধি গুণ :

(i) এতে আঁশ বেশি থাকায় এবং শর্করা ও চর্বি কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য একটি আদর্শ খাবার।

(ii) এতে শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ লবণ (Ca, K, P, Fe ও Cu) এমন সমন্বয়ে আছে যা শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে মজবুত করে। যার ফলে গর্ভবতী মা ও শিশুরা এটি নিয়মিত খেলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

(iii) এতে প্রচুর উৎসেচক (এনজাইম) আছে যা হজমে সহায়ক, খাবারে রুচি বাড়ে এবং পেটের পীড়া নিরাময় করে।

(iv) এতে লোভাস্টানিন, এনটাডেনিন ও ইরিটাডেনিন থাকে যা শরীরের কোলেস্টেরল কমানোর জন্য অন্যতম উপাদান। মাশরুম নিয়মিত খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রিত থাকে। ক্যান্সার ও টিউমার প্রতিরোধ করে।

৫। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে : বিশ্বের অনেক দেশে মাশরুম অত্যন্ত দামি খাবার। ব্যাপকভাবে মশরুম চাষ ও রপ্তানির মাধ্যমে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।

অপকারিতা :

১। বিষাক্ততা : অপরিচিত বুনো মাশরুম খাওয়া ঠিক নয়, কারণ কিছু কিছু প্রজাতি (*Agaricus xanthodermus*) বেশ বিষাক্ত। সবচেয়ে বিষাক্ত হলো *Amanita virosa* এবং *A. phalloides* প্রজাতি। বিষাক্ত মাশরুম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে।

২। বিনাশী কার্য : মাশরুম কাঠের গুড়ি, খড়, বাঁশ প্রভৃতির ক্ষতি সাধন করে থাকে।

৩। জৈব বস্তুর ঘাটতি : মাশরুম যেখানে জন্মায়, সেখানে জৈব বস্তুর অভাব দেখা দেয়।

বিষাক্ত মাশরুম চেনার উপায় : ১। বেশির ভাগ উজ্জ্বল বর্ণের প্রজাতিগুলো বিষাক্ত হয়ে থাকে। ২। উগ্রগন্ধযুক্ত ও ঝাঁঝালো প্রজাতিগুলো বিষাক্ত। ৩। বিষাক্ত প্রজাতিগুলোর ব্যাসিডিওস্পোর বেগুনি রঙের। ৪। বিষাক্ত মাশরুম কখনো খর রোদে জন্মায় না। ৫। কাঠের উপর জন্মায় এমন প্রজাতিগুলো বিষাক্ত।

পার্থক্যের বিষয়	শৈবাল	ছত্রাক
১। বর্ণ কণিকা	কোষে ক্লোরোফিল আছে।	কোষে ক্লোরোফিল নেই।
২। খাদ্য তৈরি	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে, তাই স্বভোজী।	এরা নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে না, তাই পরভোজী। খাদ্যের জন্য অন্য জীবদেহ বা জৈব বস্তুর উপর নির্ভরশীল।
৩। আলোক নির্ভরতা	এদের জন্য আলো অত্যাবশ্যক (সালোকসংশ্লেষণ করে বলে)।	এদের জন্য আলো অত্যাবশ্যক নয়।
৪। কোষ প্রাচীর	এদের কোষ প্রাচীর প্রধানত সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।	এদের কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত।
৫। সঞ্চিত খাদ্য	এদের সঞ্চিত খাদ্য শ্বেতসার (শর্করা)।	এদের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন ও তৈলবিন্দু।
৬। জননাঙ্গ	যৌন জননাঙ্গগুলো ক্রমাগত সরল অবস্থা হতে জটিল অবস্থায় পরিণত হয়েছে।	যৌন জননাঙ্গ জটিল অবস্থা হতে ক্রমাগত সরলতর অবস্থায় প্রাপ্ত হয়েছে।
৭। আবাসস্থল	এদের অধিকাংশ পানিতে বাস করে।	এদের অধিকাংশ স্থলে বাস করে।

ব্যবহারিক : *Agaricus*-এর ফ্রুটবডির বাহ্যিক গঠন পর্যবেক্ষণ।

উপকরণ : *Agaricus*-এর ফ্রুটবডির তাজা নমুনা/গ্লাস জার-এ রক্ষিত নমুনা/শুকনো নমুনা, ব্যবহারিক সিট, পেন্সিল ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : প্রদত্ত নমুনাটি পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে এবং শনাক্ত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত : প্রদত্ত নমুনাটি *Agaricus*-এর ছত্রাকের ফ্রুটবডি, কারণ-

১। নমুনাটি ছাতার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট।
২। এটি অসবুজ।
৩। দেহ দণ্ডাকার স্টাইপ এবং প্রসারিত পাইলিয়াস-এ বিভক্ত।
৪। স্টাইপের মাথায় এবং পাইলিয়াসের নিচে চক্রাকার অ্যানুলাস আছে।
৫। পাইলিয়াসের নিম্নতলে ঝুলন্ত গিল আছে।

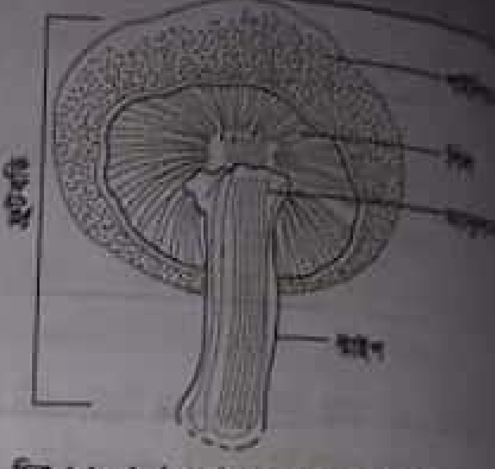

চিত্র ৫.১০.১ *Agaricus* ছত্রাক-এর ফ্রুট বডি।

ছত্রাকঘটিত রোগ

ছত্রাক দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়। নিচে দু'টি ছত্রাকঘটিত রোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ (Late blight disease of potato) : গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি ক্ষত হয়ে শুকিয়ে যাওয়াকে বলা হয় ধ্বসা বা **ব্লাইট** (blight)। আলু গাছে দুই ধরনের ব্লাইট রোগ হয়ে থাকে; একটি হলো **লেট ব্লাইট**, অপরটি হলো **আর্লি ব্লাইট** যা *Alternaria solani* দিয়ে হয়ে থাকে। আলু গাছের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো লেট ব্লাইট, যা বাংলায় বিলম্বিত ধ্বসা রোগ হিসেবে পরিচিত। মড়ক আকারে দেখা দিলে লেট ব্লাইটের কারণে আলুর ফলন সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ রোগটি সম্ভবত প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। পরে উত্তর আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হয়ে বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়ে। শীতপ্রধান অঞ্চলেই রোগটির প্রকোপ বেশি। আলুর লেট ব্লাইট রোগের কারণে ১৮৪০ দশকের মাঝের দিকে (১৮৪৩-১৮৪৭) আয়ারল্যান্ডে ভয়াবহ আইরিশ দুর্ভিক্ষ (Irish Famine) দেখা দেয়, যার ফলে প্রায় দশ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায় এবং অভাবে পড়ে আরো ২০ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে। ঐ সময় ইউরোপের প্রায় সব দেশেই আলুর মড়ক দেখা দিয়েছিল কিন্তু অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আয়ারল্যান্ড, কারণ 'Irish Lumper' নামক একটি মাত্র প্রকরণই তারা অধিক চাষ করতো। লেট ব্লাইট রোগে আলুর ফসলহানির কারণে জার্মানিতেও ৭ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল।

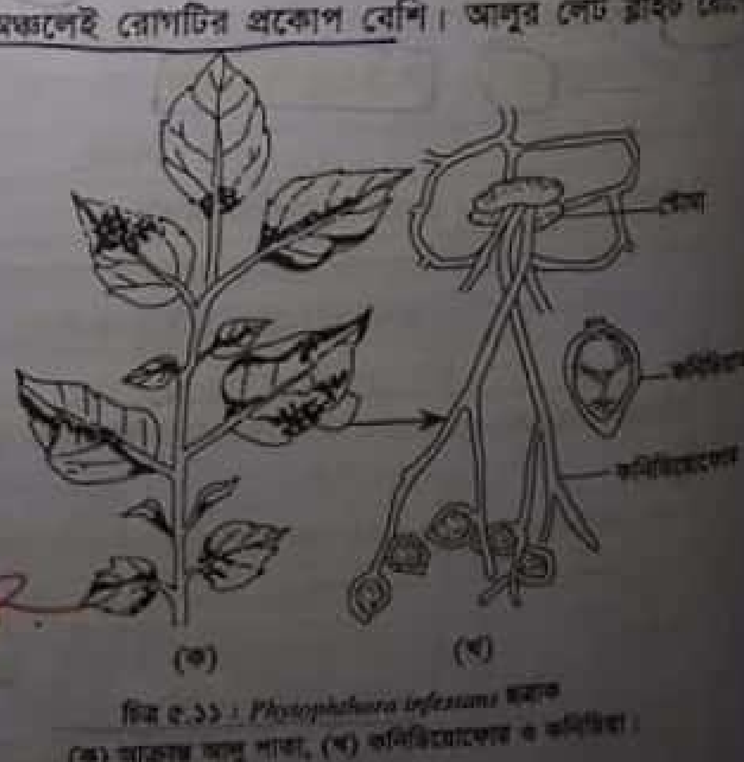

(ক) (খ)

চিত্র ৫.১১ : *Phytophthora infestans* ছত্রাক
(ক) আক্রান্ত আলু পাতা, (খ) কনিডিওফোর ও কনিডিয়া।

রোগজীবাণু (Pathogen) : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের কারণ হলো আলু গাছে *Phytophthora infestans* নামক ছত্রাকের আক্রমণ। *Phytophthora*, Phycomycetes শ্রেণির ছত্রাক। ছত্রাক দেহ মাইসেলিয়াম এবং সিনোসাইটিক। এরা পোষক দেহের আন্তঃকোষীয় ফাঁকে

অবস্থান করে এবং হস্টোরিয়া (haustoria) নামক বিশেষ হাইফার মাধ্যমে পোষক কোষ থেকে খাদ্যরস শোষণ করে বেঁচে থাকে। পরবর্তীতে আন্তকোষীয় হাইফা থেকে বায়বীয় শাখা পাতার নিম্নত্বকের স্টোম্যাটা দিয়ে গুচ্ছাকারে বের হয়ে আসে। বায়বীয় এ শাখাগুলোকে কনিডিয়োফোর বলে। কনিডিয়োফোর শাখান্বিত এবং প্রতি শাখার মাথায় একটি কনিডিয়াম (বহুবচনে কনিডিয়া) উৎপন্ন হয় (কনিডিয়াম হলো অযৌন স্পোর)। কনিডিয়া দেখতে কতকটা উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার, পুরুপ্রাচীর বিশিষ্ট কিন্তু মাথাটা পাতলা ও অর্ধস্বচ্ছ। প্রতিটি কনিডিয়ামে একাধিক নিউক্লিয়াস, প্রচুর দানাদার প্রোটোপ্লাজম এবং সঞ্চিত খাদ্য (তৈলবিন্দু) থাকে।

P. infestans ডিপ্লয়েড, ক্রোমোসোম ১২ (১১ - ১৩), এর জিনোম সিকুয়েন্সিং সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯ সালে। এতে বেসপেয়ার আছে ২৪০ মিলিয়ন, জিন শনাক্ত করা হয়েছে ১৮,০০০।

তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকলে কনিডিয়া সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন টিস্যু বা নতুন গাছকে আক্রমণ করে। তবে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প অধিক থাকলে (মেঘলা আবহাওয়া, ঘন কুয়াশা, বৃষ্টি ইত্যাদি সময়ে) প্রতিটি কনিডিয়াম থেকে অনেকগুলো দ্বিফ্ল্যাজেলাযুক্ত জুস্পোর উৎপন্ন হয় এবং পানির সাহায্যে বা বাতাসের সাহায্যে আশপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ফসলে মড়ক আকারে দেখা দেয়।

বাংলাদেশে কখনো কখনো এ রোগটি হতে দেখা যায়। শীতকালে তাপমাত্রা অধিক নিচে নেমে এলে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প অধিক থাকলে (সাধারণত কিছুদিন ধরে ঘন কুয়াশা বা মৃদু বৃষ্টিপাত, হালকা বাতাস থাকলে) এ রোগটি ফসলের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রথম পাতায় সবুজ-ধূসর বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ (spot) দেখা যায়। দাগগুলো পরে অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে হালকা বাদামি বর্ণের হয় এবং শেষ পর্যন্ত লালচে কালো বা কালো-বাদামি বর্ণের হয়। গাছের বয়স্ক পাতার কিনারায় বা অগ্রভাগে পানি ভেজা দাগ প্রথম প্রকাশ পায়। পরে কালচে ভেজা দাগসহ পচন সৃষ্টি হয়।

২। পরে আক্রান্ত স্থানে সূক্ষ্ম মখমলের মতো আস্তরণ সৃষ্টি হয়। এ সময় আক্রান্ত পাতার নিম্ন ত্বকের পত্ররন্ধ্র দিয়ে কনিডিয়োফোর বের হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কনিডিয়োফোর দেখে ছত্রাক আক্রমণ নিশ্চিত হওয়া যায়।

৩। আবহাওয়া মেঘলা ও আর্দ্র থাকলে ছত্রাকটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং পুরো পাতা, এমনকি কাণ্ডও আক্রান্ত হয়। এ সময় গাছটি ঢলে পড়তে দেখা যায় এবং দেখতে অনেকটা সিদ্ধ গাছের মতো মনে হয়।

৪। আক্রমণের প্রকটতায় মাটির নিচে আলুও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত আলুর ত্বকের নিচে লালচে-বাদামি কালো ছোপ দেখা যায়। এটি পরে সেকেন্ডারি ইনফেকশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াল রট (পচন)-এ পরিণত হয় এবং আলু পচে যায়। কোনো কোনো রোগাক্রান্ত আলু দৃশ্যত ভালো দেখা গেলেও কোল্ডস্টোরেজ-এ পচে যায়।

৫। ছত্রাক আক্রমণ তীব্র হলে আক্রান্ত আলু গাছ থেকে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হয়। রোগাক্রান্ত আলুবীজ থেকে রোগের প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। কনিডিয়া ও জুস্পোর দিয়ে রোগের সেকেন্ডারি সংক্রমণ ঘটে।

৬। গাছের পাতা পরীক্ষা করলে রোগাক্রান্ত পাতার নিম্নতলে সাদা সুতার মতো (সূত্রাকার) মাইসেলিয়াম দেখা যায়।

প্রতিকার/রোগ নিয়ন্ত্রণ :

১। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। প্রথমেই ১% বোর্দোমিশ্রণ (Bordeux mixture : কপার সালফেট, লাইম ও পানি) ছিটিয়ে বা কপার-লাইম ডাস্ট প্রয়োগ করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

২। পানি ও পানি প্রবাহ রোগের সেকেন্ডারি বিস্তার ঘটায়। তাই পানি সেচ সীমিত রাখতে হবে। নাইট্রোজেন সারও সীমিত ব্যবহার করা দরকার।

৩। আলু চাষের জন্য সুস্থ ও জীবাণু মুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। অবশ্যই রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ আলু সংগ্রহ করতে হবে। কোল্ডস্টোরেজ-এ রাখা বীজ ব্যবহার অপেক্ষাকৃত উত্তম। মনে রাখতে হবে রোগাক্রান্ত বীজ থেকেই রোগের প্রাথমিক আক্রমণ ঘটে।

৪। জমি থেকে আলু ফসল উঠানোর পর সব পরিত্যক্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৫। একই জমিতে প্রতি বছর আলু চাষ না করে ১/২ বছর পর পর চাষ করলে রোগের বিস্তার কম হতে পারে।

৬। ছত্রাক প্রতিরোধক্ষম 'জাত' লাগাতে হবে।

৭। আগাম জাত চাষ করলে রোগ আক্রমণের আগেই ফসল তুলে নেয়া যায়।

৮। এলাকা ও জমির ধরন অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় জাত ফলন কম হলেও সাধারণত রোগপ্রবণ নয়।

৯। পাতা থেকে আলুতে যাতে রোগ সংক্রমণ না হয়, সেজন্য আলু সংগ্রহের পূর্বে সাইনক্স বা আর্সেনাইট থায়োসায়ানেট ওষুধ ছিটিয়ে গাছের পাতা ঝড়িয়ে ফেলতে হয়।

১০। যে সব স্থানে এ রোগ হয় সেখানে গাছ ৮-১০ আঙ্গুল বড় হলেই ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার নামক ছত্রাকনাশক ১৫দিন পরপর ছিটাতে হবে।

দাদরোগ (Ringworm)

দাদরোগ একটি ছোঁয়াচে চর্ম রোগ। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে এ রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে এ রোগটি দেশের সব অঞ্চলেই বিস্তৃত। একে সংস্কৃত ভাষায় দদ্রু রোগ, আর ইংরেজি ভাষায় ringworm বলা হয়। যদিও এটি কোনো worm দ্বারা ঘটিত রোগ নয়। দাদরোগ সব বয়সের লোকেরই হতে পারে, তবে ছোট ছেলে মেয়েরাই অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। হাসপাতাল, এতিমখানা বা হেফজখানা, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যায় বাস করে সেখানে দাদরোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের কারণ : দাদ ছত্রাকঘটিত রোগ। উদ্ভিদ পরজীবী দ্বারা হয় বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে একে tinea বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই *Trichophyton (T. rubrum, T. verrucosum)* নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। তাই রোগটি tinea **trichophytina** বা **trichophytosis** নামেও পরিচিত। এছাড়া *Microsporum (M. canis), Epidermophyton (E. floccosum)* গণের ছত্রাক দিয়েও দাদরোগ হতে পারে।

সংক্রমণ : সাধারণত ঘামে ভেজা শরীর, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন শরীর, দীর্ঘ সময় ভেজা থাকে এমন শরীর, ত্বকে ক্ষত স্থান আছে এমন শরীর সহজে এই ছত্রাকের স্পোর (বা হাইফা) দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগ জীবাণুর সুপ্তিকাল ৫৪ দিন। সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার ৩-৫ দিন পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দেহের যে কোনো অংশেই দাদরোগ হতে পারে, তবে মুখমণ্ডল এবং হাতে অধিক দেখা যায়। উরু, মাথার খুলি, নখ ইত্যাদিও আক্রান্ত হয়। মাথার খুলির দাদরোগ অপেক্ষাকৃত মারাত্মক। আক্রান্ত স্থানের নামানুসারে ডাক্তারি পরিভাষায় দাদরোগটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

রোগ লক্ষণ

১। প্রথমে আক্রান্ত স্থানে ছোট লাল গোটা হয় এবং সামান্য চুলকায়।

২। পরে আক্রান্ত স্থানে বাদামি বর্ণের আঁইশ হয় এবং স্থানটি বৃত্তাকারে বড় হতে থাকে।

৩। ক্রমে সুনির্দিষ্ট কিনারসহ বৃত্তের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মাঝখানের ত্বক স্বাভাবিক হয়ে আসে। চুলকানি বৃদ্ধি পায়।

৪। চুলকানোর পর আক্রান্ত স্থানে জ্বালা হয় এবং আঁঠালো রস বের হয়।

৫। মাথায় হলে স্থানে স্থানে চুল উঠে যায়, নখে হলে দ্রুত নখের রং বদলায় এবং শুকিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যেতে পারে।

রোগ বিস্তার : এটি ছোঁয়াচে রোগ। অতিসহজেই রোগী থেকে সুস্থ দেহে বিস্তার লাভ করতে পারে। রোগীর চিরুনি, তোয়ালে, বিছানা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগটি দ্রুত সুস্থদেহে ছড়িয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত পোষা বিড়ালের মাধ্যমে অধিক ছড়ায়। উষ্ণ ও ভেজা স্থানে জীবাণুর সংক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার

১। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে।

২। প্রতিদিন রোগীর বিছানাপত্র ও জামাকাপড় সোডা পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ধুতে হবে।

৩। এমন কাপড় পরা যাবে না যা আক্রান্ত স্থানে ঘর্ষণ করে।

৪। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিফাংগাল ক্রিম বা ড্রাইপাওডার ব্যবহার করতে হবে।
৫। রোগাক্রান্ত পোষা প্রাণী থেকে সাবধান থাকতে হবে।
৬। মাথায় দাদ হলে মাথা ন্যাড়া করে সেলিসাইলিক অ্যাসিড ঘটিত মলম কিছুদিন ব্যবহার করতে হবে।
৭। শরীরের অন্যান্য স্থানে দাদ হলে আয়োডিন, বেনজোয়িক অ্যাসিড ব্যবহার করা ভালো।

চিকিৎসা : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই দাদরোগ আরোগ্য হয় এবং এ রোগে সাধারণত এন্টিফাংগাল ক্রিমই (Terbinafine/Miconazole ক্রিম) ব্যবহার করা হয়। মাথার দাদ চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সময় সাপেক্ষ। মলমজাতীয় ওষুধে রোগ না সারলে খাবার ওষুধ (Griseofulvin/Itraconazole ট্যাবলেট) ব্যবহার করতে হতে পারে। আক্রান্ত স্থান ভালো করে চুলকিয়ে দাদ মর্দন (*Cassia alata*) গাছের পাতার রস বা মণ্ড লাগালে ২/৩ দিনেই দাদ ভালো হয়। এটি পরীক্ষিত।

প্রতিরোধ

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ২। ত্বক যেন ভেজা না থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ৩। রোগীর ব্যবহৃত চিরুনী, তোয়ালে, বিছানা, জামা-কাপড় ব্যবহার করা যাবে না। ৪। চুল কাটার পর নিয়মিত মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে ও শুকনো রাখতে হবে। ৫। পোষা প্রাণীর দেহের ন্যাড়া স্থান থেকে সাবধান থাকতে হবে। ৬। গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া নিয়মিত পরিষ্কার করে ব্যবহার করা দরকার।

জটিলতা : চুলকানো স্থানে ব্যাকটেরিয়্যাল ইনফেকশন হয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে আক্রান্ত স্থান ফোলে যায়, পুঁজ সৃষ্টি হয়, জ্বর হতে পারে, পুঁজ বা রস গড়িয়ে পড়তে পারে। এমন অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে।

লাইকেন (Lichen)

আমরা শৈবাল ও ছত্রাক সম্বন্ধে জেনেছি। উদ্ভিদজগতে এরা পৃথক রাজ্যের বাসিন্দা হলেও প্রকৃতিতে শৈবাল ও ছত্রাককে একই সাথে সিমবায়োটিক সহঅবস্থানে দেখা যায়। শৈবাল ও ছত্রাক মিলিতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের একজাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় লাইকেন। লাইকেন হলো ছত্রাক (স্যাক ফানজাই বা ক্লাব ফানজাই) এবং এককোষী শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এসোসিয়েশনে সৃষ্ট বিশেষ প্রকৃতির থ্যালয়েড গঠন। লাইকেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিষমপৃষ্ঠ, থ্যালয়েড, অপুষ্পক উদ্ভিদ। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০০টি গণ এবং ১৭,০০০ লাইকেন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শৈবাল ও ছত্রাক পরস্পর মিথোজীবী বা অন্যোন্যজীবী রূপে (symbiotically) বসবাস করে। এ প্রকার বন্ধনে উভয়েই একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়। লাইকেনে তাদের অবস্থান ও সম্পর্ককে মিথোজীবিতা এবং জীব দুটিকে মিথোজীবী জীব বলে। লাইকেনের মোট ভরের ৫-১০% শৈবালের। (Lichen শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Leichen* থেকে যার অর্থ হলো "শৈবালতুল্য ছত্রাক বিশেষ।")

লাইকেনের বাসস্থান : লাইকেন এমন একটি সম্প্রদায় যারা এমন সব পরিবেশে জন্মাতে পারে, যেখানে অন্য কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন- অনুর্বর, বন্ধ্যা, বালু বা পাথরের মতো আবাসে এরা স্বাচ্ছন্দ্যে জন্মাতে পারে। এরা গাছের বাকল, সজীব পাতা, বন্ধ্যা মাটি, পাকা দেয়াল, ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের গুড়ি ইত্যাদি বস্তুর উপর জন্মে থাকে। তুন্দ্রা অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নীরস পর্বতগাত্রসহ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থানে এরা জন্মাতে পারে। তাই লাইকেনকে বিশ্বজনীন উদ্ভিদ বলা হয়।

লাইকেনের বৈশিষ্ট্য : লাইকেনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেগুলো নিম্নরূপ:

১। লাইকেন একটি দ্বৈত সংগঠন। কারণ একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক সদস্য মিলিতভাবে এ সংগঠন তৈরি করে।
২। ছত্রাক থ্যালাসের কাঠামো তৈরি করে এবং কাঠামোর ভেতরে শৈবাল আবৃত অবস্থায় থাকে।
৩। আকৃতিগতভাবে লাইকেন থ্যালয়েড, চ্যাপ্টা, বিষমপৃষ্ঠ অথবা শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়।
৪। এরা অধিকাংশই ধূসর বর্ণের তবে সাদা, কালো, কমলা, হলুদ ইত্যাদি বর্ণেরও হয়ে থাকে।
৫। এরা স্বভোজী তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৬। লাইকেনের উভয় জীবে অঙ্গজ ও অযৌন জনন ঘটে। কিন্তু যৌন জনন শুধুমাত্র ছত্রাক সদস্যের ঘটে।

৭। লাইকেন অনুর্বর বন্ধ্যা মাধ্যমেও জন্মে, যেখানে অন্য কোন জীব সম্প্রদায় জন্মাতে পারে না।

৮। মাটি গঠনে এরা অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৯। থ্যালাসের নিচের দিকে রাইজয়েডের মতো রাইজাইন থাকে, যা দিয়ে পানি শোষণ করে।

১০। এরা বায়ুদূষণের প্রতি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল।

লাইকেনের গঠন এবং ছত্রাক ও শৈবালের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

লাইকেন সমাঙ্গদেহী, এদের অধিকাংশই ধূসর বর্ণের; তবে সাদা, কমলা-হলুদ, সবুজ, পীতাভ-সবুজ অথবা কালো ইত্যাদি বর্ণের। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হতে কয়েক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। একটি লাইকেন দুটি জীবীয় উপাদান দিয়ে গঠিত। একটি শৈবাল যাকে ফটোবায়োন্ট (photobiont) বলে। এরা নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সবুজ শৈবালের অন্তর্ভুক্ত, যা মিক্সোফাইসি (Myxophyceae) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অপরটি ছত্রাক যাকে মাইকোবায়োন্ট (mycobiont) বলে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির এবং কিছু কিছু ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। লাইকেনে শৈবাল ও ছত্রাক উভয়ই উপকৃত হয় এবং কেউ কারও অপকার করে না। এরূপ উপকার ভিত্তিক সম্পর্ককে মিথোজীবিতা বা অন্যোন্যজীবিতা (symbiosis) বা মিউচুয়ালিজম (mutualism) বলে।

লাইকেনে শৈবাল যেভাবে উপকৃত হয়—

শৈবাল ছত্রাকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। ছত্রাক পরিবেশ থেকে পানি, খনিজ লবণ, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি শোষণ করে শৈবালকে প্রদান করে। ছত্রাক চারদিক থেকে শৈবালকে ঘিরে রাখে অর্থাৎ ছত্রাকের দেহে অবস্থানের কারণে শৈবালের দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ছত্রাকের দেহে শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে সৃষ্ট CO_2 ও পানি শৈবাল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগায়।

লাইকেনে ছত্রাক যেভাবে উপকৃত হয়—

ছত্রাক নিজ দেহে আশ্রয়দানের বিনিময়ে শৈবাল কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্য হস্টোরিয়ামের সাহায্যে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে অর্থাৎ শৈবালের প্রস্তুতকৃত খাদ্য উভয়েই ভাগ করে গ্রহণ করে। ছত্রাকের শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য ও জলীয়বাষ্প দেহ থেকে অপসারণের জন্য ছত্রাককে কোনো ধরনের শক্তির অপচয় করতে হয় না।

লাইকেনে ছত্রাকের চেয়ে শৈবালের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ লাইকেনে ছত্রাক সদস্য এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু শৈবাল সদস্য এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে। লাইকেনে শৈবালের চেয়ে ছত্রাক বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং অন্যদিকে শৈবালটি ছত্রাকের ক্রীতদাস হিসেবে অবস্থান করে বলে কোনো কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানী এরূপ সহাবস্থানকে বিশেষ ধরনের মিথোজীবিতা বা হেলোটিজম (helotism) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ লাইকেনের ক্ষেত্রে ছত্রাক সদস্যটি শৈবাল কোষের অভ্যন্তরে হস্টোরিয়া নামক শোষক অণুসূত্র প্রেরণ করে পুষ্টি সংগ্রহ করে বলে এরূপ সহাবস্থানকে আংশিক পরজীবিতা বলে উল্লেখ করেছেন।

লাইকেনের শ্রেণিবিভাগ

(ক) বাসস্থানের ভিত্তিতে লাইকেনের শ্রেণিবিভাগ :

১। কর্টিকোলাস (corticolous) : এরা গাছের বাকল বা কাণ্ডের উপরে জন্মে। যেমন- *Graphis, Parmelia*।

২। টেরিকোলাস (terricolous) : উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের মাটিতে জন্মে। যেমন- *Collema tenax, Cora pavonia*।

৩। স্যাক্সিকোলাস (sexicolous) : শীতপ্রধান অঞ্চলে পাথরের বা শিলাখণ্ডের উপর জন্মায়। যেমন- *Coloplecia Xanthoria*।

৪। লিগনিকোলাস (lignicolous) : এরা সরাসরি ভেজা কাঠের উপর জন্মায়। যেমন- *Calicicum, Piptoporus*।

৫। ওমনিকোলাস (omnicolous) : বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমে জন্মে। অর্থাৎ হাড়, চামড়া, লৌহ, কাচ, চুল, সিল্ক ইত্যাদির উপর জন্মে। যেমন- *Lecanora dispersa*।

৬। ফোলিকোলাস (folicolous) : এরা ফার্ন বা সপুষ্পক উদ্ভিদের পাতার উপর জন্মে। যেমন- ফার্নের পাতার উপরে *Porina epiphylla* জন্মে।

(খ) গঠনের শ্রেণিবিন্যাস : ইতোপূর্বে লাইকেনের মাত্র তিন প্রকার মৌলিক গঠনের কথা জানা যায়। সেগুলো হলো ক্রাসটোজ, ফোলিয়োজ এবং ফ্রুটিকোজ। কিন্তু লাইকেনের ব্যাপক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানী হক্সওয়ার্থ এবং হিল (Hawksworth & Hill) ১৯৮৪ সালে লাইকেনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা–

১। লেপ্রোজ লাইকেন (Leprose lichen) : থ্যালাসের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সরলতম প্রকৃতির। এক্ষেত্রে ছত্রাকের হাইফি শুধুমাত্র ১টি অথবা ক্ষুদ্র, একগুচ্ছ শৈবালের কোষকে আবৃত করে রাখে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন ছত্রাকের স্তর সম্পূর্ণ শৈবালের কোষগুলোকে ঢেকে রাখে না। যেমন- *Lapraria incana.*

২। ক্রাসটোজ লাইকেন (Crustose lichen) : এরূপ লাইকেন চ্যাপ্টা, ক্ষুদ্রাকার এবং পোষক বস্তুর সাথে (গাছের বাকল, পুরাতন দেয়াল, পাথর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি) নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। যেমন- *Graphis scripta, Strigula, Cryptothecia rubrocinta, Diploicia canescens* ইত্যাদি।

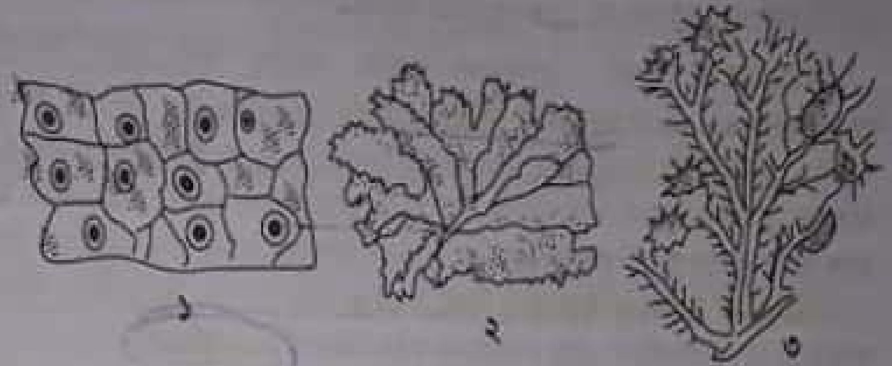

চিত্র ৫.১২ : (১) ক্রাসটোজ, (২) ফোলিয়োজ, (৩) ফ্রুটিকোজ লাইকেন।

৩। ফোলিয়োজ লাইকেন (Foliose lichen) : এ ধরনের লাইকেন দেখতে অনেকটা বিষমপৃষ্ঠ পাতার মতো। এদের কিনারা খাঁজকাটা ও আন্দোলিত। এর নিম্নতলে রাইজয়েড তুল্য রাইজাইন বের হয়। যেমন– *Flavoparmelia caperata, Parmotrema tinctorum, Xanthoria, Peltigera, Parmelia* ইত্যাদি।

৪। ফ্রুটিকোজ লাইকেন (Fruticose lichen) : এ ধরনের লাইকেন চ্যাপ্টা বা দন্ডের মতো, অধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং কেবল গোড়ার অংশ দিয়ে নির্ভরশীল বস্তুর গায়ে লেগে থাকে। এ ধরনের লাইকেন অনেক সময়ই ঝুলে থাকে, খাড়া হয়েও থাকতে পারে। যেমন- *Letharia columbiana, Usnea, Cladonia leporina* ইত্যাদি।

৫। সূত্রাকার লাইকেন (Filamentous lichen) : কিছু সংখ্যক লাইকেনে শৈবাল অংশটি সূত্রাকার, পূর্ণ বিকশিত এবং প্রকট। এরা সামান্য কয়েকটি হাইফি দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন- *Ephebe, Racodium*।

(গ) লাইকেন গঠনকারী ছত্রাকের উপর ভিত্তি করে লাইকেন প্রধানত দু' প্রকার। যথা–

(i) অ্যাসকোলাইকেন (Ascolichen) : লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে অ্যাসকোলাইকেন বলে। অধিকাংশ লাইকেনই অ্যাসকোলাইকেন।

(ii) ব্যাসিডিয়োলাইকেন (Basidiolichen) : লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক ব্যাসিডিয়োমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে ব্যাসিডিয়োলাইকেন বলে।

লাইকেনের অন্তর্গঠন : লাইকেনকে প্রস্থচ্ছেদ করলে একাধিক গঠনগত স্তর দৃষ্টি গোচর হয়। একটি ফোলিয়োজ লাইকেনের অন্তর্গঠন নিম্নরূপ:

(i) ঊর্ধ্ব কর্টেক্স (Upper cortex) : ঘন সন্নিবেশিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এই স্তর গঠিত। এ স্তরে সাধারণত ফাঁক থাকে না, থাকলেও মিউসিলেজ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(ii) শৈবাল স্তর (Algal layers) : এই স্তরে ছত্রাকের হাইফির ফাঁকে ফাঁকে শৈবাল অবস্থিত। এই স্তরটি সংক্ষিপ্ত। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির লাইকেনে শুধু এক ধরনের শৈবালই থাকে। পূর্বে এ স্তরকে গোনিডিয়াল স্তর বলা হতো।

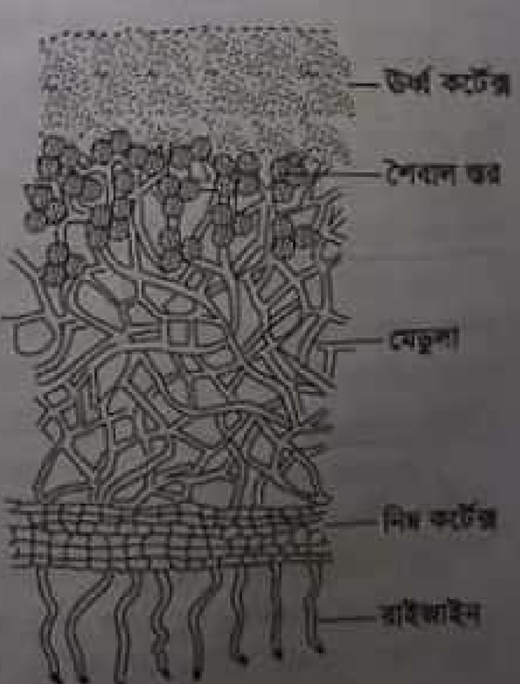

চিত্র ৫.১৩ : ফোলিয়োজ লাইকেনের অন্তর্গঠন

(iii) মেডুলা (Medulla) : অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকাভাবে অবস্থিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এই স্তর গঠিত। এই স্তর অপেক্ষাকৃত পুরু। হাইফি থ্যালাসের প্রান্তের দিকে বেশ পাতলা কিন্তু কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট। শৈবাল স্তরের নিচে এটি অবস্থিত। এ অঞ্চলের হাইফির শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত।

(iv) নিম্ন কর্টেক্স (Lower cortex) : মেডুলার নিচে ঘন সন্নিবেশিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এই স্তর গঠিত। এই স্তরের নিম্ন পৃষ্ঠে বহু এককোষী রাইজাইন (রাইজয়েড তুল্য) থাকে যা লাইকেনকে নির্ভরশীল বস্তুর (বৃক্ষের বাকল, পাথর ইত্যাদি) সাথে আটকিয়ে রাখে এবং খাদ্যরস শোষণ করতে সাহায্য করে। রাইজাইন হলো দেহের নিম্নাংশে চুলের ন্যায় একটি অঙ্গ, যা মূলের মতো কাজ করে থাকে।

লাইকেনের জনন : লাইকেন অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। থ্যালাসের খণ্ডন (fragmentation) ও ক্রমাগত মৃত্যু ও পচন (progressive death & decay) প্রক্রিয়ায় লাইকেনের অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে। সোরেডিয়া (Soredia, একবচনে-Soredium) ও ইসিডিয়া (Isidia, একবচনে- Isidium) এর পিকনিডিওস্পোরের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। সোরেডিয়াম হলো একটি শৈবালকে ছত্রাক দ্বারা চারদিক থেকে ঘিরে থাকা ক্ষুদ্রাকার দেহ যা বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে লাইকেন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসিডিয়া হলো লাইকেনের উর্ধ্ব কর্টেক্স দ্বারা আবৃত, ক্ষুদ্রাকার, সরল বা শাখান্বিত প্যাপিলির ন্যায় অযৌন রেণু যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রূপান্তরিত হয়ে লাইকেন গঠন করে। পিকনিডিয়া (Pycnidia) হলো ফ্লাস্কের ন্যায় গঠনযুক্ত অংশ যারা কিছু লাইকেনের কিছু ছত্রাক দেহে (যেমন- *Cladonia sp.*) গঠিত হয়। পিকনিডিয়ার অভ্যন্তরে পিকনিডিওস্পোর গঠিত হয়। পিকনিডিওস্পোর অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে নতুন ছত্রাক অণুসূত্র গঠন করে। নতুন গঠিত ছত্রাক অণুসূত্র উপযুক্ত পরিবেশে শৈবালের সংস্পর্শে এলে নতুন লাইকেন গঠন করে।

লাইকেনে যৌন জনন মূলত ছত্রাক দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। অ্যাস্কোলাইকেনে যৌন জনন সম্পাদিত হয় অ্যাস্কোকার্প (ascocarp) দিয়ে। এছাড়া প্লাজমোগ্যামির মাধ্যমেও লাইকেনের যৌন জনন সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্লাজমোগ্যামি হলো যে প্রক্রিয়ায় যৌন মিলনের পর ছত্রাকের দুটি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজম মিলিত হয় কিন্তু নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয় না।

বাংলাদেশে লাইকেন শিক্ষা : বাংলাদেশে লাইকেন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। এখানে কত প্রজাতির লাইকেন আছে তাও তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। অতি ধীরগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলে গবেষণাধর্মী (*experimental*) কোনো কাজ করতেও কেউ উৎসাহিত বোধ করেন না।

লাইকেনের গুরুত্ব (Importance of lichen) : দৈনন্দিন জীবনে লাইকেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপকারী দিক (Beneficial role) : নিচে লাইকেনের কয়েকটি উপকারী দিক উল্লেখ করা হলো—

(১) মরুজ ক্রমাগমন : মরু অঞ্চলে যেখানে অন্যকোন জীব জন্মাতে পারে না তেমন জায়গায় লাইকেন জন্মায় এবং ধীর গতিতে মাটি গঠনে সহায়তা করে। সেখানে লাইকেনের মৃতদেহাবশেষ থেকে হিউমাস গঠিত হয়। এসব হিউমাস পাথরের সাথে মিশে মাটি গঠন করে। এরপর সেখানে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জীব সম্প্রদায় জন্মাতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ লাইকেন জেরোসিরি পর্যায়ের সূচনা করে।

(২) মানুষের খাদ্য হিসেবে : অধিকাংশ লাইকেনে 'লাইকেনিন' নামক এক প্রকার কার্বোহাইড্রেট থাকার কারণে কতক প্রজাতি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা *Cetraria islandica* নামক লাইকেনটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ভারতের মাদ্রাজে *Parmelia*, মিশরে *Evernia* এবং জাপানে *Endocarpon* নামক লাইকেন মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) পশুর খাদ্য হিসেবে : তুন্দ্রা অঞ্চলের কিছু লাইকেন Reindeer মস (*Cadonia rangiferina*) নামে পরিচিত। এগুলো বলগা হরিণ ও গবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য। কীট পতঙ্গের লার্ভার খাদ্য হিসেবেও লাইকেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৪) অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে : লাইকেন থেকে উৎপন্ন উসনিক অ্যাসিড গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ওপর কার্যকর।

(৫) টিউমার (ক্যান্সার) রোগে : লাইকেন জাত Usno এবং Evosin নামক অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম টিউমার প্রতিরোধক, ব্যথা নিরাময়ক এবং ভাইরাস প্রতিরোধক। কিছু লাইকেন Lichenin ও Isolichenin সৃষ্টি করে। এরা টিউমার প্রতিরোধী।

(৬) হৃদরোগে : এনজাইনা নামক মারাত্মক হৃদরোগে *Rocella montaignei* থেকে উৎপন্ন Erythrin ব্যবহৃত হয়।

(৭) বিভিন্ন রোগে : জলাতঙ্কের ওষুধ হিসেবে *Peltigera*, হুপিং কফ রোগে *Cladonia* এবং যক্ষার ওষুধ হিসেবে *Cetraria islandica* ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জন্ডিস, ডায়রিয়া, অবিরাম জ্বর এবং নানাবিধ চর্মরোগেও লাইকেন জাত ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

(৮) উদ্ভিদ রোগ নিরাময়ে : লাইকেন থেকে প্রাপ্ত সোডিয়াম উসনেট টমেটোর ক্যাঙ্কার রোগ এবং লিকানোরিক অ্যাসিড তামাকের মোজাইক রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

(৯) লিটমাস পেপার প্রস্তুতিতে : রসায়নাগারে লিটমাস পেপার অ্যাসিড বা ক্ষার নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। *Rocella montaignei* থেকে নির্গত রাসায়নিক উপাদানই লিটমাস পেপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(১০) সুগন্ধি ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে : *Evernia*, *Ramalina* ইত্যাদি লাইকেন বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী ও সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(১১) রং ও ট্যানিন উৎপাদনে : *Cetraria*, *Lobaria* ইত্যাদি লাইকেন হতে ট্যানিন পাওয়া যায় যা চামড়া ট্যানিংয়ে ব্যবহৃত হয়। *Rocella montaignei* হতে এক ধরনের রং সংগ্রহ করা হয় যা উলেন ও সিল্ক জাতীয় কাপড় রং করতে ব্যবহৃত হয়।

(১২) উত্তেজক পদার্থ তৈরিতে : রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ইত্যাদি দেশে ঈস্টের পরিবর্তে *Usnea*, *Ramalia* প্রভৃতি লাইকেন অ্যালকোহল, বিয়ার ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য : লাইকেন নাইট্রোজেন সংবন্ধনে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে (লিকানোরিক অ্যাসিড, উসনিক অ্যাসিড), দূষণের সূচকরূপে প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কিছু লাইকেন থেকে ন্যাপথালিন, কর্পূর জেরানিয়ল, বর্নেঅল ইত্যাদি উদ্বায়ী দ্রব্য পাওয়া যায়।

অপকারী দিক (Harmful role) : লাইকেন বৃক্ষ, পুরাতন ইটের দেয়াল, মার্বেল পাথরের তৈরি সৌধ ইত্যাদির কিছুটা ক্ষতি সাধন করে থাকে। কতক লাইকেন বিষাক্ত। এসব লাইকেন ভক্ষণ করে অনেক গবাদি পশু এমনকি মানুষও অনেক সময় মারা যায়। *Cladonia*, *Usnea* গণের কোনো কোনো প্রজাতি তাদের অশ্রয়দাতা উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে। মার্বেল পাথরের তৈরি মূল্যবান ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদিতে বসবাসকারী লাইকেন পাথরের ক্ষয়সাধন করে এবং সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে।

Letharia vulpina নামক লাইকেনে বিষাক্ত পদার্থ থাকার কারণে ঐ লাইকেন নেকড়ে নিধনে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন কাচের উপর লাইকেন জন্মানোর ফলে কাচ অস্বচ্ছ হয়ে যায়। *Evernia*, *Usnea* প্রভৃতি লাইকেন মানুষের দেহে চর্মরোগ, এলার্জি ও হাঁপানি রোগ সৃষ্টি করে। *Usnea* জাতীয় লাইকেন এক গাছ থেকে অন্য গাছের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কোনো কারণে সেখানে দাবানল হলে ঐ লাইকেনের মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আইসল্যান্ড মস (*Cetraria islandica*), স্টোন মাশরুম (*Endocarpon miniatum*), রক ফ্লাওয়ার (*Parmelia* sp.), রেনডিয়ার মস (*Cladonia rangiferina*) ইত্যাদি কতিপয় লাইকেনের বিশেষ নাম।

পরিবেশ দূষণ নির্দেশক : লাইকেন বাতাস বা বৃষ্টির পানি থেকে অতিদ্রুত তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে পারে। একইভাবে সালফার ডাই-অক্সাইড, হেভি মেটাল, রেডিও অ্যাকটিভ বস্তুও দ্রুত শোষণ করে থাকে। এসব দূষিত বস্তু শোষণের ফলে এদের মৃত্যু ঘটে। কাজেই বায়ু দূষণের একটি নির্দেশক (indicator) হিসেবে লাইকেনকে ধরা হয়। অর্থাৎ বায়ু দূষণ অঞ্চলে লাইকেন কম পাওয়া যাবে।

লাইকেনের পরিবেশীয় গুরুত্ব (Ecological significance of Lichen)

লাইকেন একটি অতি সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণির থ্যালয়েড উদ্ভিদ হলেও ভূমি ও বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। **পাথর থেকে মাটি তৈরি :** লাইকেন নির্গত CO_2 জলীয়বাষ্প বা বৃষ্টির পানি বা কুয়াশার সাথে মিশে যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে তা পাথর বা শিলা খণ্ডকে ক্ষয় করে ছোট ছোট মাটি কণায় পরিণত করে এবং মরুজ ক্রমাগমনের সূচনা করে যা এক সময় বনভূমি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

২। **নাইট্রোজেন সংবন্ধন :** লাইকেনের দেহ গঠনকারী সায়ানোব্যাকটেরিয়া (*Nostoc*, *Anabaena*) শৈবাল বায়ুর মুক্ত N_2 গ্যাসকে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী NH_3, NO_2^-, NO_3 ইত্যাদিতে পরিণত করে।

৩। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা : লাইকেন সৃষ্ট হিউমাস মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

৪। উন্মুক্ত পাহাড় ও গাছের বাকলে লাইকেন জন্মে তাদের দৃষ্টিনন্দন করে।

৫। পরিবেশ দূষণের ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে।

৬। গাছের গুড়ি, পুরাতন ইটের দেয়াল ও ছাদে লাইকেনের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে আবাসস্থল ক্ষয় ও ফাংশনাল হয়।

> **দলগত কাজ :** পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইকেন সংগ্রহ করে শনাক্ত করতে হবে। কোনটি কোন গাছের বাকলে পাওয়া গিয়েছে তা লিখতে হবে। সারাবছরই ঐ গাছে এটি থাকে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করলে তা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সবশেষে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

শৈবাল : Algae (একবচনে Alga)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে শৈবাল। শৈবাল সালোকসংশ্লেষণকারী স্বভোজী অভাস্কুলার, অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের জাইগোট স্ত্রীজননাঙ্গে থাকা অবস্থায় কখনও বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না। শৈবাল এককোষী হতে পারে, বহুকোষীও হতে পারে। এককোষী শৈবাল এককভাবে বাস করতে পারে, আবার কলোনি করেও বাস করতে পারে। এরা মিঠা পানিতে, লবণাক্ত পানিতে, মাটিতে, এমনকি গাছের বাকল ও পাতায় বাস করতে পারে। ক্লোরোফিলযুক্ত এককোষী বা বহুকোষী সরল প্রকৃতির অভাস্কুলার এবং সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে শৈবাল বলে। অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এসব প্রক্রিয়ায় এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ শৈবালই সবুজ, কতক শৈবাল বাদামি এবং কতক শৈবাল লাল বর্ণের। নীলাভ-সবুজ শৈবালকে বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া বলা হয়, কারণ এরা আদিকোষী; অন্য সব শৈবাল প্রকৃতকোষী। বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদনকারী হিসেবে শৈবাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও পশুর খাবার থেকে শুরু করে শৈবালের আরও অনেক গুরুত্ব আছে।

ছত্রাক : Fungi (একবচনে fungus)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ছত্রাক। ছত্রাকে ক্লোরোফিল বা অন্যকোন ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট না থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই ছত্রাক মৃতজীবী বা পরজীবী। বহুকোষী ছত্রাকের সূত্রকে হাইফি বলে। হাইফিগুলো একত্রিত হয়ে মাইসেলিয়াম গঠন করে। ছত্রাক প্রকৃতকোষী, অসবুজ, অভাস্কুলার এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ। ক্লোরোফিলবিহীন এককোষী বা বহুকোষী সরল প্রকৃতির অভাস্কুলার, সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে ছত্রাক বলে। অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে এদের জনন হয়ে থাকে। ফসলের অসংখ্য রোগের কারণ ছত্রাক। আবার মানুষের খাদ্য হিসেবে (যেমন-*Agaricus*), ওষুধ তৈরিতে, (যেমন- *Aspergillus*), শিল্পে (যেমন- Yeast) ছত্রাকের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

লাইকেন : প্রকৃতিতে সহঅবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাইকেন। দুটি মিথোজীবী জীবের (শৈবাল ও ছত্রাক) সহবস্থানের ফলে লাইকেন সৃষ্টি হয়। ছত্রাক পরিবেশ থেকে পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি শোষণ করে শৈবালকে প্রদান করে, আর শৈবাল তা দিয়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত খাবার শৈবাল এবং ছত্রাক উভয়ই ভাগ করে গ্রহণ করে।

সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ : উদ্ভিদজগতের এসব উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। যেমন- শৈবাল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। ফ্ল্যাজেলাযুক্ত স্পোরকে বলে—

(ক) জুস্পোর (খ) অ্যাপ্লানোস্পোর (গ) হিপনোস্পোর (ঘ) অটোস্পোর

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা

BRYOPHYTA AND PTERIDOPHYTA

প্রধান শব্দসমূহ : মস, ফার্ন, প্রোথ্যালাস,

আমরা সারা বছরই কোনো না কোনো গাছে ফুল ফুটতে দেখি। গ্রীষ্মে স্বর্ণচাপা, সোনালু, বর্ষায় কদম, শরৎ-হেমন্তে শেফালি, শীতে গোলাপ, সূর্যমুখী, ডালিয়া, বসন্তে পলাশ, শিমুল ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদ হলো **পুষ্পক উদ্ভিদ** (flowering plants). এদেরকে ফ্যানেরোগ্যামস (phanerogams)ও বলা হয়। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের কখনোই ফুল হয় না। এসব উদ্ভিদকে বলা হয় **অপুষ্পক উদ্ভিদ** (non-flowering plants). এরা ক্রিপ্টোগ্যামস (cryptogams) নামেও পরিচিত। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদসমূহ হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত শৈবাল এবং ছত্রাকও অপুষ্পক উদ্ভিদ। শৈবাল ও ছত্রাক হলো লোয়ার ক্রিপ্টোগ্যামস (lower cryptogams) এবং ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদ হলো হায়ার ক্রিপ্টোগ্যামস (higher cryptogams), কারণ এরা গঠনগত বৈশিষ্ট্যে শৈবাল ও ছত্রাক অপেক্ষা উন্নত ও জটিল প্রকৃতির। এ দু'টোর মধ্যে আবার টেরিডোফাইটা উন্নত। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার মধ্যে বাহ্যিক মৌলিক পার্থক্য হলো ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদসমূহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না কিন্তু টেরিডোফাইটা উদ্ভিদসমূহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা চলে। এছাড়া ব্রায়োফাইটা অভাস্কুলার কিন্তু টেরিডোফাইটা ভাস্কুলার। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত থ্যালোফাইটা (শৈবাল ও ছত্রাক) এবং উন্নত টেরিডোফাইটার মধ্যে **সংযোগ সৃষ্টিকারী মধ্যবর্তী গ্রুপ** হলো ব্রায়োফাইটা।

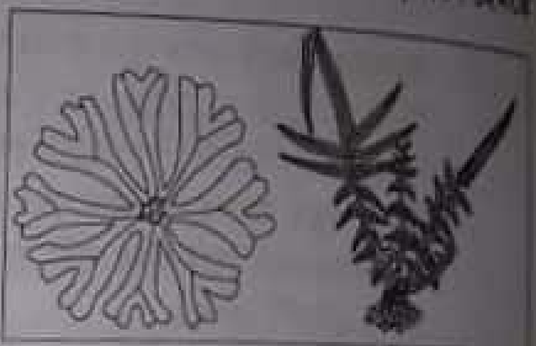

উপরে পাশাপাশি দু'টি উদ্ভিদের চিত্র দেয়া হলো, একটি ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদ, অপরটি টেরিডোফাইটা উদ্ভিদ। কোনটি ব্রায়োফাইটা আর কোনটি টেরিডোফাইটা চিনতে পার কি? চিনতে পারলে চিত্রের নিচে নাম লেখ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
২. *Riccia* এর আবাস, গঠন ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৩. টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৪. *Pteris* এর আবাস, গঠন, জনুক্রম বর্ণনা করতে পারবে।
৫. **ব্যবহারিক**
○ *Pteris* এর স্পোরোফাইট শনাক্ত করতে পারবে।

ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) বা মসবর্গীয় উদ্ভিদ

(Gk. *Bryon* = মস এবং *phyton* = উদ্ভিদ)

প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্রায়োফাইটা একটি বিভাগ। Margulis এর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্রায়োফাইটা একটি গোত্র এবং ফাইলাম (বিভাগ)। Wallace, Sanders ও Ferl-এর Biology (১৯৯৬) অনুযায়ী ব্রায়োফাইটস-এর প্রজাতির সংখ্যা ১৫,৬০০ যার অধিকাংশই স্থলজ, কিছু জলজ। স্থলজ প্রজাতিগুলোরও জীবনচক্র, বিশেষ করে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হতে পানির প্রয়োজন হয়। তাই ব্রায়োফাইটা উভচর উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানী ব্রাউন (Braun) ১৮৬৪ সালে ব্রায়োফাইটা নামটি ব্যবহার করেন। **Bryophyta বর্গের উদ্ভিদকে Bryophytes (ব্রায়োফাইটস) বলে।** বাংলাদেশ থেকে এ বিভাগের অন্তর্গত ৩৪টি গোত্রের ৭৪টি গণের ২৪৮টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। ব্রায়োফাইটার সব প্রজাতিতে নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bryophyta)

১. এরা বহুকোষী উদ্ভিদ। এরা অপুষ্পক ও অবীজী।
২. এদের দেহ গ্যামিটোফাইট (gametophyte) তথা হ্যাপ্লয়েড। গ্যামিটোফাইট সর্বদাই স্বতন্ত্র ও স্বভোজী উদ্ভিদ।

৩। দেহ থ্যালয়েড অর্থাৎ দেহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না, তবে মস জাতীয় উদ্ভিদকে 'নরম কাণ্ড ও পাতার' মতো অংশে চিহ্নিত করা যায়।

৪। এদের মূল নেই, তবে মূলের পরিবর্তে এককোষী রাইজয়েড এবং কোনো কোনো প্রজাতিতে বহুকোষী স্কেল থাকে।

৫। এদের দেহে কোনো ভাস্কুলার টিস্যু নেই। দেহ প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত।

৬। এদের জননাঙ্গ বহুকোষী এবং বন্ধ্যাকোষাবরণ দিয়ে আবৃত।

৭। যৌন জনন উগ্যামাস প্রকৃতির অর্থাৎ বড় নিশ্চল স্ত্রী গ্যামিটের (ডিম্বাণু) সাথে ক্ষুদ্র ও সচল পুং গ্যামিটের (শুক্রাণু) মিলন ঘটে।

৮। এদের ভ্রূণ বহুকোষী, ভ্রূণ স্ত্রী জননাঙ্গের অভ্যন্তরে থাকে।

৯। স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের উপর পূর্ণ বা আংশিক নির্ভরশীল এবং সর্বদাই গ্যামিটোফাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে। উৎপন্ন স্পোর একই আকার আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ হোমোস্পোরাস।

১০। জীবনচক্রে গ্যামিটোফাইট প্রধান এবং স্পোরোফাইট গৌণ।

ব্রায়োফাইটা নামটি এসেছে দু'টি গ্রিক শব্দ হতে। গ্রিক *Bryon* অর্থ মস এবং *phyton* অর্থ উদ্ভিদ। মস এবং এর সাথে মিল সম্পন্ন উদ্ভিদসমূহ ব্রায়োফাইটা বিভাগের অন্তর্গত। এ বিভাগের উদ্ভিদসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে; যথা: i) হেপাটিকি (Hepaticae), ii) অ্যান্থোসিরোটি (Anthocerotae) এবং iii) মাসাই (Musci).

ব্রায়োফাইটের আদি বৈশিষ্ট্য : (১) উদ্ভিদ হ্যাপ্লয়েড, (২) অধিকাংশই থ্যালয়েড, (৩) এদের সত্যিকার মূল নেই, (৪) ভাস্কুলার টিস্যু নেই, (৫) এরা হোমোস্পোরাস।

ব্রায়োফাইটের উন্নত বৈশিষ্ট্য : *Anthoceros* উদ্ভিদের ক্যাপসিউলে অবস্থিত কলোমেলা, স্টোমাটাযুক্ত এপিডার্মিস, ক্যাপসিউলের গোড়ায় ভাজক টিস্যুর অবস্থান এগুলো হলো উন্নত বৈশিষ্ট্য।

ব্রায়োফাইটা উভচর উদ্ভিদ : এদের অনেক সদস্যই আর্দ্র স্থলজ পরিবেশে জন্মায়। কিন্তু পানির সাহায্য ছাড়া জনন, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে না, তাই এরা উভচর উদ্ভিদ। স্থলজ পরিবেশে জন্মালেও এদের জীবন চক্রের একটি বিশেষ ধাপ পানির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এদের যৌন জননের জন্য পানির উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। জীবন চক্র সম্পন্ন করার সময় এদের শুক্রাণু পানিতে সাঁতার কেটে ডিম্বাণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং পানির উপস্থিতিতে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরাও জলজ উদ্ভিদের ন্যায় পানি শোষণ করে এবং দেহে জলজ উদ্ভিদের ন্যায় বায়ুরন্ধ্র থাকে। এ কারণে ব্রায়োফাইটাকে উভচর উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে।

Genus : *Riccia* (রিকশিয়া)

Riccia, Hepaticae শ্রেণির অন্তর্গত একটি গণ। *Riccia* উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই জন্মে থাকে এবং বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু ক্ষুদ্রাকার বলে আমরা এদেরকে সাধারণত লক্ষ্য করি না, চিনিও না। এদের সাথে আমরা তেমন পরিচিত নই। *Riccia* একটি বড় গণ। প্রায় ২০০টি প্রজাতি নিয়ে এই গণ গঠিত। Hepaticae শ্রেণির সদস্যদেরকে লিভারওয়ার্ট (Liverwort) বলে। এদের দেহ অর্থাৎ থ্যালাসের আকৃতি মানুষের লিভার-এর সাথে কিছুটা মিল সম্পন্ন হওয়াতে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে *Riccia* গণের ৪৫টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। নতুন প্রজাতির মধ্যে *R. bengalensis, R. dhakensis, R. chittagonensis* উল্লেখযোগ্য।

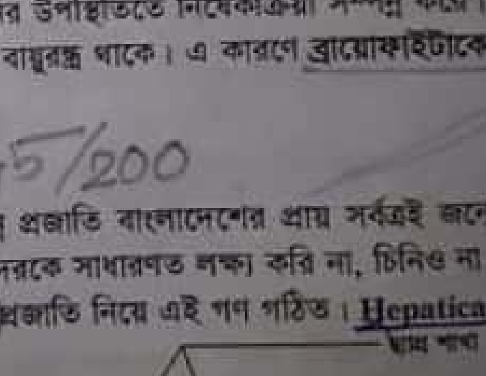

চিত্র ৬.১ : *Riccia* থ্যালাস।

আবাসস্থল : *Riccia* গণের বিভিন্ন প্রজাতি স্যাঁতসেঁতে মাটিতে, আর্দ্র প্রাচীরের গায়ে জন্মে থাকে। নদীতীরে বালিতে *Riccia* জন্মাতে দেখা যায়। *Riccia fluitans* ছোট ছোট ডোবা-পুকুরের পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। বর্ষাকালেই *Riccia* অধিক জন্মায়।

বাহ্যিক গঠন বৈশিষ্ট্য : *Riccia* গ্যামিটোফাইটিক উদ্ভিদ। এদের দেহ থ্যালয়েড অর্থাৎ দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। থ্যালাসটি সবুজ, শায়িত এবং বিষমপৃষ্ঠ। থ্যালাস দ্বিধা শাখাবিশিষ্ট। সাধারণত কতগুলো *Riccia* থ্যালাস একত্রে গোলাপের পাপড়ির মতো গোলাকার চক্র করে অবস্থান করে।

এই অবস্থাকে রোজেট বলে। থ্যালাসের উপর পৃষ্ঠে লম্বালম্বিভাবে মধ্যশিরা আছে এবং শিরা বরাবর লম্বা খাঁজ (dorsal furrow) আছে। থ্যালাসের প্রতিটি শাখার শীর্ষে একটি খাঁজ আছে, একে অগ্রস্থ খাঁজ (apical notch) বলে। থ্যালাসের নিচের পৃষ্ঠ থেকে বহুকোষী স্কেল এবং এককোষী রাইজয়েড সৃষ্টি হয়। রাইজয়েড মসৃণ এবং অমসৃণ (smooth & tuberculate)-এ দু'প্রকার হয়। থ্যালাসকে মাটির সাথে আটকিয়ে রাখা এবং মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করা স্কেল ও রাইজয়েড এর কাজ।

অভ্যন্তরীণ গঠন বৈশিষ্ট্য : প্রস্থচ্ছেদে থ্যালাসকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত দেখা যায় : (i) উপরের দিকে ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত ফটোসিনথেটিক বা আত্তীকরণ অঞ্চল, (ii) নিচের দিকে বর্ণহীন সঞ্চয়ী অঞ্চল এবং (iii) নিম্নত্বক।

(i) ফটোসিনথেটিক বা আত্তীকরণ অঞ্চল (Photosynthetic or assimilatory zone) : থ্যালাসের উপরের দিকে ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত খাড়া কোষের সারি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলে ফটোসিনথেসিস হয় এবং খাদ্য তৈরি হয়। ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত এ সারিগুলোকে আত্তীকরণ সূত্র বলে। এসব আত্তীকরণ সূত্রের মধ্যবর্তী সরু ও লম্বা নালীর ন্যায় বায়ুপূর্ণ স্থানকে বায়ু প্রকোষ্ঠ বলে। প্রতিটি বায়ু প্রকোষ্ঠ একটি ছিদ্রপথে বাইরের সাথে উন্মুক্ত থাকে। এ ছিদ্রপথকে বায়ুরন্ধ্র (airpore) বলে। আত্তীকরন সূত্রের বাইরের কোষগুলো কিছুটা বড় ও ক্লোরোপ্লাস্টবিহীন থাকে। বর্ণহীন এ কোষগুলো থ্যালাসের উপরিভাগে একটি অসম্পূর্ণ ঊর্ধ্বত্বক গঠন করে। বর্ণহীন একসারি কোষ দিয়ে থ্যালাসের ঊর্ধ্বত্বক গঠিত।

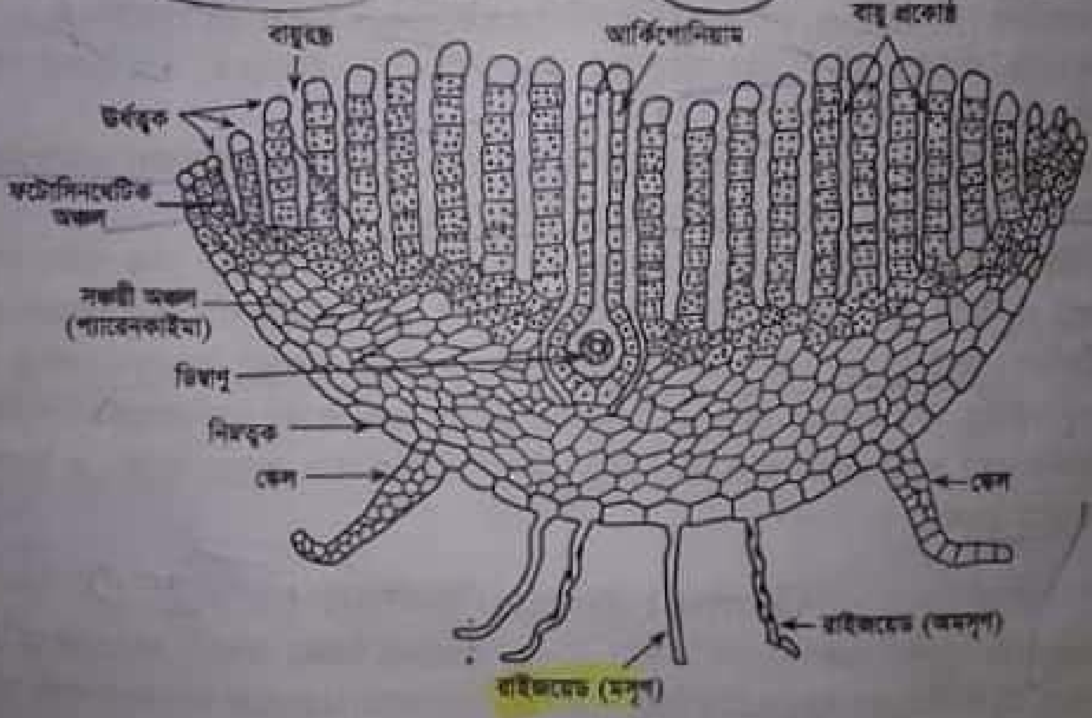

চিত্র ৬.২ : *Riccia* থ্যালাসের প্রস্থচ্ছেদ।

(ii) সঞ্চয়ী অঞ্চল (Storage zone) : থ্যালাসের ফটোসিনথেটিক অঞ্চলের নিচে এ অঞ্চল অবস্থিত। এ অঞ্চলটি কয়েক সারি বর্ণহীন প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত এবং সাধারণত আন্তঃকোষীয় ফাঁক বিবর্জিত। এ সকল কোষে প্রচুর শ্বেতসার কণা সঞ্চিত থাকে।

(iii) নিম্নত্বক : একসারি কোষ দিয়ে নিম্নত্বক গঠিত। নিম্নত্বক সুগঠিত। নিম্নত্বক থেকে বহু এককোষী রাইজয়েড (মসৃণ এবং অমসৃণ) ও বহুকোষী শল্ক বা স্কেল নির্গত হয়।

গুরুত্ব : মাটিতে জৈব পদার্থ সংযোজনে কিছুটা ভূমিকা পালন করে। পরিবেশ দূষণের সূচক হিসেবে কাজ করে। বিবর্তন ধারা বিষয়ে প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়তা করে।

Riccia-র শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ থ্যালয়েড অর্থাৎ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত নয়।
২। থ্যালাস সবুজ, শায়িত, চ্যাপ্টা এবং বিষমপৃষ্ঠ।
৩। থ্যালাস দ্বিধা শাখান্বিত এবং প্রতি শাখার মাথায় খাঁজযুক্ত।
৪। থ্যালাসের নিম্নপৃষ্ঠে দুই প্রকার এককোষী মসৃণ ও অমসৃণ রাইজয়েড এবং বহুকোষী স্কেল (শল্ক) বিদ্যমান।

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Plantae
Grade : Bryophyta
Division : Bryophyta
Class : Hepaticae
Order : Marchantiales
Family : Ricciaceae
Genus : *Riccia*

৫। বর্ণহীন টিস্যু উপরের পৃষ্ঠের দিকে দণ্ডাকার (ফাঁকে ফাঁকে বায়ু প্রকোষ্ঠযুক্ত) ফটোসিন্থেটিক অঞ্চল এবং নিচের পৃষ্ঠের দিকে অবিচ্ছিন্ন কোষের সঞ্চয়ী অঞ্চলে বিভক্ত।

৬। স্ত্রী জননাঙ্গ আর্কিগোনিয়াম, পুং জননাঙ্গ অ্যান্থেরিডিয়াম এবং স্পোরোফাইট হোমোস্পোরাস।

৭। আর্কিগোনিয়াম দেখতে ফ্লাস্কের মতো এবং অ্যান্থেরিডিয়ামের আকৃতি নাসপাতির মতো; গোলাকার, ডিম্বাকার বা বেলনাকার।

টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) বা ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ

(Gk. *Pteron* = ফার্ন এবং *phyton* = উদ্ভিদ)

গ্রিক শব্দ *Pteron* (পক্ষল বা ডানা এবং *phyton* (উদ্ভিদ) থেকে Pteridophya শব্দের উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হলো পক্ষল বা ডানাবিশিষ্ট উদ্ভিদ। বিভিন্ন শোভাবর্ধনকারী ফার্ন (fern)-এর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। ঢেঁকিশাকও (*Dryopteris*) এক ধরনের ফার্ন। সকল ফার্ন ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ টেরিডোফাইটা বিভাগের অন্তর্গত, তাই টেরিডোফাইটাকে ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। এরা অপুষ্পক ও দেহে ভাস্কুলার টিস্যু থাকায় এদেরকে ভাস্কুলার ক্রিপ্টোগ্যামস বলা হয়। Wallace, Sanders ও Ferl-এর Biology (১৯৯৬) অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রায় ১১ হাজার তেইশটি (১১০২৩) প্রজাতির টেরিডোফাইট উদ্ভিদ আছে। **Pteridophyta বিভাগের অন্তর্গত উদ্ভিদ(সমূহ)কে Pteridophytes (টেরিডোফাইটস) বলা হয়।** বাংলাদেশ থেকে ৪১ গোত্রের ১৯৫ প্রজাতির টেরিডোফাইট নথিভুক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রজাতিই স্থলজ, কতক জলজ ও কতক পরাশ্রয়ী প্রজাতি আছে। এই গ্রুপের উদ্ভিদই প্রথম স্থল ভাগে প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে।

টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য

১। এরা অপুষ্পক ও অবীজী উদ্ভিদ।

২। এরা স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ অর্থাৎ ডিপ্লয়েড।

৩। গ্যামিটোফাইট পর্যায়কে প্রোথ্যালাস বলে, যা থ্যালাস প্রকৃতির।

৪। এদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়।

৫। এদের ভাস্কুলার টিস্যু আছে।

৬। ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।

৭। অধিকাংশ প্রজাতিতে কাণ্ড রাইজোমে রূপান্তরিত হয়।

৮। স্পোরোফাইটে স্পোর উৎপন্ন হয়, যা সম (homosporous) বা অসম (heterosporous) আকারের হতে পারে।

৯। এদের জননাঙ্গ বহুকোষী এবং জননাঙ্গের চারদিকে বন্ধ্যাকোষের বেষ্টনী থাকে।

১০। এদের পুংগ্যামিট সচল এবং অ্যান্থেরিডিয়ামে উৎপন্ন হয়।

১১। এদের স্ত্রীগ্যামিট নিশ্চল এবং আর্কিগোনিয়ামে উৎপন্ন হয়।

১২। জীবনচক্রে সুস্পষ্ট হিটারোমরফিক জনুক্রম বিদ্যমান।

Genus : *Pteris* (টেরিস)

বাংলাদেশে *Pteris* উদ্ভিদ একটি পরিচিত ফার্ন উদ্ভিদ। রোদে জন্মাতে পছন্দ করে বলে *Pteris* উদ্ভিদ সানফার্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে *Pteris* এর প্রায় ১৬টি প্রজাতি জন্মে থাকে। যেমন- *Pteris vittata*, *P. longifolia* ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি জন্মায় *Pteris vittata*।

আবাসস্থল (Habitat) : *Pteris* সাধারণত পুরাতন ও ভাঙা স্যাঁতসেঁতে প্রাচীরের গায়ে জন্মায়। পুরাতন ইটের স্তূপেও এরা ভালো জন্মায়। প্রাচীরের গায়ে এবং ইটের স্তূপে জন্মায় বলে এরা প্রাচীরগাত্রীয় বা ওয়াল এরিয়াল। *Pteris* গণের প্রায় ২৫০টি প্রজাতি রয়েছে।

***Pteris*-এর দৈহিক গঠন (Vegetative structure of *Pteris*) :** *Pteris* এর প্রধান উদ্ভিদ রেণুধর বা স্পোরোফাইটিক বা ডিপ্লয়েড। এদের দেহ মূল, কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত। কাণ্ড

চিত্র ৯.৩ : একটি *Pteris* উদ্ভিদ।

রাইজোম (রূপান্তরিত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড) জাতীয় এবং আবাসভূমির কয়েক সেন্টিমিটার গভীরে জন্মায়। এটি দেখতে ... এর বৃদ্ধি অনির্দিষ্ট। রাইজোমের নিম্নতল হতে সূক্ষ্ম স্বল্প শাখাযুক্ত অস্থানিক মূল গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা চির সবুজ ... পক্ষল যৌগিক। ফার্নের পাতাকে ফ্রন্ড (frond) বলে। মুকুল অবস্থায় পাতা কীভাবে বিন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয় ... বা মুকুলপত্র বিন্যাস। ফার্নের পাতা মুকুল অবস্থায় কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় থাকে যাকে বলা হয় সারসিনেট ভার্নেশন। কুণ্ডলিত কচি পাতাকে ক্রোজিয়ার (crozier) বলে। পত্র যৌগপত্র এবং প্রতিটি পত্রকখণ্ডকে পিনা (pinna) বলে। পিনা প্রায় অবৃন্তক, সাধারণত অপজিট কখনো কখনো কিছুটা একান্তরভাবে সজ্জিত থাকে। প্রতিটি পিনা অবৃন্তক, ... লম্বাটে (linear shaped) এবং কিনারা মসৃণ। শীর্ষক পিনা সর্বাধিক লম্বা। পত্রের র‍্যাকিস-এর নিম্নপ্রান্ত এবং রাইজোম এক প্রকার অসংখ্য বাদামি রঙের শল্কপত্র দিয়ে আবৃত থাকে। শল্কপত্রকে র‍্যামেন্টাম বলে।

অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal structure)

রাইজোম (কাণ্ড) : রাইজোম কাণ্ডের সর্ববাইরে প্যারেনকাইমা কোষের একস্তর বিশিষ্ট এপিডার্মিস বা বহিস্ত্বক অবস্থিত। বহিস্ত্বক দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় দুস্তর বিশিষ্ট হাইপোডার্মিস (অধঃত্বক) এবং হাইপোডার্মিস দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় বহুস্তর বিশিষ্ট কর্টেক্স অবস্থিত। কর্টেক্স-এ একাধিক ভাস্কুলার বান্ডল আছে। ভাস্কুলার বান্ডল হ্যাড্রোসেন্ট্রিক অর্থাৎ কেন্দ্রে জাইলেম এবং এর চারদিকে ফ্লোয়েম অবস্থিত।

র‍্যাকিস : র‍্যাকিসের প্রস্থচ্ছেদে বাইরে এপিডার্মিস, এপিডার্মিস দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্ক্লেরেনকাইমা কোষের হাইপোডার্মিস (অধঃত্বক) অবস্থিত। হাইপোডার্মিস দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় বহুস্তর বিশিষ্ট কর্টেক্স অবস্থিত এবং কর্টেক্স টিস্যুতে অশ্বক্ষুরাকৃতির স্টিলি (পরিবহন কলাগুচ্ছ) অবস্থিত। ভাস্কুলার বান্ডল হ্যাড্রোসেন্ট্রিক।

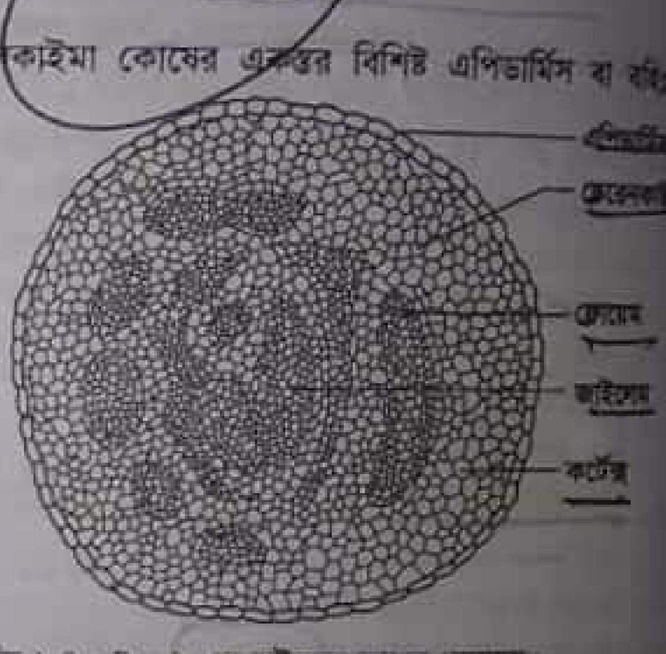

চিত্র ৬.৪ : *Pteris*-এর রাইজোম কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ।

জনন (Reproduction) : *Pteris* উদ্ভিদ অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এদের মধ্যে স্পোরোফাইট উদ্ভিদে অঙ্গজ ও অযৌন জনন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে এবং গ্যামিটোফাইট উদ্ভিদে যৌন জনন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

১। অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) : অনেক সময় পরিণত রাইজোমের অংশ বিশেষ মরে যায় এবং অপরিণত শাখাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন শাখাগুলো নতুন মূল ও পাতা সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথক স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদে পরিণত হয়।

২। অযৌন জনন (Asexual reproduction): *Pteris* উদ্ভিদে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। *Pteris* উদ্ভিদ পরিণত বয়স্ক হলে এর পত্রক বা পিনার নিম্নতলের দু'কিনারা বরাবর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পোরাঞ্জিয়া (sporangia, একবচনে sporangium) উৎপন্ন হয়। স্পোরাঞ্জিয়ামের অভ্যন্তরে রেণু বা স্পোর (spore) নামক অযৌন জনন কোষ (asexual reproductive bodies) উৎপন্ন হয়। স্পোরাঞ্জিয়াগুলো গুচ্ছাকারে অবস্থান করে এবং স্পোরাঞ্জিয়ামের গুচ্ছকে সোরাস (sorus, বহুবচনে sori) বলা হয়। প্রতিটি সোরাস দেখতে বাদামি বর্ণের ও বৃক্কাকার। যে টিস্যু হতে স্পোরাঞ্জিয়াম উৎপন্ন হয় সে টিস্যুকে প্লাসেন্টা (placenta) বা অমরা বলে। পত্রক বা পিনার কিনারা ভেতরের দিকে একটু বেঁকে এসে সোরাইকে ঢেকে রাখে। ফলক প্রান্তের এ ঢাকনি অংশকে ফলস্ ইন্ডুসিয়াম (false indusium) বলা হয়। সোরাস উৎপন্নকারী পাতাকে স্পোরোফিল (sporophyll) বলে। পরিণত স্পোরাঞ্জিয়াম একটি বৃন্ত (স্পোরাঞ্জিয়োফোর) এবং একটি ডিম্বাকার ক্যাপসিউল অংশ নিয়ে গঠিত। বৃন্তের মাথায় ক্যাপসিউল অবস্থিত। ক্যাপসিউল নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।

ক) অ্যানুলাস (Annulus) : ক্যাপসিউল প্রাচীরের অধিকাংশে কাইটিনযুক্ত ও পুরু এক কোষস্তর বিশিষ্ট আবরণে আবৃত থাকে। এই পুরু আবরণকে অ্যানুলাস বলে। এটি পানিগ্রাহী।

ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদসমূহকে পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাসে Plantae রাজ্যের মধ্যে ট্রাকিওফাইটার অন্তর্গত ফিলিসিনি বিভাগে বলা হয়েছে। *Pteris* বিভাগ Filicinophyta-এর অন্তর্গত। Margulis শ্রেণিবিন্যাসে Pteridophyta বলে কোনো বিভাগ, শ্রেণি বা গ্রুপ নেই।

(ii) স্টোমিয়াম (Stomium) : ক্যাপসিউলের বৃন্ত সংলগ্ন কিছু অংশে পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বলয়াকার কোষ থাকে, এ অংশকে স্টোমিয়াম বলে। স্পোর নির্গমনের সময় স্টোমিয়াম বরাবর স্পোরাঞ্জিয়াম ফেটে যায় এবং স্পোর নির্গমন হয়।

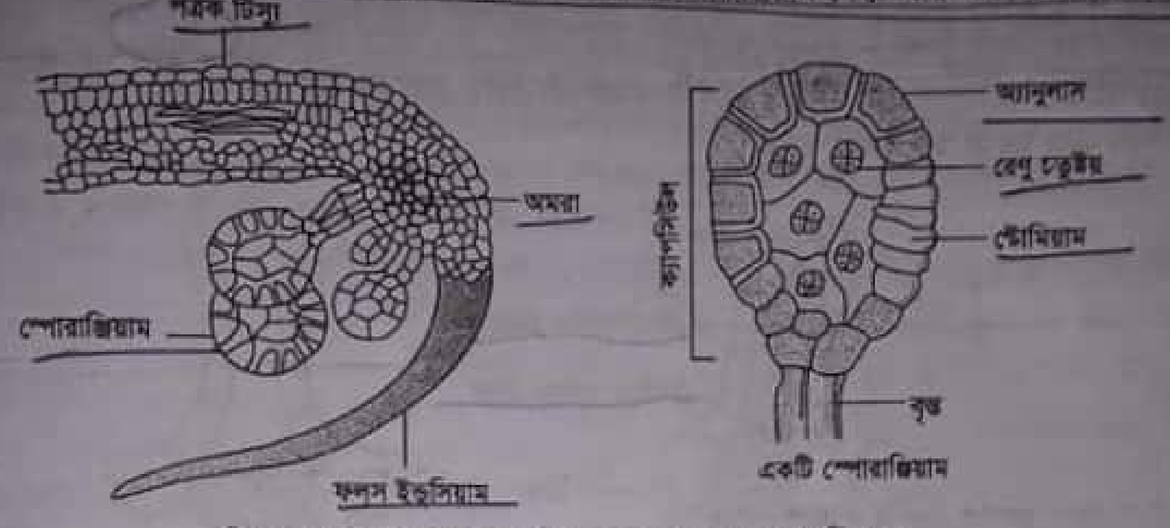

চিত্র ৬.৫ : সোরাস বরাবর ফার্ন পত্রকের প্রস্থচ্ছেদ ও স্পোরাঞ্জিয়াম।

(iii) বৃন্ত (Stalk) : স্পোরাঞ্জিয়ামের গোড়ায় একটি খাটো বৃন্ত আছে।

স্পোর উৎপাদন ও বিস্তার: ক্যাপসিউলের ভেতরের টিস্যুকে বলা হয় স্পোরোজেনাস টিস্যু, কারণ এ টিস্যু হতে স্পোর মাতৃকোষ উৎপন্ন হয়। স্পোর মাতৃকোষ ডিপ্লয়েড (2n)। মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোর মাতৃকোষ হতে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোর উৎপন্ন হয়। একটি স্পোরাঞ্জিয়াম থেকে ৬৪টি স্পোর সৃষ্টি হয়। পরিণত স্পোরগুলো গাঢ় বাদামি বর্ণের এবং একই বৈশিষ্ট্যের। স্পোর সৃষ্টি হওয়ায় স্পোরাঞ্জিয়ামে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায় ফলে স্পোরাঞ্জিয়াম শুষ্ক হয়ে যায়। স্পোরাঞ্জিয়াম শুষ্ক হয়ে গেলে এর পশ্চাদ্ভাগের অ্যানুলাসে টান পড়ে এবং স্টোমিয়াম আড়াআড়ি ফেটে যায়। আর্দ্র অ্যানুলাস পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরে আসে। অ্যানুলাসের এদিক-ওদিক চলাচলের ফলে স্পোরাঞ্জিয়াম হতে স্পোরের বিস্তার ঘটে এবং বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যামিটোফাইট (Gametophyte) : *Pteris* এর স্পোরোফাইট থেকে সৃষ্ট স্পোর বা রেণু হলো লিঙ্গধর বা গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। হ্যাপ্লয়েড স্পোর অনুকূল পরিবেশে কোনো আর্দ্র বস্তুর সংস্পর্শে আসলে অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমাগত মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডাকার সবুজ অঙ্গের সৃষ্টি করে। এটি ফার্নের গ্যামিটোফাইট। হৃৎপিণ্ডাকার এ গ্যামিটোফাইটকে প্রোথ্যালাস (prothallus) বলা হয়। প্রোথ্যালাসের নিম্নপৃষ্ঠের নিম্নাংশ হতে অনেক এককোষী রাইজয়েড উৎপন্ন হয়। রাইজয়েডগুলো প্রোথ্যালাসকে মাটির সাথে সংযুক্ত করে এবং মাটি হতে প্রোথ্যালাসকে খাদ্যরস সরবরাহ করে। প্রোথ্যালাসের উপরের দিকে একটি গভীর খাঁজ আছে। একে অগ্রস্থ খাঁজ (apical notch) বলে। প্রোথ্যালাস সবুজ বর্ণের, বহুকোষী, স্বতন্ত্র ও স্বভোজী উদ্ভিদ। প্রোথ্যালাস উভলিঙ্গ অর্থাৎ একই দেহে পুং ও স্ত্রী জনন অঙ্গ অবস্থান করে। প্রোথ্যালাসের অঙ্কীয়তলে খাঁজের কাছে স্ত্রীজননাঙ্গ (আর্কিগোনিয়াম) এবং রাইজয়েডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পুংজননাঙ্গ (অ্যান্থেরিডিয়াম) উৎপন্ন হয়।

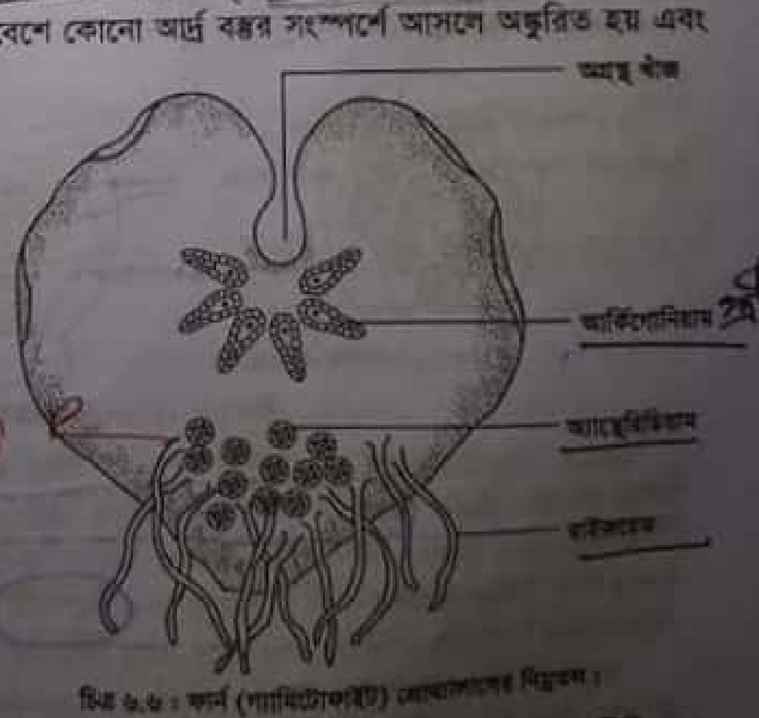

চিত্র ৬.৬ : ফার্ন (গ্যামিটোফাইট) প্রোথ্যালাসের নিম্নতল।

৩। যৌন জনন (Sexual reproduction) : প্রোথ্যালাসে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। এর নিম্নতলে খাঁজের কাছাকাছি স্থানে আর্কিগোনিয়াম (স্ত্রীজননাঙ্গ) উৎপন্ন হয়। যে অংশ হতে রাইজয়েড উৎপন্ন হয় সে অংশে অ্যান্থেরিডিয়াম (পুংজননাঙ্গ) উৎপন্ন হয়, কাজেই প্রোথ্যালাস সহবাসী।

আর্কিগোনিয়াম (Archegonium) : স্ত্রীজননাঙ্গকে আর্কিগোনিয়াম বলে। আর্কিগোনিয়াম ফ্লাস্ক আকৃতির। এটি একটি গ্রীবা (neck) এবং একটি উদর (venter) সহযোগে গঠিত। উদরের নিম্নাংশে একটি ডিম্বাণু (egg or oosphere) এবং ডিম্বাণুর উপর একটি উদরীয় নালিকা কোষ (ventral canal cell) আছে। গ্রীবায় একাধিক গ্রীবা নালিকা কোষ (neck canal cell) আছে। আর্কিগোনিয়াম পরিণত হলে গ্রীবা নালিকা কোষ এবং উদরীয় নালিকা কোষ বিগলিত হয়ে একটি নালী পথ গঠন করে এবং উদরে শুধু ডিম্বাণু থাকে।

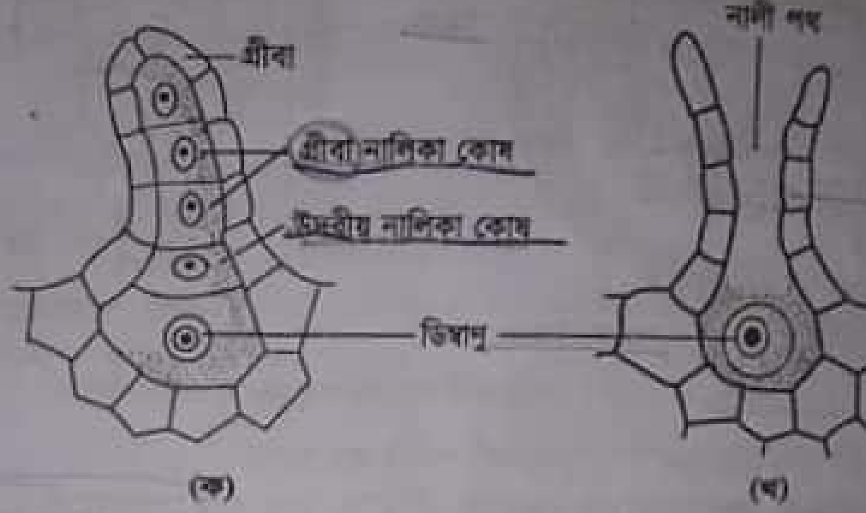

চিত্র ৬.৭ : *Pteris* আর্কিগোনিয়াম (ক) বিভিন্ন অংশ, (খ) নিষেকের জন্য প্রস্তুত।

অ্যান্থেরিডিয়াম (Antheridium) : পুংজননাঙ্গকে অ্যান্থেরিডিয়াম বলে। অ্যান্থেরিডিয়াম গোলাকৃতির। এর ভেতর ২০-৫০টি শুক্রাণু মাতৃকোষ থাকে। মাতৃকোষগুলো একটি বন্ধ্যা আবরণ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। আবরণটি ৩টি কোষ দিয়ে গঠিত। গোড়ায় ২টি রিং কোষ (ring cell) এবং উপরে ১টি ঢাকনা কোষ (cover cell) থাকে। প্রতিটি শুক্রাণু মাতৃকোষ রূপান্তরিত হয়ে প্যাচানো দণ্ডাকার বহু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণুতে (antherozoid) পরিণত হয়। অ্যান্থেরিডিয়ামের শীর্ষের আচ্ছাদনকারী ঢাকনা কোষ বিদীর্ণ হয় এবং শুক্রাণুগুলো বের হয়ে ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কেটে স্থানান্তরিত হতে পারে।

চিত্র ৬.৮ : *Pteris* ফার্নের অ্যান্থেরিডিয়াম এবং শুক্রাণু সৃষ্টি।

নিষেক (Fertilization) : শিশির বিন্দু বা বৃষ্টির পানির সাহায্যে শুক্রাণুসমূহ আর্কিগোনিয়ামে পরিবাহিত হয়। আর্কিগোনিয়াম কর্তৃক ম্যালিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়, ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক শুক্রাণু আর্কিগোনিয়ামের গ্রীবা নালী দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেও একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। নিষেকক্রিয়ার ফলে ডিপ্লয়েড (2n) উস্পোর (oospore) উৎপন্ন হয়। এভাবে নিষেকের ফলে উস্পোরে পূর্ণ ক্রোমোজোম সংখ্যা ফিরে আসে এবং সাথে সাথে ডিপ্লয়েড এবং স্পোরোফাইটিক পর্যায় শুরু হয়।

নতুন স্পোরোফাইট উদ্ভিদ (Regeneration of sporophyte) : জাইগোট বা উস্পোর স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। উস্পোর পুনঃ পুনঃ মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে। ভ্রূণ ক্রমশ বিকশিত হয়ে মূল, কাণ্ড ও পত্রবিশিষ্ট নতুন স্পোরোফাইট উদ্ভিদের জন্ম দেয়। মূল মাটিতে প্রবেশের পর গ্যামিটোফাইট শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদটি পূর্ণ *Pteris* উদ্ভিদে পরিণত হয়।

Pteris উদ্ভিদের জনুক্রম বা জীবন চক্র (Alternation of generation of *Pteris*)

কোনো জীবের জীবন চক্র সম্পন্ন করার জন্য পর্যায়ক্রমে ডিপ্লয়েড (2n) স্পোরোফাইটিক বা রেণুধর এবং হ্যাপ্লয়েড (n) গ্যামিটোফাইটিক বা লিঙ্গধর জনুর আবির্ভাবকে জনুক্রম বলে। *Pteris* উদ্ভিদের জীবন চক্রে সুস্পষ্টভাবে দুটি জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে। একটি হলো স্পোরোফাইটিক জনু এবং অপরটি গ্যামিটোফাইটিক জনু।

স্পোরোফাইটিক জনু (Sporophytic generation) : *Pteris*-এর উদ্ভিদ দেহ স্পোরোফাইটিক অর্থাৎ ডিপ্লয়েড (2n)। স্পোরোফাইট প্রজনন ঋতুতে পত্রক কিনারা বরাবর সোরাস উৎপন্ন করে। সোরাস হলো স্পোরাঞ্জিয়ামের গুচ্ছ। প্রতিটি স্পোরাঞ্জিয়ামের ক্যাপসিউলের ভেতরে ১৬টি ডিপ্লয়েড স্পোর-মাতৃকোষ (2n) থাকে। স্পোর-মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ৬৪টি হ্যাপ্লয়েড স্পোর (n) উৎপন্ন করে। স্পোর সৃষ্টির পর ক্যাপসিউলের প্রাচীর বিদীর্ণ করে স্পোরগুলো বেরিয়ে আসে। এভাবে স্পোরোফাইটিক জনুর সমাপ্তি ঘটে।

গ্যামিটোফাইটিক জনু (Gametophytic generation) : স্পোর-মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড (n) স্পোর উৎপন্ন করে যা গ্যামিটোফাইটের প্রথম ধাপ। এই হ্যাপ্লয়েড স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড প্রোথ্যালাস নামক স্বতন্ত্র গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের সৃষ্টি করে। প্রোথ্যালাসে সৃষ্ট আর্কিগোনিয়াম, অ্যান্থেরিডিয়াম এবং এদের ভেতরে সৃষ্ট ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সবই হ্যাপ্লয়েড। এদের মধ্যে নিষেকের ফলে সৃষ্টি হয় ডিপ্লয়েড **উস্পোর** (2n) যা স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম ধাপ। উস্পোর অঙ্কুরিত হয়ে এবং ক্রমাগত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে ভ্রূণ ও পূর্ণাঙ্গ স্পোরোফাইটিক *Pteris* উদ্ভিদ। *Pteris*-এর জীবনচক্রের স্পোরোফাইট পর্যায় বেশ দীর্ঘ, **গ্যামিটোফাইট পর্যায় বেশ সংক্ষিপ্ত এবং উভয় পর্যায় আকার-আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতির ও স্বতন্ত্র।** তাই এরূপ জনুক্রমকে **বিষমাকৃতির বা হিটারোমরফিক জনুক্রম** (heteromorphic alternation of generation) বলে।

চিত্র ৬.৯ : *Pteris*-এর নতুন স্পোরোফাইট।

যে জনুক্রমে রেণুধর বা স্পোরোফাইটিক এবং লিঙ্গধর বা গ্যামিটোফাইটিক, দুটি দশাই সমান তাকে ডিপ্লোবায়োন্টিক জনুক্রম বলে। আবার যে ডিপ্লোবায়োন্টিক জনুক্রমে রেণুধর ও লিঙ্গধর দশারূপে আকৃতিগতভাবে ভিন্ন ধরনের হয় তাকে **হিটারোবায়োন্টিক জনুক্রম** বলে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ১। *Pteris* উদ্ভিদ শাক হিসেবে খাওয়া যায়। ২। ঘর সাজানোর কাজেও ব্যবহার করা হয়। ৩। সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

Pteris-এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।
২। কাণ্ড রাইজোমে রূপান্তরিত হয়।
৩। রাইজোম র‍্যামেন্টা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে।
৪। পাতা যৌগিক, কচি অবস্থায় কুণ্ডলিত থাকে।
৫। সব স্পোর একই রকম (হোমোস্পোরাস)।
৬। স্পোরাঞ্জিয়া একত্রিত হয়ে পত্রকের কিনারায় সোরাস গঠন করে।
৭। স্পোরাঞ্জিয়াম ফলস্ ইন্ডুসিয়াম দিয়ে ঢাকা থাকে।
৮। প্রোথ্যালাস (গ্যামিটোফাইট) সবুজ, হৃৎপিণ্ডাকার এবং সহবাসী।
৯। রাইজোমের নিচে অস্থানিক মূল বের হয়।
১০। পাতায় র‍্যাকিস থাকে।

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Plantae
Grade : Tracheophyta
Division : Filicinophyta
Class : Filicineae
Order : Filicales
Family : Polypodiaceae
Genus : *Pteris*

চিত্র ৬.১০ : *Pteris* উদ্ভিদের জীবন চক্র (জনুক্রম)।

ব্যবহারিক : *Pteris*-এর স্পোরোফাইট শনাক্তকরণ। পূর্ণাঙ্গ *Pteris* উদ্ভিদই স্পোরোফাইট। একটি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে হার্বেরিয়াম সীট করে রাখলেই শনাক্তকরণের নমুনা হিসেবে তা ব্যবহার করা যাবে। পাওয়া গেলে তাজা নমুনা সংগ্রহ করেও তা পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ করা যাবে। নমুনাটিতে স্পোরাঙ্গ থাকলে ভালো। শনাক্তকরণের জন্য কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে। ব্যবহারিক খাতায় একটি *Pteris* নমুনা এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে। কী কারণে এটি *Pteris* উদ্ভিদ তা লিখতে হবে। (এটি মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। ফুল, ফল বা বীজ নেই। ভূনিম্নস্থ রাইজোম। পাতা যৌগিক জাতীয় পত্রক (পিনা) লম্বা, শীর্ষপত্রক অধিক লম্বা। এতে কচি পাতা কুণ্ডলিত।)

সার-সংক্ষেপ

ব্রায়োফাইটা : উদ্ভিদ দেহ লিঙ্গধর (n)। রেণুধর উদ্ভিদ (2n) সবসময় লিঙ্গধর উদ্ভিদের সাথে যুক্ত থাকে। ব্রায়োফাইটার স্পোরোফাইট গ্যামিটোফাইটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এরা মূল থাকে না। এর পরিবর্তে রাইজয়েড ও শল্ক থাকে। ব্রায়োফাইটার স্পোরোফাইট ... হোমোস্পোরাস।

প্রোথ্যালাস : ফার্ন উদ্ভিদের গ্যামিটোফাইটকে প্রোথ্যালাস বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড স্পোর অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে প্রোথ্যালাস সৃষ্টি হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রোথ্যালাস সবুজ, চ্যাপ্টা, বিষমপৃষ্ঠ এবং হৃৎপিণ্ডাকার। প্রোথ্যালাসের অঙ্কীয়তলে খাঁজের কাছে স্ত্রীজননাঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং রাইজয়েডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পুংজননাঙ্গ সৃষ্টি হয়। পুংরেণু ও স্ত্রীরেণুর যৌন মিলনের মাধ্যমে স্ত্রীজননাঙ্গে জাইগোট সৃষ্টি হয় এবং জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে স্পোরোফাইটের বৃদ্ধি হলে প্রোথ্যালাস শুকিয়ে যায়।

ফার্ন : টেরিডোফাইটা গ্রুপের Filicineae শ্রেণির উদ্ভিদসমূহকে সাধারণভাবে ফার্ন বলা হয়। ফার্ন স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ। ফার্ন উদ্ভিদের পাতা ... ফার্ন উদ্ভিদ অপুষ্পক ভিন্ন ভাস্কুলার। ফার্ন উদ্ভিদের দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা চলে। ফার্নের গ্যামিটোফাইটকে প্রোথ্যালাস বলে। ... পাতাকে ফ্রন্ড বলে। কচি পাতা কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে। ... বৃক্ষ ফার্ন পাওয়া যায়। ... বৃক্ষ ফার্ন ... হিসেবে পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ

GYMNOSPERMS AND ANGIOSPERMS

প্রধান শব্দসমূহ : সাইকাস, জীবন্ত জীবাশ্ম, প্লাসেন্টেশন, পুষ্প প্রতীক,

নগ্নবীজী এবং আবৃতবীজী উভয় প্রকার উদ্ভিদে বীজ হয়। নগ্নবীজী উদ্ভিদে কোনো ফল হয় না, কেবল বীজ হয় কিন্তু আবৃতবীজী উদ্ভিদে ফল এবং বীজ উভয়টি হয়। ফল হয় না বলে নগ্নবীজী উদ্ভিদের বীজ বাইরে থেকে দেখা যায়, বীজ ফলের ভেতরে থাকে বলে আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ বাইরে থেকে দেখা যায় না।

পাশের উপস্থাপিত চিত্র দু'টি দেখে বলতে পার কি? কোনটি নগ্নবীজী উদ্ভিদ, আর কোনটি আবৃতবীজী উদ্ভিদ? এদের মধ্যে আরও অনেক পার্থক্য আছে, ধীরে ধীরে সে সবও জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
২. *Cycas*-এর গঠন ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৩. Poaceae গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৪. Malvaceae গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৫. ব্যবহারিক : Malvaceae গোত্র শনাক্ত করতে পারবে।

নগ্নবীজী উদ্ভিদ (Gymnosperms)

পৃথিবীতে এক সময় (ডেভোনিয়ান যুগে উৎপত্তি এবং মেসোজোয়িক যুগে বিস্তৃতি) নগ্নবীজী উদ্ভিদের আধিক্য থাকলেও বর্তমানকালে এদের সংখ্যা আবৃতবীজী উদ্ভিদের তুলনায় অনেক কম। Gymnosperm উদ্ভিদের বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে নগ্নবীজী উদ্ভিদ। গ্রিক *Gymnos* অর্থ হলো naked = নগ্ন এবং *spermos* অর্থ হলো seed = বীজ। অর্থাৎ জিমনোস্পার্ম শব্দের অর্থ হলো naked seed বা নগ্নবীজী। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক থিওফ্রাস্টাস তাঁর Enquiry into Plants নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম Gymnosperm শব্দটি ব্যবহার করেন। এক সময় নগ্নবীজী উদ্ভিদকেও পুষ্পক উদ্ভিদ বলা হতো কিন্তু বর্তমানে বলা হয় না, কারণ এদের স্পোরোফিল পুষ্পের সাথে মিলসম্পন্ন নয় বরং স্ট্রোবিলাসের সাথে মিল সম্পন্ন। যেসব উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না বলে ফল উৎপন্ন হয় না এবং বীজ নগ্ন অবস্থায় জন্মে তাদেরকে **নগ্নবীজী উদ্ভিদ** বলে।

বাংলাদেশে প্রায় ৪০০০ প্রজাতির আবৃতবীজী উদ্ভিদ থাকলেও মাত্র পাঁচ প্রজাতির নগ্নবীজী উদ্ভিদ প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে। প্রজাতিগুলো হলো *Cycas pectinata* যা চট্টগ্রামের বাড়িয়াডালা পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায়; *Podocarpus neriifolius*, বাংলাদেশে এটি বাঁশপাতা নামে পরিচিত এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলে এখনো পাওয়া যায় এবং *Gnetum* নামক একটি কাষ্ঠল লতানো উদ্ভিদ যা সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন বনে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে *Gnetum* (নিটাম) এর ২/৩টি প্রজাতি আছে বলে ধারণা করা হয়। প্রজাতিগুলো হলো *Gnetum montenum*, *G. oblongum* এবং *G. latifolium*। সবগুলো প্রজাতি বিলুপ্তির আশঙ্কায় আছে। এদেরকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। লাগানো অবস্থায় বাগানে *Cycas revoluta*, *Thuja*, *Aurucaria*, *Pinus* ইত্যাদি নগ্নবীজী উদ্ভিদ দেখা যায়।

পৃথিবীতে নগ্নবীজী উদ্ভিদে ৮৩টি গণ এবং ৭২১টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অধিকাংশই বৃক্ষ বা গুল্ম জাতীয়, কতিপয় গুল্ম বা কাষ্ঠল আরোহী। বর্তমানে জীবন্ত নগ্নবীজী উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ চারটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিভাগ চারটি হলো Ginkgophyta, Cycadophyta, Gnetophyta এবং Coniferophyta.

Ginkgo biloba নামক একটি মাত্র প্রজাতি এখন Ginkgophyta-র অন্তর্ভুক্ত, বাকি সবই বিলুপ্ত। *Ginkgo biloba* একটি জীবন্ত ফসিল। প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্বের Cycadophyta বর্তমানে মাত্র ১০০ প্রজাতি নিয়ে গঠিত। এ দুটি

Scanned by CamScanner

...উদ্ভিদের শুক্রাণু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত। প্রায় ৫৫০টি প্রজাতি নিয়ে গঠিত Coniferophyta. শীতপ্রধান উত্তর গোলার্ধীয় বনাঞ্চলগুলো কনিফার প্রজাতি দিয়ে গঠিত। রাশিয়াতেও বড় কনিফার বন রয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষ *Sequoia sempervirens* (*S. gigantea*) একটি কনিফার জাতীয় উদ্ভিদ। গত ৩০০ বছর ব্যাপী এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বৃক্ষ (বয়স ৫০০০ বছর) হলো আমেরিকার নাভাডা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় বিদ্যমান ব্রিসল কোন পাইন। বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ কনিফার বনাঞ্চল সাইবেরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত যেটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বায়োম। আবৃতবীজী উদ্ভিদের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠ নগ্নবীজী উদ্ভিদ হলো Gnetophyta বিভাগের উদ্ভিদ। প্রায় ৭০টি প্রজাতি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আবৃতবীজী উদ্ভিদের মতো এদের **শুক্রাণু ফ্ল্যাজেলাবিহীন**। এদের কাণ্ডের টিস্যুতে ভেসেল আছে। *Gnetum* এর পাতা আবৃতবীজী উদ্ভিদের মতো। নামিবিয়া মরুভূমিতে এন্ডেমিক *Welwitschea*-র পুংকোন দেখতে ফুলের মতো। এই উদ্ভিদের মাত্র ২টি পাতা থাকে। ***Ephedra*** **উদ্ভিদে দ্বিনিষেক দেখা যায়**। *Ephedra* থেকে শ্বাসকষ্টের ওষুধ ইফেড্রিন পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে *Ephedra* উদ্ভিদ আছে। নগ্নবীজী উদ্ভিদসমূহ বীরুৎ, গুল্ম, আরোহী বা বৃক্ষ যাই হোক না কেন সুনির্দিষ্ট কতিপয় বৈশিষ্ট্যে এরা সবাই এক রকম। Leaf scar নগ্নবীজী উদ্ভিদের একটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য। পাতা ঝরে পড়লেও নগ্নবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডে বিশেষ চিহ্ন থেকে যাওয়াই হলো Leaf scar। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা হলো–

নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবী, চিরসবুজ, স্পোরোফাইট অসমরেণুপ্রসূ (heterosporous) অর্থাৎ মাইক্রোস্পোর ও মেগাস্পোর (পুং ও স্ত্রী লিঙ্গধর উদ্ভিদ) তৈরি করে।

২। রেণুপত্র অর্থাৎ স্পোরোফিলগুলো ঘনভাবে সন্নিবেশিত হয়ে স্ট্রোবিলাস বা কোন (cone) তৈরি করে।

৩। মেগাস্পোরোফিল-এ (স্ত্রীরেণুপত্র) কোনো গর্ভাশয় তৈরি হয় না অর্থাৎ এদের গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড নেই। এর ফলে পরাগায়নকালে পরাগরেণু সরাসরি ডিম্বক রন্ধ্রে পতিত হয়।

৪। ডিম্বক মেগাস্পোরোফিলের কিনারে নগ্ন অবস্থায় থাকে।

৫। গর্ভাশয় নেই তাই এদের কোনো ফল সৃষ্টি হয় না।

৬। ফল সৃষ্টি হয় না বলে বীজ (নিষিক্ত ডিম্বক) নগ্ন অবস্থায় থাকে।

৭। নগ্নবীজী উদ্ভিদে দ্বিনিষেক ঘটে না (ব্যতিক্রম *Ephedra*), তাই শাঁস (endosperm) হ্যাপ্লয়েড এবং নিষেকের পূর্বে সৃষ্টি হয়।

৮। জাইলেম টিস্যুতে সত্যিকার ভেসেল কোষ থাকে না (ব্যতিক্রম *Gnetum*) এবং ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গীকোষ থাকে না।

৯। সকলেই বায়ু পরাগী।

১০। জীবনচক্রে অসম আকৃতির (heteromorphic) জনুক্রম বিদ্যমান।

১১। সাধারণত আর্কিগোনিয়া সৃষ্টি হয়।

Genus : *Cycas* (সাইকাস)

শ্রেণিবিন্যাস

Kingdom : Plantae
Division : Cycadophyta
Class : Cycadopsida
Order : Cycadales
Family : Cycadaceae
Genus : *Cycas*

স্বভাব এবং আবাসভূমি : *Cycas* বহুবর্ষজীবী নগ্নবীজী উদ্ভিদ। সাধারণত পাহাড়ের উপর শুষ্ক স্থানে জন্মে থাকে। অবশ্য সমতল ভূমিতে চাষ করলেও এরা বেশ বৃদ্ধি লাভ করে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এদের বৃদ্ধির জন্য ভালো।

চিত্র ৭.১ : একটি *Cycas pectinata* উদ্ভিদ।

Scanned by CamScanner

ভৌগোলিক বিস্তার : পৃথিবীর উষ্ণ এবং উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় (subtropical) এলাকায় *Cycas* উদ্ভিদের বিস্তার লক্ষ করা যায়। অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, ভারত এবং বাংলাদেশে *Cycas* উদ্ভিদ জন্মে থাকে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে *Cycas pectinata* প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মায়। শেরপুরের গজনি বনাঞ্চলেও এদের জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া *C. circinalis* এবং *C. revoluta* বাংলাদেশে বিভিন্ন বাগানে আলঙ্কারিক উদ্ভিদরূপে লাগান হয়। ধারণা করা হয় প্রায় কোটি বছর পূর্বে *Cycas* জাতীয় উদ্ভিদগুলো আবির্ভূত হয়েছিল।

গঠন বৈশিষ্ট্য : অন্যান্য বীজযুক্ত উদ্ভিদের ন্যায় *Cycas* উদ্ভিদটিও স্পোরোফাইট। স্পোরোফাইটটি মূল, কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত। কাণ্ড খাড়া, সাধারণত অশাখ, স্থূল, বেলনাকার (cylindrical)। কাণ্ডগাত্র স্থায়ী পত্রমূল দিয়ে আচ্ছাদিত বলে অমসৃণ। কাণ্ড ৮ হতে ১৪ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কোনো কোনো প্রজাতি, যেমন- *C. media* আরো উঁচু হতে পারে। সাধারণত শাখাবিহীন, তবে শীর্ষমুকুল ভেঙে গেলে কাণ্ড শাখাযুক্ত হয়। পাতা কাণ্ডের অগ্রভাগে মুকুটের ন্যায় অবস্থান করে। প্রতিটি পাতা পক্ষল যৌগিক। কাণ্ডের মাথায় যৌগপত্রগুলো সর্পিলাকারে সাজানো। কচিপাতা ফার্নের ন্যায় কুণ্ডলিত মুকুল পত্রবিন্যাসযুক্ত (circinate vernation)। *Cycas* উদ্ভিদে যৌগপত্র বা পর্ণপত্র (foliage leaves) ছাড়া আরও এক প্রকার বাদামি বর্ণের **শল্কপত্র** (scale leave) আছে। সুতরাং পাতা দু'ধরনের। শল্কপত্রগুলো যৌগপত্রের মুকুলকে আবৃত করে রাখে। পাম উদ্ভিদ এবং ফার্ন-এর পাতার সাথে সাইকাসের পাতা কিছুটা মিলসম্পন্ন বলে অনেক সময় *Cycas*-কে পামফার্ন বলা হয়। যৌগপত্রের প্রতিটি পত্রকখণ্ড গাঢ় সবুজ বর্ণের, মসৃণ, চর্মবৎ, রেখাকার হতে লেন্স আকৃতির। পত্রকখণ্ডে একটিমাত্র মধ্যশিরা (midrib) থাকে, কোনো প্রকার শিরা (vein) বা উপশিরা (veinlet) স্পষ্ট নয়। পত্রকখণ্ডের সংখ্যা এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতিতে ভিন্নতর হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে *Cycas*-এর প্রধান মূল থাকে। তবে ইহা স্বল্পস্থায়ী কারণ অল্পকাল পরেই প্রধান মূল নষ্ট হয়ে যায়। পরে সেখানে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়। অস্থানিক মূল কখনো কখনো মাটির ঠিক নিচে বৃদ্ধি পায়। সেখানে ভূমিতলের উপর অসংখ্য খাটো খাটো দ্ব্যগ্র শাখার সৃষ্টি করে। ভূমির উপরিতলে দ্ব্যগ্র শাখাবিশিষ্ট এ সকল মূল এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। মূলের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির সাথে সাথে *Nostoc*, *Anabaena* নামক সায়ানোব্যাকটেরিয়া দ্বারাও আক্রান্ত হয়। ফলে আক্রান্ত মূলগুলো স্বাভাবিক সরু না হয়ে বিকৃত আকৃতি ধারণ করে। সে কারণে সামুদ্রিক প্রবাল বা কোরালের মতো দেখায়। এমন মূলকে **কোরালয়েড মূল** (coralloid root) বা **রুট টিউবারকল** (root tubercle) বলে। কোরালয়েড মূলের অন্তর্গঠনে মধ্যকর্টেক্সে *Anabaena* ও *Nostoc* অবস্থান করে, এ অংশকে শৈবাল স্তর বলে।

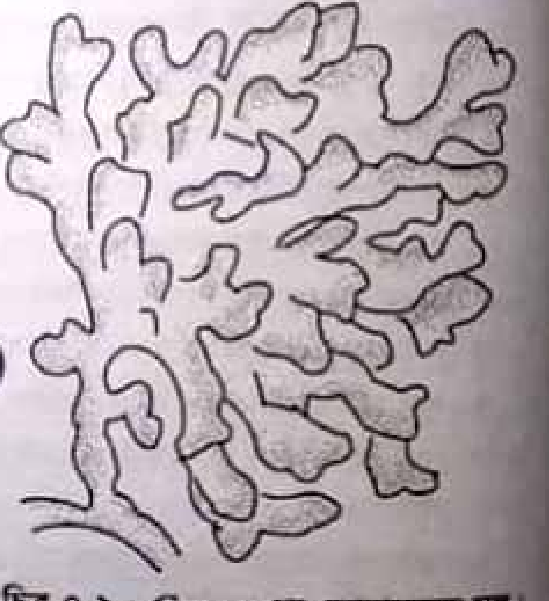

চিত্র ৭.২ : *Cycas*-এর কোরালয়েড মূল।

জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil) : বর্তমানকালের কোনো জীবিত উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অতীতকালের কোনো জীবাশ্ম উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলসম্পন্ন হলে তাকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। *Cycas* একটি জীবন্ত জীবাশ্ম।

Cycas-কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলার কারণ নিম্নরূপ :

Cycas উদ্ভিদ Cycadales বর্গের অন্তর্গত। প্রাথমিক মেসোজোয়িক যুগে Cycadales বর্গের অনেক উদ্ভিদ পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এদের অনেকেই এখন বিলুপ্ত। এদেরকে পাওয়া যায় **জীবাশ্ম** (fossil) হিসেবে। এ বর্গের *Cycas* সহ ৯টি গণের প্রায় ১০০টি প্রজাতি এখনো পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। এদের অনেক বৈশিষ্ট্য সেই আদি কালের বিলুপ্ত জীবাশ্ম সাইকাড্‌স-এর বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ এবং আদি প্রকৃতির। এজন্যই *Cycas* সহ বর্তমানকালের সকল সাইকাড্‌সকে (Cycadales বর্গের সদস্যদেরকে সাধারণভাবে Cycads বলা হয়) **জীবন্ত জীবাশ্ম** (Living fossil) বলা হয়।

Scanned by CamScanner

Cycas উদ্ভিদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। *Cycas* উদ্ভিদ স্পোরোফাইট। দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।

২। উদ্ভিদ খাড়া পাম জাতীয়। বীজ উৎপন্ন হয় কিন্তু ফল উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ বীজ নগ্ন।

৩। পাতা বৃহৎ, পক্ষল যৌগিক, কাণ্ডের মাথার দিকে সর্পিলাকারে সজ্জিত।

৪। কচি পাতার ভার্নেশন সারসিনেট (কুণ্ডলিত)।

৫। পাতায় ট্রান্সফিউশন টিস্যু বিদ্যমান।

৬। গৌণ অস্থানিক কোরালয়েড মূল বিদ্যমান।

৭। পুংরেণুপত্রগুলো একত্রিত হয়ে স্ট্রোবিলাস গঠন করে কিন্তু স্ত্রীরেণুপত্র সত্যিকার স্ট্রোবিলাস গঠন করে না।

৮। হেটারোস্পোরিক অর্থাৎ যৌন জননে মেগা ও মাইক্রোস্পোর সৃষ্টি হয়।

৯। বাতাসের দ্বারা পরাগায়ন ঘটে।

১০। *Cycas*-এর শুক্রাণু উদ্ভিদকূলে সর্ববৃহৎ, লাটিমের মতো, সচল ও বহু ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট।

Cycas উদ্ভিদের সাথে ফার্নের সাদৃশ্য

(i) *Cycas* ও ফার্ন উভয়ই স্পোরোফাইট। দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত।

(ii) পাতা পক্ষল যৌগিক।

(iii) উভয়ের কচিপাতা কুন্ডলিত অবস্থায় থাকে।

(iv) উভয় উদ্ভিদের শুক্রাণু বহু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত।

(v) উভয়ের জীবন চক্রে অসম-আকৃতির জনুক্রম (heteromorphic alternation of generation) বিদ্যমান।

জনন প্রক্রিয়া (Reproduction) : *Cycas* উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি প্রধানত দু'প্রকারে ঘটে থাকে, যথা- ১। অযৌন জনন এবং ২। যৌন জনন।

১। অযৌন জনন : শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ছাড়া অন্য সব ধরনের বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া হলো অযৌন জনন প্রক্রিয়া। *Cycas* উদ্ভিদের কাণ্ডে এক প্রকার মুকুল সৃষ্টি হয়। এই মুকুল অন্যত্র রোপণ করলে তা পূর্ণাঙ্গ নতুন *Cycas* উদ্ভিদ-এ পরিণত হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে কোনো কোনো সাইকাস প্রজাতির গোড়া থেকে চারা সৃষ্টি হয়। চারা উঠিয়ে লাগালেই নতুন সাইকাস উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেহে সৃষ্ট অঙ্গের মাধ্যমে নতুন গাছের সৃষ্টি হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়া বলা হয়। নার্সারির জন্য মুকুল থেকে চারা করাই সহজ ও উত্তম পদ্ধতি।

২। যৌন জনন : *Cycas*-এ পুং উদ্ভিদ এবং স্ত্রী উদ্ভিদ পৃথক। পুং *Cycas* উদ্ভিদের শীর্ষে অসংখ্য পুংরেণুপত্র (microsporophyll) সৃষ্টি হয় যা একত্রিত হয়ে একটি মোচাকৃতির পুংস্ট্রোবিলাস তৈরি করে। পুংরেণুপত্রের সরু বর্ধিত মাথাকে অ্যাপোফাইসিস বলে। পুংরেণুপত্রের পৃষ্ঠদেশে বহু স্পোরাঞ্জিয়া (একবচনে স্পোরাঞ্জিয়াম) তৈরি হয়। ২-৪টি স্পোরাঞ্জিয়া একত্রে অবস্থান করে, যাকে সোরাস (বহুবচনে সোরাই) বলে। স্পোরাঞ্জিয়ামের ভেতরে স্পোর মাতৃকোষ সৃষ্টি হয়। প্রতিটি স্পোর মাতৃকোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে হ্যাপ্লয়েড পুংরেণু (microspore) তৈরি করে। পুংরেণু হতে পরে শুক্রাণু তৈরি হয়।

অপরদিকে স্ত্রী *Cycas* উদ্ভিদের মাথায় স্ত্রীরেণুপত্র (megasporophyll) তৈরি হয়। স্ত্রীরেণুপত্র ঢিলাভাবে সজ্জিত থাকে, কোনো কমপ্যাক্ট স্ট্রোবিলাস গঠন করে না। স্ত্রীরেণুপত্রের কিনারে ডিম্বক (ovule) সৃষ্টি হয়। উপরের অংশে পিনিউল (ছুরাকৃতির পিনা বা পত্রক) থাকে। দুই কিনারে ডিম্বকসহ প্রতিটি স্ত্রীরেণুপত্রকে ফণা তোলা সাপের মাথার মতো দেখায় (যা অনেক সময় বাজারে সর্পমণি নামে বিক্রি করতে দেখা যায়)। ডিম্বকের ভেতরে স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ সৃষ্টি হয়। স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ মায়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু (megaspore) তৈরি করে। স্ত্রীরেণু থেকে আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয়। আর্কিগোনিয়ামের ভেতরে সৃষ্টি হয় ডিম্বাণু। আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি *Cycas*-এর একটি আদি বৈশিষ্ট্য।

Scanned by CamScanner

চিত্র ৭.৫ : (ক) Cycas-এর পুংস্ট্রোবিলাস, (খ) মাইক্রোস্পোরোফিল এবং (গ) মেগাস্পোরোফিল।

নিষেক : পুংরেণু বায়ুবাহিত হয়ে স্ত্রী উদ্ভিদের ডিম্বকের আর্কিগোনিয়ামের প্রকোষ্ঠে পতিত হয় এবং পোলেন টিউব সৃষ্টি করে। পোলেন টিউবের ভেতরে শুক্রাণু তৈরি হয়। Cycas-এর শুক্রাণু লাটিমের মতো, **বহু ফ্ল্যাজেলাবিশিষ্ট এবং উদ্ভিদকুলের মধ্যে সর্ববৃহৎ।** পোলেন টিউব হতে এই শুক্রাণু (n) আর্কিগোনিয়ামস্থ ডিম্বাণুর (n) সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (2n) তৈরি করে। পরবর্তীতে ডিম্বকটি একটি বীজে পরিণত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন Cycas উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

Cycas এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব : Cycas কে শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে বাড়ি বা বাগানেই লাগানো হয়। এর পাতা ঘর সাজানোর কাজে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেট সাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। Cycas এর পাতা দিয়ে ঝুড়ি, মাদুর তৈরি করা হয়। ফুলের ডালি ও তোড়া সাজাতেও Cycas-এর কচি পাতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Cycas circinalis এর স্ত্রীকোষ ও বীজ হতে একপ্রকার সাগু (স্টার্চ) প্রস্তুত করা হয়। Cycas revoluta এর বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। Cycas pectinata উদ্ভিদের কচিপাতা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো প্রজাতির বীজ হতে মদ ও কাণ্ডের মজ্জা হতে মদ তৈরি করা হয়।

Cycas-এর স্ত্রীস্ট্রোবিলাস দেখতে অনেকটা বড় কোনো সাপের মাথার মতো। শহর-বন্দরের রাস্তার পাশে, ফুটপাতে এগুলো বিক্রি করা হয়- সর্ব রোগের ওষুধ এবং চর্ম রোগের ওষুধ হিসেবে। আসলে এর কোনো চিকিৎসাগত গুণ নেই।

আবৃতবীজী উদ্ভিদ (Angiosperms)

আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, পেয়ারা, বটগাছ ইত্যাদি উদ্ভিদ আমাদের অতি পরিচিত। এ গুলোকে আমরা ফলদ (ফলের গাছ) উদ্ভিদ হিসেবে চিনি। শিম, বরবটি, মরিচগাছ এ গুলোও আমাদের বেশ পরিচিত। এগুলোকে সবজি উদ্ভিদ হিসেবে জানি। রজনীগন্ধা, গাঁদা, জবা এ সব উদ্ভিদকে ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসেবে চিনি। যে উদ্ভিদগুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হলো এর সবগুলোই হলো আবৃতবীজী উদ্ভিদ, কারণ এসব উদ্ভিদের বীজ বাইরে থেকে দেখা যায় না। বীজগুলো থাকে ফলের ভেতরে, অর্থাৎ ফলত্বক দিয়ে আবৃত থাকে। যে সব উদ্ভিদের বীজ ফলের অভ্যন্তরে থাকে সে উদ্ভিদই আবৃতবীজী উদ্ভিদ।

বি. দ্র. : শিক্ষার্থীরা যেন Poaceae এবং Malvaceae উদ্ভিদের গোত্র পরিচিতি, শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য এবং Malvaceae ... উদ্ভিদ চেনে। এগুলো ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পড়াতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে Angiosperm-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে আবৃতবীজী উদ্ভিদ। দু'টি গ্রিক শব্দ হতে Angiosperm শব্দের উৎপত্তি। গ্রিক *Angeion* অর্থ হলো vessel বা container অর্থাৎ পাত্র এবং *spermos* অর্থ হলো seed অর্থাৎ বীজ। কাজেই যে উদ্ভিদের বীজ কোনো পাত্রের মধ্যে (এখানে ফলের মধ্যে) আবৃত থাকে সে উদ্ভিদই হলো **Angiosperm** বা আবৃতবীজী উদ্ভিদ। এখানে পাত্র হলো ফল বা ফলাবরণ, আর ফল সৃষ্টি হয় ফুলের গর্ভাশয় থেকে, তাই আবৃতবীজী উদ্ভিদের অপর নাম হলো Flowering plants বা পুষ্পক উদ্ভিদ।

আজ থেকে প্রায় ১৩ কোটি বছর আগে আবৃতবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। অনেকের মতে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছিল আবৃতবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থল এবং এখান থেকে ক্রমান্বয়ে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদ অনেক ছোট হতে পারে, যেমন- *Wolffia* (০.১ মিমি)। বাংলাদেশে এর দুটি প্রজাতি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম আবৃতবীজী উদ্ভিদটি হলো *Wolffia arrhiza*. বাংলাদেশে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে বৈলাম, গর্জন, তেলশুর প্রধান। বাড়তে দিলে বেত অনেক লম্বা হতে পারে। *Eucalyptus* প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু হতে পারে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। উদ্ভিদ স্পোরোফাইট (রেণুধর), পুষ্পক এবং ভাস্কুলার টিস্যু সমৃদ্ধ।
২। গর্ভকেশর (carpel) সাধারণত গর্ভাশয় (ovary), গর্ভদণ্ড (style) এবং গর্ভমুণ্ড (stigma)– এ তিন অংশে বিভক্ত।
৩। গর্ভাশয় আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ বিশেষ।
৪। ডিম্বক (ovule) গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়, গর্ভধারণের পর ডিম্বক বীজে পরিণত হয় তাই বীজ ফলের ভেতরে আবৃত অবস্থায় থাকে।
৫। শুক্রাণু ফ্ল্যাজেলাবিহীন, পরাগায়নকালে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়।
৬। এদের দ্বিনিষেক ঘটে, দ্বিনিষেকের পর সস্য (endosperm) গঠন আরম্ভ হয়। তাই বীজের সস্য ট্রিপ্লয়েড (3n)।
৭। কোনো প্রকার আর্কিগোনিয়া সৃষ্টি হয় না। আর্কিগোনিয়া সৃষ্টি না হওয়া উন্নত বৈশিষ্ট্য।
৮। জাইলেম টিস্যুতে প্রকৃত ভেসেলকোষ এবং ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গীকোষ থাকে।
৯। বীজে একটি বা দুটি বীজপত্র থাকে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের সংখ্যা ও বিস্তৃতি

পৃথিবীতে আবৃতবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, শনাক্তকৃত প্রজাতির সংখ্যা ২,৮৭,০০০ (হে. উড, ১৯৬৭)। তুন্দ্রা থেকে মরুময় প্রায় সকল পরিবেশেই এদেরকে জন্মাতে দেখা যায়।

প্রফেসর এম. সালার খানের মতানুযায়ী বাংলাদেশে আবৃতবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির অনুমিত সংখ্যা ৫০০০। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফ্লোরা ও ফনা অব বাংলাদেশ' (খণ্ড ৬–১২) অনুযায়ী' নথিভুক্ত প্রজাতির সংখ্যা ৩৬১১টি। এরপর বেশকিছু নতুন প্রজাতি (যেমন- *Colocasia hassanii* H. Ara) এবং বহু নতুন রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম থেকে জুন ২০১৫ তে প্রকাশিত বুলেটিন-এ Urticaceae গোত্রেরই ১৯টি প্রজাতি বাংলাদেশের জন্য নতুন নথিভুক্ত হয়েছে (নাসির, হাসান ও বুশরা)। তাই বলা যায় বাংলাদেশ থেকে নথিভুক্ত প্রজাতির সংখ্যা হবে প্রায় চার হাজার।

পার্থক্যের বিষয়	নগ্নবীজী (ব্যক্তবীজী) উদ্ভিদ	আবৃতবীজী উদ্ভিদ
১। গর্ভাশয়	এদের গর্ভাশয় থাকে না।	এদের গর্ভাশয় থাকে।
২। ফল সৃষ্টি	গর্ভাশয় না থাকায় ফল উৎপন্ন হয় না।	গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়।
৩। বীজের অবস্থান	ফল হয় না বলে বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে।	ফল হয় তাই বীজ ফলের ভেতরে থাকে।
৪। আর্কিগোনিয়া	আর্কিগোনিয়া সৃষ্টি হয়।	আর্কিগোনিয়া সৃষ্টি হয় না।
৫। পরাগায়ন	পরাগরেণু সরাসরি ডিম্বক রন্ধ্রে পতিত হয়।	পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়।
৬। নিষেক	সাধারণত দ্বি-নিষেক হয় না।	দ্বি-নিষেক হয়।
৭। এন্ডোস্পার্ম (সস্য)	এন্ডোস্পার্ম হ্যাপ্লয়েড। নিষেকের পূর্বে উৎপন্ন হয়।	এন্ডোস্পার্ম ট্রিপ্লয়েড। নিষেকের পরে উৎপন্ন হয়।
৮। ফ্লোয়েম ও পরিবহন টিস্যু	জাইলেমে সুগঠিত ভেসেল কোষ এবং ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ নেই।	জাইলেমে সুগঠিত ভেসেল কোষ এবং ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ থাকে।

Scanned by CamScanner

আবৃতবীজী উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রায় ২,৮৭,০০০টি প্রজাতির মধ্যে মাত্র ১,০০০টি প্রজাতির গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে ১০০টি প্রজাতির (যেমন-খাদ্য, কাঠ, বস্ত্র ও ওষুধের জন্য) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়ে থাকে। আর ১৫টি প্রজাতি বিশ্বব্যাপি মানুষের প্রধান খাদ্যের জোগান দেয়। যেমন-ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বার্লি, আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভা প্রভৃতি। এছাড়া শতাধিক উদ্ভিদ থেকে অন্তত ১২০ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের গোত্র পরিচিতি : পৃথিবীর সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদকে প্রধানত দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যথা-১। ম্যাগনোলিয়া শ্রেণি (Magnoliopsida) বা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং ২। লিলি শ্রেণি (Liliopsida) বা একবীজপত্রী উদ্ভিদ। প্রতিটি শ্রেণিকে পুনরায় একাধিক উপশ্রেণি, বর্গ এবং গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। ড. আর্থার ক্রনকুইস্ট (১৯৮১) সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদকে ৩৮০টি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ গোত্র ৩১৫টি এবং একবীজপত্রী উদ্ভিদ গোত্র ৬৫টি।

প্রতিটি গোত্রের রয়েছে কতিপয় শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই প্রতিটি গোত্রের পরিচিতি লাভ করা যায়। উদ্ভিদের স্বরূপ, মূল, কাণ্ড, পাতা, মঞ্জরী, ফুল, ফল এবং বীজ এর প্রতিটিতে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। কাজেই গোত্র পরিচিতি লাভের আগে দরকার গোত্র পরিচিতির জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় বিশেষ অর্থবোধক শব্দ সমূহে পরিচিত হওয়া। নিচে সংক্ষিপ্ত উপায়ে কতিপয় বিশেষ অর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

স্বরূপ (Habitat)

বীরুৎ (Herb) : ছোট ও নরম কাণ্ডবিশিষ্ট অকাষ্ঠল উদ্ভিদ, যেমন- ধান, গম ও দুর্বাঘাস। বীরুৎ বর্ষজীবী থেকে বহুবর্ষজীবী।

উপগুল্ম (Under shrub) : গুল্মের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির উদ্ভিদ, যেমন- কালকাসুন্দা, দাঁতমর্দন।

গুল্ম (Shrub) : একক গুঁড়িবিহীন ঝোপজাতীয় মাঝারি ধরনের কাষ্ঠল উদ্ভিদ, যেমন- রঙ্গন, জবা ও গোলাপ। গুল্ম বহুবর্ষজীবী।

বৃক্ষ (Tree) : একক কাণ্ডবিশিষ্ট বৃহদাকৃতির কাষ্ঠল উদ্ভিদ, যেমন-আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি। বৃক্ষ বহুবর্ষজীবী।

পরাশ্রয়ী (Epiphytes) : যে উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদকে আশ্রয় করে জন্মে কিন্তু খাদ্য শোষণ করে না।

মৃতজীবী (Saprophytes) : যে উদ্ভিদ মৃত ও পচা জৈব পদার্থ হতে খাদ্য গ্রহণ করে।

পরজীবী (Parasites) : যে উদ্ভিদ অন্য সবুজ উদ্ভিদ হতে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে।

মূল (Root)

প্রধান মূল (Taproot) : ভ্রূণমূল হতে সৃষ্ট প্রাথমিক মূল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যে মূলতন্ত্র গঠন করে তাই প্রধান মূল। প্রধানমূল দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। মূলা, গাজর, বীট ইত্যাদি রূপান্তরিত প্রধান মূল। খাদ্য সঞ্চয় করে বলে এরা সঞ্চয়ী প্রধান মূল।

গুচ্ছমূল (Fibrous root) : কাণ্ডের নিম্নাংশ হতে সৃষ্ট একগুচ্ছ সরু মূলকে গুচ্ছমূল বলে। গুচ্ছমূল একবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

কাণ্ড (Stem)

কাণ্ড সাধারণত নিরেট, দণ্ডাকার ও বায়বীয় হয়ে থাকে। এতে পর্ব (যেখান থেকে পাতা গজায়) ও মধ্যপর্ব (দুই পর্বের মধ্যবর্তী অংশ) থাকে। কাণ্ড কণ্টকিত হতে পারে, রোমযুক্ত হতে পারে বা মসৃণ হতে পারে। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

ফাঁপা কাণ্ড (Fistular stem) : কাণ্ড কখনো নিরেট না হয়ে মধ্যপর্ব ফাঁপা হয়। ঘাস গোত্রের (Poaceae) উদ্ভিদে এরূপ কাণ্ড দেখা যায়। এছাড়া Cyperaceae গোত্রের উদ্ভিদকাণ্ড তিন কোণবিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং Lamiaceae গোত্রের উদ্ভিদকাণ্ড চার কোণবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

রাইজোম (Rhizome) : রাইজোম হলো ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড। আদা, হলুদ এগুলো ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড (এগুলো মূল নয়)।

Scanned by CamScanner

টিউবার (Tuber) : কান্ডের ভূ-নিম্নস্থ শাখার মাথার স্ফীত অংশকে টিউবার বলে। আলু (potato) টিউবার কান্ডের উদাহরণ। মিষ্টি আলু মূলের স্ফীত অংশ, কাণ্ড নয়।

বাল্ব (Bulb) : ভূ-নিম্নস্থ অতি সংক্ষিপ্ত রূপান্তরিত কাণ্ড হলো বাল্ব। যেমন- পেঁয়াজ, রসুন জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড।

পাতা (Leaf)

কান্ডের পর্ব হতে পাতা উৎপন্ন হয়। পাতা বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হতে পারে। প্রতি পর্বে ১টি, ২টি বা তার অধিক পাতা থাকতে পারে। একটি আদর্শ পাতার তিনটি অংশ থাকে। যেমন- পত্রমূল (base), পত্রবৃন্ত (petiole) ও পত্রফলক (lamina)। পাতা বোঁটাযুক্ত বা বোঁটাবিহীন হতে পারে, উপপত্রযুক্ত বা উপপত্রবিহীন হতে পারে। একটি পাতায় একটি বা একাধিক পত্রফলক থাকতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্য গোত্র, গণ ও প্রজাতি শনাক্তকরণে কাজে আসে।

পিটিওল (petiole) বা পত্রবৃন্ত/বোঁটা : পাতার বোঁটাই পিটিওল। পাতায় বোঁটা থাকলে তাকে পিটিওলেট (Petiolate) বা বৃন্তযুক্ত পাতা বলা হয়; বোঁটা না থাকলে তাকে সেসাইল (sessile) বা বৃন্তহীন পাতা বলা হয়। অধিকাংশ পাতায় বোঁটা থাকে।

ল্যামিনা (Lamina or leaf blade) বা পত্রফলক : বোঁটার মাথায় চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত সবুজ অংশই ল্যামিনা বা পত্রফলক। পত্রফলকই পাতার প্রধান অংশ।

স্টিপিউল (Stipule) বা উপপত্র : কোনো কোনো পাতার বোঁটার গোড়ায় দুই পাশে পত্র সদৃশ ক্ষুদ্রাকার উপাঙ্গ সৃষ্টি হয়, এই উপাঙ্গকে স্টিপিউল বা উপপত্র বলা হয়।

মুক্তপার্শ্বীয় উপপত্র (Free lateral stipules) : উপপত্র দুটি যখন পত্রমূলের দুপাশে মুক্ত অবস্থায় থাকে।

সিম্পল লিফ (Simple leaf) বা সরল পত্র : পাতায় একটি মাত্র পত্রফলক থাকলে তাকে সিম্পল লিফ বা সরল পত্র বলা হয়। জবা, আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা সরল পত্রের উদাহরণ।

কম্পাউন্ড লিফ (Compound leaf) বা যৌগিক পত্র : একটি পাতায় একাধিক পত্রফলক থাকলে তাকে যৌগিক পত্র বলা হয়। গোলাপ, নিম, লজ্জাবতি, সজিনা, কামিনী প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা যৌগিক। যৌগিক পত্রের প্রতিটি ফলককে পত্রক (leaflet) বলা হয়। অর্থাৎ একাধিক পত্রক নিয়ে এক একটি যৌগিক পত্র গঠিত।

অচূড়পক্ষল যৌগিক পত্র (Paripinnate compound leaf) : র‍্যাকিসের চূড়ায় যদি কোনো পত্রক না থাকে অর্থাৎ পত্রকগুলো জোড় সংখ্যায় থাকে তবে তাকে অচূড়পক্ষল যৌগিক পত্র বলে। যেমন- বাঁদর লাঠি।

সচূড়পক্ষল যৌগিক পত্র (Imparipinnate compound leaf) : র‍্যাকিসের চূড়ায় যখন একটি বিজোড় পত্রক থাকে তখন তাকে সচূড়পক্ষল যৌগিক পত্র বলে। যেমন- গোলাপ।

দ্বিপক্ষল যৌগিক পত্র (Bipinnate compound leaf) : এ ক্ষেত্রে র‍্যাকিসের পাশ হতে শাখা বের হয় এবং পত্রকগুলো শাখার দুই পাশে সাজানো থাকে। যেমন- কৃষ্ণচূড়া।

ত্রিপক্ষল যৌগিক পত্র (Tripinnate compound leaf) : এ ক্ষেত্রে র‍্যাকিসের শাখা হতে প্রশাখা বের হয় এবং প্রশাখার দুই পাশে পত্রকগুলো সংযুক্ত থাকে। যেমন- সজিনা।

চিত্র ৭.৪ : সরল পত্র ও যৌগিক পত্র এবং পাতার জালিকা ও সমান্তরাল শিরাবিন্যাস।

Scanned by CamScanner

ফলকের আকৃতি (Shape of lamina) : পত্রফলক লম্বা, বল্লমাকার, ডিম্বাকার, হৃৎপিণ্ডাকার, বৃত্তাকার, উপবৃত্তা… ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের হতে পারে।

পত্রফলকের ভিনেশন (venation) বা শিরাবিন্যাস : পত্রফলকে মধ্যশিরা (অথবা একাধিক প্রধান শিরা), শি… উপশিরা থাকে। ফলকের শিরাবিন্যাস উদ্ভিদ শনাক্তকরণে কাজে লাগে। যে নির্দিষ্ট রীতিতে শিরা-উপশিরাগুলো পত্রফ… বিন্যস্ত থাকে তাকে শিরাবিন্যাস বলে। শিরাবিন্যাস দু'ধরনের :

১। **রেটিকুলেট ভিনেশন (Reticulate venation) বা জালিকা শিরাবিন্যাস :** পাতার শিরা-উপশিরা ও এদের শা… প্রশাখাগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি জালের মতো সৃষ্টি করলে তাকে জালিকা শিরাবিন্যাস বলা হয়। জালিকা শিরাবি… দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।

২। **প্যারালেল ভিনেশন (Parallel venation) বা সমান্তরাল শিরাবিন্যাস :** পাতার শিরাগুলো পরস্পর যুক্ত না হ… সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকলে তাকে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বলা হয়। সমান্তরাল শিরাবিন্যাস একবীজপত্রী উদ্ভিদে… বৈশিষ্ট্য।

ফাইলোট্যাক্সি (Phyllotaxy) বা পত্রবিন্যাস : কাণ্ডে পাতা একান্তর (প্রতি পর্বে একটি করে), প্রতিমুখ (প্রতি পর্বে দু… করে) বা আবর্তক (প্রতি পর্বে দুইয়ের অধিক করে) ভাবে বিন্যস্ত থাকতে পারে।

পুষ্পবিন্যাস বা পুষ্পমঞ্জরী (Inflorescence) : কাণ্ডের শীর্ষ মুকুল অথবা কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন শাখা… শাখাতন্ত্রের উপর পুষ্পের বিন্যাস পদ্ধতিকে পুষ্পমঞ্জরী বলে। পুষ্পমঞ্জরী প্রধানত দু'ধরনের; যেমন- রেসিমোস ও সাইমোস।

১। **রেসিমোস (Racemose) :** অনিয়ত বর্ধনশীল (অর্থাৎ ক্রমশ বাড়তে থাকে) মঞ্জরীদণ্ডযুক্ত পুষ্পমঞ্জরী। রেসিমো… পুষ্পমঞ্জরী বিভিন্ন ধরনের হয়।

রেসিম (Raceme) : মঞ্জরীদণ্ড লম্বা ও অনিয়তভাবে বর্ধনশীল। বৃন্তযুক্ত পুষ্প অগ্রোন্মুখভাবে (উপরের দিকে ক্রম… কনিষ্ঠ) উৎপন্ন হয়। যেমন- সরিষা।

স্পাইক (Spike) : প্রলম্বিত ও অনিয়তভাবে বর্ধিত মঞ্জরীদণ্ডে অবৃন্তক পুষ্প উৎপন্ন হয়। যেমন- রজনীগন্ধা।

স্পাইকলেট (Spikelet) : ছোট প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত স্পাইক। মঞ্জরীদণ্ড সংক্ষিপ্ত হয় এবং গোড়ার দিকে দুটি বর্মাকা… অপুষ্পক গুম (empty glume), উপরে একটি সপুষ্পক গুম (flowering glume) বা লেমা (lemma) থাকে। এর উপ… বিপরীত দিকে অবস্থান করে একটি প্যালিয়া (palea)। প্যালিয়ার উপরে পুষ্প থাকে। যেমন- ধান, গম, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদের মঞ্জরী।

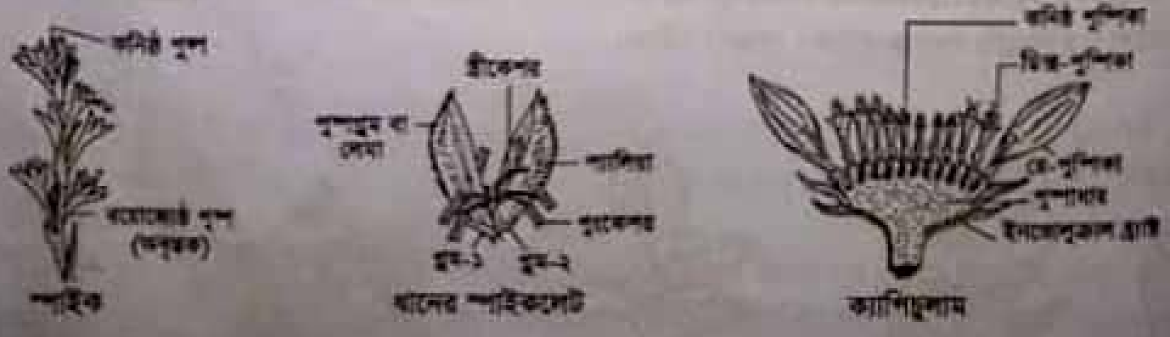

চিত্র ৭.৫ : বিভিন্ন প্রকার মঞ্জরী।

ক্যাপিচুলাম (Capitulum) বা শিরমঞ্জরী (Head) : মঞ্জরীদণ্ড প্রলম্বিত না হয়ে স্থূল, স্ফীত ও প্রশস্ত হয়ে উত্… পুষ্পাধারে (receptacle) পরিণত হয়। পুষ্পাধারের উপর দু'ধরনের পুষ্পিকা (floret) যথা- কেন্দ্রে নলাকৃতি মধ্যপু…

Scanned by CamScanner

disc-florets) এবং তার বাইরে জিহ্বাকৃতি প্রান্তপুষ্পিকা (ray-florets) বিন্যস্ত থাকে। পুষ্পাধারের নিচে মঞ্জরীপত্র চক্রাকারে বিন্যস্ত হয়ে মঞ্জরীপত্রাবরণ (involucre) গঠন করে। যেমন- গাঁদা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

২। সাইমোস (Cymose) : নিয়ত বর্ধনশীল (অর্থাৎ শীর্ষমুকুলে বৃদ্ধি রহিত হয়ে যায়) মঞ্জরীদণ্ডযুক্ত পুষ্পমঞ্জরী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি মাত্র পুষ্প সৃষ্টির পর মঞ্জরীদণ্ডে আর কোনো পুষ্প হয় না। এরা সাধারণত একক পুষ্পবিশিষ্ট। অনেকে একেও সাইমোস মঞ্জরী বলে থাকেন, যেমন- জবা। জবা

ফুল সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শব্দাবলি

ব্র্যাক্ট (Bract) বা মঞ্জরীপত্র : যে ক্ষুদ্রাকৃতির পাতা বা পাতার ন্যায় অঙ্গের কক্ষে কোনো ফুল বা মঞ্জরী জন্মে তাকে ব্র্যাক্ট বা মঞ্জরীপত্র বলে। ব্র্যাক্ট-এর পরের স্তবকে ব্র্যাক্ট-এর ন্যায় অঙ্গ থাকলে তাকে **ব্র্যাক্টিওল** (bractiole) বা **উপমঞ্জরীপত্র** বলে। সব ফুলে ব্র্যাক্ট ও ব্র্যাক্টিওল থাকে না।

পুষ্পাক্ষ (Floral axis) : যে অক্ষের উপর পুষ্পের চারটি স্তবক সজ্জিত থাকে তাকে পুষ্পাক্ষ বলে।

পুষ্প স্তবক : সাধারণত চারটি স্তবক নিয়ে একটি পুষ্প গঠিত হয়।

১। **ক্যালিক্স (Calyx) বা বৃতি :** ফুলের বাইরের স্তবকটিকে (সাধারণত সবুজ) বলা হয় ক্যালিক্স বা বৃতি। ক্যালিক্স এর প্রতিটি সদস্যকে বলা হয় সেপাল (sepal) বা বৃত্যাংশ। ক্যালিক্সের বাইরে ক্যালিক্সের ন্যায় কোনো স্তবক থাকলে তাকে বলা হয় এপিক্যালিক্স (epicalyx) বা উপবৃতি। জবাতে উপবৃতি আছে।

২। **করোলা (Corolla) বা দলমণ্ডল :** বৃতির ভেতরের স্তবক (সাধারণত রঙিন থাকে) হলো করোলা বা দলমণ্ডল। এর প্রতিটি সদস্যকে বলা হয় পেটাল (petal) বা পাপড়ি।

এস্টিভেশন (Aestivation) বা পুষ্পপত্রবিন্যাস

মুকুলাবস্থায় বৃত্যাংশগুলো (অথবা পাপড়িগুলো) পরস্পরের সাথে কীভাবে বিন্যস্ত থাকে তাকে বলা হয় **এস্টিভেশন** বা **পুষ্পপত্রবিন্যাস**। এস্টিভেশন কয়েক প্রকার হতে পারে, যেমন-

ওপেন (Open) বা মুক্ত : এক্ষেত্রে বৃত্যাংশ বা পাপড়িসমূহ পরস্পর হতে বেশ দূরে দূরে অবস্থান করে, একটি অপরটির প্রান্তও স্পর্শ করে না তাকে **মুক্ত পুষ্পপত্রবিন্যাস** বলে। যেমন- গন্ধরাজের বৃতির এস্টিভেশন।

ভালভেট (Valvate) বা প্রান্তস্পর্শী : এ ক্ষেত্রে বৃত্যাংশগুলোর (বা পাপড়িগুলোর) একটির প্রান্ত আর একটির প্রান্তের কাছাকাছি থাকে। যেমন- জবা ফুলের বৃতির এস্টিভেশন, *Calotropis procera* (আকন্দ) ও বাবলা ফুলের এস্টিভেশন।

টুইস্টেড (Twisted) বা পাকানো : এক্ষেত্রে বৃত্যাংশগুলোর (বা পাপড়িগুলোর) একটির প্রান্ত অপরটির প্রান্তকে পরস্পর ঢেকে রাখে। যেমন- *Hibiscus rosa-sinensis* (জবা) ফুলের দলমণ্ডলের এস্টিভেশন।

ও টাই টু ক্লাই কাই ভে

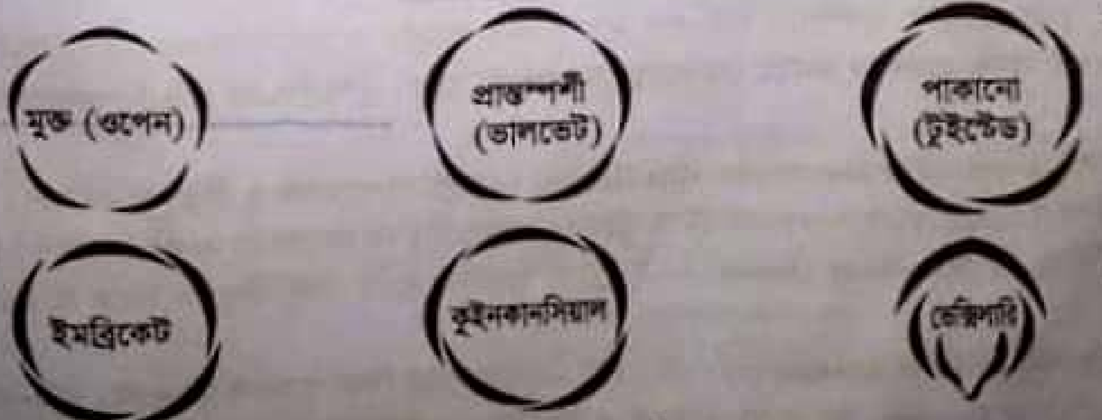

চিত্র ৭.৬ : বিভিন্ন প্রকার এস্টিভেশন।

Scanned by CamScanner

ইমব্রিকেট (Imbricate) : এক্ষেত্রে একটি বৃত্যাংশের (বা পাপড়ির) দুই প্রান্তই আবৃত থাকে এবং অপর একটি প্রান্তই অনাবৃত থাকে। যেমন- *Delonix regia* (কৃষ্ণচূড়া), *Cassia sophera* (কালকাসুন্দা) ফুলের এস্টিভেশন।

কুইনকানসিয়াল (Quincuncial) : যদি দুটি বৃত্যাংশ (বা পাপড়ি) ভেতরে এবং দুটি বাইরে থাকে তবে কুইনকানসিয়াল এস্টিভেশন বলে। *Psidium guajava* (পেয়ারা), *Brassica napus* (সরিষা) ফুলের এস্টিভেশন।

ভেক্সিলারি (Vexillary) : এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পাপড়ি (পাঁচটির মধ্যে) তার পাশের দুটির দুই প্রান্তকে ঢেকে রাখে এবং পাশের দুটি অপর দুটির দুই প্রান্তকে ঢেকে রাখে। প্রজাপতিসম ফুলে এরূপ দেখা যায়। *Pisum sativum* (মটরশুঁটি), *Lablab purpureus* (শিম) ফুলের এস্টিভেশন।

৩। অ্যানড্রিসিয়াম (Androecium) বা পুংস্তবক : দলমণ্ডলের ভেতরে অবস্থিত ফুলের তৃতীয় স্তবক হলো অ্যানড্রিসিয়াম বা পুংস্তবক। এর প্রতিটি সদস্যকে বলা হয় **স্ট্যামেন (stamen) বা পুংকেশর**। পুংকেশরের দণ্ডকে বলা হয় **ফিলামেন্ট** (filament) বা **পুংদণ্ড** এবং মাথার স্ফীত অংশকে বলা হয় **অ্যান্থার** (anther) বা **পরাগধানী**, পরাগধানীর ভেতরে থাকে **পোলেন গ্রেন** (pollen grain) বা পরাগরেণু।

সাধারণত ছয়টি পুংকেশরের মাঝে চারটি লম্বা এবং দুটি খাটো হলে তাকে **টেট্রাডিনেমাস** (tetradynamous) বলে। সাধারণত চারটি পুংকেশরের মাঝে দুটি লম্বা এবং দুটি খাটো হলে তাকে **ডাইডিনেমাস** (didynamous) বলে।

পরাগধানীর প্রকার

পাদলগ্ন (Basifixed) পরাগধানী : পরাগধানীর পাদদেশে পুংদণ্ড দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে।

পৃষ্ঠলগ্ন (Dorsifixed) পরাগধানী : পরাগধানীর পৃষ্ঠদেশের মধ্যবর্তী স্থানে পুংদণ্ড দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে।

পার্শ্বলগ্ন (Adnate) পরাগধানী : পরাগধানীর সমগ্র পৃষ্ঠদেশ বরাবর পুংদণ্ড দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে।

সর্বমুখ (Versatile) পরাগধানী : পুংদণ্ডের সরু অগ্রভাগ পরাগধানীর পৃষ্ঠদেশের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সূক্ষ্ম বিন্দুতে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, পরাগধানী মৃদু বাতাসে এদিক-সেদিক দুলতে পারে। যেমন- ধানের পরাগধানী।

রেখাকার (Linear) পরাগধানী : সরু ও লম্বা পরাগধানী।

বৃক্কাকার (Reniform) পরাগধানী : পরাগধানী দেখতে যখন বৃক্কের (kidney) মতো হয়। যেমন- জবার পরাগধানী।

দললগ্ন (Epipetalous) পুংকেশর : পুংকেশর পাপড়ির সাথে সংযুক্ত থাকে। যেমন- ধুতুরা, বেগুন ইত্যাদি ফুলে দেখা যায়।

৪। গাইনিসিয়াম (Gynoecium) বা স্ত্রীস্তবক : ফুলের সবচেয়ে ভেতরের স্তবক (চতুর্থ স্তবক) হলো গাইনিসিয়াম বা স্ত্রীস্তবক। এ স্তবকের প্রতিটি সদস্যকে বলা হয় কার্পেল (carpel), স্ত্রীকেশর বা গর্ভপত্র। কার্পেলের গোড়ায় স্ফীত অংশ হলো ওভারি (ovary), গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়; মাঝের সরু অংশ হলো স্টাইল (style) বা গর্ভদণ্ড এবং মাথাটি হলো স্টিগমা (stigma) বা গর্ভমুণ্ড। গর্ভাশয় অন্যান্য স্তবকের উপরে থাকলে তাকে অধিগর্ভ (superior) গর্ভাশয় বলে; আর গর্ভাশয় অন্যান্য স্তবকের নিচে থাকলে তাকে অধোগর্ভ (inferior) গর্ভাশয় বলে।

পেরিয়্যান্থ (Perianth) বা পুষ্পপুট : বৃতি এবং দলকে যখন আকৃতি ও বর্ণে পৃথক করা যায় না অর্থাৎ দেখতে একই রকম দেখায় তখন এদেরকে একত্রে পেরিয়্যান্থ বা পুষ্পপুট বলে। পুষ্পপুট-এর প্রতিটি সদস্যকে বলা হয় টেপাল (tepal)।

উভলিঙ্গ পুষ্প (Bisexual or Hermaphrodite flower) : যে পুষ্পে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক বিদ্যমান। যেমন- জবা।

একলিঙ্গ পুষ্প (Unisexual flower) : যে পুষ্পে পুংস্তবক অথবা স্ত্রীস্তবক যে কোনো একটি বিদ্যমান। যেমন- লাউ।

পুংপুষ্প (Male or Staminate flower) : যে পুষ্পে পুংস্তবক থাকে কিন্তু স্ত্রীস্তবক থাকে না। যেমন- লাউ-এর পুংপুষ্প।

স্ত্রীপুষ্প (Female or Pistillate flower) : যে পুষ্পে স্ত্রীস্তবক থাকে কিন্তু পুংস্তবক থাকে না। লাউ-এর স্ত্রীপুষ্প।

ক্লীবপুষ্প (Neuter flower) : যে পুষ্পে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকের কোনোটাই থাকে না। যেমন- বাগানের সৌন্দর্যবর্ধক কিছু উদ্ভিদ।

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ পুষ্প (Complete flower) : যে পুষ্পে চারটি স্তবকই বিদ্যমান। যেমন- জবা।

অসম্পূর্ণ পুষ্প (Incomplete flower) : যে পুষ্পে চারটি স্তবকের এক বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত থাকে। যেমন- লাউ।

সমাঙ্গ পুষ্প (Regular flower): যে পুষ্পে প্রতিটি স্তবকের অংশগুলো পরস্পর সম-আকার ও সম-আকৃতিবিশিষ্ট থাকে। যেমন- জবা।

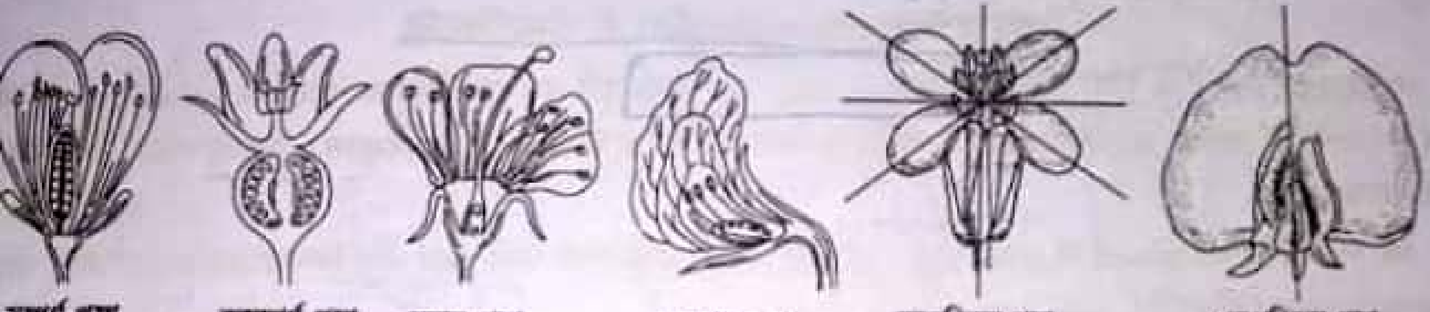

চিত্র ৭.৭ : বিভিন্ন প্রকার পুষ্প।

অসমাঙ্গ পুষ্প (Irregular flower) : যে পুষ্পে প্রতিটি স্তবকের অংশগুলো পরস্পর বিষম আকার ও আকৃতিবিশিষ্ট হয়। যেমন- মটরশুটি।

বহুপ্রতিসম পুষ্প (Actinomorphic flower) : যে পুষ্প খাড়াভাবে কেন্দ্র বরাবর কাটলে একবারের অধিক সমান দুটি অংশে বিভক্ত হয়। যেমন- সরিষা, জবা।

একপ্রতিসম পুষ্প (Zygomorphic flower) : যে পুষ্প খাড়াভাবে কেন্দ্র বরাবর কাটলে মাত্র একবার দুটি সমান অংশে বিভক্ত হয়। যেমন- শিম ও অপরাজিতা পুষ্প।

অপ্রতিসম পুষ্প (Asymmetrical flower) : যে পুষ্প খাড়াভাবে কেন্দ্র বরাবর কাটলে কখনোই দুটি সমান অংশে বিভক্ত করা যায় না। যেমন- কলাবতী ফুল।

সবৃন্তক পুষ্প (Pedicellate flower) : যে পুষ্পে বোঁটা থাকে।

অবৃন্তক পুষ্প (Sessile flower) : যে পুষ্পে বোঁটা থাকে না।

ত্র্যংশক (Trimerous) : যে পুষ্পের স্তবকের অংশগুলো তিন বা তিনের গুণিতক সংখ্যায় থাকে।

চতুর্থংশক (Tetramerous) : যে পুষ্পের স্তবকের অংশগুলো চার বা চারের গুণিতক সংখ্যায় থাকে।

পঞ্চমাংশক (Pentamerous) : যে পুষ্পের স্তবকের অংশগুলো পাঁচ বা পাঁচের গুণিতক সংখ্যায় থাকে।

গর্ভপাদ পুষ্প (Hypogynous) : পুষ্পাক্ষ উত্তল হয় এবং গর্ভাশয় এর কেন্দ্রে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে। পুষ্পের অবশিষ্ট তিনটি স্তবক ক্রমান্বয়ে গর্ভাশয়ের নিচে সজ্জিত থাকে। এরা হলো অধিগর্ভ গর্ভাশয় (superior ovary)। যেমন-সরিষা, জবা, ধান ফুল।

হাইপোগাইনাস (গর্ভপাদ) পুষ্প　　পেরিগাইনাস (গর্ভকটি) পুষ্প　　ইপিগাইনাস (গর্ভশীর্ষ) পুষ্প

Scanned by CamScanner

গর্ভকটি পুষ্প (Perigynous) : পুষ্পাক্ষ অবতল বা পেয়ালাকৃতি হয় এবং গর্ভাশয় এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। পুষ্পের অবশিষ্ট তিনটি স্তবক গর্ভাশয়কে ঘিরে ক্রমান্বয়ে পেয়ালার কিনারায় সজ্জিত থাকে। এরা হলো অর্ধ-ঊর্ধ্ব গর্ভাশয় (half superior ovary)। যেমন-শিম, গোলাপ ফুল।

গর্ভশীর্ষ পুষ্প (Epigynous) : পুষ্পাক্ষ প্রসারিত হয়ে পেয়ালাকৃতি ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ের পাদদেশে সংযুক্ত থাকে। পুষ্পের অবশিষ্ট তিনটি স্তবক গর্ভাশয়ের উপরে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। এরা হলো অধোগর্ভ গর্ভাশয় (inferior ovary)। যেমন-কুমড়া, পেয়ারা ফুল।

প্লাসেন্টেশন (Placentation) বা অমরাবিন্যাস

গর্ভাশয়ের ভেতরে যে টিস্যু থেকে ওভিউল (ovule) বা ডিম্বক সৃষ্টি হয় সে টিস্যুকে প্লাসেন্টা (placenta) বা অমরা বলে। গর্ভাশয়ের ভেতরে প্লাসেন্টার বিন্যাস পদ্ধতিকে বলা হয় প্লাসেন্টেশন বা অমরাবিন্যাস। অমরাবিন্যাস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে; যেমন-

(i) মার্জিনাল (marginal) বা একপ্রান্তীয় : এক্ষেত্রে একপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট গর্ভাশয়ের এক কিনার বরাবর প্লাসেন্টা থাকে। *Pisum sativum* (মটরশুটি), *Lablab purpureus* (শিম)।

(ii) অ্যাক্সাইল (axile) বা অক্ষীয় : এক্ষেত্রে গর্ভাশয় একাধিক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে এবং প্রতিটি কক্ষে মধ্যঅক্ষে প্লাসেন্টা থাকে। *Hibiscus rosa-sinensis* (জবা)।

চিত্র ৭.৮ : বিভিন্ন ধরনের অমরাবিন্যাস।

(iii) ফ্রি সেন্ট্রাল (free central) বা মুক্তমধ্য : এক্ষেত্রে গর্ভাশয়ে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে এবং মধ্যঅক্ষে প্লাসেন্টা থাকে। তুঁত, *Portulaca oleracea* (নুনিয়া শাক)।

(iv) প্যারাইটাল (paraietal) বা বহুপ্রান্তীয় : এক্ষেত্রে গর্ভাশয় এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয় এবং প্লাসেন্টাগুলো থাকে পরিধীয় দেয়ালে। *Cucumis sativus* (শশা), *Lagenaria vulgaris* (লাউ)।

(v) সুপারফিশিয়াল (superficial) বা গাত্রীয় : এক্ষেত্রে গর্ভাশয় একাধিক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট থাকে এবং প্লাসেন্টা এর প্রাচীরে থাকে। *Nymphaea nouchali* (শাপলা), *Nelumbo nucifera* (পদ্ম)।

(vi) বেসাল (basal) বা মূলীয় : এক্ষেত্রে গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয় এবং প্লাসেন্টা গর্ভাশয়ের গোড়ায় থাকে। *Tridax procumbens* (ত্রিধারা), *Helianthus annuus* (সূর্যমুখী), *Oryza sativa* (ধান)।

(vii) এ্যাপিক্যাল (apical) বা শীর্ষক : এক্ষেত্রে গর্ভাশয় একাধিক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয় এবং প্লাসেন্টা গর্ভাশয়ের শীর্ষে থাকে। *Coriandrum sativum* (ধনিয়া), *Euphorbia pulcherrima* (লাল পাতা)।

ফল (Fruits)

প্রকৃত ফল (True fruit) : গর্ভাশয় থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন- আম, জাম, লিচু।

অপ্রকৃত ফল (False fruit) : গর্ভাশয় ব্যতীত অন্য অংশ থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন- আপেল।

সরল ফল (Simple fruit) : একটি পুষ্প হতে একটি মাত্র ফল উৎপন্ন হয়। যেমন- আম।

Scanned by CamScanner

গুচ্ছিত ফল (Aggregate fruit) : একটি মাত্র পুষ্পের মুক্ত গর্ভাশয়গুলো হতে একগুচ্ছ ফল উৎপন্ন হয়। যেমন- আতা।

যৌগিক ফল (Multiple fruit) : সমগ্র পুষ্পমঞ্জরী হতে একটি মাত্র ফল উৎপন্ন হয়। যেমন- কাঁঠাল।

লিগিউম (Legume) : ফল উপর থেকে নিচে দুটি কপাটে বিদীর্ণ হয়।

ক্যাপসিউল (Capsule) : ফল উপর থেকে নিচে বহু কপাটে বিদীর্ণ হয়। যেমন- ধুতুরা, ঢেঁড়স, পাট

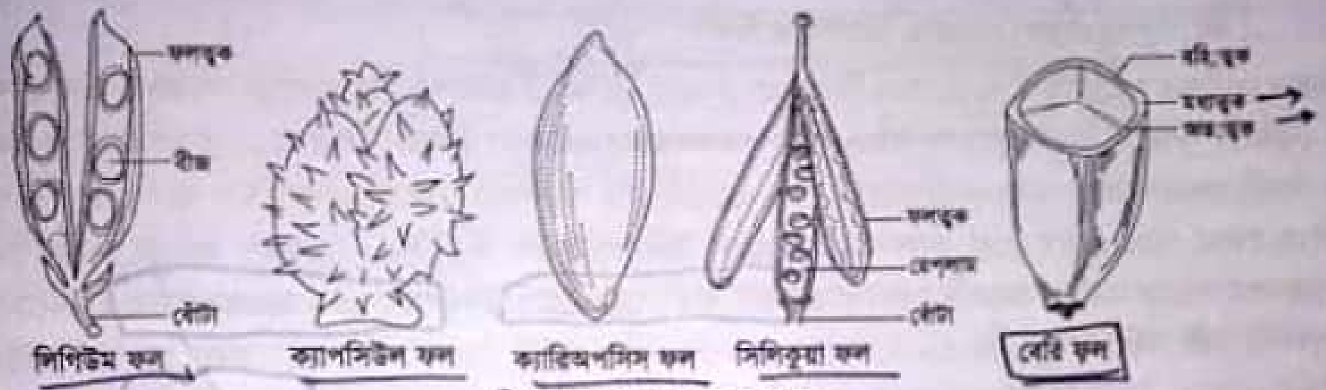

চিত্র ৭.৯ : কয়েক প্রকার ফল।

ক্যারিঅপসিস (Caryopsis) : ফল এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট এবং একটি মাত্র বীজযুক্ত। ফলত্বক ও বীজত্বক পরস্পর সংলগ্ন থাকে। যেমন- ধান।

সিলিকুয়া (Siliqua) : শুষ্ক বিদারী ফল যা পরিপক্ব হলে নিচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ ফেটে যায়। এই ফল লম্বা ও নলাকার হয়। যেমন- সরিষা।

বেরি (Berry) : ফল এক বা একাধিক গর্ভপত্রী এবং বহুবীজী। অন্তত্বক ও মধ্যত্বক সংযুক্ত থাকে। যেমন- কলা, টমেটো।

সাইজোকার্প (Schizocarp) : শুষ্ক অবিদারী ফল। যেমন- ধনে।

সরোসিস (Sorosis) : স্পাইক, স্প্যাডিক্স মঞ্জরীটি একটি রসালো যৌগিক ফলে পরিণত হয়। যেমন- কাঁঠাল, আনারস।

পুষ্প সংকেত (Floral Formula)

পুষ্পের লিঙ্গ, বিভিন্ন স্তবক, প্রত্যেক স্তবকের সদস্যসংখ্যা ও অবস্থান, তাদের সম ও অসম সংযুক্তি, মঞ্জরীপত্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি প্রভৃতি তথ্য যে সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প সংকেত (floral formula) বলে।

পুষ্প সংকেতে ব্যবহৃত বর্ণমালা

পুষ্পের অংশ	ইংরেজি বর্ণমালা	বাংলা বর্ণমালা
মঞ্জরীপত্রের জন্য (for bract)	Br. or B.	মপ.
উপমঞ্জরীপত্রের জন্য (for bracteole)	Brl. or b	উমপ.
উপবৃতির জন্য (for epicalyx)	Ek	উবৃ.
বৃতির জন্য (for calyx)	K	বৃ
দলের জন্য (for corolla)	C	দ
পুষ্পপুটের জন্য (for perianth)	P	পু
পুংস্তবকের জন্য (for androecium)	A	পুং
স্ত্রীস্তবকের জন্য (for gynoecium)	G	স্ত্রী

Scanned by CamScanner

পুষ্প সংকেতে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ :

একপ্রতিসম পুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন	†	বা	%
বহুপ্রতিসম পুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন	⊕		
পুংপুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন	♂		
স্ত্রীপুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন	♀		
উভলিঙ্গ পুষ্পের জন্য সাংকেতিক চিহ্ন	⚥	বা	☿
বহু সংখ্যা (অনেক) বোঝাতে সাংকেতিক চিহ্ন	α		

অসমসংযোগ	⌒
সমসংযোগ	( )
অধিগর্ভ	$\underline{\text{গ}}$
অধোগর্ভ	$\overline{\text{গ}}$

কোনো স্তবকের সাংকেতিক বর্ণের পরে যে সংখ্যা দেওয়া হয় তা ঐ স্তবকের সদস্যসংখ্যা বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ ব_5 লিখলে বোঝাবে বৃতিতে পাঁচটি বৃত্যংশ আছে এবং বৃত্যংশগুলো পৃথক বা বিযুক্ত; কিন্তু $\text{ব}_{(৫)}$ এরূপ লিখলে বোঝা যাবে বৃতিতে পাঁচটি বৃত্যাংশ আছে এবং বৃত্যাংশগুলো যুক্ত। কোনো দুটি বা তিনটি স্তবকের সংকেতিক বর্ণের উপরে একটি লম্বা রেখা দিলে বোঝা যাবে এদের মধ্যে অসমসংযুক্তি আছে। উদাহরণস্বরূপ $\overline{\text{দ}_{(৫)}\ \text{পুং}_{(৫)}}$ এরূপ লিখলে বোঝা যাবে দলের সাথে পুংকেশর সংযুক্ত আছে। কাজেই দেখা যায় বন্ধনী দ্বারা সমসংযোগ এবং রেখা দ্বারা অসমসংযোগ বোঝানো হয়। এ ছাড়া গর্ভাশয় যদি অধিগর্ভ (superior) হয় তবে 'গ'-এর নিচে একটি রেখা দেয়া হয়, যেমন $\underline{\text{গ}}$; আর গর্ভাশয় যদি অধোগর্ভ (inferior) হয় তবে 'গ'-এর উপর রেখা দেয়া হয়; যেমন $\overline{\text{গ}}$। যখন গর্ভাশয়টি অর্ধ-অধোগর্ভ হয় তখন 'গ' এর ডান পাশে টান দিতে হয়, যেমন গ–।

পুষ্প সংকেত লিখার পদ্ধতি

পুষ্প সংকেত লিখতে পর্যায়ক্রমে (i) প্রথমে মঞ্জরীপত্রের বর্ণমালা, (ii) তারপরে উপমঞ্জরীপত্রের বর্ণমালা, (iii) পরে একপ্রতিসম কি বহুপ্রতিসম এই সংকেত, (iv) পরে একলিঙ্গ কি উভলিঙ্গ এই সংকেত, (v) উপবৃতির সাংকেতিক বর্ণ ও উপবৃত্যাংশের সংখ্যা, (vi) তারপরে বৃতির সাংকেতিক বর্ণ ও বৃত্যাংশের সংখ্যা (সংযুক্ত হলে বন্ধনীসহ), (vii) তারপরে দলের সাংকেতিক বর্ণ ও পাপড়ির সংখ্যা (সংযুক্ত হলে বন্ধনীতে), (viii) তারপরে পুংস্তবকের সাংকেতিক বর্ণ ও পুংকেশরের সংখ্যা (সংযুক্ত হলে বন্ধনীতে এবং দলের সাথে সংযুক্ত থাকলে উভয়ের সাংকেতিক বর্ণমালার উপর রেখা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে) এবং (ix) সর্বশেষে স্ত্রীস্তবকের সাংকেতিক বর্ণ ও গর্ভপত্রের সংখ্যা (সংযুক্ত থাকলে বন্ধনীর মধ্যে এবং অধিগর্ভ থাকলে নিচে রেখা ও অধোগর্ভ থাকলে উপরে রেখা দিতে হবে)। বৃতি, দল, পুংস্তবক অথবা স্ত্রীস্তবকের কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে সাধারণত সেই স্তবকের সংকেত লিখে '0' (শূন্য) লিখা হয়।

যেমন– $K_5\ C_5\ A_0\ G_3$ অর্থাৎ পুষ্পটি স্ত্রীপুষ্প (এখানে পুংস্তবক অনুপস্থিত অর্থাৎ কোনো পুংকেশর নেই)।

পুষ্প প্রতীক (Floral Diagram)

যে প্রতীকের সাহায্যে একটি পুষ্পের মাতৃঅক্ষের (mother axis) তুলনায় এর বিভিন্ন স্তবকের পুষ্পপত্রগুলোর অবস্থান, সংখ্যা, সমসংযোগ, অসমসংযোগ, পুষ্পপত্রবিন্যাস, অমরাবিন্যাস প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয় তাকে পুষ্প প্রতীক বলে। পুষ্প প্রতীক মোটামুটিভাবে বৃত্তাকার দেখানো হয়। বৃত্তের উপরে মাতৃঅক্ষ একটি বিন্দুর আকারে দেখানো হয় এবং বৃত্তের নিচে মঞ্জরীপত্র (যদি থাকে) দেখানো হয়। বৃত্তের বাইরের স্তবকে বৃত্যংশ ও এর পুষ্পপত্রবিন্যাস দেখানো হয়; দ্বিতীয় স্তবকে পাপড়ি ও এর পুষ্পপত্রবিন্যাস দেখানো হয়; তৃতীয় স্তবকে পুংকেশর, এর সংখ্যা, সম বা অসমসংযুক্তি দেখানো হয় এবং মধ্যখানে গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ তথা অমরাবিন্যাস দেখানো হয়। উপবৃতি থাকলে বৃতির স্তবকের বাইরে আর একটি স্তবকে দেখানো হয়।

চিত্র ৭.১০ : মাতৃঅক্ষ পরিচিতি।

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন স্তবকের সদস্যদের মধ্যে অসমসংযোগ ক্ষুদ্র সংযোগ রেখা দিয়ে দেখানো হয়। একই স্তবকের সদস্যদের মধ্যকার সমসংযোগ তাদের প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে দেখানো হয়।

মাতৃঅক্ষ পরিচিতি : যে অক্ষ (axis) হতে পুষ্পের সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃঅক্ষ বলে। পুষ্পের মাতৃঅক্ষের দিকের অংশ হলো পশ্চাৎ অংশ এবং তার বিপরীত অংশ অর্থাৎ মঞ্জরীপত্রের দিকের অংশ হলো পুষ্পের সম্মুখ অংশ। মাতৃঅক্ষ সঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারলে সঠিক পুষ্প প্রতীক অঙ্কন করা সম্ভব নয়। এখানে চিত্রের সাহায্যে একটি *Crotalaria retusa* (অতসী) পুষ্পের মাতৃঅক্ষ ও পুষ্পের অগ্র–পশ্চাৎ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৭.১১ : জবা ফুলের পুষ্প প্রতীক (গোত্র Malvaceae)

জবা ফুলের পুষ্প প্রতীকের ব্যাখ্যা : উপবৃতিতে উপবৃত্যংশ ৫টি, মুক্ত, বৃতিতে বৃত্যংশ ৫টি, সংযুক্ত, পুষ্পপত্রবিন্যাস ভালভেট; দলমণ্ডলে পাপড়ি ৫টি, মুক্ত, পুংনলের সাথে যুক্ত, পুষ্পপত্রবিন্যাস টুইস্টেড; পুংস্তবকে পুংকেশর বহু, একগুচ্ছক, সকল পুংদণ্ড একক নলে যুক্ত, পরাগধানী মুক্ত; স্ত্রীস্তবকে গর্ভপত্র ৫টি, সংযুক্ত, গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, অমরাবিন্যাস অক্ষীয়। পুষ্প প্রতীক থেকে প্রতীয়মান হয় ফুলটি বহুপ্রতিসম এবং উভলিঙ্গ।

কয়েকটি পুষ্প সংকেতের ব্যাখ্যা

১। জবা (গোত্র : **Malvaceae**)

পুষ্প সংকেত : $\oplus$ ⚥ $উবৃ_৫\ বৃ_{(৫)}\ \overline{দ_৫\ পুং_{(\alpha)}}\ \underline{গ}_{(৫)}$ $[\oplus$ ⚥ $Ek_5\ K_{(5)}\ \overline{C_5\ A_{(\alpha)}}\ \underline{G}_{(5)}]$

ব্যাখ্যা: মঞ্জরীপত্র ও উপমঞ্জরীপত্র নেই। পুষ্পটি বহুপ্রতিসম ও উভলিঙ্গ। ৫টি মুক্ত উপবৃতি আছে; বৃত্যাংশ ৫টি, সংযুক্ত; পাপড়ি ৫টি, মুক্ত; পুংকেশর অসংখ্য, সংযুক্ত, একগুচ্ছক এবং দললগ্ন; গর্ভপত্র ৫টি, সংযুক্ত এবং গর্ভাশয় অধিগর্ভ।

২। ধান (গোত্র : **Poaceae**)

পুষ্প সংকেত : মপ.উমপ † ⚥ $পু_২\ পুং_{৩+৩}\ \underline{গ}_১$ $[Br.\ Brl$ † ⚥ $P_2\ A_{3+3}\ \underline{G}_1]$

ব্যাখ্যা : মঞ্জরী ও উপমঞ্জরীপত্র উপস্থিত। পুষ্পটি একপ্রতিসম ও উভলিঙ্গ। টেপাল ২টি, মুক্ত; পুংকেশর ৬টি, মুক্ত, দুই বৃত্তে সজ্জিত; গর্ভপত্র ১টি, মুক্ত এবং গর্ভাশয় অধিগর্ভ।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের গোত্র পরিচিতি

যে সব আবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে তাদেরকে বলা হয় **একবীজপত্রী উদ্ভিদ**। ধান, গম, ভুট্টা, আখ, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদের কতিপয় উদাহরণ।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের শনাক্তকারী কতিপয় বৈশিষ্ট্য

১। বীজে বীজপত্র একটি।

২। মূল গুচ্ছমূল।

৩। পাতার শিরাবিন্যাস সাধারণত সমান্তরাল।

৪। পুষ্পে পুষ্পপত্রের সংখ্যা ৩ বা এর গুণিতক (৩টি, ৬টি বা ৯টি) অর্থাৎ পুষ্প ট্রাইমেরাস।

৫। বীজপত্রের অবস্থান শীর্ষ এবং ভ্রূণ মুকুল পার্শ্বীয়।

ড. আর্থার ক্রনকুইস্ট (১৯৮১) পৃথিবীর সকল জানা একবীজপত্রী উদ্ভিদকে ৬৫টি গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আদি-উন্নত ধারা অনুযায়ী প্রথম গোত্র Butomaceae এবং সর্বশেষ গোত্র Orchidaceae. **Poaceae** গোত্রের অবস্থান ৩৪ তম।

Scanned by CamScanner

গোত্র Poaceae (পূর্বনাম Gramineae) (ঘাস গোত্র বা Grass Family)

শ্রেণিবিন্যাস
Division : Magnoliophyta
Class : Liliopsida
Subclass : Commelinidae
Order : Cyperales
Family : Poaceae (Gramineae)

প্রজাতির সংখ্যা ও বিস্তৃতি : প্রায় ৫০০ গণ এবং ৮০০০ প্রজাতি নিয়ে ঘাস গোত্র গঠিত। এ গোত্রের উদ্ভিদ পৃথিবীর সব ধরনের অবস্থানে পাওয়া গেলেও অধিক পাওয়া যায় উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এবং উত্তর-নাতিশীতোষ্ণ মৃদু শুষ্ক অঞ্চলে। বাংলাদেশে এই গোত্রের ১১৩টি গণ এবং ২৮৫টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে।

টাইপ জিনাস *Poa* থেকে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে Poaceae

চিত্র ৭.১২ : পত্রের লিগিউল দেখানো হয়েছে।

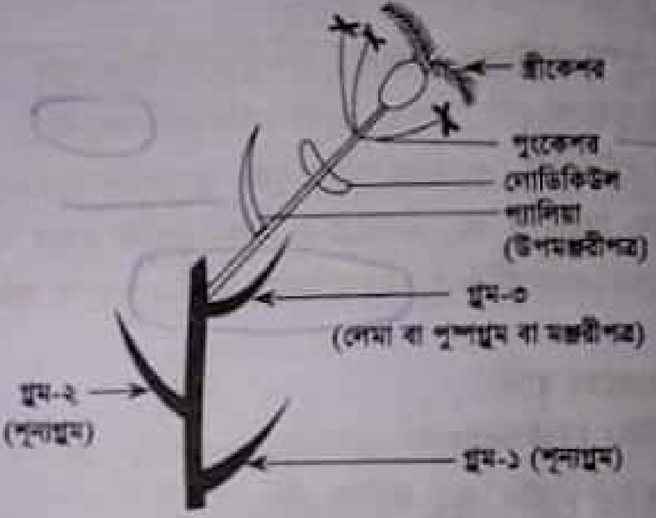

চিত্র ৭.১৩ : একটি স্পাইকলেটের ডায়াগ্রামেটিক চিত্র।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। কাণ্ড সাধারণত নলাকার, মধ্যপর্ব ফাঁপা।
২। পত্রমূল কাণ্ডবেষ্টক এবং পাতা লিগিউলবিশিষ্ট।
৩। পুষ্পবিন্যাস (মঞ্জরী) স্পাইকলেট (spikelet)।
৪। পরাগধানী সর্বমুখ (versatile)।
৫। গর্ভমুণ্ড পালকের ন্যায়।
৬। অমরাবিন্যাস মূলীয় (basal)
৭। ফল ক্যারিঅপসিস (caryopsis)।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

স্বভাব (Habit) : বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, কতক বৃক্ষবৎ, যেমন- বাঁশ।

মূল (Root) : গুচ্ছমূল।

কাণ্ড (Stem) : নলাকার, অধিকাংশ গণে মধ্যপর্ব ফাঁপা (এ ধরনের কাণ্ডকে সাধারণত culm বলা হয়)। *Sacchar...* ও *Zea* (ইক্ষু এবং ভুট্টা গণ) গণদ্বয়ে কাণ্ড তেমন ফাঁপা থাকে না।

পাতা (Leaves) : সরল, একান্তর, সাধারণত দুই সারিতে বিন্যস্ত, লিগিউলবিশিষ্ট; *Echinochloa* গণে লিগি... নেই। প্রতিটি পাতা সাধারণত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা- গোড়াতে সীথ (sheath, যা সাধারণত কাণ্ডবেষ্টক), প... পত্রফলক (blade) এবং লিগিউল (ligule)। লিগিউল হলো লিফসীথের মাথা এবং পত্রফলকের সংযোগস্থলে অব... একটি উপবৃদ্ধি।

পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence) : স্পাইকলেট (spikelet)। একটি স্পাইকলেটে এক বা একাধিক পুষ্প থা... পারে। একটি এক পুষ্পক স্পাইকলেটে গোড়ায় ২টি শুকনা গ্লুম (glumes) থাকে যাদেরকে বলা হয় শূন্য গ্লুম... এদের কক্ষে কোনো পুষ্প থাকে না; এর উপরে আরো ২টি গ্লুম থাকে যার ১ম টিকে বলা হয় লেমা (lemma, Gk. le... = a husk, তুষ) বা পুষ্প গ্লুম এবং উপরেরটিকে বলা হয় প্যালিয়া (palea, L. *palea* = chaff, তুষ)। লেমাকে ... মঞ্জরীপত্র এবং প্যালিয়াকে ব্র্যাকটিওল বা উপ-মঞ্জরীপত্রের সাথে তুলনা করা যায়। লেমার বিপরীতে প্যালিয়া অ... প্যালিয়ামধ্য পুষ্পটি লেমার কক্ষে অবস্থিত; আর পুষ্পটি প্যালিয়ার কক্ষে অবস্থিত।

Scanned by CamScanner

পুষ্প (Flower) : ঘাস গোত্রের পুষ্পকে সাধারণত পুষ্পিকা (floret) বলা হয়। পুষ্পিকা উভলিঙ্গ বা একলিঙ্গ হতে পারে। ভুট্টা উদ্ভিদে এক লিঙ্গ এবং ভিন্নবাসী (স্ত্রী এবং পুরুষ পুষ্প আলাদা গাছে), জিজানিয়াতে এক লিঙ্গ, সহবাসী (একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ পুষ্প থাকে)।

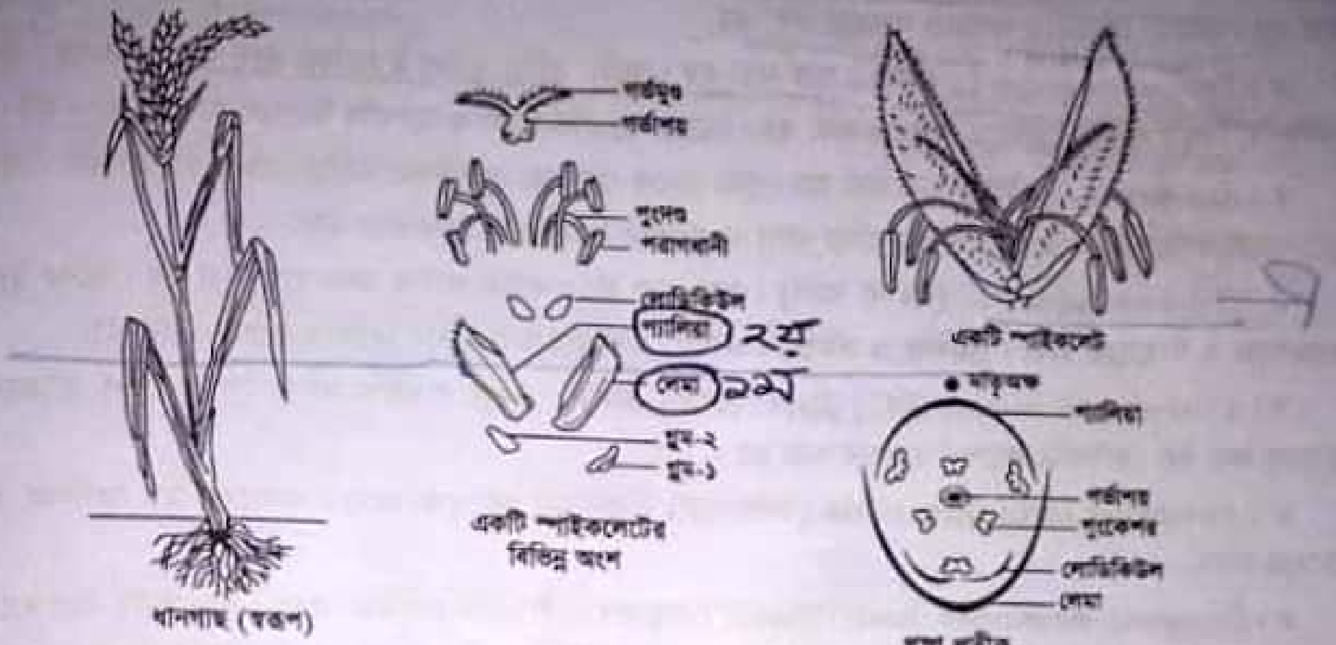

বি. দ্র. এখানে পুষ্পের প্রতীক অঙ্কিত হলো। স্পাইকলেটের প্রতীক অঙ্কন করতে হলে শূন্যতুষ - ১ এবং শূন্যতুষ - ২ যুক্ত করতে হবে।

চিত্র ৭.১৪ : *Oryza sativa* উদ্ভিদের স্বরূপ, মঞ্জরী ও ফুলের বিভিন্ন অংশ।

পুষ্পপুট (Perianth) : সকল পুষ্পিকাতে পুষ্পপুট নেই। কোনো কোনো উদ্ভিদের পুষ্পিকাতে ক্ষুদ্রাকায় দু'টি পুষ্পপুট থাকে যাকে লোডিকিউল (lodicule) বলা হয়। ক্ষুদ্র শল্কপত্রের ন্যায় পুষ্পপুট হলো লোডিকিউল।

পুংস্তবক (Androecium) : পুংকেশর সাধারণত ৩টি, ধান ও বাঁশ উদ্ভিদের পুষ্পে ৬টি পুংকেশর দুই আবর্তে অবস্থিত। পরাগধানী রেখাকার, সর্বমুখ, লম্বালম্বি বিদীর্ণ হয়।

স্ত্রীস্তবক (Gynoecium) : গর্ভপত্র ১টি, গর্ভাশয় ১টি, গর্ভদণ্ড ১টি, গর্ভমুণ্ড ২টি, পালকের ন্যায় এবং পার্শ্বীয়; গর্ভাশয় এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; প্রকোষ্ঠে ডিম্বক ১টি, ডিম্বক মূলজ এবং খাড়া।

অমরাবিন্যাস (Placentation) : মূলীয়।

ফল (Fruit) : ক্যারিঅপসিস।

বীজ (Seed) : সস্যল (endospermic), ভ্রূণ অতিক্ষুদ্র ও বীজের এক কোণায় অবস্থিত।

পুষ্প সংকেত (Floral formula) : ধান পুষ্পের পুষ্প সংকেত : মপ. উমপ. ⚥ $পু_{2}$ $পুং_{0+6}$ $গ_{1}$

Poaceae গোত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ

১। *Bambusa bambos* (L.) Voss (বাঁশ) : উঁচু বৃক্ষবৎ আদি ঘাস। গৃহ নির্মাণ ও কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কুটির শিল্পে বিভিন্ন প্রকার গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে ২৮ প্রজাতির বাঁশ জন্মে থাকে। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঁশ কাষ্ঠল, বৃক্ষবৎ এবং বেশ উঁচু। তবুও বাঁশকে ঘাস বলা হয়। কারণ এদের পুষ্প বৈশিষ্ট্য, ফাঁপা মধ্যপর্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঘাসের মতো।

২। *Oryza sativa* L. (ধান) : চাষ করা হয়। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত আসে ধানের চাল থেকে। চিড়া, মুড়ি, পিঠা, পায়েস সবই আসে ধান বা চাল থেকে। খড় উঁচু মানের গো-খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধানের কুঁড়া থেকে ভোজ্য তেল ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

Scanned by CamScanner

৩। *Saccharum officinarum* L. (আখ, ইক্ষু) : চাষ করা হয়। আখ থেকে গুড়, চিনি, জ্বালানি ইত্যাদি পাওয়া যায়। মোলাসেস থেকে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল, ভিনেগার তৈরি করা হয়। আখের ছোবড়া পার্টেক্স তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জ্বালানির কাজেও ব্যবহার করা হয়।

৪। *Triticum aestivum* L. (গম) : চাষ করা হয়। আটা, সুজি, ময়দা ইত্যাদির জন্য চাষ করা হয়। রুটি, পাউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গমের খড় গো-খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫। *Zea mays* L. (ভুট্টা) : চাষ করা হয়। ভুট্টা থেকে পপকর্ন ও খইসহ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়। ভুট্টা থেকে কর্ণফ্লেক্স তৈরি হয়। হাঁস-মুরগির খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬। *Hordeum vulgare* L. (যব বা বার্লি) : চাষ করা হয়। যবের আটার জন্য চাষ করা হয়। যবের ছাতু উপাদেয়, সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য। হরলিক্স ও কমপ্ল্যান জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭। *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf. (লেমন ঘাস) : লেবুর গন্ধযুক্ত ঘাস। সুগন্ধি তেল ও প্রসাধনী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। চাইনিজ স্যুপেও ব্যবহার করা হয়।

৮। *Phragmites karka* (Retz.) Trin (নলখাগড়া) : জলাময় জায়গায় জন্মে। কাগজের মণ্ড তৈরিসহ এর বহুবিধ ব্যবহার আছে।

৯। *Thysanolaema maxima* (Roxb.) Kuntze (ঝাড়ুঘাস) : পাহাড়ি এলাকায় জন্মে। ঝাড়ু তৈরি করা হয়।

১০। *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (দূর্বাঘাস) : লন তৈরি, পশু খাদ্য এবং ওষুধি উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রক্তপাত বন্ধ ও ক্ষত নিরাময়ে ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : অর্থনৈতিক দিক থেকে এই গোত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, যব বা বার্লি, চিনা, কাউন ইত্যাদি মানুষের প্রধান খাদ্য যোগান দিয়ে থাকে। পৃথিবীর ৬০% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত এবং বহু লোকের প্রধান খাদ্য রুটি। হাজার প্রজাতির ঘাস গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের ব্যবহার দেখা যায় দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। মিষ্টি দ্রব্যের যোগান দিয়ে থাকে আখ। গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর যোগান দিয়ে থাকে ছন, ইকড়, কাশ ইত্যাদি উদ্ভিদ। প্রাত্যহিক ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিতেও প্রয়োজন পড়ে এই গোত্রের উদ্ভিদের।

খাদ্যশস্য (Cereals) : ঘাস পরিবারের (Poaceae) খাদ্যদানা (grain) উৎপাদনকারী উদ্ভিদসমূহকে খাদ্যশস্য বলে। যেমন- ধান, গম, ভুট্টা।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গোত্র পরিচিতি

যে সব আবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজে দু'টি বীজপত্র থাকে তাদেরকে বলা হয় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। আম, জাম, কাঁঠাল, শিম, ছোলা ইত্যাদি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। বীজে বীজপত্র দু'টি।

২। মূল প্রধান মূল।

৩। পাতার শিরাবিন্যাস সাধারণত জালিকাকার।

৪। পুষ্পে পুষ্পপত্রের সংখ্যা ৪ বা ৫ বা তার গুণিতক (৪, ৮ বা ৫, ১০ এরূপ)-অর্থাৎ পুষ্প টেট্রামেরাস বা পেন্টামেরাস।

৫। বীজে বীজপত্রের অবস্থান পার্শ্বীয় এবং ভ্রূণমুকুল শীর্ষ।

ড. আর্থার ক্রনকুইস্ট (১৯৮১) পৃথিবীর সকল জানা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকে ৩১৫টি গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আমি ধারা অনুযায়ী প্রথম গোত্র Winteraceae এবং সর্বশেষ গোত্র Asteraceae। নিচে Malvaceae গোত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

Scanned by CamScanner

গোত্র : Malvaceae (মালভেসি)

(টাইপ জেনাস *Malva* থেকে গোত্র নাম Malvaceae করা হয়েছে।)

alvaceae গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। উদ্ভিদের কচি অংশ রোমশ ও মিউসিলেজপূর্ণ (পিচ্ছিল পদার্থযুক্ত)।
২। উপপত্র মুক্তপার্শ্বীয়।
৩। পুষ্প একক এবং সাধারণত উপবৃতিযুক্ত।
৪। পুংকেশর বহু, একগুচ্ছক, পুংকেশরীয় নালিকা গর্ভদণ্ডের চারদিকে বেষ্টিত।
৫। পরাগধানী একপ্রকোষ্ঠী (এককোষী নয়) ও বৃক্কাকার।
৬। পরাগরেণু বৃহৎ এবং কণ্টকিত।
৭। আমরাবিন্যাস অক্ষীয় (axile)

শ্রেণিবিন্যাস: আর্থার ক্রনকুইস্ট (১৯৮১)
Division : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Subclass : Dillenidae
Order : Malvales
Family : Malvaceae

চিত্র ৭.১৫ : চিত্রে Malvaceae গোত্রের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।

বিস্তৃতি : Malvaceae একটি বড় গোত্র। ৭৫টি গণ এবং ১০০০ থেকে ১৫০০ প্রজাতি নিয়ে এই গোত্র গঠিত। পৃথিবীর বহু দেশে এর বিভিন্ন প্রজাতি জন্মে থাকে। বাংলাদেশে এই গোত্রের আনুমানিক ১৪টি গণ এবং ৪২টি প্রজাতি জন্মে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গণ হলো *Hibiscus* (প্রজাতি ১৫টি)।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

স্বরূপ : বীরুৎ, গুল্ম বা বৃক্ষ। উদ্ভিদ প্রায়শ পিচ্ছিল পদার্থযুক্ত।

মূল : প্রধান মূলতন্ত্র।

কাণ্ড : কাষ্ঠল, শাখান্বিত ও বেলনাকার।

পাতা : সরল, কিনার অখণ্ড বা খণ্ডিত, জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, উপপত্রযুক্ত, উপপত্র মুক্তপার্শ্বীয়, সবৃন্তক, ডিম্বাকার।

পুষ্পবিন্যাস : একক (সাইমোস)।

পুষ্প : একক, বৃহৎ, অক্ষীয় বা শীর্ষ, পূর্ণাঙ্গ, সমাঙ্গ, উভলিঙ্গ, গর্ভপাদপুষ্পী।

উপবৃতি : উপবৃত্যংশ ৩–১০টি, মুক্ত অথবা যুক্ত। (*Sida* এবং *Abutilon* গণে উপবৃতি নেই।)

বৃতি : বৃত্যংশ পাঁচটি, সংযুক্ত বা মুক্ত, অনেক সময় স্থায়ী, এস্টিভেশন ভালভেট তথা প্রান্তস্পর্শী।

চিত্র ৭.১৬ : জবা পুষ্পের লম্বচ্ছেদ।

Scanned by CamScanner

টুইস্টেড তথা পাকানো।

দলমণ্ডল : পাপড়ি পাঁচটি, মুক্ত, পুংকেশরীয় নলের সাথে গোড়ায় যুক্ত,

পুংস্তবক : পুংকেশর বহু, একগুচ্ছক, পুংদণ্ড সংযুক্ত হয়ে একটি নল সৃষ্টি করে, পুং-নল গোড়ায় দললগ্ন, পরাগধানী একপ্রকোষ্ঠী, (এককোষী নয়) বৃক্কাকার, রেণু বৃহৎ, কণ্টকিত।

স্ত্রীস্তবক : গর্ভপত্র ১–২০ বা এর বেশি, সাধারণত ৫–১০টি, সংযুক্ত, গর্ভাশয় অধিগর্ভ, ১ - বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, সাধারণত ৫ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, গর্ভদণ্ডের সংখ্যা গর্ভপত্রের সংখ্যার সমান, সংযুক্ত, গর্ভমুণ্ডের সংখ্যা গর্ভদণ্ডের সংখ্যার সমান কখনো দ্বিগুণ। (*Plagianthus* গণে গর্ভপত্র ১টি বা ২টি, *Abutilon* গণে গর্ভপত্র ১৫–২০টি এবং *Malva* গণে গর্ভপত্র অনেক।)

অমরাবিন্যাস : অক্ষীয়।

ফল : সাধারণত ক্যাপসিউল (capsule); কখনো বেরি (berry), অথবা সাইজোকার্প (schizocarp)।

জবা পুষ্পের পুষ্প সংকেত : ⊕ ⚥ উবৃ$_{৫}$ বৃ$_{(৫)}$ $\overline{দ_{৫}\ পুং_{(\infty)}}$ $\underline{গ}_{(৫)}$

Malvaceae প্রধান উদ্ভিদসমূহ

১। **জবা** (*Hibiscus rosa-sinensis* Linn.) :

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : জবার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। ফুলের জন্য একে বাগানে লাগানো হয়। জবা ফুলের রস মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, চুল কালো ও লম্বা হয়। এর রস চুল পড়া বন্ধ করে, নতুন চুল জন্মায় ও চুল উজ্জ্বল করে। জবাকুসুম তেলের এটি একটি উপাদান। জবার কলি সকালে কিছুদিন খেলে দুর্বলতা কেটে যায়। জবা ফুল রক্ত আমাশয় ও অর্শরোগেরও একটি ভালো ওষুধ।

২। **ঢেঁড়স** (*Abelmoschus esculentus* Linn. Moench.) :

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ঢেঁড়স-এর প্রধান ব্যবহার সবজি হিসেবে। এটি স্যুপ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। এর ভেষজ গুরুত্বও আছে। কচি ঢেঁড়সে লৌহ থাকায় নিয়মিত খেলে শারীরিক দুর্বলতা সারে। এটি বহুমূত্র রোগেরও উপকার করে থাকে। ঢেঁড়স গাছ হতে ভালো আঁশ পাওয়া যায়।

৩। **কার্পাস তুলা** (*Gossypium herbaceum* Linn.) :

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : এর বীজত্বক থেকে তুলা পাওয়া যায়। কার্পাস তুলার গুরুত্ব সুতা তৈরিতে। তুলা হতে সুতা হয়, সুতা হতে সুতি কাপড় তৈরি হয়। লেপ, তোষক তৈরিতেও কার্পাস তুলা ব্যবহার হয়। তুলা বীজ হতে ভোজ্য তেল আহরণ করা হয়। এছাড়া তুলা জীবাণুমুক্ত করে শৈল্য চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

৪। **কেনাফ-মেস্তাপাট** (*Hibiscus cannabinus* Linn.) :

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কেনাফ-মেস্তাপাটের বাকল থেকে পাট জাতীয় আঁশ পাওয়া যায়। এ আঁশ পাটের মতোই দড়ি, ব্যাগ, চট প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৫। **মেস্তাপাট** (*Hibiscus sabdariffa var. altissima* Linn.) :

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : এর আঁশ দিয়ে চট, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

৬। **স্থলপদ্ম** (*Hibiscus mutabilis*) : এই উদ্ভিদ ও এর ফুল বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

Malvaceae গোত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপাদান কার্পাস তুলা এ গোত্রের *Gossypium* গণের বিভিন্ন প্রজাতি হতে সংগ্রহ করা হয়। এ গোত্রের কেনাফ ও মেস্তাপাট হতেও গুরুত্বপূর্ণ তন্তু পাওয়া যায়। ঢেঁড়স একটি উৎকৃষ্ট সবজি। জবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি বাগানের অলঙ্কৃত উদ্ভিদ। ইন্ডিয়ান টিউলিপ (*Thespesia populnea*)-এর কাঠ থেকে পেন্সিল, খেলনা ও কৃষি কাজের উপকরণ তৈরি হয়। জবা বিভিন্ন প্রকার ওষুধে কাজে লাগে। এটি পূজার উপকরণ।

দলগত কাজ : ১ম দল : স্থলবাসী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের পার্থক্য নির্ণয়।
২য় দল : একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পার্থক্য নির্ণয়।
৩য় দল : Poaceae এবং Malvaceae গোত্রের পার্থক্য নির্ণয়।

বি.দ্র. (i) প্রজাতিক নাম দুই শব্দের হলে মাঝখানে হাইফেন দিতে হয়। তাই *rosa-sinensis*।
(ii) পাপড়ি গোড়ায় পুংকেশরীয় নলের সাথে যুক্ত থাকলেও একে মুক্ত বলা হয়।

Scanned by CamScanner

ব্যবহারিক : Malvaceae গোত্র শনাক্তকরণ।

উপকরণ: Malvaceae গোত্রের ফুল (নমুনা জবা), পেন্সিল, রাবার, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ব্যবহারিক সিট ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : ফুলের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করতে হবে, পৃথকভাবে অঙ্কন করতে হবে, সম্ভব হলে পুষ্প প্রতীক অঙ্কন করতে হবে, পুষ্প সংকেত লিখতে হবে।

শনাক্তকরণ : শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লিখে শনাক্ত করতে হবে।

নমুনা- জবা (*Hibiscus rosa-sinensis*)।

স্বরূপ (Habit) : গুল্ম।

কাণ্ড (Stem) : কাষ্ঠল।

পাতা (Leaves) : সরল, একান্তর, উপপত্রিক (উপপত্র বল্লমাকার ও মুক্তপার্শ্বীয়), বৃন্তক, ডিম্বাকার, বহুশিরাল জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, ভঙ্গুর, মসৃণ, কিনারা দন্তুর, শীর্ষ সূক্ষ্মাগ্র, পিচ্ছিল পদার্থযুক্ত।

পুষ্পবিন্যাস (Inflorescence) : একক নিয়ত।

ফুল (Flowers) : একক পুষ্প, বেশ বড় এবং উজ্জ্বল লাল, বৃন্তক, উভলিঙ্গ, বহুপ্রতিসম, গর্ভপাদপুষ্প, পূর্ণাঙ্গ, সমাঙ্গ, পঞ্চাংশক।

উপবৃতি (Epicalyx) : উপবৃত্যাংশ ৫টি (বা ৬টি) মুক্ত, সবুজ, ভালভেট।

বৃতি (Calyx) : বৃত্যাংশ ৫টি, যুক্ত, নলাকার, আঠাল পিচ্ছিল পদার্থযুক্ত, সবুজ, এস্টিভেশন প্রান্তস্পর্শী (ভালভেট)।

দলমণ্ডল (Corolla) : পাপড়ি ৫টি, নিচের দিকে সামান্য যুক্ত, সমাঙ্গ, উজ্জ্বল লাল, মিউসিলেজযুক্ত, এস্টিভেশন পাকানো (টুইস্টেড)।

পুংস্তবক (Androecium) : পুংকেশর অসংখ্য, একগুচ্ছ, দললগ্ন, পুংদণ্ডসমূহ মিলিতভাবে একটি নলের সৃষ্টি করেছে। এই নল গর্ভদণ্ডকে ঘিরে রেখেছে, পরাগধানী বৃক্কাকার, পৃষ্ঠলগ্ন ও মুক্ত, রং হলুদ, দৈর্ঘ্যশ্রেণী, বাইরের দিকে বিদীর্ণ হয়, রেণু বড় এবং কণ্টকিত।

স্ত্রীস্তবক (Gynoecium) : গর্ভপত্র ৫টি, সংযুক্ত, গর্ভাশয় পাঁচ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, অধিগর্ভ, প্রতি প্রকোষ্ঠে ডিম্বক দু'টি, গর্ভদণ্ড একটি, লম্বা, গর্ভমুণ্ড পাঁচটি, মুক্ত, আঠাল।

অমরাবিন্যাস (Placentation) : অক্ষীয়।

ফল (Fruit) : সাধারণত ফল সৃষ্টি হয় না।

পুষ্প সংকেত (Floral formula) : $\oplus$ ⚥ $উবৃ_5\ বৃ_{(5)}\ \overline{দ_5\ পুং_{(\alpha)}}\ \underline{গ}_{(5)}$

কারণসহ শনাক্তকরণ :

১। উদ্ভিদের কচি অংশ মিউসিলেজ নামক পিচ্ছিল পদার্থযুক্ত।
২। পাতায় মুক্তপার্শ্বীয় উপপত্র বিদ্যমান।
৩। পুষ্প একক এবং সাধারণত উপবৃতিবিশিষ্ট।
৪। দলমণ্ডল পাকানো।
৫। পুংকেশর অসংখ্য, একগুচ্ছ এবং পুংদণ্ডসমূহ মিলিতভাবে একটি ফাঁপা পুংকেশরীয় নালিকা গঠন করে যা গর্ভদণ্ডের চারদিকে বেষ্টন করে রাখে।
৬। পরাগধানী একপ্রকোষ্ঠী (এককোষী নয়) এবং বৃক্কাকার।
৭। পরাগ রেণু বৃহৎ এবং কণ্টকিত।
৮। অমরাবিন্যাস অক্ষীয় (axile)।

... নমুনাটি Malvaceae (মালভেসি) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned by CamScanner

সার-সংক্ষেপ

সাইকাস (*Cycas*) : সাইকাস একটি নগ্নবীজী উদ্ভিদ গণের নাম। বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে এর মাত্র একটি প্রজাতি জন্মে থাকে, যার নাম *Cycas pectinata.* চট্টগ্রামের বাড়িয়াঢালা পাহাড়ি অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়। সাইকাস উদ্ভিদ দেখতে অনেকটা পাম গাছের মতো, সরল কাণ্ডের মাথায় একসাথে অনেকগুলো বড় আকারের যৌগিক পত্র সর্পিলাকারে সাজানো থাকে। এদের মুকুল পত্রবিন্যাস ফার্নের পাতার মতো কুণ্ডলিত। এদিক থেকে ফার্নের সাথে সাইকাসের মিল রয়েছে। সাইকাস-এর স্ত্রী এবং পুরুষ উদ্ভিদ পৃথক।

জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil) : উদ্ভিদটি জীবন্ত অথচ এর বৈশিষ্ট্য সুদূর অতীতের কোনো জীবাশ্ম উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন, এমন অবস্থা হলে তাকে বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম। সাইকাস এমন একটি উদ্ভিদ, তাই সাইকাসকেও জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়। আজ থেকে ২৯০ মিলিয়ন বছর আগে সাইকাসের উদ্ভব ঘটে। সেই আদি কালের উদ্ভিদের সাথে বর্তমান কালের সাইকাস উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই এরা জীবন্ত জীবাশ্ম।

প্লাসেন্টেশন : প্লাসেন্টেশন (অমরাবিন্যাস) শব্দটি আবৃতবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফুলের গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বক (ovule) সৃষ্টি হয়, যা পরে বীজে পরিণত হয়। গর্ভাশয়ের যে টিস্যু থেকে ডিম্বক সৃষ্টি হয় সেই টিস্যুকে বলা হয় প্লাসেন্টা। বিভিন্ন উদ্ভিদের গর্ভাশয়ে প্লাসেন্টার সাজানো পদ্ধতি একই রকম নয়, বরং বিভিন্ন রকম। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে প্লাসেন্টা টিস্যুর বিভিন্ন রকম সাজানো পদ্ধতিকে বলা হয় প্লাসেন্টেশন। মার্জিনাল, অ্যাক্সাইল, প্যারাইটাল, বেসাল, ফ্রি সেন্ট্রাল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্লাসেন্টেশন।

পুষ্প প্রতীক : একটি বৃত্তাকার নকশা বা প্রতীকের মাধ্যমে একটি ফুলের বিভিন্ন স্তবকের সদস্যদের সংখ্যা, এদের মধ্যকার সমসংযোগ, অসমসংযোগ, পুষ্পপত্রবিন্যাস, অমরাবিন্যাস ইত্যাদি দেখানো যায়। এ নকশার মাধ্যমেই একটি পুষ্পের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায়। বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। যে বৃত্তাকার নকশার মাধ্যমে একটি পুষ্পের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয় তাকে পুষ্প প্রতীক বলে।

স্পাইকলেট : এক ধরনের পুষ্পমঞ্জরীকে স্পাইকলেট বলা হয়। এই ধরনের মঞ্জরী Poaceae গোত্রের উদ্ভিদে দেখা যায়, তাই Poaceae গোত্রের একটি শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো স্পাইকলেট মঞ্জরীর উপস্থিতি। এ ক্ষেত্রে মঞ্জরীদণ্ড অতি সংক্ষিপ্ত হয়, গোড়াতে দু'টি বর্মাকার অপুষ্পক গ্লুম থাকে, এর উপর পুষ্পক গ্লুম থাকে। পুষ্পক গ্লুমের কক্ষে প্যালিয়াসহ পুষ্প থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। কোন গোত্রের উদ্ভিদের পুংরেণু বৃহৎ এবং কণ্টকিত ?

(ক) Poaceae (খ) Malvaceae (গ) Liliaceae (ঘ) Solanaceae

২। *Cycas*-এর বৈশিষ্ট্য হলো–

(i) ফুলে গর্ভাশয় নেই

(ii) কোরালয়েড মূল বিদ্যমান

(iii) ফল হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

Scanned by CamScanner

অষ্টম অধ্যায়

টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র

TISSUE AND TISSUE SYSTEM

প্রধান শব্দসমূহ : ভাজক টিস্যু, ভাস্কুলার টিস্যু, টিস্যুতন্ত্র

একটি গাছ মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিভাজনযোগ্য। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গঠনকারী কোষসমূহের সৃষ্টি-উৎস, গঠন এবং কাজ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। মূলের প্রধান কাজ গাছকে মাটির সাথে ধরে রাখা এবং মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ পরিশোষণ করা, পাতার কাজ খাদ্য তৈরি করা, কাণ্ডের কাজ মূল থেকে পানি ও খনিজ লবণ পাতায় পৌঁছে দেয়া এবং পাতায় তৈরি খাদ্য মূলসহ সকল অঙ্গে পৌঁছে দেয়া। অন্যদিকে মূল, কাণ্ড ও পাতার বাইরের অংশের গঠন ও কাজ এক ধরনের (ভেতরের অংশকে রক্ষা করা) আর ভেতরের অংশের গঠন ও কাজ অন্য ধরনের। দেখা যায় একই উৎস থেকে সৃষ্ট, একই ধরনের একগুচ্ছ কোষ মিলিতভাবে একই কাজ সম্পন্ন করে থাকে। একই উৎস থেকে সৃষ্ট, একই ধরনের কাজ সম্পন্নকারী সমধর্মী একটি অবিচ্ছিন্ন কোষগুচ্ছকে বলা হয় টিস্যু বা কোষকলা। কাজেই টিস্যু একটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। টিস্যু সৃষ্টির মূল কারণ হলো উদ্ভিদ দেহ গঠনকারী কোষের শ্রমবিভাগ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. ভাজক টিস্যু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
২. এপিডার্মাল, গ্রাউন্ড ও ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্রের অবস্থান, গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. টিস্যুতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
৪. একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
৫. ব্যবহারিক
০ একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড প্রস্থচ্ছেদ করে শনাক্ত করতে পারবে।

টিস্যুর প্রকারভেদ

সাধারণত একটি উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের টিস্যু থাকে। তবে সব ধরনের টিস্যুকে, টিস্যু গঠনকারী কোষের বিভাজন অনুযায়ী দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- ১। ভাজক টিস্যু এবং ২। স্থায়ী টিস্যু। নিচে এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১। ভাজক টিস্যু (Meristematic tissue) : তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ কোনো একটি উদ্ভিদের চারা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে লম্বা হচ্ছে, আবার এর গোড়াটিও ধীরে ধীরে মোটা হচ্ছে। কী কারণে এবং কীভাবে গাছটি ক্রমান্বয়ে উঁচু ও মোটা হচ্ছে তা ভেবে দেখেছ কি? গাছের কোনো কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থিত (যেমন কাণ্ড শীর্ষ, মূল শীর্ষ ইত্যাদি) কোষগুচ্ছ বিরামহীনভাবে বিভাজিত হয়েই চলেছে। কোষের ক্রমাগত বিভাজনই এই বৃদ্ধির কারণ। যে কোষগুলো বিভাজিত হয় তা হলো ভাজক কোষ, আর ভাজক কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুই ভাজক টিস্যু। ভাজক টিস্যুর অপর নাম মেরিস্টেম।

ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য

(i) কোষগুলো জীবিত, অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সমব্যাসীয়।
(ii) ভাজক টিস্যুর কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন।
(iii) ভাজক টিস্যুর কোষগুলো সাধারণত আয়তাকার, ডিম্বাকার, পঞ্চভুজ বা ষড়ভুজাকার হয়।
(iv) এই টিস্যুর কোষগুলো সেলুলোজ নির্মিত পাতলা কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট হয়।
(v) কোষের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে।

চিত্র ৮.১ : আদর্শ ভাজক কোষ।

(vi) ভাজক টিস্যুর কোষে সাধারণত কোষ গহ্বর থাকে না।
(vii) কোষগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এদের মধ্যে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে না।
(viii) এই টিস্যুর কোষগুলোর বিপাকীয় হার বেশি এবং সর্বদাই সক্রিয় বিপাকীয় অবস্থায় থাকে।
(ix) কোষে কোনো প্রকার সঞ্চিত খাদ্য, ক্ষরিত বস্তু বা বর্জ্য পদার্থ থাকে না।
(x) প্লাস্টিডগুলো প্রোপ্লাস্টিড অবস্থায় থাকে।

ভাজক টিস্যুর কাজ

(i) শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর বিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এতে ছোট গাছ ক্রমে উঁচু ও লম্বা হয়।
(ii) পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যুর বিভাজনের ফলে উদ্ভিদের ব্যাস বৃদ্ধি পায়। এতে সরু কাণ্ড ক্রমে মোটা হয়।
(iii) ভাজক টিস্যু হতে স্থায়ী টিস্যু সৃষ্টি হয়।
(iv) ভাজক টিস্যুর বিভাজনের মাধ্যমে ক্ষত স্থান পূরণ হয়।

ভাজক টিস্যুর শ্রেণিবিভাগ (Classification of meristem) : উৎপত্তি, গঠন, সম্প্রসারণ, অবস্থান, কার্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভাজক টিস্যুকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়; যেমন– (১) উৎপত্তি অনুসারে, (২) অবস্থান অনুসারে, (৩) কোষ বিভাজন অনুসারে এবং (৪) কাজ অনুসারে।

১। উৎপত্তি অনুসারে : উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে ভাজক টিস্যুকে (ক) প্রারম্ভিক ভাজক টিস্যু (খ) প্রাইমারি ভাজক টিস্যু এবং (গ) সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু– এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) প্রোমেরিস্টেম বা প্রারম্ভিক ভাজক টিস্যু (Promeristem) : মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগের শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল রয়েছে যেখান থেকে পরবর্তীতে প্রাইমারি ভাজক টিস্যুর উৎপত্তি ঘটে, তাকে **প্রারম্ভিক ভাজক টিস্যু** বলে। এ অঞ্চল থেকেই প্রথম বৃদ্ধি শুরু হয়।

(খ) প্রাইমারি ভাজক টিস্যু (Primary meristem) : যে ভাজক টিস্যু উদ্ভিদের ভ্রূণাবস্থায়ই উৎপত্তি লাভ করে, তাকে **প্রাইমারি ভাজক টিস্যু** বলা হয়। মূল এবং কাণ্ডের শীর্ষে যে ভাজক টিস্যু থাকে তা-ই প্রাইমারি ভাজক টিস্যু। এদের বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রারম্ভিক ভাজক টিস্যু হতে এদের উৎপত্তি হয়। প্রাইমারি ভাজক টিস্যু হতে প্রাইমারি স্থায়ী টিস্যুর সৃষ্টি হয়।

(গ) সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু (Secondary meristem) : যে ভাজক টিস্যু কোনো স্থায়ী টিস্যু হতে পরবর্তী সময়ে উৎপন্ন হয়, তাকে সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু বলে। সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু উদ্ভিদের ভ্রূণাবস্থার অনেক পরে সৃষ্টি হয়। কর্ক ক্যাম্বিয়াম সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যুর উদাহরণ।

২। অবস্থান অনুসারে : উদ্ভিদের কোন অংশে অবস্থিত এর উপর নির্ভর করে ভাজক টিস্যুকে (ক) **শীর্ষস্থ**, (খ) **ইন্টারক্যালারি** বা **নিবেশিত** এবং (গ) **পার্শ্বীয়**–এ তিন প্রকারে ভাগ করা হয়।

(ক) শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু (Apical meristem) : মূল, কাণ্ড বা এদের শাখা-প্রশাখার শীর্ষে অবস্থিত ভাজক টিস্যুকেই **শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু** বলে। কতক পাতা ও ফলের শীর্ষেও ভাজক টিস্যু থাকতে পারে। শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর বিভাজনের মাধ্যমেই এসব অঙ্গ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরা প্রাথমিক স্থায়ী টিস্যু তৈরি করে থাকে। পুষ্পক উদ্ভিদে শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু এক্যাধিক কোষ নিয়ে গঠিত। এরা প্রাইমারি টিস্যু।

চিত্র : ৮.২ : অবস্থান অনুসারে টিস্যুর প্রকারভেদ (ডায়াগ্রামেটিক)

(খ) ইন্টারক্যালারি বা নিবেশিত ভাজক টিস্যু (Intercalary meristem) : দুটি স্থায়ী টিস্যুর মাঝখানে অবস্থিত ভাজক টিস্যুকে **ইন্টারক্যালারি** বা **নিবেশিত ভাজক টিস্যু** বলে। অঙ্গসমূহের বৃদ্ধির সময় শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু হতে কিয়দংশ পৃথক হয়ে এ প্রকার ভাজক টিস্যু সৃষ্টি করে। কাজেই এরা প্রাইমারি টিস্যু। এরা পত্রমূলে, মধ্যপর্বের গোড়ায় বা পর্বসন্ধির নিচে থাকতে পারে।

(গ) পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু (Lateral meristem) : মূল বা কাণ্ডের পার্শ্ব বরাবর লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত ভাজক টিস্যুকে পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু বলে। এ প্রকার টিস্যুও দুটি স্থায়ী টিস্যুর মাঝখানে অবস্থিত। এরা স্থায়ী টিস্যু হতে উৎপন্ন হয়, তাই এরা সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু। এদের বিভাজনের ফলে মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি প্রস্থে হয়ে থাকে। ইন্টারফেসিকুলার ক্যাম্বিয়াম, কর্ক ক্যাম্বিয়াম প্রভৃতি পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যুর উদাহরণ। এদের বিভাজনের কারণে উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধি ঘটে।

৩। কোষ বিভাজন অনুসারে : বিভাজন প্রক্রিয়ার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে ভাজক টিস্যুকে-(ক) মাস, (খ) প্লেট এবং (গ) রিব-এ তিনভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) মাস ভাজক টিস্যু (Mass meristem) : যে ভাজক টিস্যুর কোষবিভাজন সব তলে (plane) ঘটে থাকে, ফলে সৃষ্ট কোষ সমষ্টি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত না থেকে কোষপুঞ্জ গঠন করে, তাকে মাস ভাজক টিস্যু বলা হয়। এ প্রকার বিভাজনের ফলে অঙ্গটি ভলিউমে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; যেমন- বর্ধনশীল ভ্রূণ, রেণুথলি, এন্ডোস্পার্ম তথা সস্য টিস্যু, মজ্জা, কর্টেক্স প্রভৃতি।

(খ) প্লেট ভাজক টিস্যু (Plate meristem) : যে ভাজক টিস্যুর কোষ মাত্র দুইতলে (plane) বিভাজিত হয়, ফলে কোষগুলো প্লেটের মতো হয়, তাকে প্লেট ভাজক টিস্যু বলা হয়। এ প্রকার বিভাজনের ফলে অঙ্গটি আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; যেমন পাতা।

(গ) রিব ভাজক টিস্যু (Rib meristem) : যে ভাজক টিস্যুর কোষগুলো একটি তলে বিভাজিত হয়, ফলে কোষগুলো রৈখিক সজ্জাক্রমে একসারিতে অবস্থান করে এবং দেখতে বুকের পাঁজরের ন্যায় দেখায়, তাকে রিব ভাজক টিস্যু বলা হয়। এ প্রকার বিভাজনের ফলে একসারি কোষ সৃষ্টি হয়; যেমন- বর্ধিষ্ণু মূল ও কাণ্ডের মজ্জা রশ্মি।

৪। কাজ অনুসারে : কর্মপ্রক্রিয়া অনুসারে ভাজক টিস্যুকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

(ক) প্রোটোডার্ম (Protoderm) : যে ভাজক টিস্যুর কোষসমূহ উদ্ভিদদেহের ত্বক সৃষ্টি করে তাকে প্রোটোডার্ম বলে। মূল, কাণ্ড ও এদের শাখা-প্রশাখার ত্বক (এপিডার্মিস বা এপিব্লেমা) সৃষ্টি করা হলো প্রোটোডার্ম-এর কাজ।

(খ) প্রোক্যাম্বিয়াম (Procambium) : ক্যাম্বিয়াম, জাইলেম ও ফ্লোয়েম সৃষ্টিকারী ভাজক টিস্যুকে প্রোক্যাম্বিয়াম বলে। পরিবহন টিস্যু সৃষ্টি করাই প্রোক্যাম্বিয়ামের কাজ।

(গ) গ্রাউন্ড মেরিস্টেম (Ground meristem) : শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর যে অংশ বারবার বিভাজিত হয়ে উদ্ভিদ দেহের মূল ভিত্তি তথা কর্টেক্স, মজ্জা ও মজ্জা রশ্মি সৃষ্টি করে তাকে গ্রাউন্ড মেরিস্টেম বলে।

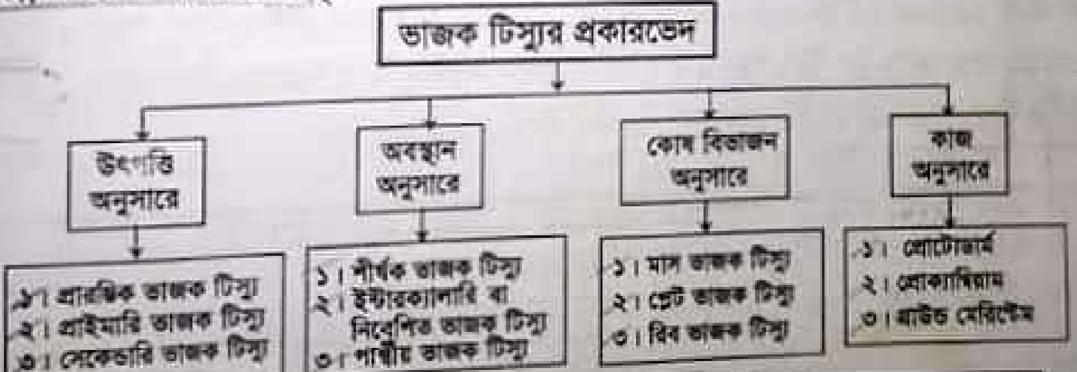

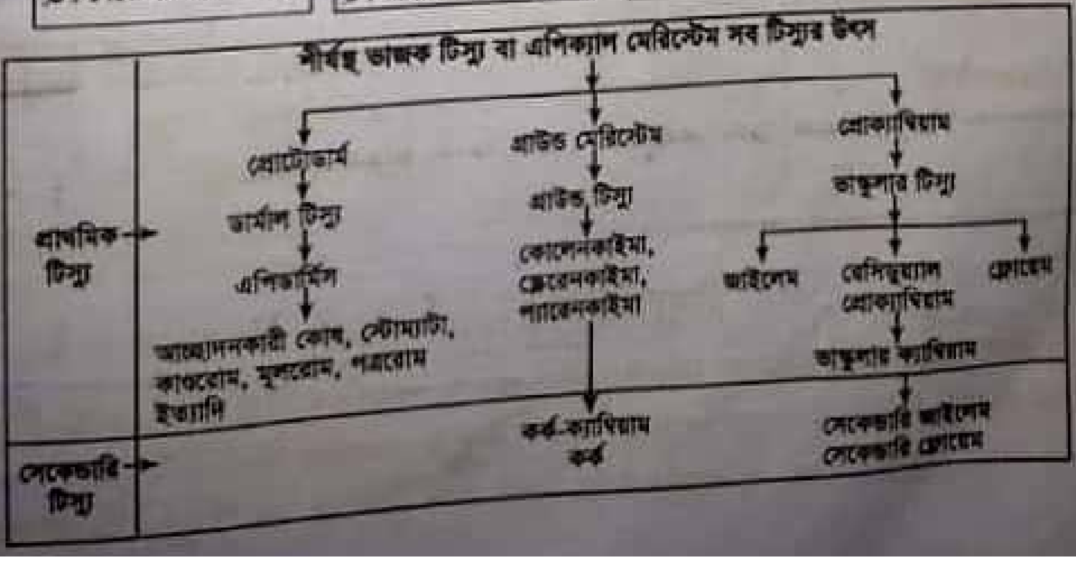

২। স্থায়ী টিস্যু (Permanent tissue) : যে টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে অক্ষম সে টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলে। এ টিস্যুর কোষগুলো পূর্ণভাবে বিকশিত এবং সঠিক আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ এরা আকার-আকৃতি ও বিকাশে স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তাই এরা স্থায়ী টিস্যু। বিশেষ অবস্থা ছাড়া এরা আর বিভাজিত হতে পারে না। ভাজক টিস্যু হতে কোষের পূর্ণ বিকাশ লাভের পর বিভাজন ক্ষমতা স্থগিত হওয়ার মাধ্যমে স্থায়ী টিস্যুর উদ্ভব ঘটে।

স্থায়ী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য

(i) স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো সাধারণত বিভাজনে অক্ষম।
(ii) টিস্যুতে দু'রকম কোষ থাকে-জীবিত ও মৃত।
(iii) জীবিত কোষে সাইটোপ্লাজম স্বাভাবিকের চেয়ে কম।
(iv) মৃত কোষ প্রোটোপ্লাজমবিহীন।
(v) কোষগুলোর প্রাচীর অপেক্ষাকৃত স্থূল অর্থাৎ বেশ পুরু।
(vi) কোষ গহ্বর অপেক্ষাকৃত বড়।
(vii) নিউক্লিয়াস স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট এবং কোষের এক পাশে অবস্থান করে।
(viii) কোষ প্রাচীরে নানা নকশা দেখা যায়।

স্থায়ী টিস্যুর শ্রেণিবিভাগ : গঠন ও কাজের ভিত্তিতে স্থায়ী টিস্যু তিন প্রকার; যথা : **(১) সরল টিস্যু** (simple tissue), **(২) জটিল বা যৌগিক টিস্যু** (complex tissue) এবং **(৩) ক্ষরণকারী বা নিঃস্রাবী টিস্যু** (secretory tissue)।

(১) সরল টিস্যু (Simple tissue) : সরল স্থায়ী টিস্যুর সবগুলো কোষ আকার, আকৃতি ও গঠন বৈশিষ্ট্যে একই ধরনের হয়। কোষের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা : (i) প্যারেনকাইমা, (ii) কোলেনকাইমা এবং (iii) স্ক্লেরেনকাইমা।

(২) জটিল টিস্যু (Complex tissue) : জটিল স্থায়ী টিস্যু একাধিক প্রকার কোষ দিয়ে গঠিত এবং সম্মিলিতভাবে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করে। কাজ, অবস্থান ও গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী জটিল টিস্যু প্রধানত দু'প্রকার। যথা : **(ক) জাইলেম টিস্যু** এবং **(খ) ফ্লোয়েম টিস্যু**। এ দু'প্রকার টিস্যু একত্রে পরিবহনতন্ত্র গঠন করে। এ টিস্যু মূল থেকে পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। খাদ্যদ্রব্য ও পানি পরিবহন করাই এ টিস্যুর প্রধান কাজ।

(৩) ক্ষরণকারী বা নিঃস্রাবী টিস্যু (Secretory tissue) : যে টিস্যু হতে নানা প্রকার তরল পদার্থ (উৎসেচক, বর্জ্য পদার্থ = রেজিন, গদ, উদ্বায়ী তেল, আঠা ইত্যাদি) নিঃসৃত হয়ে থাকে, তাকে ক্ষরণকারী বা নিঃস্রাবী টিস্যু বলে। ক্ষরণকারী টিস্যু দু'প্রকার; যথা : (i) **তরুক্ষীর টিস্যু** (laticiferous tissue) এবং (ii) **গ্রন্থি টিস্যু** (glandular tissue)।

স্থায়ী টিস্যুর প্রকারভেদ

সরল টিস্যু	জটিল বা যৌগিক টিস্যু	ক্ষরণকারী বা নিঃস্রাবী টিস্যু
১। প্যারেনকাইমা	১। জাইলেম	১। তরুক্ষীর টিস্যু
২। কোলেনকাইমা	২। ফ্লোয়েম	২। গ্রন্থি টিস্যু
৩। স্ক্লেরেনকাইমা		

টিস্যুতন্ত্র (Tissue system)

একই ধরনের কাজ করে (শারীরবৃত্তীয় বা যান্ত্রিক) এমন এক বা একাধিক টিস্যু মিলে একটি টিস্যুতন্ত্র গঠন করে। একই ধরনের শারীরবৃত্তীয় বা যান্ত্রিক কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত এক বা একাধিক টিস্যুকে টিস্যুতন্ত্র বলে। বিজ্ঞানী স্যাক্স (Sachs-1875)-এর মতে, টিস্যুর অবস্থান ও কার্যের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের সব টিস্যুকে তিনটি টিস্যুতন্ত্রে ভাগ করা

যায়। যথা : ১। এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র (epidermal tissue system), ২। গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র (ground tissue system) এবং ৩। ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র (vascular or conducting tissue system)। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার টিস্যুতন্ত্রের বর্ণনা দেয়া হলো :

১। **এপিডার্মাল (বা ডার্মাল) বা ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র (Epidermal tissue system) : যে টিস্যুতন্ত্র উদ্ভিদ অঙ্গের বহিরাবরণ (ত্বক) সৃষ্টি করে তাকে এপিডার্মাল বা ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র বলে।** অবস্থান ও কাজের দিক থেকে অন্য টিস্যুর সাথে মিল না থাকায় একটি মাত্র টিস্যু দিয়েই ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র গঠিত হয়েছে। উদ্ভিদের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, মূল, ফুল, ফল, বীজ প্রভৃতি অঙ্গের ত্বক এই টিস্যুতন্ত্রের অন্তর্গত। কাণ্ড ও পাতার ত্বক বা বহিরাবরণকে এপিডার্মিস (epidermis) এবং মূলের বহিরাবরণকে এপিব্লেমা (epiblema) বলে। প্রাথমিক শীর্ষক ভাজক টিস্যু হতে এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্রের উৎপত্তি। এপিডার্মাল তথা ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা গঠিত।

(ক) এপিডার্মিস বা ত্বক (Epidermis) : উদ্ভিদের বাইরের স্তরকে এপিডার্মিস বা ত্বক বলে। এটি সাধারণত একসারি প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। তবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক সারি কোষে গঠিত হতে পারে, যেমন- বট, অশ্বত্থ, পাকুর ইত্যাদি গাছের পাতায়। করবী গাছের পাতায় তিনসারি কোষের ত্বক দেখা যায়। এপিডার্মিসের কোষগুলো আয়তাকার ও অতি ঘনভাবে সন্নিবেশিত। তাই, এদের মাঝে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে না, তবে স্টোম্যাটা বা লেন্টিসেল থাকতে পারে। প্রতিটি কোষে অল্প পরিমাণ সাইটোপ্লাজম, একটি নিউক্লিয়াস, একটি কোষগহ্বর বিদ্যমান থাকে। সাধারণত **রক্ষী কোষ** (guard cell) ব্যতীত অন্য কোনো কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। কোনো কোনো জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। এপিডার্মাল কোষে পাশের ও ভেতরের দিকের প্রাচীর পাতলা, কিন্তু বাইরের দিকের প্রাচীরে সুবেরিন ও কিউটিন জমা হওয়ায় পুরু হয়। কিউটিন বা সুবেরিনের (মোমের আস্তরণ) পুরু স্তরকে **কিউটিকল** বলে। কিউটিকল মূলের ত্বকে অনুপস্থিত কিন্তু কাণ্ড ও পাতায় বিদ্যমান থাকে। *Cycas, Pinus* ও ঘাস জাতীয় কিছু উদ্ভিদের পাতায় লিগনিন জমা হতে দেখা যায়। কোনো কোনো গাছের পত্রত্বকে মিউসিলেজ জমা হয়। সরিষা গোত্রীয় উদ্ভিদের পত্রত্বকে মাইরোসিন এনজাইম নিঃসরণকারী মাইরোসিন কোষ থাকে। কিছু ঘাস ও নলখাগড়া জাতের ত্বকীয় কোষে কর্ক ও সিলিকা কোষ থাকতে পারে। গম, ভুট্টা, আখ ইত্যাদি গাছের পাতার ত্বকে **বুলিফর্ম** (bulliform) কোষ থাকে। বুলিফর্ম কোষ হলো বৃহদাকৃতির কিছু ত্বকীয় কোষ। এপিডার্মিসের কোষ হতে **রোম** বা **ট্রাইকোম** নামক বিভিন্ন প্রকার উপাঙ্গ উদ্গত হয়। মূলের বাইরের ত্বককে এপিব্লেমা বলে। এপিব্লেমার কোনো কোনো কোষ হতে এককোষী রোম উৎপন্ন হয়। এদেরকে **মূলরোম** বলে।

কাজ : (i) এপিডার্মিস বা ত্বক উদ্ভিদকে, বিশেষ করে উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ টিস্যুকে বাইরের আঘাত থেকে ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা হতে রক্ষা করে। (ii) রোমযুক্ত ত্বক, বিশেষ করে বিষাক্ত গ্রন্থিওয়ালা রোমযুক্ত ত্বক বিভিন্ন প্রাণীর আক্রমণ হতে উদ্ভিদকে রক্ষা করে থাকে। (iii) অনেক সময় ত্বক উদ্ভিদ কর্তৃক পানির অপচয়ও বন্ধ করে থাকে। (iv) মোমের আস্তরণ পড়া ত্বক ছত্রাকের আক্রমণ হতে অভ্যন্তরীণ টিস্যুকে রক্ষা করতে পারে। (v) ত্বক-এর ছিদ্র (স্টোম্যাটা = পত্ররন্ধ্র) দিয়ে উদ্ভিদ অভ্যন্তর ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসের আদান-প্রদান করে থাকে। (vi) ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত ত্বক খাদ্য তৈরি করে। (vii) মূলরোম পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। (viii) বুলিফর্ম কোষ পানি সঞ্চয় করে এবং পাতার প্রসারণ ও বিকাশে সহায়তা করে। (ix) ত্বককোষ প্রয়োজনে বিভাজিত হতে পারে এবং ক্ষত সারিয়ে তোলে।

(খ) এপিডার্মিসের উপাঙ্গসমূহ (Epidermal appendages) : এপিডার্মিস বা ত্বক হতে উদ্গত উপাঙ্গকে এপিডার্মাল উপাঙ্গ বলে। এগুলো উদ্ভিদকে তৃণভোজী প্রাণীর কবল হতে রক্ষা করে। নিম্নে কয়েকটি উপাঙ্গের বর্ণনা দেয়া হলো।

(i) রোম বা ট্রাইকোম (Hair or trichome) : এরা এককোষী বা বহুকোষী এবং সরল বা গুচ্ছাকার হতে পারে। মূলরোম ত্বকের এককোষী উপাঙ্গ এবং সবক্ষেত্রে কিউটিকল বিবর্জিত। কাণ্ডরোম সাধারণত বহুকোষী এবং সর্বদা

কিউটিকলযুক্ত হয়ে থাকে। যেসব উদ্ভিদে বা অঙ্গে সেকেন্ডারি বৃদ্ধি ঘটে সে সব উদ্ভিদে বা অঙ্গে পেরিডার্মও ত্বকীয় টিস্যুর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

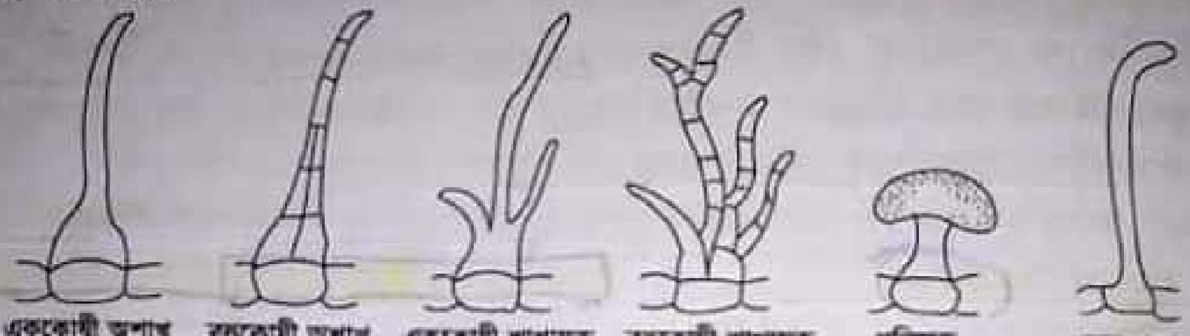

চিত্র ৮.৩ : বিভিন্ন প্রকার রোম।

কাজ : মূলরোম পানি শোষণ করে। কাণ্ডরোম আঠা, গদ ও বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে। উদ্ভিদকে বাইরের আঘাত হতে রক্ষা করে। এরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পানি সঞ্চয় করে।

(ii) শল্ক (Scales) : বিশেষ ধরনের রোমকে শল্ক বলে।

(iii) কোলেটার্স (Colleters) : বিশেষ ধরনের বহুকোষী ট্রাইকোমকে কোলেটার্স বলে।

(iv) থলি (Bladder) : বিশেষ ধরনের এক প্রকার পানি ধারক এবং প্রশস্ত ট্রাইকোমকে থলি বলে।

(গ) স্টোম্যাটা বা পত্ররন্ধ্র (Stomata) : পাতা ও কচি কাণ্ডের ত্বক ছিদ্রযুক্ত থাকে। ছিদ্রগুলো আণুবীক্ষণিক বলে খালি চোখে ধরা পড়ে না। এ সব ছিদ্র দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির রক্ষীকোষ দিয়ে বেষ্টিত থাকে। রক্ষীকোষে একটি বড় নিউক্লিয়াস, বহু ক্লোরোপ্লাস্ট এবং ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে।

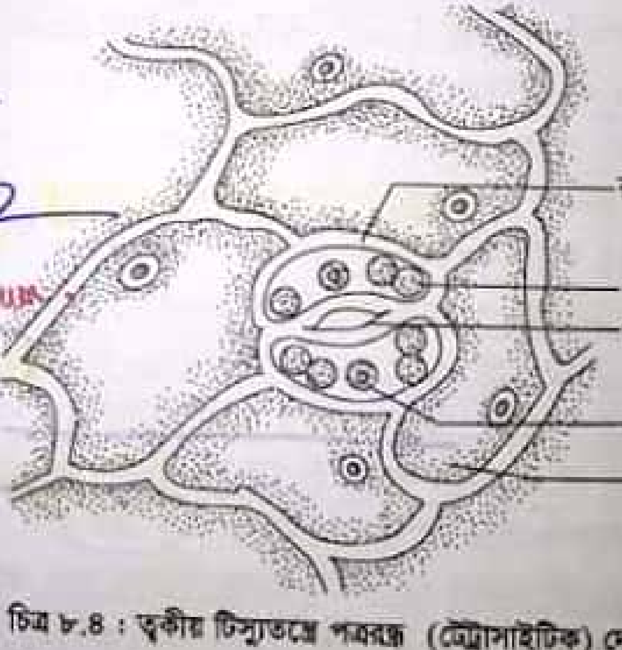

চিত্র ৮.৪ : ত্বকীয় টিস্যুতন্ত্রে পত্ররন্ধ্র (অ্যানোমোসাইটিক) দেখানো হয়েছে।

উদ্ভিদের বায়বীয় অংশের ত্বকে অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে বেষ্টিত ও নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ছিদ্রকে স্টোম্যাটা (এক বচনে স্টোমা) বা পত্ররন্ধ্র বলে। রক্ষীকোষের চারদিকে অবস্থিত সাধারণ ত্বকীয় কোষ হতে একটু ভিন্ন আকার-আকৃতির ত্বকীয় কোষকে সহকারি কোষ বলে। স্টোম্যাটার নিচে একটি বড় বায়ুকুঠুরী থাকে। এ বায়ুকুঠুরীকে সাব-স্টোম্যাটাল বায়ুকুঠুরী বা শ্বাসকুঠুরী (sub-stomatal air chamber or respiratory cavity) বলা হয়। পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধকরণ রক্ষীকোষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত দিনের বেলায় পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং রাত্রে বন্ধ থাকে, তবে পাথরকুচি গোত্রের উদ্ভিদে রাত্রে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং দিনে বন্ধ থাকে।

পত্ররন্ধ্রের প্রকারভেদ : রক্ষীকোষের চারদিকে অবস্থিত সাবসিডিয়ারি (সহকারি) কোষসমূহের সংখ্যা ও অবস্থান অনুযায়ী পত্ররন্ধ্র কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য কয়েক প্রকার পত্ররন্ধ্র নিম্নরূপ :

১। Diacytic : স্টোমা দু'টি সাবসিডিয়ারি কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। কোষ দু'টি রক্ষীকোষের সাথে সমকোণে অবস্থিত।

২। **Paracytic :** স্টোমা দু'টি সাবসিডিয়ারি কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। কোষ দু'টি রক্ষীকোষে সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

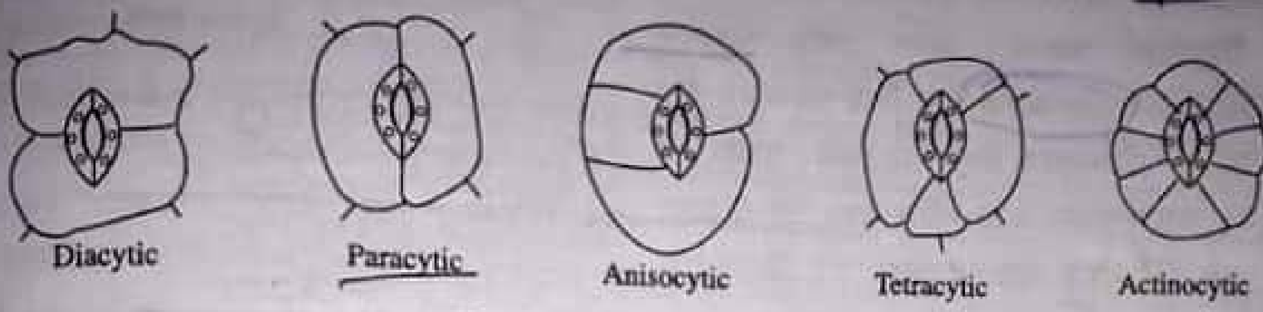

চিত্র ৮.৫ : বিভিন্ন ধরনের পত্ররন্ধ্র।

৩। **Anisocytic :** স্টোমা তিনটি সাবসিডিয়ারি কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তার মধ্যে একটি কোষ ছোট।

৪। **Tetracytic :** স্টোমা চারটি সাবসিডিয়ারি কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

৫। **Actinocytic :** স্টোমা অনেকগুলো রেডিয়েলি লম্বা কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

৬। **Anomocytic :** স্টোমাকে পরিবেষ্টনকারী কোষসমূহ সাধারণ ত্বকীয় কোষ থেকে পৃথকযোগ্য নয়।

পত্ররন্ধ্রের কাজ : (*i*) উদ্ভিদের ভেতর ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান করাই এর কাজ। (*ii*) সালোকসংশ্লেষণের সময় রন্ধ্রপথে বায়ু হতে CO_2 গ্যাস গ্রহণ ও O_2 গ্যাস ত্যাগ করে। (*iii*) শ্বসনের সময় রন্ধ্রপথে বায়ু হতে O_2 গ্যাস গ্রহণ ও CO_2 গ্যাস ত্যাগ করে। (*iv*) মূল কর্তৃক সংগৃহীত পানি প্রস্বেদনের সাহায্যে বাষ্পাকারে বের করে দেয়াই এ রন্ধ্রের প্রধান কাজ। (*v*) রক্ষীকোষ পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। (*vi*) রক্ষীকোষের ক্লোরোপ্লাস্ট খাদ্য তৈরি করে।

কাজেই সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন ও প্রস্বেদন–এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াতেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পত্ররন্ধ্র (স্টোমাটা) অংশগ্রহণ করে থাকে।

(ঘ) **পানি-পত্ররন্ধ্র বা হাইডাথোড (Hydathode) :** পানি-পত্ররন্ধ্র এক বিশেষ ধরনের পানি নির্মোচন অঙ্গ। ঘাস, কচু, টমেটো ইত্যাদি গাছের পাতার কিনারায় প্রচণ্ড গরমের দিনে পানির ফোঁটার সারি দেখে এ অঙ্গের অবস্থান জানা যায়। মাটিতে প্রচুর পানি থাকলে এবং আবহাওয়া অতিরিক্ত আর্দ্র থাকলে সাধারণত এমনটি ঘটে। বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভিদ দেহ থেকে পানি এই রন্ধ্রের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয় বলে এই রন্ধ্রপথকে পানি-পত্ররন্ধ্র বলে। এর শীর্ষে রক্ষীকোষে আবদ্ধ একটি রন্ধ্র থাকে। রন্ধ্রের নিচে একটি গহ্বর রয়েছে। গহ্বরের নিচে অনেকগুলো অসংলগ্ন কোষ থাকে, এগুলোকে বলা হয় এপিথেম বা এপিথেলিয়াম (epithelium)। এপিথেলিয়ামের ঠিক নিচে ট্রাকিডের শেষপ্রান্ত অবস্থিত। মূলজ চাপে পানি ট্রাকিডের শেষপ্রান্ত দিয়ে এপিথেলিয়ামের মাধ্যমে বিন্দু আকারে রন্ধ্রপথে জমা হয়। ভোরে এসব জল বিন্দু দেখা যায়। অন্য সময় পানি দ্রুত বাষ্পায়িত হয় এবং সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় বলে তা দেখা যায় না। হাইডাথোড দিয়ে তরল পানি বের হয়ে যাওয়াকে গাটেশন বলে।

চিত্র ৮.৬ : হাইডাথোড

২। **গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র (Ground tissue system) :** ত্বকীয় ও পরিবহনতন্ত্র ছাড়া উদ্ভিদদেহের অন্যান্য অংশ গঠনকারী টিস্যুতন্ত্রকে গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র বলে। আদি (fundamental) টিস্যুতন্ত্র নামেও এটি পরিচিত। এক বা একাধিক টিস্যু নিয়ে এই টিস্যুতন্ত্র গঠিত। উদ্ভিদের অধিকাংশ অংশ এই টিস্যুতন্ত্রের অন্তর্গত। সাধারণত প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে এই তন্ত্র গঠিত। অনেক সময় প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা– এই তিন প্রকার টিস্যু মিলিতভাবে এই টিস্যুতন্ত্র গঠন করে থাকে। পেরিব্লেম ভাজক টিস্যু হতে এই টিস্যুতন্ত্রের উৎপত্তি।

উদ্ভিদের এপিডার্মিস তথা ত্বক-এর নিচ হতে আরম্ভ করে ভাস্কুলার বান্ডল (vascular bundle) ব্যতীত কেন্দ্র প… এই টিস্যুতন্ত্রের অন্তর্গত। কতক ক্ষেত্রে অধঃত্বক (hypodermis) স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত হয় আর বাকি সবটুকু প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে তৈরি। পাতায় এই তন্ত্র শুধু প্যারেনকাইমা দিয়ে গঠিত হয়। সব উদ্ভিদের মূলে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এই টিস্যুতন্ত্রকে প্রধানত স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : (১) **বহিঃস্টিলীয় অঞ্চল** (extrastelar region) অর্থাৎ স্টিলীর বাইরের অংশ এবং (২) **অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চল** (intrastelar region) অর্থাৎ স্টিলীর ভেতরের অংশ। এখানে উল্লেখ্য যে, পেরিসাইকল স্তর হতে আরম্ভ করে ভাস্কুলার বান্ডলসহ কেন্দ্র পর্যন্ত অংশকে স্টিলি (stele) বলে।

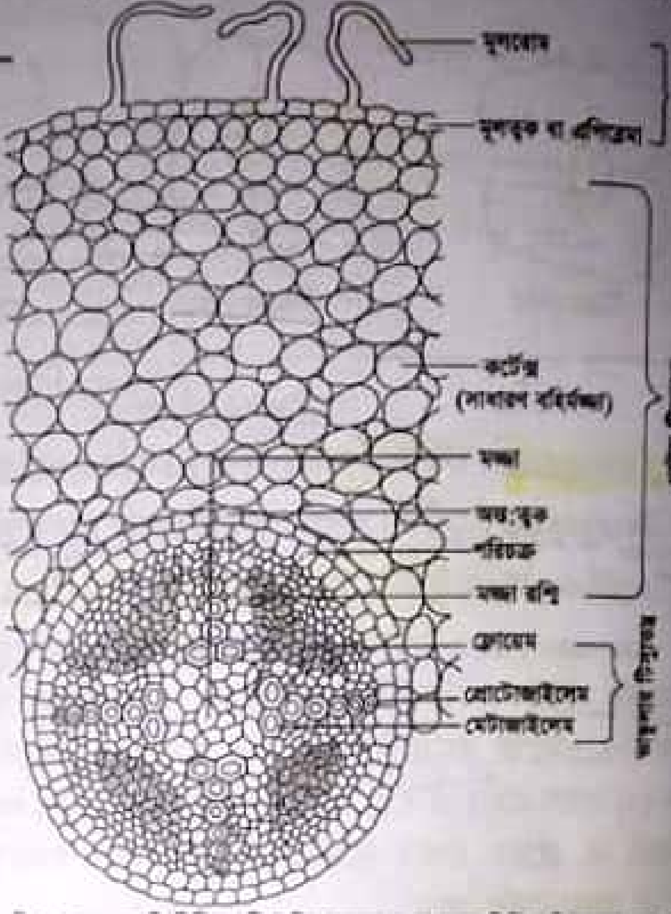

চিত্র ৮.৭ : একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ মূলের প্রস্থচ্ছেদে বিভিন্ন টিস্যুতন্ত্র দেখানো হয়ে…

কাজ : প্রধানত বিপাককরণ, খাদ্য সঞ্চয় এবং আংশিকভাবে দৃঢ়তা প্রদান করা।

(১) বহিঃস্টিলীয় অঞ্চল (Extrastelar region) : স্টিলীর বাইরের অংশকে বহিঃস্টিলীয় অঞ্চল বলে। এ অঞ্চল নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত :

(i) অধঃত্বক (Hypodermis) : ত্বকের নিচে কোলেনকাইমা বা স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যুর এক বা একাধিক স্তর থাকলে তাকে **অধঃত্বক** বলে। সাধারণত কাণ্ডেই অধঃত্বক থাকে। মূলে অধঃত্বক থাকে না।

কাজ : কাণ্ডকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করা এবং ভেতরের অংশকে রক্ষা করাই অধঃত্বকের প্রধান কাজ।

(ii) কর্টেক্স (Cortex) : অধঃত্বকের নিচ হতে আরম্ভ করে অন্তঃত্বকের উপর পর্যন্ত অংশকে **কর্টেক্স** বলে। এটি প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত এবং বহু স্তরবিশিষ্ট। পাশাপাশি কোষের মধ্যে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে। অনেক সময় অন্যান্য টিস্যুও বিক্ষিপ্তভাবে এই অংশে দেখা যায়। মূলের কর্টেক্স বহুস্তর বিশিষ্ট হয়। কাণ্ডের কর্টেক্স কয়েকস্তর বিশিষ্ট হয়।

কাজ : পানি ও খাদ্য সঞ্চয়ই মূলের কর্টেক্সের প্রধান কাজ। কাণ্ডের কর্টেক্স পানি ও খাদ্য সঞ্চয় ছাড়াও উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করে এবং সালোকসংশ্লেষণে অংশ গ্রহণ করে।

(iii) অন্তঃত্বক (Endodermis) : স্টিলীর বাইরে এবং কর্টেক্সের নিচে এক স্তরবিশিষ্ট **অন্তঃত্বক** অবস্থিত। মূলে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডে অন্তঃত্বক বিদ্যমান। এ স্তরের কোষগুলো ফাঁকবিহীনভাবে সন্নিবেশিত ও পিপাকৃতির (barrel shaped)। কোষগুলোর ভেতরের প্রাচীর ফিতার ন্যায় এবং লিগনিন ও সুবেরিনের আবরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে। এ আবরণকে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ (casperian strip) বলে। বিজ্ঞানী ক্যাসপেরি (Caspary) এটি লক্ষ্য করেন ১৮৬৫ সালে। মূলের অন্তঃত্বকে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ থাকে। অন্তঃত্বকের যেসব কোষগুলোর প্রাচীর পাতলা থাকে তাদের প্যাসেজ কোষ বলে। অনেক সময় এ স্তরে প্রচুর শ্বেতসার কণিকা বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়, তখন এ স্তরকে **শ্বেতসার আবরণ** (starch sheath) বলে। সাধারণত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে শ্বেতসার আবরণ থাকে। ভাস্কুলার বান্ডল ও তৎসংলগ্ন কোষগুলো যাতে বায়ু ও পানিতে আবদ্ধ হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য অন্তঃত্বক বাঁধ (dam) এর মতো কাজ করে।

কাজ : অন্তঃত্বক সম্ভবত খাদ্য সঞ্চয়, ভেতরের অংশকে রক্ষা করা এবং মূলজ চাপ নিয়ন্ত্রণ করায় ভূমিকা রাখে।

(২) অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চল (Intrastelar region) : পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ ছাড়া পেরিসাইকল স্তর হতে আরম্ভ করে মূল ও কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি। নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত :

(i) পেরিসাইকল বা পরিচক্র (Pericycle) : অন্তঃত্বকের নিচে এবং ভাস্কুলার বান্ডলের বাইরে এক বা একাধিক স্তরে বিন্যস্ত বিশেষ টিস্যুকে পেরিসাইকল বলে। কতক জলজ উদ্ভিদের মূলে বা কাণ্ডে এদের দেখতে পাওয়া যায় না। মূলে সাধারণত পেরিসাইকল এক স্তরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। শুধু প্যারেনকাইমা টিস্যু অথবা স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু অথবা দুই টিস্যুর মিশ্রণে এ স্তর গঠিত হতে পারে। কুমড়া ও কুমারিকা কাণ্ডে এটি বহুস্তর বিশিষ্ট ও স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত। স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু শুধু ফ্লোয়েমের মাথায় অবস্থান করলে এটিকে হার্ড বাস্ট বা গুচ্ছটুপি (bundle cap) বলে। এ স্তর হতে সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যুর সৃষ্টি হয়।

কাজ : খাদ্য সঞ্চয় ও কাণ্ডকে দৃঢ়তা প্রদান করে। এছাড়া পার্শ্বমূল সৃষ্টি করা এবং কাণ্ডে অস্থানিক মূল সৃষ্টি করা এ অংশের কাজ।

(ii) মজ্জা বা মেডুলা (Pith or Medulla) : পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ দিয়ে পরিবেষ্টিত মূল বা কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলের অংশকে মজ্জা বলে। মজ্জা সাধারণত প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত হয়। কখনো কখনো স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। মজ্জায় সাধারণত পাশাপাশি কোষের মধ্যে ফাঁক থাকে। অনেক সময় কিছু মজ্জাকোষ নষ্ট হয়ে মূল বা কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে একটি শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়।

কাজ : খাদ্য সঞ্চয়ই মজ্জার প্রধান কাজ। স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত হলে মজ্জা সে অংশকে দৃঢ়তা প্রদান করে থাকে।

(iii) মজ্জা রশ্মি (Medullary ray) : মজ্জা যদি দুটি পরিবহন টিস্যুগুচ্ছের মধ্য দিয়ে রশ্মির ন্যায় পেরিসাইকল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে সেই রশ্মির ন্যায় অংশকে মজ্জা রশ্মি বলে। এটি প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত।

কাজ : পানি ও খাদ্য পরিবহন করা। পানি ও খাদ্যবস্তু সঞ্চয় এবং প্রয়োজনে গৌণ টিস্যু সৃষ্টি করা মজ্জা রশ্মির কাজ।

পাতার গ্রাউন্ড টিস্যু : পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে মেসোফিল (mesophyll) বলে। এটি অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট ও পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। বিষমপৃষ্ঠ পাতায় মেসোফিল প্যালিসেড (palisade) ও স্পঞ্জী (spongy) প্যারেনকাইমা কোষ স্তরে বিভক্ত থাকে। প্যালিসেড প্যারেনকাইমা কোষগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট, লম্বাভাবে বিন্যস্ত এবং স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কোষগুলো প্রধানত অনিয়ত, ডিম্বাকার, কোষাবকাশভাবে বিন্যস্ত। সমাঙ্গপৃষ্ঠ পাতায় মেসোফিল টিস্যু শুধু এক ধরনের প্যারেনকাইমা টিস্যু (হয় স্পঞ্জী, নতুবা প্যালিসেড) নিয়ে গঠিত।

কাজ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করা এ টিস্যুর কাজ।

৩। ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র (Vascular tissue system) : ভাস্কুলার বান্ডলের (জাইলেম ও ফ্লোয়েম) সমন্বয়ে গঠিত টিস্যুতন্ত্রকে বলা হয় ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র। ফ্যাসিকুলার (fasicular) টিস্যুতন্ত্র নামেও এটি পরিচিত। এ টিস্যুতন্ত্র খাদ্য উপাদান ও তৈরিকৃত খাদ্য পরিবহন করে বলে একে পরিবহন টিস্যুতন্ত্রও বলা হয়। জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু নিয়ে এ টিস্যুতন্ত্র গঠিত। জাইলেম ও ফ্লোয়েম পৃথক পৃথকভাবে অথবা একসাথে থাকতে পারে। জাইলেম টিস্যু ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্যখানে ক্যাম্বিয়াম নামক ভাজক টিস্যু থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মাঝে অবস্থিত ভাজক টিস্যুই হলো ক্যাম্বিয়াম। প্রতিটি জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে একটি ভাস্কুলার বান্ডল গঠন করে এবং এক বা একাধিক ভাস্কুলার বান্ডল নিয়ে একটি ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র গঠিত হয়। উদ্ভিদমূলে এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদকাণ্ডে ভাস্কুলার বান্ডলগুলো সাধারণত বৃত্তাকারে সাজানো থাকে, তবে একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এরা কর্টেক্সের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

জাইলেম টিস্যু (Xylem tissue : Gk-*Xylon* = wood) : ট্রাকিড, ভেসেল (ট্রাকিয়া), জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যারেনকাইমা– এই চার প্রকার উপাদান দিয়ে জাইলেম টিস্যু গঠিত। পরিণত জাইলেম টিস্যুর সজীব উপাদান জাইলেম প্যারেনকাইমা। ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ এবং নগ্নবীজী উদ্ভিদে জাইলেম টিস্যুতে ভেসেল থাকে না। নগ্নবীজী *Gnetum*-

এ সরল প্রকৃতির ভেসেল থাকে)। ভেসেল আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলেও Winteraceae, Tetracentra Trochodendraceae গোত্রের উদ্ভিদে ভেসেল থাকে না।

কিছু ভেসেল কোষ সরু গর্তযুক্ত হয়, আবার কিছু ভেসেল কোষ বড় গর্তযুক্ত হয়। সরু গর্তযুক্ত ভেসেল কো প্রোটোজাইলেম বলা হয়। আসলে এরা প্রথমে সৃষ্টি হয় বলে এদের নাম হয়েছে আদিজাইলেম বা প্রোটোজাই অপেক্ষাকৃত পরে সৃষ্টি হয় বলে বড় গর্তযুক্ত ভেসেল কোষকে মেটাজাইলেম বলা হয়। আবৃতবীজী উদ্ভিদের মেটাজাইলেম স্টিলির কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত থাকে এবং প্রোটোজাইলেম স্টিলির পরিধির দিকে থাকে। কাণ্ডে অবস্থান ঠিক উল্টো; অর্থাৎ কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডলে মেটাজাইলেম পরিধির দিকে এবং প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের বিন্যস্ত থাকে, একে এন্ডার্ক (endarch) বলে। মূলের ভাস্কুলার টিস্যুতে প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে এবং মেটাজাই কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত থাকে, একে এক্সার্ক (exarch) বলে। পাতায় প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম উভয়ই কেন্দ্র পরিধি দুই দিকে বিন্যস্ত থাকে, একে মেসার্ক (mesarch) বলে। উদ্ভিদ নমুনার সেকশন কেটে প্রোটোজাইলেম মেটাজাইলেমের অবস্থান দেখেই বলা যায় কোনটি মূল আর কোনটি কাণ্ড।

ফ্লোয়েম টিস্যু (Phloem tissue : Gk-*Phloos* = bark) : সীভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লো ফাইবার– এই চার প্রকার কোষীয় উপাদান নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত। পরিণত সিভনল বা সিভকোষে কোনো নিউক্লি থাকে না। সঙ্গীকোষের নিউক্লিয়াস বড়, সাইটোপ্লাজম ঘন এবং কোষগহ্বর ছোট থাকে। নগ্নবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম টিস্যু সঙ্গীকোষ থাকে না। সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমে অবস্থিত ফাইবারকে বাস্ট ফাইবার বলা হয়। পাটের আঁশ বাস্ট ফাইবার।

পরিবহন টিস্যু (Vascular bandle) : উদ্ভিদদেহে যে টিস্যু খাদ্যের কাঁচামাল (পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি) তৈরিকৃত খাদ্য পরিবহন করে থাকে তাকে পরিবহন টিস্যু বলে। জাইলেম টিস্যু মূল হতে পাতা ও অন্যান্য সবুজ অ পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করে, আবার পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিদদেহের অন্যান্য সজী অংশে পরিবহন করে ফ্লোয়েম টিস্যু। তাই জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুই পরিবহন টিস্যু।

সাধারণত কাণ্ডে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু একই ব্যাসার্ধে অবস্থিত থেকে মিলিতভাবে একটি বান্ডল সৃষ্টি করে। মূ জাইলেম এবং ফ্লোয়েম পৃথক ব্যাসার্ধে থাকে এবং পৃথক পৃথক বান্ডল সৃষ্টি করে। জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর এই বান্ড খাদ্যদ্রব্য (কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত খাদ্য) পরিবহন করে। জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর গুচ্ছকে **ভাস্কুলার বান্ডল** বলে।

পুষ্পক উদ্ভিদের টিস্যুতন্ত্র, টিস্যু এবং গঠনকারী কোষ

টিস্যুতন্ত্র	টিস্যু	কোষ
(ক) এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র (দেহের আচ্ছাদন তৈরি)	(i) এপিডার্মিস (ii) পেরিডার্ম	প্যারেনকাইমা কোষ, রক্ষীকোষ, ট্রাইকোম কর্ককোষ, কর্ক-ক্যাম্বিয়াম,
(খ) গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র (ফটোসিনথেসিস, সঞ্চয় এবং দৃঢ়তা প্রদান)	প্যারেনকাইমা কোলেনকাইমা স্ক্লেরেনকাইমা	প্যারেনকাইমা কোষ কোলেনকাইমা কোষ স্ক্লেরেনকাইমা কোষ
(গ) ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র (পানি, খনিজ লবণ, তৈরি খাদ্য পরিবহন ও দৃঢ়তা প্রদান)।	(i) জাইলেম (ii) ফ্লোয়েম	ট্রাকিড, ভেসেল, প্যারেনকাইমা কোষ, ফাইবার সিভনল, সঙ্গীকোষ, প্যারেনকাইমা কোষ, ফাইবার, কর্ক প্যারেনকাইমা

ভাস্কুলার বান্ডল-এর প্রকারভেদ : জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর তুলনামূলক অবস্থানের উপর নির্ভর করে ভাস্কু বান্ডলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : (১) সংযুক্ত (conjoint), (২) অরীয় (radial) এবং (৩) কেন্দ্রি (concentric)।

(১) সংযুক্ত (Conjoint) : জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধের উপর একই গুচ্ছে যুক্তভাবে অবস্থান করলে তা সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডল বলে। ফ্লোয়েমের সংখ্যা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে সংযুক্ত ভাস্কুলার বান্ডলকে আবার দু'ভা ভাগ করা হয়েছে; যথা : (i) সমপার্শ্বীয় (collateral) এবং (ii) সমদ্বিপার্শ্বীয় (bicollateral)।

(i) **সমপার্শ্বীয় (Collateral)** : এক খণ্ড ফ্লোয়েম টিস্যু এবং এক খণ্ড জাইলেম টিস্যু একই ব্যাসার্ধে পাশাপাশি (ফ্লোয়েম পরিধির তথা বাইরের দিকে এবং জাইলেম কেন্দ্রের তথা ভেতরের দিকে) অবস্থান করলে তাকে সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে। পুষ্পক উদ্ভিদের কাণ্ডে এ ধরনের বান্ডল দেখা যায়। ক্যাম্বিয়ামের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে এই ভাস্কুলার বান্ডলকে আবার নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(a) **মুক্ত সমপার্শ্বীয় (Open collateral)** : একই ব্যাসার্ধে পাশাপাশি অবস্থিত জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম (জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে কয়েক স্তরবিশিষ্ট আয়তাকার ভাজক কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকে ক্যাম্বিয়াম বলে) থাকলে তাকে মুক্ত সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে; যেমন- দ্বিবীজপত্রী (কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড ব্যতীত) ও নগ্নবীজী উদ্ভিদের কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডল।

(b) **বদ্ধ সমপার্শ্বীয় (Closed collateral)** : সমপার্শ্বীয় বান্ডলের জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যখানে ক্যাম্বিয়াম না থাকলে তাকে বদ্ধ সমপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে; যেমন-একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের ভাস্কুলার বান্ডল।

(ii) **সমদ্বিপার্শ্বীয় (Bicollateral)** : যে ভাস্কুলার বান্ডলের মাঝখানে জাইলেম এবং তার উপর ও নিচ উভয় পাশে দুই খণ্ড ফ্লোয়েম টিস্যু থাকে তাকে সমদ্বিপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে। সমদ্বিপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেমের উভয় পাশেই ক্যাম্বিয়াম থাকে, তাই সমদ্বিপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল সব সময়ই মুক্ত। জাইলেমের বাইরের দিকের (পরিধির দিকের) ফ্লোয়েমকে **বহিঃফ্লোয়েম** এবং ভেতরের দিকের (কেন্দ্রের দিকের) ফ্লোয়েমকে **অন্তঃফ্লোয়েম** বলে। লাউ, কুমড়া ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ডে সমদ্বিপার্শ্বীয় ভাস্কুলার বান্ডল উপস্থিত।

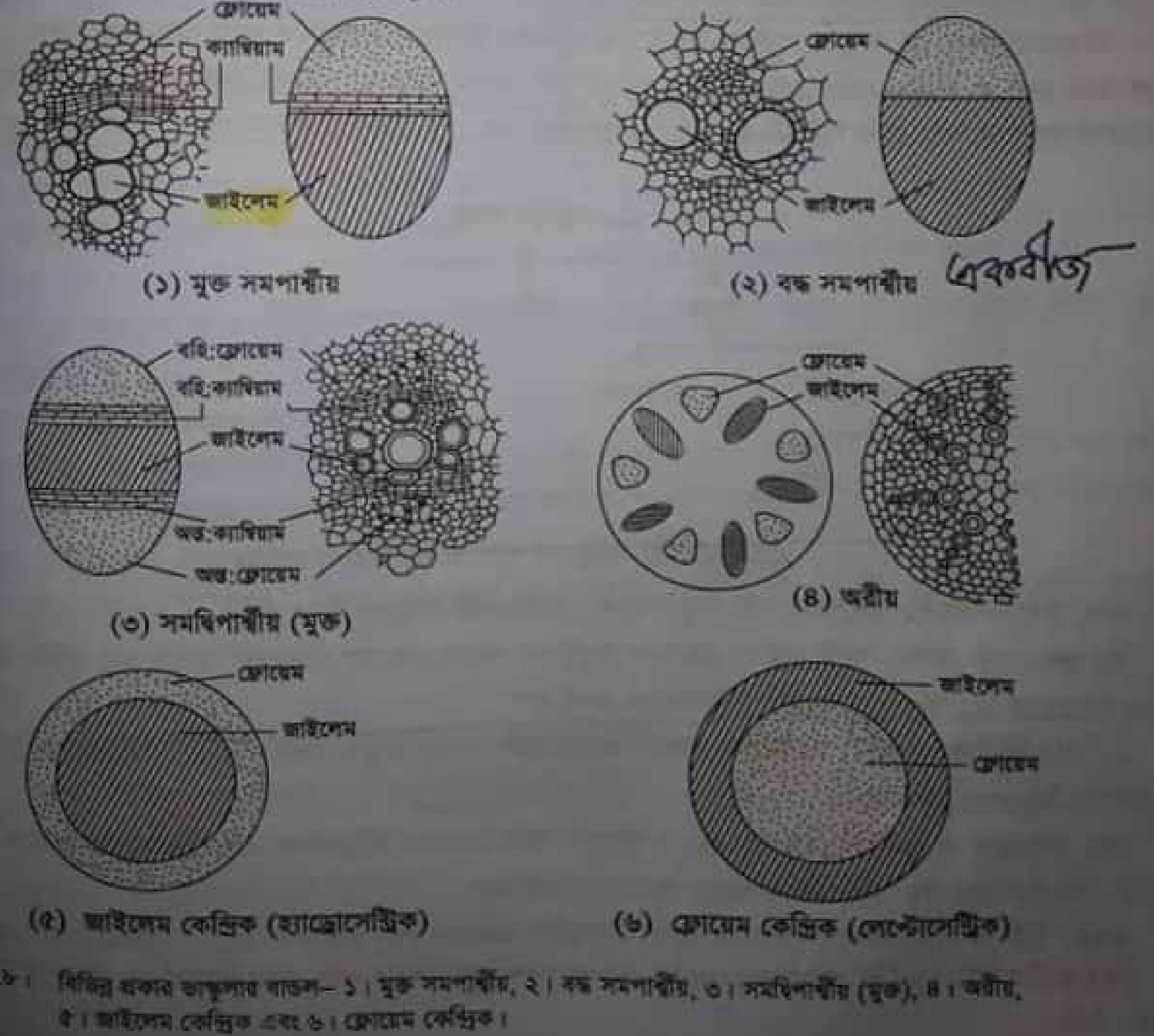

চিত্র ৮.৮। বিভিন্ন প্রকার ভাস্কুলার বান্ডল- ১। মুক্ত সমপার্শ্বীয়, ২। বদ্ধ সমপার্শ্বীয়, ৩। সমদ্বিপার্শ্বীয় (মুক্ত), ৪। অরীয়, ৫। জাইলেম কেন্দ্রিক এবং ৬। ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক।

(২) অরীয় (Radial) : যে ভাস্কুলার বান্ডলে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একত্রে একটি বান্ডলের সৃষ্টি না করে পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন বান্ডলের সৃষ্টি করে এবং জাইলেম বান্ডল ও ফ্লোয়েম বান্ডল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে পাশাপাশি অবস্থান করে তাকে অরীয় ভাস্কুলার বান্ডল বলে। পুষ্পক উদ্ভিদের মূলে এ ধরনের ভাস্কুলার বান্ডল দেখা যায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে জাইলেম অথবা ফ্লোয়েম বান্ডল-এর সংখ্যা সাধারণত পাঁচ এর কম থাকে কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে এদের প্রত্যেকের সংখ্যা সাধারণত ছয় এর অধিক।

(৩) কেন্দ্রিক (Concentric) : জাইলেম অথবা ফ্লোয়েম টিস্যুর যে কোনো একটি কেন্দ্রে থাকে এবং অন্যটি তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখলে তাকে **কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল** বলে। কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডল সব সময়ই বদ্ধ হয়। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যখানে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না। সাধারণত টেরিডোফাইটে এ ধরনের বান্ডল অধিক দেখা যায়। জাইলেম ও ফ্লোয়েমের তুলনামূলক অবস্থানের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রিক ভাস্কুলার বান্ডলকে নিম্নলিখিত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা :

(i) হ্যাড্রোসেন্ট্রিক বা জাইলেম কেন্দ্রিক (Hadrocentric) : এ ক্ষেত্রে জাইলেম কেন্দ্রে থাকে এবং ফ্লোয়েম তাকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে রাখে; যেমন- *Pteris, Lycopodium* ইত্যাদি উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল।

(ii) লেপ্টোসেন্ট্রিক বা ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক (Leptocentric) : এ ক্ষেত্রে ফ্লোয়েম কেন্দ্রে থাকে এবং জাইলেম তাকে ঘিরে রাখে; যেমন- *Dracaena* উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল।

ভাস্কুলার বান্ডল-এর কাজ : ভাস্কুলার বান্ডল তথা পরিবহন টিস্যুতন্ত্র নিম্নলিখিত কাজ করে থাকে, যথা : (i) উদ্ভিদের মূল হতে কাণ্ড ও পাতায় পানি এবং দ্রবীভূত খনিজ লবণ আয়ন হিসেবে পরিবহন করা, (ii) পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের মূল হতে কচি মুকুল পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা এবং (iii) উদ্ভিদকে দৃঢ়তা এবং যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করা।

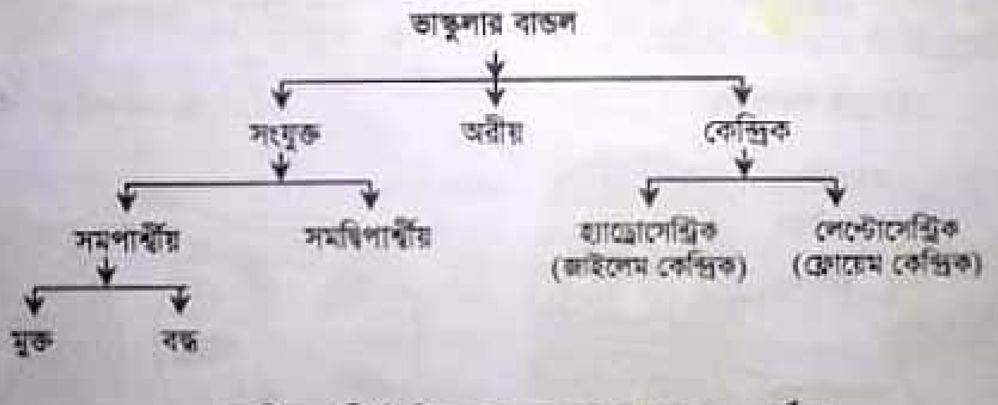

একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের অন্তর্গঠন

ঘাস, বাঁশ, কলাবতী, ধান, গম, ভুট্টা, কচু ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ।

কচু মূল : কচু মূলের একটি পাতলা প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে এর পরিধি হতে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়।

১। বহিঃস্টিলীয় অঞ্চল : এপিব্লেমা থেকে এন্ডোডার্মিস পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হলো বহিঃস্টিলীয় অঞ্চল। এতে নিম্নলিখিত টিস্যুগুলো দেখা যায়।

(ক) এপিব্লেমা বা মূলত্বক (Epiblema) : মূলত্বক অতি ঘনভাবে সন্নিবেশিত একসারি প্যারেনকাইমা কোষ নিয়ে গঠিত। মূলত্বকে কিছু কিছু এককোষী মূলরোম দেখতে পাওয়া যায়।

কাজ : পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করা এবং অভ্যন্তরীণ অংশকে রক্ষা করা।

(খ) কর্টেক্স (Cortex) বা বহির্মজ্জা : কর্টেক্স অনেক অংশ জুড়ে বিস্তৃত এবং একে নিম্নলিখিত অংশে ভাগ করা যেতে পারে। যথা :

(i) **জেনারেল কর্টেক্স (General cortex) বা সাধারণ বহির্মজ্জা :** সাধারণ বহির্মজ্জা পাতলা প্রাচীরযুক্ত অনেকসারি প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে আন্তঃকোষীয় ফাঁক বিদ্যমান। (কখনো কখনো অ্যারেনকাইমা অর্থাৎ বায়ুকুঠুরী থাকতে পারে)।

কাজ : খাদ্য সঞ্চয় করা।

(ii) **এন্ডোডার্মিস (Endodermis) বা অন্তস্ত্বক :** এটি একসারি পিপাকৃতির কোষ দিয়ে গঠিত। কোষগুলো পরস্পর অতি ঘনভাবে সন্নিবেশিত। এ কোষগুলোর পার্শ্বপ্রাচীর ও বাইরের প্রাচীরটি স্থূল।

কাজ : কর্টেক্স হতে পরিচক্রকে পৃথক করা এবং সম্ভবত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।

২। **অন্তঃস্টিলীয় অঞ্চল :** পেরিসাইকল থেকে মজ্জা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। এতে নিম্নলিখিত টিস্যুগুলো দেখা যায়।

(ক) **পেরিসাইকল (Pericycle) বা পরিচক্র :** এটি একসারি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট ছোট প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। কোষগুলো খুব ঘনভাবে সন্নিবেশিত।

কাজ : নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্য সঞ্চয় করা।

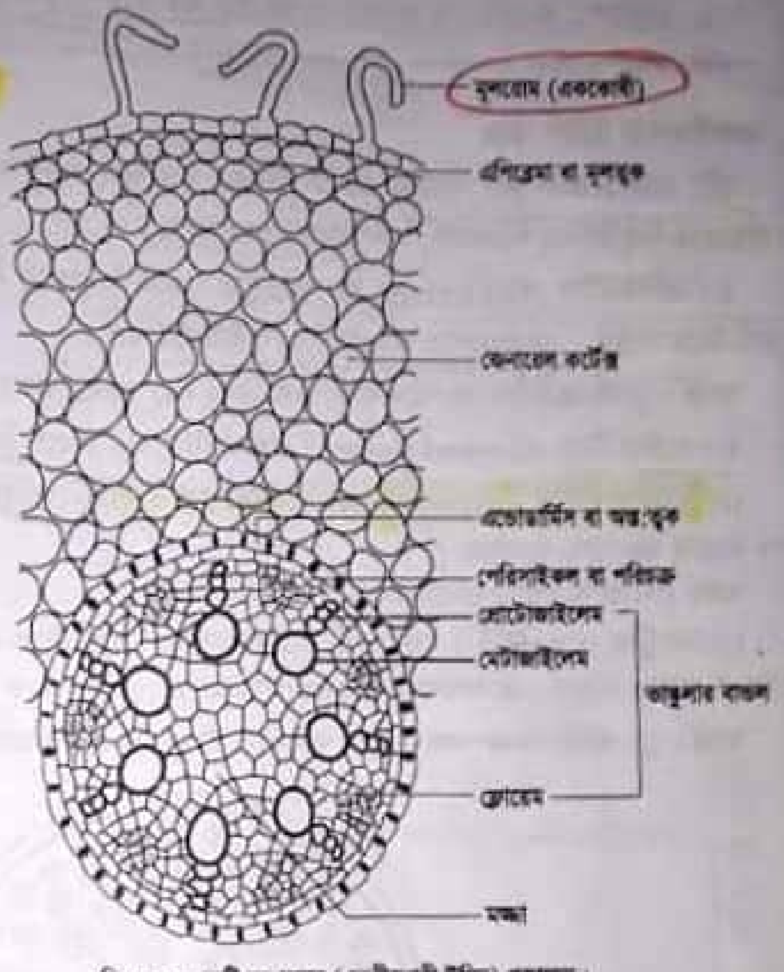

চিত্র ৮.৯ : একটি কচু মূলের (একবীজপত্রী উদ্ভিদ) প্রস্থচ্ছেদ।

(খ) **ভাস্কুলার বান্ডল (Vascular bundle) বা পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ :** জাইলেম বা ফ্লোয়েম গুচ্ছের সংখ্যা ছয়ের অধিক। এরা ভিন্ন ব্যাসার্ধে অরীয়ভাবে এবং চক্রাকারে সাজানো থাকে। প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে এবং মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে থাকে অর্থাৎ জাইলেম বহিঃস্থ প্রকার (exarch)।

কাজ : খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করা।

(গ) **মজ্জা রশ্মি বা সংযোজক টিস্যু (Medallary ray or conjunctive tissue) :** পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্যারেনকাইমা জাতীয় যে সব কোষ জাইলেম ও ফ্লোয়েম গুচ্ছকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এরাই মজ্জা রশ্মি বা সংযোজক টিস্যু গঠন করে।

কাজ : পরিচক্র ও মজ্জার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা।

(ঘ) **পিথ (Pith) বা মজ্জা :** মূলের কেন্দ্রস্থলে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ দিয়ে গঠিত অংশকেই মজ্জা বলে। তুলনামূলকভাবে কচু মূলে মজ্জা বড়।

কাজ : খাদ্য সঞ্চয় করা।

একবীজপত্রী উদ্ভিদ মূলের অন্তর্গঠনগত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

i. ত্বকে কিউটিকল অনুপস্থিত। এতে এককোষী রোম আছে।
ii. অধঃত্বক অনুপস্থিত।
iii. কর্টেক্স বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত নয়।
iv. পরিচক্র একসারি কোষ দিয়ে গঠিত।

v. ভাস্কুলার বান্ডল অরীয় এবং একান্তরভাবে সজ্জিত।

vi. মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে এবং প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে অবস্থিত।

vii. জাইলেম বা ফ্লোয়েম গুচ্ছের সংখ্যা ছয় এর অধিক। (দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ মূলে এই সংখ্যা সাধারণত ২-৪টি)।

viii. মজ্জা বৃহৎ।

একবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ড

ভুট্টা কাণ্ড : কচি ভুট্টা কাণ্ডের একটি পাতলা প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অবলোকন করলে পরিধি হতে কেন্দ্রের দিকে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়।

১। এপিডার্মিস (Epidermis) বা বহিঃত্বক : এটি সবচেয়ে বাইরের স্তর। বহিঃত্বক একসারি চ্যাপ্টা প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। কোষগুলোর বহিঃপ্রাচীর কিউটিকল যুক্ত।

কাজ : (i) অভ্যন্তরীণ অংশকে রক্ষা করা এবং (ii) পানির অপচয় রোধ করা।

২। গ্রাউন্ড টিস্যু (Ground tissue) : গ্রাউন্ড টিস্যু দুই অংশে বিভক্ত, যথা :

(i) হাইপোডার্মিস (Hypodermis) বা অধঃত্বক : এটি একাধিক সারি স্ক্লেরেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। বহিঃত্বকের ঠিক নিচেই অধঃত্বক অবস্থিত।

কাজ : কাণ্ডকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

(ii) কর্টেক্স (Cortex) : বহু সারি প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। অধঃত্বকের নিচ হতে কাণ্ডের কেন্দ্র পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। এ অঞ্চলের কোষগুলোর আন্তঃকোষীয় ফাঁক আছে।

কাজ : (i) খাদ্য সঞ্চয় করা ও (ii) পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ ধারণ করা।

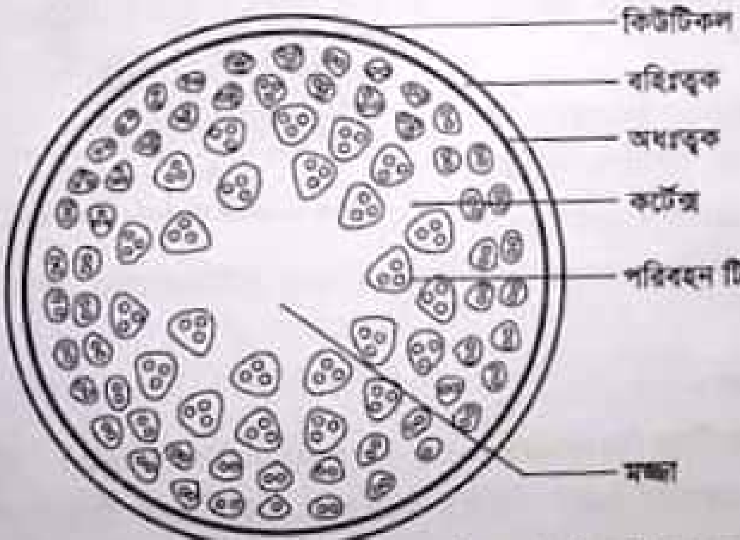

চিত্র ৮.১০ : একবীজপত্রী কাণ্ডের প্রাথমিক অন্তর্গঠন (ডায়াগ্রামেটিক); নমুনা—ভুট্টা কাণ্ড।

৪। ভাস্কুলার বান্ডল (Vascular bundle) বা পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ : ভাস্কুলার বান্ডল সংখ্যায় অনেক। এরা গ্রাউন্ড টিস্যুতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। বান্ডলগুলো সমপার্শ্বীয় এবং বদ্ধ। পরিধির দিকে অধিক সংখ্যক অবস্থিত। এরা অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির এবং ঘন সন্নিবেশিত। প্রতিটি ভাস্কুলার বান্ডল স্ক্লেরেনকাইমা কোষের আবরণী দিয়ে পরিবেষ্টিত। শুধু ফ্লোয়েম ও জাইলেম দিয়ে ভাস্কুলার বান্ডল গঠিত। এতে কোনো ক্যাম্বিয়াম নেই। প্রতিটি বান্ডল নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।

(i) জাইলেম (Xylem) : জাইলেম টিস্যুর গঠন অনেকটা ইংরেজি 'Y' অক্ষরের মতো। মেটাজাইলেম 'Y' এর দুই বাহুতে এবং প্রোটোজাইলেম লেজের দিকে অবস্থিত। প্রতিটি বান্ডলে প্রোটোজাইলেমের নিচে একটি ছোট গহ্বর দেখা যায়। কেন্দ্রের দিকের প্রোটোজাইলেম ও এর আশপাশের প্যারেনকাইমা কোষ বিনষ্ট হয়ে এ গহ্বর সৃষ্টি হয়।

কাজ : পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করা।

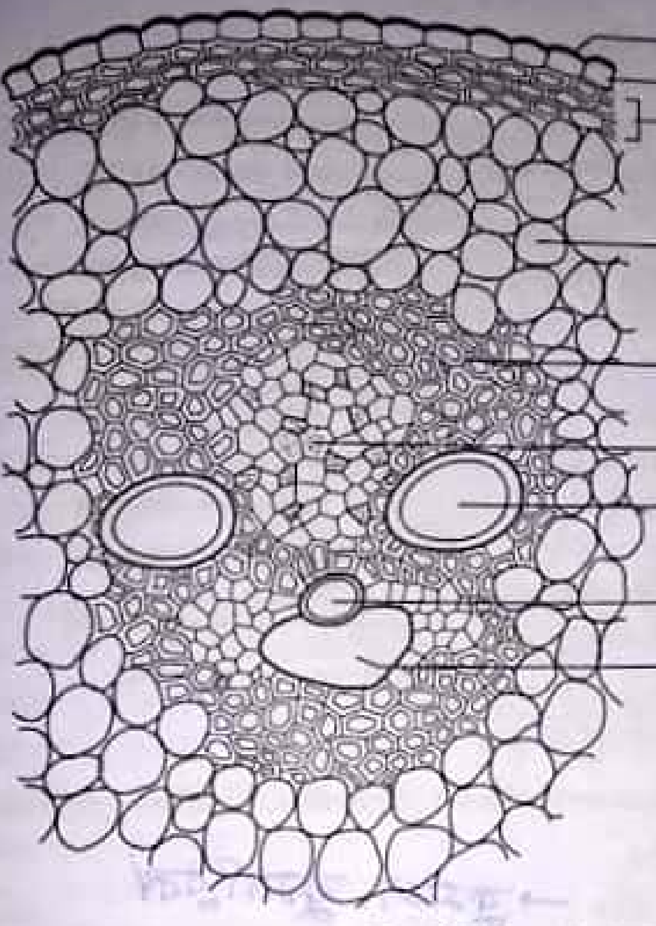

চিত্র ৮.১১ : একটি ভুট্টা কাণ্ডের (একবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ড) প্রস্থচ্ছেদ।

(ii) ফ্লোয়েম (Phloem) : এটি জাইলেম টিস্যুর Y-এর দুটি বাহুর মাঝখানে অবস্থিত। সীভনল এবং সঙ্গীকোষ দিয়ে ফ্লোয়েম গঠিত। এতে কোনো ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা নেই।

কাজ : প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবহন করা।

৫। মজ্জা ও মজ্জা রশ্মি : এতে ছোট মজ্জা আছে কিন্তু সুস্পষ্ট মজ্জা রশ্মি নেই।

একবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের অন্তর্গঠনগত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। সাধারণত কাণ্ডরোম অনুপস্থিত।

২। বহিঃত্বকে কিউটিকল উপস্থিত।

৩। অধঃত্বক আছে এবং সাধারণত স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত।

৪। ভাস্কুলার বান্ডলগুলো গ্রাউন্ড টিস্যুতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো।

৫। মেটাজাইলেম পরিধির দিকে এবং প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত।

৬। জাইলেম Y বা V আকৃতিবিশিষ্ট।

৭। ভাস্কুলার বান্ডল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও বদ্ধ (জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ক্যাম্বিয়াম নেই)।

■ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের প্রাথমিক অন্তর্গঠন (নমুনা : সূর্যমুখী) :

[শুধু একবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ডের সাথে তুলনা করে দেখার এবং শেখার জন্য ডায়াগ্রামেটিক চিত্রের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।]

(i) বহিঃত্বক : বহিঃত্বকে কিউটিকল ও কাণ্ডরোম আছে।

(ii) অধঃত্বক : একাধিক সারি কোষে গঠিত।

(iii) সাধারণ কর্টেক্স : বহুসারি কোষ নিয়ে গঠিত।

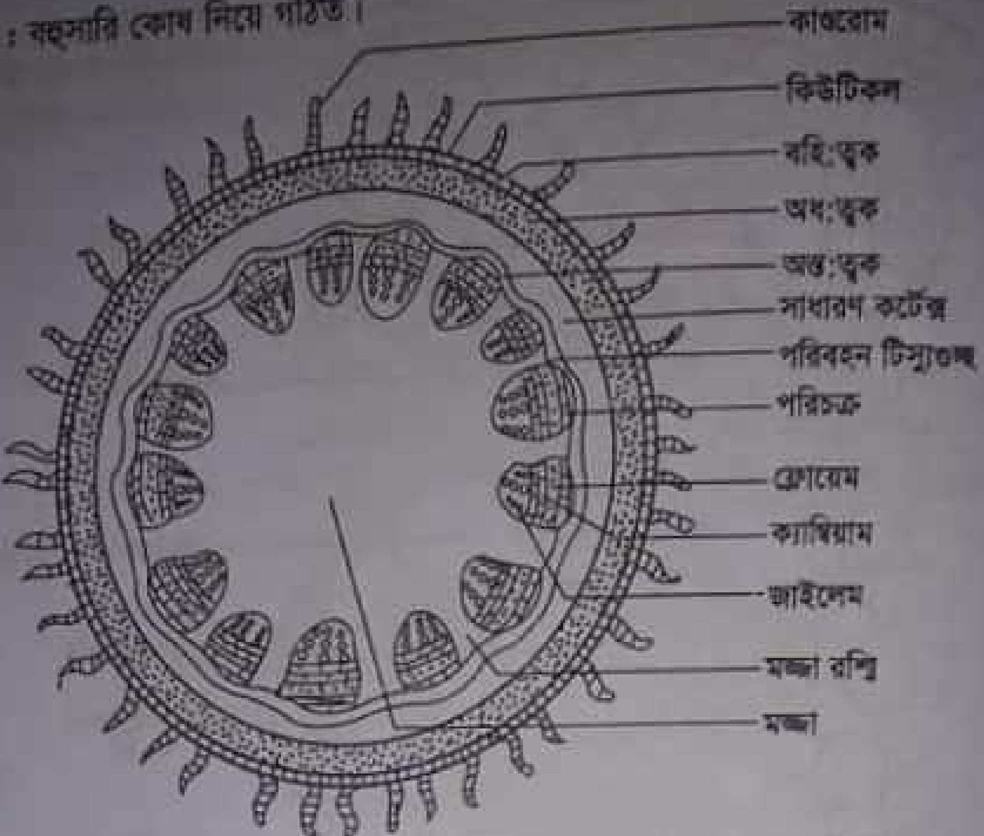

চিত্র ৮.১২ : দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের প্রাথমিক অন্তর্গঠন (ডায়াগ্রামেটিক); নমুনা- কচি সূর্যমুখী কাণ্ড।

(iv) **অন্তঃত্বক :** একসারি কোষ নিয়ে গঠিত।

(v) **পরিচক্র :** একাধিক সারি কোষ দিয়ে গঠিত। → কুমড়া, কুমারিকা

(vi) **পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ :** চক্রাকারে সজ্জিত। ভাস্কুলার বান্ডল সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় ও মুক্ত। মেটাজাইলেম পরি... দিকে অবস্থিত।

(vii) **মজ্জা ও মজ্জারশ্মি :** কেন্দ্রে মজ্জা অবস্থিত, দুই বান্ডলের মাঝখানে মজ্জারশ্মি অবস্থিত।

(১) এটি কাণ্ড- কারণ ত্বকরোম বহুকোষী, ভাস্কুলার বান্ডল সংযুক্ত।

(২) এটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ কাণ্ড-কারণ ভাস্কুলার বান্ডল মুক্ত সমপার্শ্বীয়।

ব্যবহারিক

উপকরণ : যে কোনো একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ড, কাচের বাটি, পানি, ব্লেড/ রেজার, আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র, স্লাইড, কভার স্লিপ, স্যাফ্রানিন দ্রবণ, তুলি/ নিডল ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : কচু, ভুট্টা, কলাবতী (সর্বজয়া) ইত্যাদি যেকোনো একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের পাতলা প্রস্থচ্ছেদ করে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করে গঠন বৈশিষ্ট্য জানা যায় এবং শনাক্ত করা যায়। কলাবতী বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, কলেজ আঙিনায় লাগিয়ে রাখলে বাহারী ফুলদায়ী উদ্ভিদ হিসেবে সৌন্দর্য বাড়াবে আবার ব্যবহারিক নমুনা সংগ্রহ করা যাবে।

ব্লেড বা রেজার দিয়ে নমুনার পাতলা প্রস্থচ্ছেদ কেটে কাচের বাটিতে পানির মধ্যে রেখে তাতে কয়েক ফোঁটা স্যাফ্রানিন দ্রবণ মিশিয়ে দিলে ভাস্কুলার বান্ডলসহ অন্যান্য শক্ত টিস্যুগুলো লাল রং প্রাপ্ত হবে, ফলে সহজেই বিভিন্ন টিস্যু শনাক্ত করা যাবে।

কাচের স্লাইডে এক ফোঁটা পানি নাও। বাটি থেকে তুলির সাহায্যে একটি পাতলা প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে স্লাইডে রাখ এবং সাবধানে নমুনার উপর একটি কভার স্লিপ রাখ। স্লাইডটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্থাপন কর এবং ২০x অভিলক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ কর, চিত্র আঁক এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। তোমার অঙ্কিত প্রস্থচ্ছেদটি কেন একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ড তা কারণসহ উল্লেখ কর। শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য টেক্সট-এ বলা আছে।

সার-সংক্ষেপ

ভাজক টিস্যু (মেরিস্টেম) : যে টিস্যুর কোষসমূহ বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়, ফলে উদ্ভিদাঙ্গ দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সে টিস্যুই ভাজক টিস্যু। কতক ভাজক টিস্যু উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড বা এদের শাখা-প্রশাখার শীর্ষে অবস্থিত, এদেরকে বলা হয় শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যু। এদের বিভাজনের কারণে উদ্ভিদের কাণ্ড বা মূল এবং এদের শাখা-প্রশাখা দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। কতক ভাজক টিস্যু উদ্ভিদাঙ্গের পার্শ্ব বরাবর লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত, এদেরকে বলা হয় পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু। পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যুর বিভাজনের কারণে উদ্ভিদাঙ্গ প্রস্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদের জীবনে ভাজক টিস্যুর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ ভাজক টিস্যু না থাকলে উদ্ভিদের দেহ গঠন ও বৃদ্ধি হতো না।

ভাস্কুলার টিস্যু : জাইলেম ও ফ্লোয়েম-এর সমন্বয়ে গঠিত টিস্যুই ভাস্কুলার টিস্যু। কেবলমাত্র টেরিডোফাইটস, নগ্নবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে ভাস্কুলার টিস্যু থাকে, তাই এদেরকে ভাস্কুলার উদ্ভিদ বলা হয়। ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যারেনকাইমা নিয়ে জাইলেম টিস্যু গঠিত। সীভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম ফাইবার ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত। একাধিক প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত বলে এরা জটিল টিস্যু। এ টিস্যুর কোষসমূহ বিভাজনে অক্ষম বলে এরা **স্থায়ী টিস্যু**। কাজেই ভাস্কুলার টিস্যু হলো **স্থায়ী** এবং **জটিল টিস্যু**। জাইলেম টিস্যু প্রধানত মূল থেকে পাতা পর্যন্ত পানি পরিবহন করে, অপরপক্ষে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের সব সজীব কোষে পৌঁছে। খাদ্য এবং খাদ্যের কাঁচামাল পরিবহন করে বলে এরা **পরিবহন টিস্যু** নামেও পরিচিত। মূলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম পৃথক পৃথক বান্ডলে অবস্থান করে, কিন্তু কাণ্ডে একই বান্ডলে অবস্থান করে। কাজেই ভাস্কুলার বান্ডলের প্রকৃতি দেখে মূল এবং কাণ্ড শনাক্ত করা যায়।

টিস্যুতন্ত্র : টিস্যু দিয়ে টিস্যুতন্ত্র গঠিত হয়। একই ধরনের কাজ করে এমন এক বা একাধিক টিস্যু মিলেই একটি টিস্যুতন্ত্র গঠন করে। অবস্থান ও কাজের উপর ভিত্তি করে টিস্যুতন্ত্র তিন প্রকার; যথা- এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র, গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র এবং ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র। উদ্ভিদাঙ্গের বহিরাবরণ সৃষ্টিকারী টিস্যুর নাম এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র। অভ্যন্তরীণ অংশকে রক্ষা করা এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্রের প্রধান কাজ। উদ্ভিদাঙ্গের মূলভিত্তি গঠনকারী টিস্যু সমষ্টিকে নিয়ে গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র গঠিত। গ্রাউন্ড টিস্যু একাধিক অংশে বিভক্ত। জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু দিয়ে গঠিত টিস্যুতন্ত্রকে ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র বলা হয়। উদ্ভিদাঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান এবং খাদ্য ও কাঁচামাল পরিবহনই ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্রের প্রধান কাজ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। উদ্ভিদের মূলে কোন ধরনের ভাস্কুলার বান্ডল থাকে ?

(ক) সমপার্শ্বীয় (খ) সমদ্বিপার্শ্বীয় (গ) অরীয় (ঘ) কেন্দ্রিক

২। ভাজক টিস্যুর বৈশিষ্ট্য হলো–

(i) এই টিস্যুর কোষগুলো বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন

(ii) এই টিস্যু খাদ্য তৈরি করে

(iii) এই টিস্যুর কোষীয় বিপাক হার বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাশের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

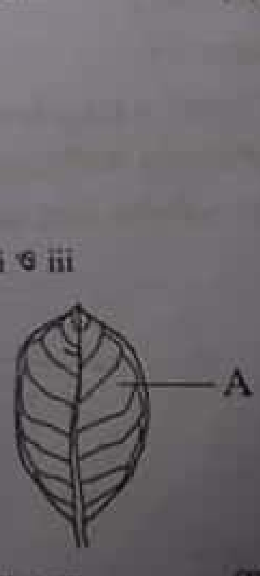

৩। পাশের চিত্রে পাতার A স্থানটি–

(i) দুটি রক্ষীকোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত

(ii) শ্বাস কুঠুরী বিদ্যমান

(iii) ভাজক টিস্যু দ্বারা পরিবেষ্টিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নবম অধ্যায়

উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব

PLANT PHYSIOLOGY

প্রধান শব্দসমূহ : পত্ররন্ধ্র, প্রস্বেদন, ফটোফসফোরাইলেশন, সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক, পানি ও খনিজ লবণ পরিশোষণ, কোষ রসের আরোহণ, প্রস্বেদন ইত্যাদি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পেয়েছ। এই অধ্যায়ে উক্ত প্রক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

প্রতিটি সজীব উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে বহুবিধ শারীরতাত্ত্বিক (physiological) ক্রিয়া-বিক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। একাধিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া মিলিতভাবে এক একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (physiological process) সম্পন্ন করে। উদ্ভিদ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হলো খনিজ লবণ পরিশোষণ, রস উত্তোলন, সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, প্রস্বেদন প্রভৃতি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

R Stephen Hales নামক একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বলেন যে, উদ্ভিদ বায়ু থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে এবং সূর্যালোক হয়ত এতে অংশগ্রহণ করে। এ কারণে তাঁকে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের (Plant Physiology) জনক বলা হয়। Plant Physiology শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ *Physis* (nature) এবং *logos* (discourse) থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. আধুনিক মতবাদসহ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
৩. সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৪. চিত্রসহ পত্ররন্ধ্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।
৫. পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়ার কৌশল বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৬. পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
৭. ব্যবহারিক
 o পত্ররন্ধ্রের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারবে।
৮. ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্র বর্ণনা করতে পারবে।
৯. ক্যালভিন চক্র ও হ্যাচ এন্ড স্ল্যাক চক্রের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
১০. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় লিমিটিং ফ্যাক্টরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
১১. ব্যবহারিক
 o সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অপরিহার্যতার পরীক্ষাটি করতে পারবে।
১২. সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
১৩. অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
১৪. শিল্পে অবাত শ্বসনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫. শ্বসনের প্রভাবকসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
১৬. ব্যবহারিক
 o অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করতে পারবে।

খনিজ লবণ পরিশোষণ (Absorption of Mineral Salts)

উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত দেহাভ্যন্তরে এগুলো তৈরি হয় না; বাইরে থেকে, বিশেষ করে মাটি থেকে এসব খনিজ লবণ শোষণ করে নিতে হয়। স্বাস্থ্যপ্রদ ও শারীরিক পরিপূর্ণতার জন্য এগুলো আবশ্যকীয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, উদ্ভিদের জন্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার (গন্ধক), লৌহ, ম্যাংগানিজ, তামা, দস্তা, মলিবডেনাম, বোরন, সোডিয়াম ও ক্লোরিন—এই ১৭টি উপাদান অত্যাবশ্যকীয়। এর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া সব কয়টি উপাদান উদ্ভিদ মাটি হতে শোষণ করে।

Scanned by CamScanner

লবণ পরিশোষণ অঙ্গ : মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলের নব গঠিত কোষগুলোই লবণ পরিশোষণে অধিক কার্যক্ষম। মূলরোম দিয়েও কিছু লবণ পরিশোষিত হয়ে থাকে।

কোন্ অবস্থায় লবণ পরিশোষিত হয় : উদ্ভিদ কখনো কঠিন অবস্থায় কোনো পদার্থ শোষণ করতে পারে না এবং এ বৈশিষ্ট্যে প্রাণী হতে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ পৃথক। মাটিই খনিজ লবণ সরবরাহের একমাত্র উৎস। খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ক্যাটায়ন (+) ও অ্যানায়ন (–)-এ বিভক্ত থাকে এবং উদ্ভিদ তা আয়ন হিসেবেই পরিশোষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। পানিতে দ্রবীভূত হলে এটি Na^+ (ক্যাটায়ন) ও Cl^- (অ্যানায়ন)-এ বিভক্ত হয় এবং Na^+ ও Cl^- আয়ন হিসেবেই মূল কর্তৃক শোষিত হয়। আয়ন দুটি সমভাবে অথবা অসমভাবে শোষিত হতে পারে। বিভিন্ন আয়ন শোষণের হার বিভিন্ন প্রকার। K^+ এবং NO_3^- আয়ন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে শোষিত হয় এবং Ca^{++} এবং SO_4^{--} সর্বাপেক্ষা মন্থর গতিতে শোষিত হয় বলে মনে করা হয়। সাধারণ ক্যাটায়ন হলো K, Mg, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Na এবং সাধারণ অ্যানায়ন হলো N, P, B, S এবং Cl যথাক্রমে NO_3^-, PO_4^{---}, BO_4^{---}, SO_4^{--}, Cl^- হিসেবে।

উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান

E. Epstein (1972) বলেন যে, নিম্নলিখিত দুটি কারণে (অথবা দুটির যে কোনোটি) একটি মৌলকে অত্যাবশ্যকীয় বলা যাবে; যথা- (১) এ মৌলটি ছাড়া উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারবে না, (২) মৌলটি উদ্ভিদ গঠনের বা মেটাবলিজমের প্রয়োজনীয় অংশ (যেমন- ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণু গঠনের জন্য দরকারি, আর ক্লোরোফিল ফটোসিনথেসিস-এর জন্য দরকারি।) ফসফরাসের অভাবে উদ্ভিদের পাতা ও ফল ঝরে পড়ে।

যে মৌলগুলো অধিক পরিমাণে লাগে সেগুলো **ম্যাক্রোমৌল** (১–৯); যে মৌলগুলো অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে লাগে সেগুলো **মাইক্রোমৌল** (১০–১৭); যে মৌল কোনো কোনো উদ্ভিদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন, তা হলো **উপকারীমৌল**; যেমন সিলিকন (ঘাসের জন্য), সোডিয়াম (C_4 উদ্ভিদের জন্য), কোবাল্ট (নাইট্রোজেন ফিকসিং লিগিউমের জন্য)। সিলিকন ঘাস উদ্ভিদের জন্য ম্যাক্রোমৌল (পরিমাণ-৩০); C_4 উদ্ভিদের জন্য সোডিয়াম মাইক্রোমৌল। কাজেই ম্যাক্রোমৌল ৯টি এবং মাইক্রোমৌল ৮টি বলা যায়।

মৌলের নাম	ধাতু/অধাতু	রাসায়নিক সংকেত	গ্রহণীয় রূপ	শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব (m mol/kg)
১. হাইড্রোজেন	অধাতু	H	H_2O	60,000
২. কার্বন	"	C	CO_2	40,000
৩. অক্সিজেন	"	O	O_2, CO_2 এবং H_2O	30,000
৪. নাইট্রোজেন	"	N	NO_3^-, NH_4^+	1000
৫. পটাসিয়াম	ধাতু	K	K^+	250
৬. ক্যালসিয়াম	"	Ca	Ca^{2+}	125
৭. ম্যাগনেসিয়াম	"	Mg	Mg^{2+}	80
৮. ফসফরাস	অধাতু	P	PO_4^{3-}	60
৯. সালফার (গন্ধক)	"	S	SO_4^{2-}	30
১০. ক্লোরিন	"	Cl	Cl^-	3.0
১১. বোরন	"	B	BO_3^-	2.0
১২. আয়রন (লৌহ)	ধাতু	Fe	Fe^{2+}, Fe^{3+}	2.0
১৩. ম্যাঙ্গানিজ	"	Mn	Mn^{2+}	1.0
১৪. জিঙ্ক (দস্তা)	"	Zn	Zn^{2+}	0.3
১৫. কপার (তামা)	"	Cu	Cu^{2+}	0.1
১৬. সোডিয়াম	"	Na	Na^+	
১৭. মলিবডেনাম	"	Mo	MoO_4^-	0.001

Scanned by CamScanner

মাটিতে খনিজ লবণের প্রাপ্যতা (Availability of Mineral Salts in Soil)

মাটিস্থ দ্রবণে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং ক্যাটায়নের কিছু পরিমাণ কলয়ডাল দানার গায়ে লেগে থাকতে (adsorbed) পারে। মনে করা হয় কলয়ডাল দানার গায়ে লাগানো আয়নসমূহ আয়ন একচেঞ্জ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য। আয়ন একচেঞ্জ-এর জন্য দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

মতবাদ দুটি নিম্নরূপ :

(i) **কার্বন ডাই-অক্সাইড মতবাদ :** এ মতবাদ অনুযায়ী উদ্ভিদমূল শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে CO_2 সৃষ্টি করে তা মাটিস্থ পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে। কার্বনিক অ্যাসিড পরে ভেঙে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-)-এ পরিণত হয়। কলয়ডাল দানার গায়ে লাগানো ক্যাটায়নের সাথে H^+ এর স্থান পরিবর্তন হয়। অন্য দিকে HCO_3^- আয়নের জন্যও অ্যানায়নের সাথে বিনিময় ঘটে। এর ফলে মূলের শোষণ অঙ্গের কাছে উভয় প্রকার আয়নই সহজলভ্য হয়।

(ii) **কনট্যাক্ট একচেঞ্জ মতবাদ :** এ মতবাদ অনুযায়ী কলয়ডাল দানার গায়ে লাগানো আয়ন স্থির অবস্থায় থাকে না এবং আয়নসমূহ কলয়ডাল দানার গায়ে স্বল্প জায়গায় কম্পিত হতে থাকে। মূলের গায়ের আয়নসমূহও একইভাবে কম্পিত হতে থাকে। এভাবে দুই অবস্থানের আয়নসমূহের কম্পনের স্থান যদি সাধারণ অবস্থায় চলে আসে অর্থাৎ যুগপৎ ঘটে (overlap) তবেই ক্যাটায়ন একচেঞ্জ তথা এক ক্যাটায়নের সঙ্গে অন্য ক্যাটায়নের বিনিময় সংঘটিত হয়। এভাবে মূলের জন্য আয়ন সহজলভ্য হয়।

উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়া

উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ (N, Ca, P, K, Mg, Fe, S, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Cl, Na প্রভৃতি) মাটি হতে আয়ন আকারে শোষণ করে নেয়। লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ক্যাটায়ন (+) অথবা অ্যানায়ন (–) হিসেবে অবস্থান করে; যেমন- NaCl লবণ দ্রবীভূত হয়ে Na^+ (ক্যাটায়ন) এবং Cl^- (অ্যানায়ন) হিসেবে অবস্থান করে। মাটিস্থ পানিতে অবস্থিত সাধারণ ক্যাটায়নগুলো K^+, Mg^{++}, Fe^{+++}, Mn^{++}, Cu^{++}, Zn^{++} এবং সাধারণ অ্যানায়নগুলো হলো N, P, B, S, এবং Cl যথাক্রমে (NO_3^-, PO_4^{---}, BO_4^{---}, SO_4^{--}, Cl^- হিসেবে)।

লবণ পরিশোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অদ্যাবধি লবণ পরিশোষণ সম্বন্ধে কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সর্বজন স্বীকৃত হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত লবণের ঘনত্ব মূলস্থ কোষরসের ঘনত্ব অপেক্ষা অনেক কম। তবুও উদ্ভিদ ঘনত্বের আনতি (concentration gradient)-এর বিরুদ্ধে লবণ শোষণ করে থাকে। যদিও এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষ হতে লবণ বের হয়ে যাওয়ার কথা। যা হোক, খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রক্রিয়াকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : (১) সক্রিয় পরিশোষণ এবং (২) নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ।

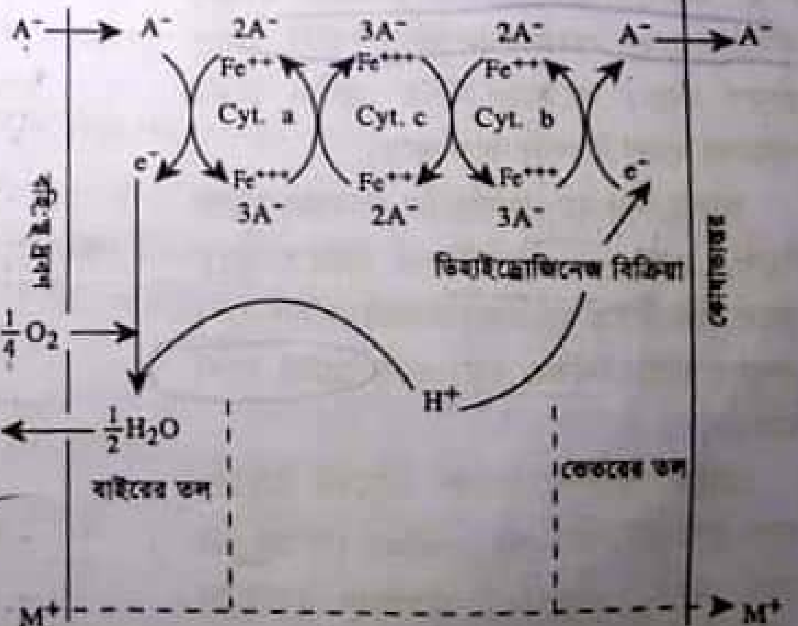

চিত্র ৯.১ : সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ অনুযায়ী অ্যানায়ন (A^-) সক্রিয়ভাবে এবং ক্যাটায়ন (M^+) নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হচ্ছে।

(১) সক্রিয় পরিশোষণ (Active absorption) : মাটিস্থ দ্রবণে কোনো আয়নের ঘনত্ব মূলের শোষণ অঞ্চলের কোষরসে সেই আয়নের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হলেও দেখা যায় মাটির দ্রবণ হতে ঐ আয়ন কোষের অভ্যন্তরে

প্রবেশ করছে। ঘনত্ব আনতির (concentration gradient) বিপরীতে এই শোষণ বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে ঘটে থাকে। এতে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই এ জাতীয় পরিশোষণকে সক্রিয় পরিশোষণ বলে। অধিকাংশ খনিজ লবণ সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতিতেই মূল কর্তৃক পরিশোষিত হয়ে থাকে। সক্রিয় শোষণেরও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন- সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ, লেসিথিন মতবাদ ইত্যাদি। তবে প্রত্যেক মতবাদই আয়ন বাহক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সক্রিয় শোষণে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন একই সাথে পরিশোষিত হতে পারে।

আয়ন বাহক ধারণা (The carrier concept of ion) : আয়ন বাহক ধারণার উপর নির্ভরশীল তিনটি মতবাদ নিচে বর্ণনা করা হলো :

(i) লুনডেগড় মতবাদ (Lundegardth theory): এ মতবাদকে Cytochrome pump মতবাদও বলা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী বাহক হচ্ছে cytochrome (Cyt.)। এ মতানুযায়ী অ্যানায়ন পরিশোষণ প্রকৃতপক্ষে cytochrome system-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। লুনডেগড়-এর মতে ভেতরের তল-এ ডিহাইড্রোজিনেজ বিক্রিয়ার ফলে প্রোটন (H^+) এবং ইলেকট্রন (e^-) সৃষ্টি হয়। ইলেকট্রনটি সাইটোক্রোম চেইন-এর মাধ্যমে বাইরের দিকে চলে আসে এবং অক্সিজেনের সাথে মিলে প্রোটন সহযোগে পানি তৈরি করে। এর ফলে বাইরের তলে সাইটোক্রোমের বিজারিত লৌহ (reduced iron) ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত (oxidised) হয় এবং একটি অ্যানায়ন গ্রহণ করে।

প্রক্রিয়াটি এরূপ : $Fe^{++}(2A^-) - e^- + A^- \longrightarrow Fe^{+++}(3A^-)$

ভেতরের তলে (inner space) সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ ডিহাইড্রোজিনেজ বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং বাইরের তলে (outer space) সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ যে অ্যানায়ন (A^-) গ্রহণ করে তা বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ভেতরের দিকে মুক্ত করে দেয়। এভাবে ভেতরের দিকে অ্যানায়ন (A^-) জমা হতে থাকে। কিন্তু ক্যাটায়ন শোষণ নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় হতে পারে।

(ii) প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ : আধুনিক ধারণায়, কোষঝিল্লীর উভয় দিকে একটি তড়িৎ রাসায়নিক নতিমাত্রা (electrochemical gradient) সৃষ্টির মাধ্যমে আয়নগুলো কোষের ভেতরে স্থানান্তরিত হয়।

এ আধুনিক মতবাদ অনুসারে, আয়ন নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রোটিন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভেতরের দ্রবণে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রোটিন নির্দিষ্ট আয়নের বাহক হিসেবে কাজ করে।

ধারণা করা হয় কোষঝিল্লীর ভেতরের তলের দিকে ATP-ase এনজাইমের ক্রিয়ায় ATP ভেঙে শক্তি নির্গত হয়। যার প্রভাবে প্রোটন (H^+) কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। একে প্রোটন পাম্প বলে।

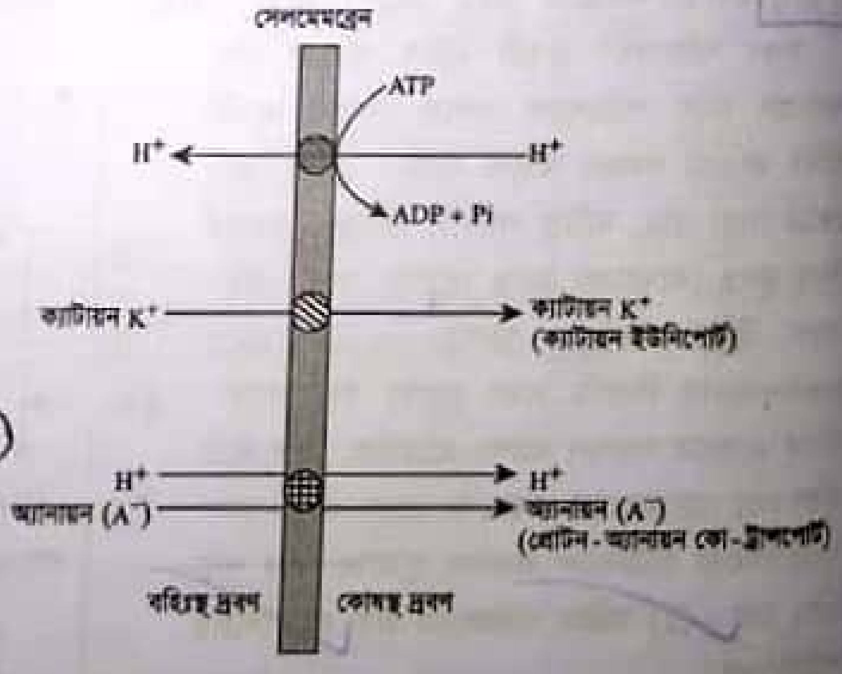

চিত্র ৯.২ : প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট অনুযায়ী আয়ন শোষণ

প্রোটন পাম্পের কারণে কোষের বাইরের সাথে ভেতরের দিকে pH gradient (বাইরে pH কম) এবং potential gradient (কোষের বাইরের +ve চার্জ বেশি, কোষের ভেতরে +ve চার্জ কম) তৈরি হয় যাকে একত্রে Electrochemical potential gradient বা Proton motive force বলে।

কোষ পর্দার অভ্যন্তরে Proton motive force তৈরি হলেই বাহক প্রোটিনগুলো সক্রিয় হয় এবং ক্যাটায়নগুলোকে বহন করে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভেতরে নিয়ে আসে। প্রোটনও বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে চায়, আর সে সময় অ্যানায়নগুলো প্রোটনের সাথে (প্রোটন ও অ্যানায়ন একসঙ্গে) প্রোটিন বাহকের মাধ্যমে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এজন্য একে প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট বলা হয়। এ ধারণাটি Peter Mitchel (1968) এর কেমি-অসমোটিক মতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

(iii) লেসিথিন বাহক ধারণা (Lacithin carrier concept) : Bennet Clark (1956) নামক বিজ্ঞানী মনে করেন, লেসিথিন নামক ফসফোলিপিড আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে। লেসিথিন কোষঝিল্লির বাইরের তলে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন গ্রহণ করে একটি যৌগ তৈরি করে ভেতরের তলে নিয়ে যায়। যৌগটি ভেতরের তলে কোলিন-ফসফেটাইডিক অ্যাসিড এ ভেঙে গিয়ে আয়ন দুটিকে মুক্ত করে। ATP প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয়।

(২) নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ (Passive absorption) : নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় আয়ন শোষণের জন্য কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এতে শ্বসন হার স্বাভাবিক থাকে। নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ঘটে থাকে:

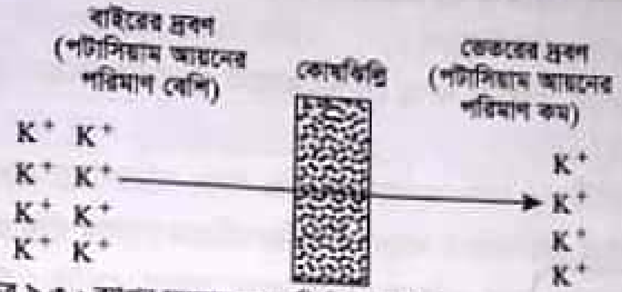

চিত্র ৯.৩ : ব্যাপন মতবাদ অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে আয়ন শোষণ।

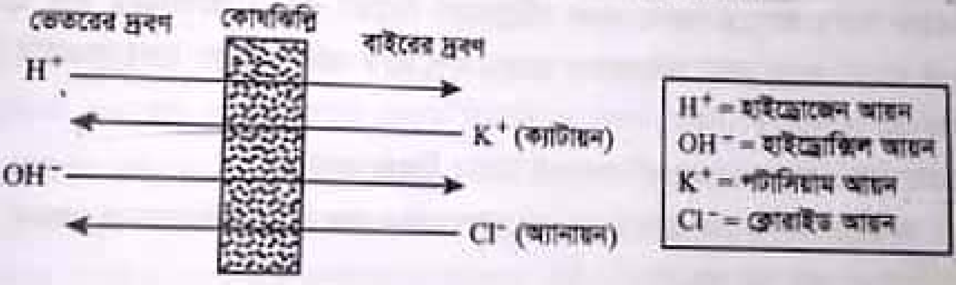

চিত্র ৯.৪ : আয়ন বিনিময় মতবাদ অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে আয়ন শোষণ।

(i) ব্যাপন (Diffusion) মতবাদ : মাটিতে অবস্থিত দ্রবণ হতে কোষের অভ্যন্তরে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কিছু আয়ন প্রবেশ করে। উদ্ভিদের লবণ শোষণ অঞ্চলের কোষরসে কোনো আয়নের ঘনত্ব মাটির দ্রবণে অবস্থিত ঐ আয়নের ঘনত্ব হতে কম হলে আয়নটি মাটির দ্রবণ হতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষরসে প্রবেশ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে আয়ন পরিশোষিত হতে থাকে। (Hope & Stevens, 1952)

(ii) আয়ন বিনিময় (Ion exchange) মতবাদ : উদ্ভিদমূলের কোষরস হতে হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন বাইরের দ্রবণে নির্গত হয়। তখন কোষের বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য বাইরের দ্রবণ হতে ক্যাটায়ন (K^+) কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। একইভাবে হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নের বিনিময়ে অ্যানায়ন (Cl^-) আয়ন কোষরসে প্রবেশ করে। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন একসাথে পরিশোষিত হয় না।

(iii) ডোন্যান সাম্যাবস্থা (Donnan equilibrium) মতবাদ : কোষঝিল্লির অভ্যন্তরে অব্যাপনযোগ্য কিছু স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকলে, একে নিরপেক্ষ করার জন্য বাহির হতে কিছু ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট ক্যাটায়ন ঝিল্লির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্লাজমাঝিল্লির ভেতর এরূপ স্থির আয়নের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে বাইরে থেকে ভেতরে একটি সাম্যাবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ক্যাটায়নের ব্যাপন চলতে থাকে, একে ডোন্যান সাম্যাবস্থা বলে। বিজ্ঞানী F. G. Donnan (1911-1914) এই মতবাদের প্রবক্তা।

Scanned by CamScanner

(iv) ব্যাপক প্রবাহ (Mass flow) মতবাদ : অনেক বিজ্ঞানী [Hylmo (1955) ও Kramen (1956)] মনে করেন প্রস্বেদন টানে যখন ব্যাপক হারে পানি পরিশোষিত হয় তখন পানির সাথে সাথে খনিজ লবণের আয়নও পরিশোষিত হয়।

কাজ : নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে পড় এবং নিচের ছকটি পূরণ কর।		
পার্থক্যের বিষয়	সক্রিয় পরিশোষণ	নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ
১। বিপাকীয় শক্তি		
২। শ্বসন হার		
৩। ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন শোষণ		
৪। আয়ন বাহক		
৫। এনজাইম		

খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবকসমূহ : আয়নের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, pH, আলোক, অক্সিজেন, শ্বসনিক বস্তু প্রভৃতি প্রভাবক দিয়ে খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রভাবিত হয়। এ প্রভাবকগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে খনিজ লবণ পরিশোষণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ :

১। **আয়নের ঘনত্ব :** বহিস্থ দ্রবণে আয়নের ঘনত্ব শোষণ হারকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়নের ঘনত্ব বাড়লে শোষণ হার বৃদ্ধি পায়।

২। **তাপমাত্রা :** একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাপমাত্রার বৃদ্ধি লবণ পরিশোষণ হার বৃদ্ধি করে। এ সীমা থেকে নিম্ন তাপমাত্রা বা উচ্চ তাপমাত্রা পরিশোষণ হার কমিয়ে আনে, এমনকি পরিশোষণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩। **আলো :** আলো পরোক্ষভাবে লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে। পত্ররন্ধ্রের খোলা-বন্ধ হওয়া এবং প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে আলো লবণ পরিশোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রস্বেদনের হার বাড়লে মূল হতে পাতায় পানির পরিবহন হার বাড়ে, ফলে লবণ পরিবহনও বাড়ে। মূল হতে অধিক লবণ চলে যাওয়ায় পরবর্তীতে মূল অধিক পরিমাণ লবণ শোষণ করতে পারে।

৪। **প্রস্বেদন :** প্রস্বেদন প্রক্রিয়াও লবণ পরিশোষণে প্রভাব বিস্তার করে।

৫। **অক্সিজেন :** অক্সিজেনের অভাব হলে লবণ পরিশোষণ হার কম হয়। অক্সিজেনের অভাব শ্বসন প্রক্রিয়ায় বাধা ঘটায়, তাই লবণ পরিশোষণ হার কম হয়।

৬। **শ্বসনিক বস্তু :** শ্বসনিক বস্তু কম থাকলে শ্বসন হার কম হয়, আর তাই লবণ পরিশোষণ হারও কমে যায়।

৭। **আয়নের পারস্পরিক ক্রিয়া :** একটি আয়ন শোষিত হলে সেখানে বিদ্যমান অন্য একটি আয়নের উপর তার প্রভাব পড়ে। Ca, Mg আয়নের উপস্থিতি K আয়নের শোষণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

৮। **বৃদ্ধি :** সক্রিয় কোষ বিভাজন অঞ্চল ও বৃদ্ধি অঞ্চলে লবণ পরিশোষণ বেশি ঘটে।

প্রস্বেদন (Transpiration)

উদ্ভিদ অব্যাহতভাবে তার মূলরোম দিয়ে পানি শোষণ করে এবং সেই পানি পাতা পর্যন্ত পৌঁছায়। উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত পানির সামান্য অংশই তার বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় খরচ হয় এবং বেশির ভাগই (শতকরা ৯৯ ভাগ পর্যন্ত) বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়।

যে শারীরতাত্ত্বিক (physiological) প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ (সাধারণত পাতা) হতে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়, তাকে প্রস্বেদন বলে। বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত উদ্ভিদের যে কোনো অংশে প্রস্বেদন সংঘটিত হয়। তবে পাতাই উদ্ভিদের প্রধান প্রস্বেদন অঙ্গ।

Scanned by CamScanner

প্রস্বেদনের প্রকার : যে পথে পানি বাষ্পাকারে উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তর হতে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে সে পথের ভিন্নতার উপর নির্ভর করে প্রস্বেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা :

(১) **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration) :** পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন।

(২) **লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration) :** কাণ্ডের লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন;

(৩) **ত্বকীয় প্রস্বেদন (Cuticular transpiration) :** পত্রত্বকের কিউটিকলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদন।

(১) **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন :** পানি বাষ্পাকারে পত্ররন্ধ্র পথে বেরিয়ে বাতাসের সাথে মিশে যাওয়াকে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বলে। পাতায় এবং কচি কাণ্ডে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকে ফুলের বৃতি, পাপড়িতেও পত্ররন্ধ্র থাকে। শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ প্রস্বেদন এ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। কাজেই পাতাই প্রস্বেদনের প্রধান অঙ্গ।

(২) **লেন্টিকুলার প্রস্বেদন :** উদ্ভিদের সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় কাণ্ডের কর্ক টিস্যুর স্থানে স্থানে ফেটে গিয়ে লেন্টিসেল (lenticel)-এর সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেল দিয়ে কিছু কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। পানি যখন বাষ্পাকারে লেন্টিসেল পথে বেরিয়ে যায়, তখন তাকে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে। খুব কম পরিমাণ পানিই এ পথে বের হয়।

চিত্র ৯.৫ : উদ্ভিদে মূল কর্তৃক পানি পরিশোষণ এবং পাতা কর্তৃক প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার নির্দেশন।

(৩) **ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন :** উদ্ভিদ দেহকে শুষ্কতার হাত হতে রক্ষার জন্য বহিঃত্বকের উপর যে কিউটিন জাতীয় অভেদ্য রাসায়নিক পদার্থের আস্তর থাকে তাকে কিউটিকল বলে। কিউটিন হলো একটি স্নেহজাতীয় পদার্থ। বিশেষত পাতার উভয় পাশের বহিঃত্বকে কিউটিকল থাকে। কিউটিকল পাতলা হলে অনেক সময় কিউটিকল ভেদ করেও কিছু পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় অর্থাৎ প্রস্বেদন হয়। ত্বকের কিউটিকল ভেদ করে সংঘটিত প্রস্বেদনকে ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে। যদিও পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের তুলনায় এর পরিমাণ অনেক কম। তথাপি অত্যধিক শুষ্কাবস্থায় যখন পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় (এবং এর ফলে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বন্ধ হয়ে পড়ে) তখনও ত্বকীয় প্রস্বেদন চলতে পারে।

পত্ররন্ধ্র (Stomata)

পাতার (এবং কচি কাণ্ডের) ঊর্ধ্ব ও নিম্নতলের বহিঃত্বকে (এপিডার্মিসে) অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দিয়ে পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম ছিদ্রকে পত্ররন্ধ্র বা স্টোম্যাটা (stomata, একবচনে stoma) বলে। পত্ররন্ধ্র শুধু বিশেষ আকৃতির ছিদ্র নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রাঙ্গ। এ অঙ্গের মাধ্যমে কয়েকটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মাধ্যমে প্রস্বেদন ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এর সাথে পত্ররন্ধ্র খোলা বা বন্ধ হওয়ার বিষয়টিও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রজাতির উপর নির্ভর করে পাতার প্রতি এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকায় ১,০০০ হতে ৬০,০০০ পত্ররন্ধ্র থাকতে পারে।

চিত্র ৯.৬ : একটি পত্ররন্ধ্রের গঠন।

পত্ররন্ধ্রের গঠন : পত্ররন্ধ্র পাতার উপরিতলে অবস্থিত দুটি বৃক্কাকৃতির রক্ষীকোষ এবং এদের দিয়ে বেষ্টিত রন্ধ্র নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকের রক্ষীকোষে একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, বহু ক্লোরোপ্লাস্ট ও ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে। রক্ষীকোষে প্রচুর

Scanned by CamScanner

ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এটি খাদ্য তৈরি করে। রক্ষীকোষের চারদিকে অবস্থিত সাধারণ ত্বকীয় কোষ হতে একটু ভিন্ন আকৃতির ত্বকীয় সহকারি কোষ থাকে। স্টোম্যাটার নিচে একটি বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।

অধিকাংশ উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র সকাল ১০-১১টা এবং বিকাল ২-৩টায় পূর্ণ খোলা থাকে, অন্যান্য সময় আংশিক খোলা থাকে এবং রাত্রিতে বন্ধ থাকে।

পত্ররন্ধ্রের কাজ : উদ্ভিদের প্রধান তিনটি শারীরবৃত্তীয় কাজে পত্ররন্ধ্র অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন–

(i) পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন প্রক্রিয়াকালীন সময়ে উদ্ভিদ অঙ্গ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে।

(ii) উদ্ভিদদেহ থেকে অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে বের করে দেয়া পত্ররন্ধ্রের প্রধান কাজ।

(iii) পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল (Mechanism of opening and closing of stomata) : পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের সবচেয়ে উপযোগী অংশ হলো পত্ররন্ধ্র। রক্ষীকোষদ্বয়ের পত্ররন্ধ্র সংলগ্ন প্রাচীর বেশ পুরু কিন্তু বহির্ভাগের অর্থাৎ বহিঃত্বক-কোষসংলগ্ন প্রাচীর বেশ পাতলা হয় এবং এদের মধ্যে একটি করে বড় নিউক্লিয়াস এবং কিছু ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। **রক্ষীকোষদ্বয়ের স্ফীত অথবা শিথিল অবস্থা পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।** পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কারণে রক্ষীকোষে অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে থাকে। **রক্ষীকোষদ্বয় পার্শ্বস্থ বহিঃত্বক কোষ হতে অন্তঃঅভিস্রবণ** প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয় এবং এর ফলে **রন্ধ্রসংলগ্ন পার্শ্বপ্রাচীর পুরু হওয়ায় এবং সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল** আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত থাকায় উল্টোদিকে বেঁকে যায় এবং রন্ধ্র খুলে যায়। অপরপক্ষে **বহিঃঅভিস্রবণের ফলে রক্ষীকোষদ্বয় স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।** কাজেই দেখা যায়, পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া রক্ষীকোষদ্বয়ের গঠন এবং তার স্ফীত হওয়া ও শিথিল হওয়ার উপর নির্ভরশীল। **পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছে।**

চিত্র ৯.৭ : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল।

(i) বিজ্ঞানী H. Von Mohl ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে মত প্রকাশ করেন যে রক্ষীকোষের স্ফীতির পরিবর্তনই পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ।

(ii) F. E. Lloyd ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাব করেন যে রক্ষীকোষের স্ফীতির পরিবর্তন স্টার্চ-শ্যুগার পারস্পরিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। এই ধারণা পরবর্তীতে স্টার্চ-শ্যুগার মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্বেতসার অদ্রবণীয় হওয়ায় এর উপস্থিতিতে রক্ষীকোষদ্বয়ের অভিস্রবণিক চাপ কমে যায়, ফলে কোষস্থ পানির বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং এটি শিথিল হয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে যখন অদ্রবণীয় শ্বেতসার হতে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় চিনি তৈরি হয় তখন অভিস্রবণিক চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী কোষ হতে অন্তঃঅভিস্রবণ ঘটে এবং রক্ষীকোষ দুটি স্ফীত হয়, ফলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

কোনো কোনো প্রজাতির উদ্ভিদের রক্ষীকোষে কোনো ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না, অথচ পত্ররন্ধ্র পূর্ণমাত্রায় কর্মক্ষম থাকে। কাজেই পত্ররন্ধ্র খোলাতে স্টার্চ-এর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়।

Scanned by CamScanner

(iii) বিজ্ঞানী স্যায়েরি (Sayre, 1926) এর মতে, শ্বেতসার ও চিনির আন্তঃপরিবর্তন কোষ রসের pH এর জন্য ঘটে থাকে। রাত্রিতে সূর্যালোক না থাকায় সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু শ্বসন চলতে থাকে। শ্বসনের ফলে সৃষ্ট CO_2 রক্ষীকোষের কোষরসে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে, তাই pH কমে যায় (pH_5)। কোষরসের pH কম হলে কোষস্থ দ্রবণীয় চিনি অদ্রবণীয় শ্বেতসারে পরিণত হয়। রক্ষীকোষে অদ্রবণীয় শ্বেতসার জমা হলে পানির বহিঃঅভিস্রবণ ঘটে, তাই রক্ষীকোষদ্বয় স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়; ফলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

দিনের বেলায় সূর্যালোকের কারণে আবার সালোকসংশ্লেষণ শুরু হয়, ফলে কোষরসে দ্রবীভূত CO_2 ব্যবহৃত হয়ে যায় এবং pH বেড়ে যায় (pH_7)। কোষরসস্থ pH বেড়ে গেলে অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে পুনরায় দ্রবণীয় চিনিতে পরিণত করে। ফলে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ার পার্শ্ববর্তী কোষ হতে পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। তাই রক্ষীকোষ স্ফীত হয়, এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

$$\text{অদ্রবণীয় শ্বেতসার} \underset{\text{অন্ধকার}, pH_5}{\overset{\text{আলো}, pH_7}{\rightleftharpoons}} \text{দ্রবণীয় চিনি}$$

প্রোটন প্রবাহ মতবাদ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত স্টার্চ-শ্যুগার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(iv) আধুনিক মতবাদ বা প্রোটন প্রবাহ মতবাদ (Proton transport theory) :

S. Imamura ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে রক্ষীকোষে পটাশিয়াম আয়ন প্রবেশ প্রমাণ করেন। পরবর্তী বহু গবেষণায় রক্ষীকোষে পটাশিয়াম আয়নের প্রবেশকে রক্ষীকোষের স্ফীতির মূল কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

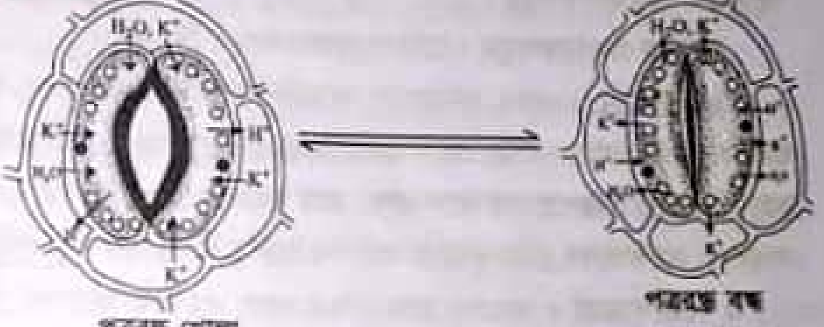

চিত্র ৯.৮ : পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধে K^+ প্রোটন প্রবাহ মতবাদ।

পত্ররন্ধ্র খোলা (আলোতে)

আলোক বর্ণালীর নীল অংশ (Blue light) রক্ষীকোষের রিসেপ্টর (সেন্সর)গুলোকে উদ্দীপ্ত করে, যার ফলে সক্রিয়ভাবে পটাশিয়াম আয়ন (K^+) রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। K^+ প্রবেশের কারণে কোষস্থ দ্রবণে দ্রব্যের (solute) ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ পানির পরিমাণ কমে যায়) এবং পার্শ্ববর্তী কোষ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। রক্ষীকোষে পানি প্রবেশের ফলে রক্ষীকোষ স্ফীত হয় এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

- কোষে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে (সালোকসংশ্লেষণের ফলে এমন হয়) রক্ষীকোষে K^+ প্রবেশ বৃদ্ধি পায়, ফলে পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে পানি রক্ষীকোষে প্রবেশ করে এবং রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।
- রক্ষীকোষ থেকে সক্রিয়ভাবে H^+ বের হয়ে গেলেও পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।

পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া (অন্ধকারে)

রক্ষীকোষ থেকে K^+ বের হয়ে যায়, (আলোর অভাবে বা অন্য কোনো কারণে) সাথে সাথে পানিও বের হয়ে যায়। ফলে রক্ষীকোষ স্ফীতি হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

- মেসোফিল কোষে পানির অভাব দেখা দিলে সেখানে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড তৈরি হয়। যার ফলে রক্ষীকোষ থেকে K^+ বের হয়ে যায়। K^+ বের হয়ে গেলে পানিও বের হয়ে যায়, ফলে রক্ষীকোষ স্ফীতি হারায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

- উচ্চ তাপমাত্রায় ফটোসিনথেসিস কমে যায় এবং কোষীয় শ্বসন বেড়ে যায়। এর ফলে কোষে CO_2 এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পরিণামে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই মনে করা হয় পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্য একটি নিয়ামক কাজ করে।

> অভিস্রবণিকভাবে কর্মক্ষম দ্রব (osmotically active solute), যার কারণে রক্ষীকোষে পানি প্রবেশ করে তা বিভিন্ন উৎস থেকে আসে, যেমন–
>
> (i) নীল আলোর কারণে K^+ ও Cl^- প্রবেশ ও সেখানে তৈরি ম্যালেট (malate 2^-)
>
> (ii) স্টার্চ হাইড্রোলাইসিস হয়ে সৃষ্ট সুকরোজ।
>
> (iii) ফটোসিনথেসিসের ফলে সৃষ্ট সুকরোজ।
>
> (iv) মেসোফিল কোষ থেকে অ্যাপোপ্লাস্টিক (Apoplastic) উপায়ে প্রবেশকৃত সুকরোজ।
>
> দেখা যায় সকালে পত্ররন্ধ্র খোলার সূচনা করে K^+, এরপর কোষে ক্রমেই সুকরোজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এক সময় সুকরোজই প্রভাবশালী হয়ে উঠে। সন্ধ্যায় প্রথমে K^+, পরে সুকরোজ এবং শেষে পানি বের হয়ে যায় এবং পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহ : প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা : বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ।

বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ : বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ নিম্নরূপ :

১। আলো : প্রখর সূর্যালোক স্বাভাবিকভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এবং যার ফলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। আলোকের উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং আলোর অনুপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়; আর পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার উপরই বেশির ভাগ প্রস্বেদন নির্ভরশীল। এ সব কারণেই প্রস্বেদনের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আলোর গুরুত্ব শীর্ষস্থানীয়। ব্লু লাইট পত্ররন্ধ্র খোলা ত্বরান্বিত করে।

২। তাপমাত্রা : তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে প্রস্বেদন হারেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কারণ তাপ বাড়লে বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়, আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়, ফলে বায়ু অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প শোষণ করতে পারে। অপরদিকে তাপ বাড়লে পানিও দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং প্রস্বেদনের হারকে ত্বরান্বিত করে। তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে পত্ররন্ধ্রের আয়তনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং তাপ বিভিন্ন দিক হতে প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

৩। আপেক্ষিক আর্দ্রতা : আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। কারণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বায়ু অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে গেলে বায়ু কোষাভ্যন্তর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়। ব্যস্তানুপাতিক

৪। বায়ুপ্রবাহ : উদ্ভিদের প্রস্বেদন অঙ্গের আশপাশের বায়ু সাধারণত বেশি আর্দ্র থাকে। কারণ এ অঞ্চল কোষাভ্যন্তর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প সরাসরি গ্রহণ করে সম্পৃক্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে প্রস্বেদনের হারের হ্রাস ঘটে। প্রবাহিত বায়ু পাতার নিকট হতে অধিক আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত করে নিয়ে যায়, ফলে স্থানটি কম আর্দ্র বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। কম আর্দ্র বায়ু কোষাভ্যন্তর হতে নির্গত জলীয়বাষ্প অধিকমাত্রায় গ্রহণ করে প্রস্বেদনের হারকে বাড়িয়ে দেয়।

৫। আবহমণ্ডলের চাপ : আবহমণ্ডলে চাপ কমার কারণে কম তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়, ফলে চাপ কমলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে চাপ বাড়লে প্রস্বেদনের হার কমে যায়। ব্যস্তানুপাতিক

৬। মাটিস্থ পানি : মাটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকলে উদ্ভিদ মাটি হতে অধিকমাত্রায় পানি গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়। অপরদিকে মাটিতে পানির প্রাপ্যতা কমে গেলে প্রস্বেদনের হারও ক্রমান্বয়ে কমে যায়।

Scanned by CamScanner

অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ : অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ নিম্নরূপ :

১। **মূল-বিটপ অনুপাত :** আনুপাতিক হারে মূলের পরিমাণ কম হলে উদ্ভিদের জন্য মাটি হতে পানির প্রাপ্যতাও কমে যায় এবং প্রস্বেদনের হারও কমে যায় অর্থাৎ প্রস্বেদন অঞ্চল অপেক্ষা শোষণ অঞ্চল কম হলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।

২। **পাতার আয়তন ও সংখ্যা :** পাতার আয়তন ও সংখ্যার তারতম্যে প্রস্বেদনের তারতম্য হয়। পাতার আয়তন ও সংখ্যা যত বেশি হবে প্রস্বেদনও তত বেশি হবে।

৩। **পাতার গঠন :** পাতার গঠনের উপর প্রস্বেদনের হার নির্ভরশীল। পাতায় পাতলা কিউটিকল, পাতলা কোষ প্রাচীর, অধিক শস্য টিস্যু ও উন্মুক্ত পত্ররন্ধ্র থাকলে প্রস্বেদন তুলনামূলকভাবে বেশি হয় কিন্তু পুরু কিউটিকল, অধিক প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং পত্ররন্ধ্র গর্তস্থিত থাকলে প্রস্বেদনের হার কমে যায়। পাতার গায়ে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, রন্ধ্রের পরিমাণ, রক্ষীকোষের গঠন প্রভৃতি প্রস্বেদনের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪। **মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ :** পাতার মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ বেশি হলে প্রস্বেদন হার বাড়ে। পক্ষান্তরে, মেসোফিল টিস্যুতে পানির পরিমাণ কমলে প্রস্বেদন হার কম হয়।

৫। **জীবনীশক্তি (Vigour) :** প্রস্বেদনের হার উদ্ভিদের জীবনীশক্তির উপরও নির্ভর করে। সুস্থ-সবল উদ্ভিদে রোগাক্রান্ত দুর্বল উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রস্বেদন বেশি হয়।

প্রস্বেদনের অপকারিতা ও উপকারিতা : প্রস্বেদন উদ্ভিদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি ক্ষতিকরও বটে। অবশ্য ক্ষতির তুলনায় উদ্ভিদ লাভবানই হয় বেশি। নিচে এটি বর্ণনা করা হলো :

অপকারিতা বা নেতিবাচক প্রভাব : মাটিতে পানির অভাব দেখা দিলেই প্রস্বেদন উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মাটিতে পানির অভাবের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক উদ্ভিদ মাটি হতে যে পরিমাণ পানি শোষণ করে তার অধিক পরিমাণ প্রস্বেদনে বের হয়ে গেলে তার অন্তঃচাপ কমে যায়; ফলে গাছটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে (উইলটিং)। কয়েকদিনের জন্য এ অবস্থা চলতে থাকলে গাছটি মরে যায়। প্রস্বেদনের কারণে শোষিত পানির কিছুটা অপচয় হয়।

প্রস্বেদনের উপকারিতা বা উদ্ভিদের জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব

প্রস্বেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন বা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তথা প্রয়োজনীয়তার বিশেষ কারণগুলো নিচে দেয়া হলো :

১। **পানি শোষণ :** পাতায় প্রস্বেদনের ফলে বাহিকা নালীতে পানির যে টান পড়ে সেই টান মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণে সাহায্য করে থাকে। তাই জীবন রক্ষাকারী পানি শোষণে প্রস্বেদনের ভূমিকা আছে।

২। **পানি ও খাদ্যরস উপরে উঠানো :** পাতা ও অন্যান্য অংশে পানি ও খাদ্যরস পৌছানো অপরিহার্য। প্রস্বেদনের ফলে বাহিকা নালীতে পানির যে টান পড়ে তা সরাসরি পানিকে জাইলেম ভেসেলের মাধ্যমে মূল হতে কাণ্ড হয়ে পাতা পর্যন্ত পৌছাতে সহায়তা করে। এ পানির সাথে মূল কর্তৃক শোষিত খনিজ পদার্থ তথা সামগ্রিকভাবে খাদ্যরস উপরে উত্থিত হয়।

৩। **লবণ পরিশোষণ :** প্রস্বেদনের কারণে চারদিক থেকে লবণ উদ্ভিদমূলের কাছাকাছি আসে, তাই উদ্ভিদ সহজে লবণ পরিশোষণ করতে পারে।

৪। **পাতা ও অন্যান্য অংশে খনিজ লবণ পৌছানো :** মূল কর্তৃক মাটি হতে যে লবণ শোষিত হয় তা স্বাভাবিকভাবে উঁচু গাছের পাতা পর্যন্ত পৌছাতে কয়েক বছর লাগার কথা। পাতার প্রতিটি ক্লোরোফিল অণু তৈরি হতে Mg এর দরকার যা শোষিত হয়ে মূল হতে পাতা পর্যন্ত পৌছে থাকে কেবল প্রস্বেদনের কারণেই। কাজেই প্রস্বেদন না হলে পাতায় ক্লোরোফিল সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যেতো, ফলে খাদ্য তৈরিই বন্ধ হয়ে যেতো।

৫। **সকল কোষে পানি সরবরাহ :** প্রতিটি জীবিত কোষেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এর জন্য পানির প্রয়োজন। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার কারণে পানি সহজে সকল কোষে পৌছাতে পারে।

৬। **সালোকসংশ্লেষণ :** সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরির জন্য পানির প্রয়োজন ($6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$)। প্রস্বেদন না হলে এ বিপুল পরিমাণ পানি পাওয়া যেতো না, ফলে সালোকসংশ্লেষণ তথা

Scanned by CamScanner

৭। **পাতায় উপযুক্ত তাপ নিয়ন্ত্রণ :** বিভিন্ন কাজের জন্য পাতায় একটি উপযুক্ত তাপমাত্রার দরকার। প্রস্বেদন পাতা অত্যধিক গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং উপযুক্ত তাপমাত্রা রক্ষা করে।

৮। **কোষ বিভাজন :** কোষ বিভাজনের জন্য কোষের স্ফীতি অবস্থার প্রয়োজন। প্রস্বেদন পরোক্ষভাবে এ স্ফীতি অবস্থা এবং আরো পরোক্ষভাবে কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

৯। **দৈহিক বৃদ্ধি :** কোষ বিভাজন, স্বাভাবিক স্ফীতি রক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রস্বেদন গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

১০। **শক্তি নির্গমন :** পাতা সূর্য হতে প্রতি মিনিটে প্রচুর শক্তি শোষণ করে। এর মাত্র শতকরা একভাগ (বা তারও কম) বিভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য খরচ হয়, বাকি অধিকাংশ তাপশক্তি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। নতুবা গাছ অতি তাপে মরে যেতো।

১১। **অভিস্রবণ প্রক্রিয়া :** প্রস্বেদনের ফলে কোষরসের ঘনত্ব বাড়ে, ফলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঘটার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

১২। **পাতায় ছত্রাক আক্রমণ রোধ :** প্রস্বেদনের ফলে পাতার পৃষ্ঠে কিছু পানিগ্রাহী লবণ জমা হয়, যা ছত্রাক আক্রমণ হতে পাতাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

১৩। **খাদ্য পরিবহন :** প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিবহন অব্যাহত থাকে।

১৪। **পুষ্প পরিস্ফুটন ও ফল সৃষ্টি :** প্রস্বেদনের ফলে কোষে পরম রসস্ফীতি রক্ষা পায় বলে পুষ্প প্রস্ফুটন ও ফল সৃষ্টি সম্ভব হয়।

১৫। প্রস্বেদনের ফলে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে গিয়ে আকাশে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। যে এলাকায় গাছপালা বেশি থাকে সে এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন প্রক্রিয়া : একটি উদ্ভিদে সংঘটিত প্রস্বেদনের শতকরা প্রায় ৯৫-৯৮ ভাগই পত্ররন্ধ্রীয় প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে। পত্ররন্ধ্র খোলা থাকা অবস্থায় প্রস্বেদন কার্য সম্পন্ন হয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকা অবস্থায় প্রস্বেদন হয় না। মাটি থেকে শোষণকৃত পানি মূল থেকে কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা হয়ে পাতায় পৌঁছায় এবং পাতার শিরা-উপশিরার মাধ্যমে পাতার প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ও স্পঞ্জী প্যারেনকাইমা কোষে পৌঁছায়। উক্ত পানি শোষণ করে পাতার প্যারেনকাইমা কোষগুলো সম্পৃক্ত (saturated) হয় এবং ঐ পানির অধিকাংশই পাতার অভ্যন্তরস্থ ও বহিস্থ তাপ, চাপ ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাষ্পে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প তখন পাতার টিস্যুর আন্তঃকোষীয় ফাঁকে এবং পত্ররন্ধ্রসমূহের নিচে অবস্থিত পত্ররন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠে (গহ্বরে) জমা হয়। রক্ষীকোষের স্ফীতির কারণে পত্ররন্ধ্র খুলে গেলে সঞ্চিত বাষ্প ঐ রন্ধ্রপথে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকলে ব্যাপন প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। [চিত্র ৯.৫]

কয়েকটি প্রয়োজনীয় শব্দ

অভিস্রবণ (Osmosis) : একই দ্রাবকবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পাশাপাশি পৃথক থাকলে দ্রাবক পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তার বেশি ঘনত্বের এলাকা হতে কম ঘনত্বের এলাকার দিকে ব্যাপিত (diffusion) হয় সেই প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে।

ডিফিউশন (Diffusion) বা ব্যাপন : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে বিস্তার লাভ প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

অভিস্রবণিক চাপ (Osmotic Pressure) : একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট একটি দ্রবণ ও তার বিশুদ্ধ দ্রবককে যদি একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পৃথক করে রাখা যায় তবে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের অধিক

Scanned by CamScanner

যে দ্রবণের প্রবেশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিক হতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের অভিস্রবণিক চাপ বলে।

প্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis) বা প্রোটোপ্লাজম সংকোচন : বহিঃঅভিস্রবণ (exosmosis) প্রক্রিয়ায় সজীব কোষস্থ পানি কোষের বাইরে বেরিয়ে আসার ফলে কোষের প্রোটোপ্লাজম সংকোচিত হওয়াকে প্লাজমোলাইসিস বলে।

টারজিডিটি (Turgidity) বা রসস্ফীতি : অন্তঃঅভিস্রবণ (endosmosis) প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণের ফলে কোষের স্ফীত হওয়ার অবস্থাকে টারজিডিটি বলে।

টারগার প্রেশার (Turgor Pressure) বা স্ফীতি চাপ : টারজিডিটি তথা রসস্ফীতির জন্য প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক কোষপ্রাচীরের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে টারগার প্রেশার বলে।

ইমবাইবিশন (Imbibition) : কলয়েড জাতীয় শুষ্ক বা আংশিক শুষ্ক পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে **ইমবাইবিশন** বলে। যেসব পদার্থ পানি শোষণ করে স্ফীত হয় সেসব পদার্থকে হাইড্রোফিলিক পদার্থ বলে। যেমন- আটা, সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, জেলাটিন ইত্যাদি।

ফটোসিনথেসিস (Photosynthesis) বা সালোকসংশ্লেষণ

গ্রিক *Photo* অর্থ light অর্থাৎ আলো এবং *synthesis* অর্থ সংশ্লেষণ অর্থাৎ একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে কোনো যৌগ পদার্থ সৃষ্টি। কাজেই Photosynthesis এর শাব্দিক অর্থ আলোর সাহায্যে কোনো যৌগ পদার্থ সৃষ্টি। Photosynthesis শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী বার্নেস (C.R. Barnes) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

আলোকশক্তিকে শোষণ করে তা সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোসিনথেসিস (The process of absorbing light energy and converting it into stored chemical energy is called photosynthesis.)

এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় CO_2, পানি, সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিল। উৎপন্ন হয় কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা এবং O_2। CO_2 ব্যবহৃত হয় কার্বোহাইড্রেট তৈরির জন্য, পানি ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক শক্তি হিসেবে $NADPH + H^+$ তৈরির জন্য। সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় শক্তির জন্য এবং ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয় সূর্যশক্তিকে শোষণ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য। এটি একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। বিষয়টিকে একটু বিস্তারিত করে এভাবে লেখা যায়।

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ-কোষস্থ ক্লোরোফিল আলোকশক্তিকে ATP এবং $NADPH + H^+$ নামক রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং ঐ রাসায়নিক শক্তিকে (ATP ও $NADPH + H^+$) কাজে লাগিয়ে CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত ও উপজাত হিসেবে O_2 নির্গত করে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস বলে।

নিচের রাসায়নিক বিক্রিয়াটির মাধ্যমে উচ্চতর উদ্ভিদে সংঘটিত সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে দেখানো যায়।

$$\underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{পানি}}{12H_2O} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2}$$

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ১ অণু হেক্সোজ শর্করা প্রস্তুত করতে ৬ অণু CO_2 ও ১২ অণু H_2O প্রয়োজন পড়ে এবং ৫০-৬০ কোটিন কণা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সালোকসংশ্লেষণকে একটি জটিল জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলা হয়। কারণ এখানে H_2O থেকে একদিকে যেমন O_2 মুক্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি CO_2 এর সাথে হাইড্রোজেন সংযুক্ত হয়।

বি.দ্র. কেবলমাত্র ক্যালভিন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং সালোকসংশ্লেষণে লিমিটিং ফ্যাক্টরের ভূমিকা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের জন্য সবটুকুই পড়া ও জানা দরকার।

Scanned by CamScanner

> উপরের বিক্রিয়াটির প্রতি লক্ষ্য করলে যে কারো মনে হতে পারে যে এই বিক্রিয়ায় বামদিকে ১২টি পানির ($12H_2O$) স্থলে ৬টি ... দেখিয়ে বিক্রিয়ার ডানদিকে ৬টি পানি না দেখালেই হতো। অর্থাৎ বিক্রিয়াটিকে $6H_2O + 6CO_2$ + আলোকশক্তি $\xrightarrow{\text{ক্লোরোফিল}}$ $C_6H_{12}O_6$ + ... এমন লিখলেই হতো এবং বিক্রিয়াটি আরও সহজ হতো।
>
> এবার নিচের বিক্রিয়াটিতে C, H ও O এর পরিণতি লক্ষ করুন :
>
> 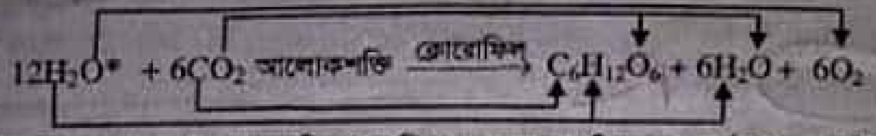
>
>
> এই বিক্রিয়ার মৌলিক বন্টন থেকে দেখা যায় বামদিকের পানির ১২ পরমাণু অক্সিজেন সম্পূর্ণটাই মুক্ত অক্সিজেন হিসেবে বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন দ্রব্য হিসেবে বের হয়ে যায়। এর কোনটাই ডানদিকে উৎপাদিত পানির অংশে হয় না। অর্থাৎ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পানি আর বিক্রিয়া শেষে উৎপাদিত পানি এক নয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পানি এই প্রক্রিয়ার উপজাত পদার্থ। কাজেই বিক্রিয়ায় ১২ অণু পানির অংশগ্রহণ সঠিক।

পানির সালোকবিভাজন (Photolysis of water) : আলোর উপস্থিতিতে পানি (H_2O) ভেঙে অক্সিজেন (O_2), হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন ($2H^+$) ও ইলেকট্রন (e^-) উৎপন্ন হওয়াকে পানির সালোকবিভাজন বলে।

সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্ট নামক সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুতেই ঘটে থাকে। কাজেই ক্লোরোপ্লাস্টই হলো সালোকসংশ্লেষণের স্থান। এখানেই এ প্রক্রিয়ার শুরু এবং এখানেই এর সমাপ্তি। ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে সবুজ শৈবাল, ব্রায়োফাইট্স, টেরিডোফাইট্স, জিমনোস্পার্ম এবং অ্যানজিওস্পার্ম উদ্ভিদে। সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে ক্লোরোপ্লাস্ট নেই, তবে থাইলাকয়েডের গায়ে ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট থাকে। অন্যান্য কিছু শৈবাল (লোহিত শৈবাল, বাদামি শৈবাল ইত্যাদি) পিগমেন্টসমূহ ক্রোম্যাটোফোর (chromatophore) নামক অঙ্গাণুতে থাকে। উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়ার অধিকাংশ উপাদান গ্রানার থাইলাকয়েডে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পিগমেন্ট (pigment) হলো **ক্লোরোফিল**। ক্লোরোফিল ছাড়া **ক্যারোটিনয়েড্স** (carotenoids = ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল ইত্যাদি) এবং **ফাইকোবিলিনস** (phycobilins = ফাইকোসায়ানিন, ফাইকোইরেথ্রিন-শুধু শৈবালে পাওয়া যায়) থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্লোরোপ্লাস্টের অবস্থান : উদ্ভিদের যে অঙ্গে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে সে অঙ্গ সবুজ হয়, তাই অন্যভাবে বলা যায় উদ্ভিদের সবুজ অংশে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সবুজ শৈবাল, *Riccia, Marchantia*-র মতো থ্যালয়েড ব্রায়োফাইট্স-এর প্রায় সমগ্র দেহেই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। তবে উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদের কচি কাণ্ড ও পাতায় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। সবচেয়ে বেশি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে পাতায়, তাই সামগ্রিক বিবেচনায় সবুজ পাতাকেই ফটোসিনথেসিস-এর প্রধান অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পাতার মেসোফিল টিস্যুতেই ক্লোরোপ্লাস্ট বিন্যস্ত থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদ পাতায় মেসোফিল কোষগুলো প্রায় একই রকম কিন্তু দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতায় মেসোফিল টিস্যু দু'ভাগে বিভক্ত– উপরের ত্বকের দিকে ঘনভাবে সন্নিবেশিত লম্বা লম্বা কোষের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং নিচের ত্বকের দিকে ফাঁক ফাঁকভাবে অবস্থিত গোলাকার কোষের স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা। পাতার নিচের ত্বকে অনেক স্টোম্যাটা থাকে। স্টোম্যাটার মাধ্যমে বাতাস থেকে CO_2 গৃহীত হয় এবং ভেতর থেকে বাতাসে O_2 নির্গত হয়।

রঞ্জক পদার্থ : যে সব রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষণে জড়িত সেগুলো হচ্ছে-ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েডস ও ফাইকোবিলিনস।

ক্লোরোফিল (Chlorophyll) : ক্লোরোফিল পিগমেন্ট সবুজ প্লাস্টিড তথা ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে, আর ক্লোরোপ্লাস্ট পাতার মেসোফিল টিস্যুতে অধিক পরিমাণে থাকে। সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল 'a' (ch 'a'), ক্লোরোফিল 'b' (ch 'b'), জ্যান্থোফিল ও ক্যারোটিন পিগমেন্টসমূহ থাকে। ch 'a' হলদে-সবুজ, ch 'b' নীলাভ-সবুজ, জ্যান্থোফিল হলুদ

এবং ক্যারোটিন কমলা রং সম্পন্ন। এটি ছাড়াও ব্যাকটেরিয়াতে এবং শৈবালে ভিন্ন ধরনের ক্লোরোফিল থাকে। অধুনা বিজ্ঞানীরা মনে করেন ch 'a' একমাত্র পিগমেন্ট যার শোষিত আলোকশক্তি সালোকসংশ্লেষণে কাজে লাগে এবং অন্যান্য পিগমেন্টগুলো তাদের শোষিত আলোকশক্তি ch 'a'-কে প্রদানপূর্বক সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে। কতক ch 'a' অণু (P700) ৭০০ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বেশি শোষণ করে এবং কতক ch'a' অণু (P680) ৬৮০nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বেশি শোষণ করে। এরা বিশেষ ধরনের ক্লোরোফিল যা সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। নিচে এদের আণবিক সংকেত দেয়া হলো :

ক্লোরোফিল 'a' : $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ ক্লোরোফিল 'b' : $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$

চিত্র ৯.৯ : পাতার প্রস্থচ্ছেদে সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গ দেখানো হয়েছে।

ক্যারোটিনয়েডস (Carotinoids) : ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ ক্লোরোফিল ছাড়াও হলুদ, কমলা, বাদামি প্রভৃতি বর্ণের রঞ্জক থাকে। এগুলোকে একসাথে ক্যারোটিনয়েডস বলে। এদের মধ্যে ক্যারোটিন (carotene) কমলা রঙের এবং জ্যান্থোফিল (xanthophyll) হলুদ রঙের। এদের আণবিক সংকেত–ক্যারোটিন : $C_{40}H_{56}O$; জ্যান্থোফিল : $C_{40}H_{56}O_2$।

ফাইকোবিলিনস (Phycobilins) : নীল রঙের রঞ্জক পদার্থের নাম ফাইকোসায়ানিন এবং লাল রঙের রঞ্জক পদার্থের নাম ফাইকোইরেথ্রিন। এ দুটি রঞ্জক পদার্থকে একত্রে ফাইকোবিলিনস বলে। সায়ানোব্যাকটেরিয়া ও লোহিত শৈবালে এদের পাওয়া যায়। এদের আণবিক সংকেত–ফাইকোসায়ানিন : $C_{34}H_{44}O_8N_4$; ফাইকোইরেথ্রিন : $C_{34}H_{46}O_8N_4$। সালোকসংশ্লেষণের জন্য মূল পিগমেন্ট হলো ক্লোরোফিল। ক্যারোটিনয়েডস এবং ফাইকোবিলিনস হলো আনুষঙ্গিক পিগমেন্ট। ক্লোরোফিল-a ছাড়া অন্যান্য পিগমেন্টকে বলা হয় অ্যান্টেনা পিগমেন্ট কারণ এরা আলোকশক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল-a কে প্রদান করে।

আলোক বর্ণালির কর্মক্ষমতা

আলো এক ধরনের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ। এর উৎস হলো সূর্য। সূর্য একটি বিরাট উত্তপ্ত পরমাণু চুল্লি। এখানে অনবরত হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। সূর্যের উত্তপ্ত কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরের সময় যে শক্তি বিকিরিত হয়, তাকে ফোটন কণা বলে। এক্স-রে ও গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম এবং ইনফ্রারেড ও রেডিও-রে-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক বেশি। এসব তরঙ্গের শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলো আমরা দেখতে পাই যা সাদা আলো নামে পরিচিত।

দৃশ্যমান আলো অনেকগুলো তরঙ্গের (spectra) সমষ্টি মাত্র। দৃশ্যমান আলোর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য যে একককে প্রকাশ করা হয় তাকে ন্যানোমিটার (nanometer = nm; $1\ nm = 10^{-9}\ m$) বলে। দৃশ্যমান আলো একটি প্রিজম-এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো হলে অন্তস্থ যে তড়িৎতরঙ্গ রয়েছে তা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এর মধ্যে মোট সাত ধরনের তড়িৎতরঙ্গ রয়েছে যার সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য হলো ৩৯০ nm এবং সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৭৬০ nm। এসব তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌছালে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রঙে ধরা পড়ে। এগুলো হলো– বেগুনি (violet), নীল (indigo), নীলাভ-সবুজ বা আসমানী (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red)। এগুলোর আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম বেনিআসহকলা বা VIBGYOR হয়েছে। একে আলোর বর্ণচ্ছটা বা বর্ণালি (light spectrum) বলে। নিচে বর্ণালির নাম ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উল্লেখ করা হলো।

Scanned by CamScanner

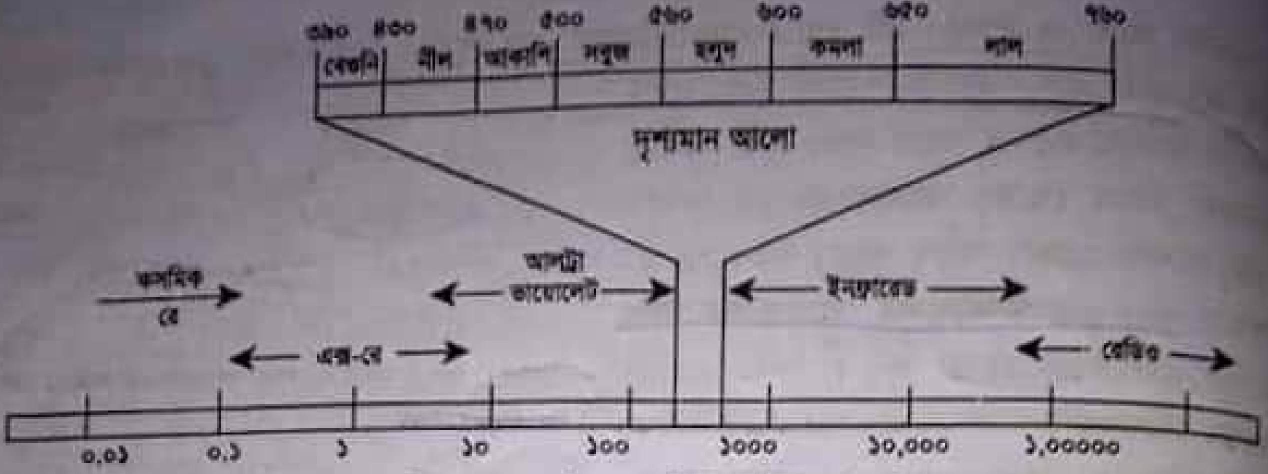

চিত্র ৯.১০ : সূর্যালোকের বিভিন্ন বর্ণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

আলো কোনো বস্তুর উপর পতিত হলে তার কিছু অংশ শোষিত হয়। বস্তুর উপর পতিত আলোর বিভিন্ন আলোর তরঙ্গের যে পরিমাণ শোষিত হয়, তাকে **শোষণ বর্ণালি** (absorption spectrum) বলে। আপতিত সূর্যালোকের ১% ক্লোরোপ্লাস্ট কর্তৃক শোষিত হয়, ১২% বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় এবং বাকি ৫% ভূগর্ভে প্রতিসরিত বা বিলীন হয়। পাতা শোষিত সৌররশ্মির মোট পরিমাণের মাত্র ০.৫–৩.৫% ক্লোরোফিল ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ কর্তৃক শোষিত হয়।

সালোকসংশ্লেষণের সময় বেগুনি-নীল ও কমলা-লাল আলো বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বাকি আলো অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়। একক আলো হিসেবে লাল আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়।

আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া

ফটোসিস্টেম : ক্লোরোফিল অণুসমূহ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রন গ্রহীতাসমূহ এক সাথে একটি ইউনিট হিসেবে অবস্থান করে। এই ইউনিটকে ফটোসিস্টেম (photosystem) বলে। ফটোসিস্টেম থাইলাকয়েড মেমব্রেনে অবস্থান করে এবং এতে ৪০০ পর্যন্ত ক্লোরোফিল অণু থাকতে পারে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনে দু'ধরনের ফটোসিস্টেম থাকে; যথা– (১) ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) এবং (২) ফটোসিস্টেম-২ (PS-II) আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা অনুসারে PS-I এবং PS-II নামকরণ করা হয়েছে। সৃষ্টিগতভাবেও PS-I আগে সৃষ্টি হয়েছে।

PS-I (ফটোসিস্টেম-১) এর বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল-a অণুটি ৭০০ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক অত্যন্ত প্রবলভাবে শোষণ করে, তাই একে বলা হয় P700।

PS-II (ফটোসিস্টেম-২) এর বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল-a অণুটি ৬৮০ nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক অত্যন্ত প্রবলভাবে শোষণ করে, তাই একে বলা হয় P680।

প্রতিটি ফটোসিস্টেমের তিনটি অংশ থাকে; যথা–১। আলোক শোষণ অংশ (light harvesting part), ২। বিক্রিয়া কেন্দ্র এবং ৩। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC)।

বিক্রিয়া কেন্দ্র (Reaction Centre) : এক অণু ক্লোরোফিল-a এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রোটিন নিয়ে একটি বিক্রিয়া কেন্দ্র গঠিত। প্রোটিনটি নিকটস্থ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে। ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েডসমূহ আলোক শক্তি শোষণ করে এবং এই শক্তিকে বিক্রিয়া কেন্দ্রে প্রদান করে।

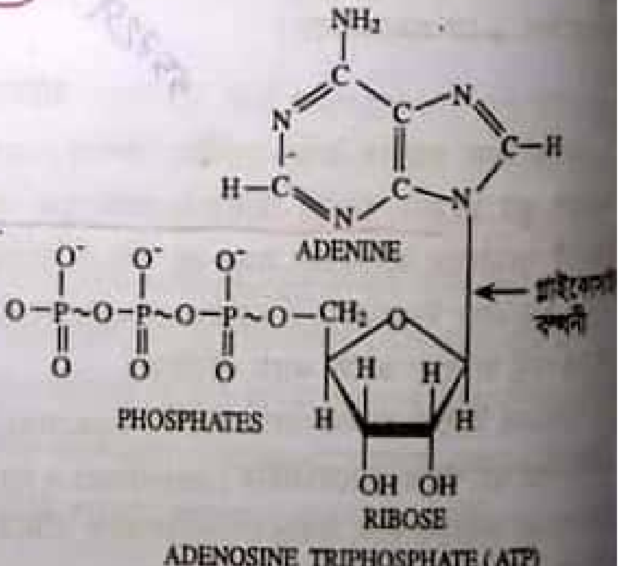

চিত্র ৯.১১ : ATP-এর গঠন।

ATP তৈরি : ATP (Adenosine Triphosphate) একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ। জীবকোষে রাসায়নিক শক্তির উৎস হিসেবে ATP কাজ করে। ADP (Adenosine Diphosphate) এর সাথে একটি অজৈব (Pi) ফসফেট যুক্ত হয়ে একটি ATP তৈরি হয়।

Scanned by CamScanner

$$ADP + Pi \xrightarrow{ATP\text{-}ase} ATP + H_2O$$

আলোক শোষণের ফলে পর্যাপ্ত ইলেকট্রন-এনার্জির সহায়তায় ATP-ase এনজাইম এর কার্যকারিতায় ADP এর সাথে Pi যুক্ত হয়ে ATP তৈরি হয়। থাইলাকয়েড (thylakoid) এর যে সার্ফেস স্ট্রোমার (stroma) দিকে থাকে সে দিকে ATP তৈরি হয়। একটি ATP অণুতে প্রচুর শক্তি মজুত থাকে। প্রয়োজনে ATP-র মজুতকৃত শক্তি কোষের বিভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য সরবরাহ করে। তাই **ATP-কে জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রা** (Biological coin or Energy coin) বলা হয়। শক্তি সঞ্চয় ও সরবরাহের কারণে নিম্নলিখিত বিশেষণে ATP-কে ডাকা হয়:

(i) A universal energy storage compound. (ii) The energy currency of the cell. (iii) The coin of the cell's energy transfer. (iv) The universal molecule of energy transfer.

NADP : NADP (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate) একটি কো-এনজাইম। NADP থেকে তৈরি হয় NADPH + H⁺। এ বিক্রিয়ায় একটি reductase এনজাইম লৌহঘটিত প্রোটিন কাজ করে। CO_2-কে কার্বোহাইড্রেটে স্থিতিকরণ ও বিজারণে NADPH + H^+ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্ভিদদেহের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে অসংখ্য থলে সদৃশ্য গঠন থাকে, এদেরকে থাইলাকয়েড বলে। থাইলাকয়েড মেমব্রেনের যে অংশ স্ট্রোমাতে উন্মুক্ত নয় সেখানে PS-II ইউনিটসমূহ বিদ্যমান; থাইলাকয়েড মেমব্রেনের যে অংশ স্ট্রোমাতে উন্মুক্ত সেখানে PS-I এবং ATP synthase ইউনিট থাকে; সাইটোক্রোম যৌগ, প্লাস্টোকুইনন, প্লাস্টোসায়ানিন মেমব্রেনের সকল অংশে সমানভাবে বিদ্যমান। প্রকৃতিতে **PS-II এর বহু পূর্বে PS-I সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র ৩ বিলিয়ন বছর পূর্বে সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে PS-II সৃষ্টি হয়।**

থাইলাকয়েড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন : থাইলাকয়েড মেমব্রেনে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন বাহক নিয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন (ETC) গঠিত। বাহকগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নরূপ :

১। **ফিয়োফাইটিন (Pheophytin = Ph) :** একটি রূপান্তরিত ক্লোরোফিল-a অণু। পরবর্তী বাহক প্লাস্টোকুইননের সাথে এটি সংযোগ সৃষ্টি করে।

২। **প্লাস্টোকুইনন (Plastoquinone = PQ) :** অতি ছোট চলনশীল (mobile) লিপিড যা থাইলাকয়েড মেমব্রেনে মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে।

৩। **সাইটোক্রোম (Cytochrome = Cyt.) :** সাইটোক্রোম হলো লৌহঘটিত হিম (heme) গ্রুপবিশিষ্ট প্রোটিন। হিম গ্রুপের লৌহ ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে।

৪। **প্লাস্টোসায়ানিন (Plastocyanin = PC) :** অত্যন্ত চলনশীল একটি ক্ষুদ্র মেমব্রেন প্রোটিন। এর ইলেকট্রন গ্রহীতা গ্রুপ হলো কপার। এটি মুক্তভাবে থাইলাকয়েড প্রকোষ্ঠে চলাচল করতে পারে।

৫। **ফেরিডক্সিন (Ferredoxin = Fd) :** এটি একটি আয়রন-সালফার (Fe-S) প্রোটিন। এর লৌহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে ও বিতরণ করে।

৬। **NADP reductase :** এটি আসলে একটি ফ্ল্যাভোপ্রোটিন এবং বাউন্ড কো-এনজাইম FAD (ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড)। এর ফ্ল্যাভিন গ্রুপ হলো ইলেকট্রন গ্রহীতা।

সালোকসংশ্লেষণে পানি সরবরাহ : উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ফটোসিনথেসিস-এর প্রধান স্থান হলো পাতার মেসোফিল টিস্যুর কোষস্থ ক্লোরোপ্লাস্ট। কাজেই পাতার মেসোফিল কোষে অব্যাহত পানি সরবরাহ নিশ্চিত হতে হবে।

উদ্ভিদ তার মূলরোম দিয়ে (কখনো রাইজয়েড দিয়ে) মাটি কণা ফাঁকের কৈশিক পানি শোষণ করে। মূলরোম কর্তৃক শোষিত পানি ক্রমান্বয়ে কর্টেক্স পার হয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌঁছায়। জাইলেম টিস্যুর ভেসেল ও ট্রাকিড-এর মাধ্যমে উক্ত পানি কাণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখা পার হয়ে পাতায় পৌঁছায়। পাতার শিরাবিন্যাসের মাধ্যমে উক্ত পানি সমস্ত পত্রফলকের মেসোফিল টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানত অসমোসিস প্রক্রিয়ায় পানি প্রথমে কোষাভ্যন্তরে এবং শেষ পর্যন্ত ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে। উক্ত পানি ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং ফটোলাইসিস (photolysis) তথা সালোক বিভাজনের মাধ্যমে ভেঙে O_2 হিসেবে বায়ুতে নির্গত হয় এবং $2H^+$, NADP-কে বিজারিত করে NADPH + H^+ সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয়।

Scanned by CamScanner

পাতার মেসোফিল টিস্যুতে CO_2-এর প্রবেশ : CO_2 ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান, কারণ শর্করা তৈরির প্রধান কাঁচামাল হলো CO_2. সবুজ উদ্ভিদ এটি বায়ু থেকে গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডলে ০.০৩৫% CO_2 থাকে। পাতার পৃষ্ঠে অসংখ্য পত্ররন্ধ্র। খোলা পত্ররন্ধ্র দিয়ে বায়ু পত্ররন্ধ্রের পিছনের বায়ুকুঠুরী পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। বায়ুকুঠুরী হতে CO_2 ব্যাপনের মাধ্যমে মেসোফিল টিস্যুর কোষে প্রবেশ করে। কোষ থেকে পরে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে এবং কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) তৈরি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কলাকৌশল (Photosynthetic Mechanism)

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blackman) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেন; যথা- (ক) আলোকনির্ভর অধ্যায় এবং (খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়।

(ক) আলোকনির্ভর অধ্যায় (Light dependent reactions) : ATP ও NADPH + H^+ তৈরি।

আলোকনির্ভর অধ্যায়ের বিক্রিয়াসমূহ থাইলাকয়েড মেমব্রেন-এ সংঘটিত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার যে অধ্যায়ে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP ও NADPH + H^+ তে সঞ্চারিত হয়, তাকে আলোকনির্ভর অধ্যায় বলে। এ অংশের জন্য আলোক অপরিহার্য।

ক্লোরোফিল অণু আলোকরশ্মির ফোটন (photon) শোষণ করে এবং শোষণকৃত ফোটন হতে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP তৈরি করে।

এ ছাড়া আলোক অধ্যায়ে H_2O ভেঙে O_2 নির্গত হয় এবং NADP বিজারিত হয়ে NADPH + H^+ তৈরি হয়। আলোকনির্ভর অধ্যায়কে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হয় :

$$2ADP + 2Pi + 2NADP + 4H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} 2ATP + 2NADPH + H^+ + 2H_2O + O_2$$

উচ্চশক্তি সম্পন্ন ATP ও NADPH + H^+ সৃষ্টি করতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা সূর্যালোক হতে আসে। সূর্যালোকের শক্তিকে ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে। CO_2 আত্তীকরণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করতে ATP ও NADPH + H^+ এর শক্তি ব্যবহৃত হয় বলে ATP ও NADPH + H^+ কে আত্তীকরণ শক্তি (assimilatory power) বলে।

ফটোফসফোরাইলেশন : কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন; আর আলোক শক্তি ব্যবহার করে ফসফোরাইলেশন ঘটানোকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। ফটোফসফোরাইলেশন অচক্রীয় (non-cyclic) এবং চক্রীয় (cyclic) এ দু'ভাবে হতে পারে। বর্তমান ধারণার আলোকে এদেরকে নিচে বর্ণনা করা হলো :

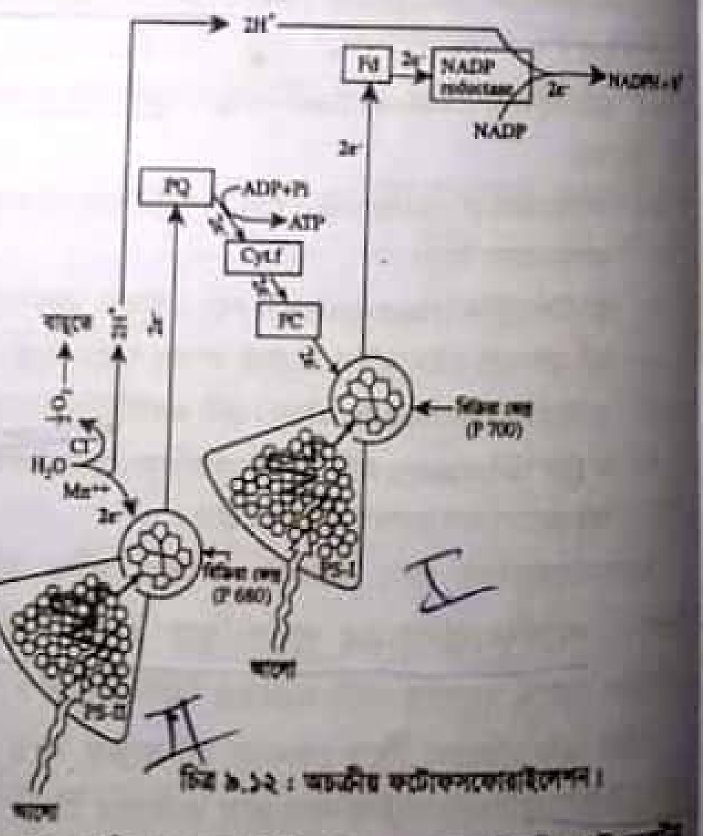

চিত্র ৯.১২ : অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন।

(১) অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন : যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-২ হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন পুনরায় সেখানে ফিরে না গিয়ে, ফটোসিস্টেম-১ এ চলে আসে তাকে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-১ এবং ফটোসিস্টেম-২ উভয়ই অংশ গ্রহণ করে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

Scanned by CamScanner

১। ফটোসিস্টেম-২ (PS-II) এর ক্লোরোফিল অণু আলোকশক্তি শোষণ করে। শোষিত আলোকশক্তি এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্রিয়া কেন্দ্র (reaction centre) P680-তে পৌঁছে। বিক্রিয়া কেন্দ্র শক্তিকৃত ইলেক্ট্রনকে গ্রহীতার কাছে পাঠাতে পারে।

২। P680 এর অরবিট হতে শক্তিকৃত ২টি ইলেক্ট্রন উৎক্ষিপ্ত হয় যা নিকটস্থ ইলেক্ট্রন গ্রহীতা ফিয়োফাইটিন (ছকে দেখানো হয়নি) কর্তৃক গৃহীত হয়। একই সময়ে পানি ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট ২টি ইলেক্ট্রন এসে P680 এর ইলেক্ট্রন ঘাটতি পূরণ করে।

৩। ফিয়োফাইটিন হতে ইলেক্ট্রন ২টি সাথে সাথেই প্লাস্টোকুইনন-এ (PQ) স্থানান্তরিত হয়। PQ একটি লিপিড ও চলনশীল বাহক।

৪। PQ তার ইলেক্ট্রন সাইটোক্রোম-এফ (Cyt. f) কে প্রদান করে পুনরায় ফিয়োফাইটিন হতে ইলেক্ট্রন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। এ ধাপে যে শক্তি নির্গত হয় তা দিয়ে ADP এর সাথে অজৈব ফসফেট সংযুক্ত হয়ে একটি ATP তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে ATP তৈরি হয় কেমিঅসমেটিক প্রক্রিয়ায়।

৫। সাইটোক্রোম-এফ, ইলেক্ট্রন ২টি প্লাস্টোসায়ানিন (PC)-কে প্রদান করে। PC একটি মেমব্রেন প্রোটিন।

৬। প্লাস্টোসায়ানিন (PC) ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) এর P700 কে ইলেক্ট্রন প্রদান করে (কারণ ইতোমধ্যেই PS-I কর্তৃক আলোকশক্তি শোষণের ফলে P700 বিক্রিয়া কেন্দ্রে ক্লোরোফিল- a অণুর অরবিট হতে দুটি শক্তিকৃত ইলেক্ট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং তথায় ইলেক্ট্রনের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে)।

৭। P 700 হতে উৎক্ষিপ্ত ২টি ইলেক্ট্রন ফেরিডক্সিন (Fd) গ্রহণ করে।

৮। Fd হতে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে NADP-reductase। NADP reductase দুটি ইলেক্ট্রন (P700 বিক্রিয়া কেন্দ্র হতে উৎক্ষিপ্ত) এবং দুটি প্রোটন (পানির ভাঙন হতে সৃষ্ট) সহযোগে NADP কে বিজারিত করে NADPH + H+ তৈরি করে।

PS-II হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন পুনরায় সেখানে ফিরে না গিয়ে PS-I-এ চলে আসে।

ফটোসিস্টেম-২ যে ইলেক্ট্রন হারায় পানি হতে ইলেক্ট্রন এসে তা পূরণ করে। অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন অব্যাহতভাবে পানি থেকে PS-II-তে ইলেক্ট্রন সরবরাহ হতে থাকে। কারণ, একই সময়ে Mn^{++} ও Cl^- এর উপস্থিতিতে পানি ভেঙে O_2, ইলেক্ট্রন (e^-) এবং প্রোটন (H^+)-এ বিভক্ত হয়। অক্সিজেন অণু বায়ুতে চলে যায়, ইলেক্ট্রন ফটোসিস্টেম-২ কর্তৃক গৃহীত হয়। পানির এ দুটি প্রোটন ($2H^+$) এবং PS-I হতে উদ্ভূত দুটি ইলেক্ট্রন ($2e^-$) NADP-কে বিজারিত করে NADPH + H^+ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কাজেই ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন নির্গত হয় তা অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন পর্যায়ে পানির ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হয়। পানির এরূপ ভাঙনকে পানির সালোকবিভাজন বা ফটোলাইসিস অব ওয়াটার বলে।

(২) চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন: যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-১ হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রন বিভিন্ন বাহক ঘুরে একটি ATP তৈরি পূর্বক পুনরায় ফটোসিস্টেম-১-এ ফিরে আসে তাকে চক্রীয় ফটোফসফো-রাইলেশন বলে।

এ প্রক্রিয়ায় কেবল ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) অংশগ্রহণ করে। ফটোসিস্টেম-১ (PS-I) এর ক্লোরোফিল অণু আলোক ফোটন শোষণ করে শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং এই শক্তি বিক্রিয়া কেন্দ্রে (P700) স্থানান্তরিত হয়। পরে P700 ক্লোরোফিল- a অণু হতে দুটি শক্তিপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়। উচ্চ শক্তিপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রন ফেরিডক্সিন (Fd)-এ যায়। পরে Fd হতে ইলেক্ট্রন প্লাস্টোকুইনন (PQ)-এ (কারো কারো মতে Cyt. b_6 হয়ে) স্থানান্তরিত হয়। PQ হতে ইলেক্ট্রন Cyt. f.-এ আসে। এ সময় ইলেক্ট্রনের মুক্ত শক্তি দ্বারা ADP ও Pi সহযোগে একটি ATP তৈরি হয়। Cyt. f. হতে ইলেক্ট্রন প্লাস্টোসায়ানিন (PC)-এর মাধ্যমে P700-তে ফিরে আসে। আদি ব্যাক্টেরিয়াতে কেবল চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন ঘটে। সায়ানোব্যাক্টেরিয়া, শৈবাল ও সবুজ উদ্ভিদে সাধারণত NADP-র

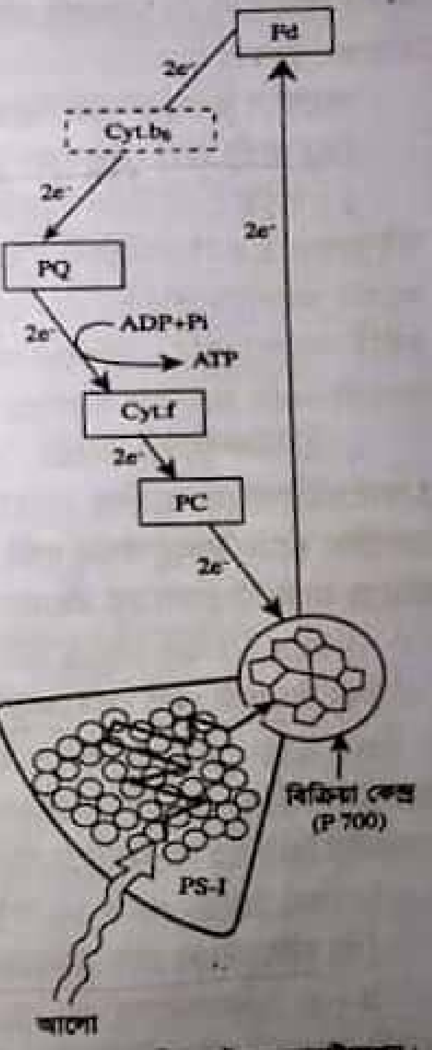

চিত্র ৯.১৩ : চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন।

Scanned by CamScanner

সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে চক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। পানির সরবরাহ বন্ধ হলে অচক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে না, চক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে। প্রয়োজন হলে উভয় প্রক্রিয়া একইসাথে চলতে পারে।

(খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (Light independent reactions) : কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা কার্বন বিজারণ পদ্ধতি। আলোকনির্ভর অধ্যায়ে সৃষ্ট ATP ও NADPH + H^+ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 হতে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ অধ্যায়ে CO_2 বিজারিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে বলে একে কার্বন বিজারণ অধ্যায় বলা হয়। কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় কোনো আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না তাই একে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় বা অন্ধকার অধ্যায়ও বলা হয়। তবে আলোর উপস্থিতিতেই কার্বন বিজারণ হয়ে থাকে। এর কারণ আলোর উপস্থিতিতে ATP ও NADPH + H^+ সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং স্টোম্যাটা খোলা থাকায় CO_2 ও O_2 বিনিময় সহজ হয়। আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (বা কার্বন বিজারণ) এর বিক্রিয়াসমূহ ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে সংঘটিত হয়। আবহমণ্ডলের CO_2 হতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টির তিনটি স্বীকৃত পথ আছে; তা হলো- (১) ক্যালভিন চক্র, (২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং (৩) CAM প্রক্রিয়া।

কোষে সংঘটিত মেটাবলিক বিক্রিয়াসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে যাকে বলা হয় গতিপথ (Pathway)। যে গতিপথ চক্রাকারে ঘটে থাকে তাকে চক্রও (cycle) বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ, যেমন-আম, জাম।

(১) ক্যালভিন চক্র : C_3 চক্র (Calvin cycle : C_3 cycle) : ১৯৪৭-১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালভিন ও তাঁর সহযোগীরা (Melvin Calvin,1911-1997, Benson & Bassham) তেজস্ক্রিয় কার্বন (^{14}C-কার্বনের আইসোটোপ) ব্যবহার করে সন্ধানী পদ্ধতিতে (tracer technique) *Chlorella* নামক এককোষী শৈবালে কার্বন বিজারণের যে চক্রাকার গতিপথ আবিষ্কার করেন তা ক্যালভিন চক্র নামে পরিচিত। ক্যালভিন এজন্য ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র নিম্নরূপ :

(ক) কার্বন যোগ (কার্বোক্সাইলেশন) :

১। বায়ুস্থ CO_2 (এক কার্বনবিশিষ্ট) ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে প্রবেশ করে তথায় পূর্ব থেকে অবস্থিত ৫-কার্বনবিশিষ্ট রাইবুলোজ ১,৫-বিসফসফেট (RuBP)-এর সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে ৬-কার্বনবিশিষ্ট সম্পূর্ণ অস্থায়ী কিটো অ্যাসিড। কাজেই ক্যালভিন চক্রের CO_2-এর গ্রহীতা হলো RuBP। রুবিস্কো (rubisco) এনজাইম CO_2-কে RuBP এর সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করে। [পৃথিবীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম হলো রুবিস্কো কারণ এটি প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীবজগতের মাঝে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে। রুবিস্কো হলো 'রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ/ অক্সিজিনেজ এনজাইমের অ্যাক্রোনিম (acronym)]।

২। ৬ কার্বনবিশিষ্ট কিটো অ্যাসিড এক অণু H_2O গ্রহণ করে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সাথে সাথেই দুই অণু 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3PGA) উৎপন্ন করে। 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ। ক্যালভিন চক্রে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩-কার্বনবিশিষ্ট বলে এ চক্রকে C_3 চক্রও বলা হয়। যে সব উদ্ভিদে C_3 চক্রের মাধ্যমে কার্বন বিজারণ হয় তাদেরকে C_3 উদ্ভিদ বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ যেমন- আম, জাম।

[৬ চক্রে ১২ অণু 3PGA তৈরি হয়]

(খ) ফসফেট যোগ (ফসফোরাইলেশন)

৩। ATP থেকে একটি ফসফেট গ্রহণ করে 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ (BPGA) পরিণত হয়। এখানে একটি ATP খরচ হয় এবং ১টি ADP মুক্ত হয়। এখানে 3-ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইম বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে থাকে।

[১২ অণু 3PGA থেকে ১২ অণু BPGA তৈরি হয়; ১২টি ATP খরচ হয়, ১২টি ADP মুক্ত হয়]

(গ) হাইড্রোজেন যোগ (রিডাকশন)

৪। 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট-এ (G3P) পরিণত হয়। এখানে একটি ফসফেট হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। NADPH+H^+ বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং NADP হিসেবে মুক্ত হয়। গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। G3P একটি ৩-কার্বনবিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেট।

Scanned by CamScanner

[১২ অণু BPGA থেকে ১২ অণু G3P তৈরি হয়; ১২টি NADPH + H⁺ অংশ গ্রহণ করে, ১২টি NADP ও ১২টি Pi যুক্ত হয়।]

(ঘ) RuBP পুনঃউৎপাদন এবং দ্রব্য (স্টার্চ, সুকরোজ) উৎপাদন

[১২টি G3P তে (১২ × ৩ = ৩৬) ৩৬টি কার্বন আছে। এর মধ্যে ১০টি G3P (৩০টি কার্বন) বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ৬টি ৫-কার্বনবিশিষ্ট (৫ × ৬ = ৩০) RuBP পুনঃউৎপাদন করে। ২টি G3P (৩ × ২ = ৬ কার্বন) মিলিতভাবে বিভিন্ন বিক্রিয়া শেষে গ্লুকোজ সৃষ্টির মাধ্যমে সুকরোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ (যা কোষ, টিস্যু ও অঙ্গ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় অথবা জমা হয়) ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করে।]

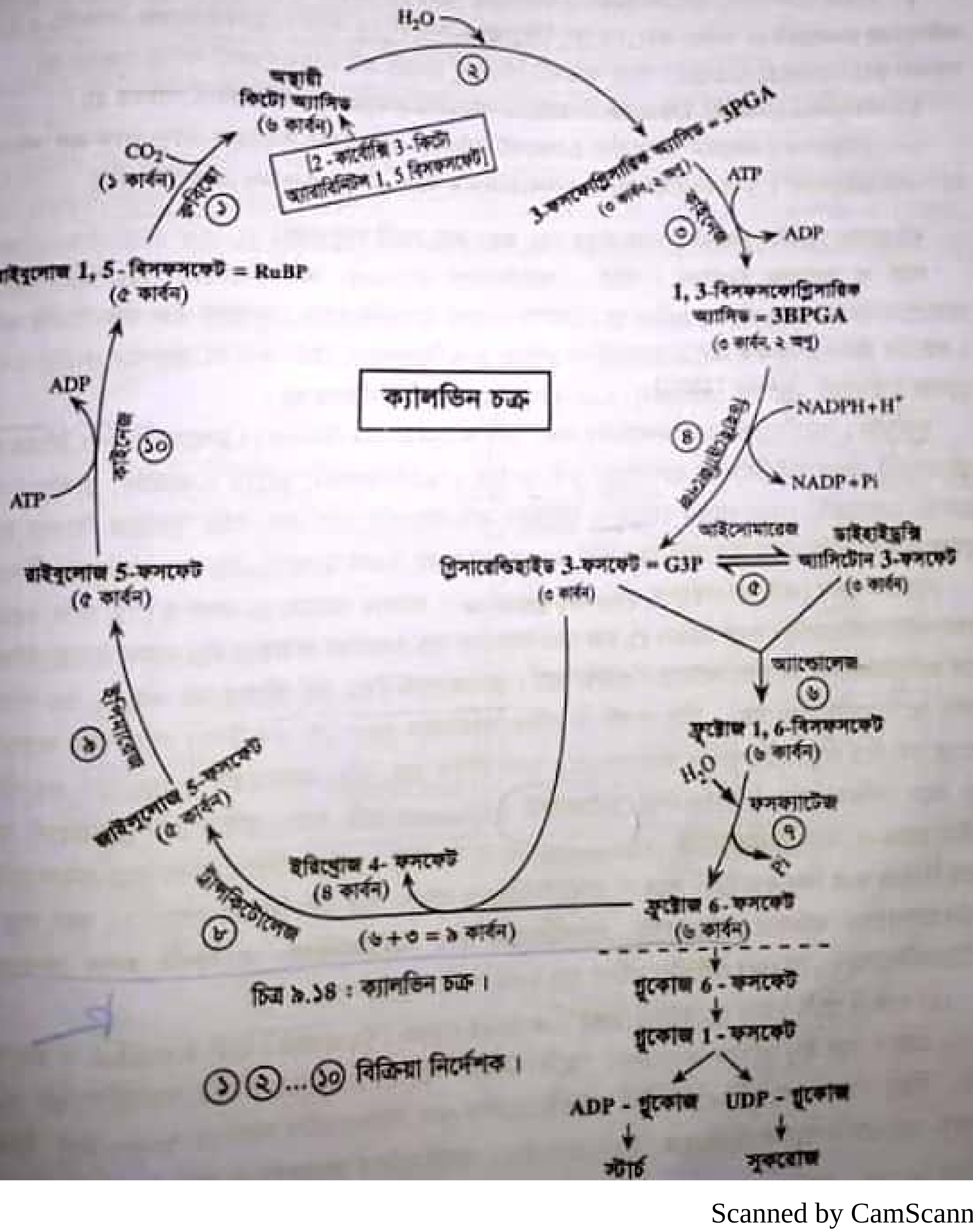

চিত্র ৯.১৪ : ক্যালভিন চক্র।

১, ২ ... ১০ বিক্রিয়া নির্দেশক।

Scanned by CamScanner

৫। এক অণু গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট, **ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ** এনজাইমের সহায়তায় এক
ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট-এ পরিণত হয়।

৬। এক অণু ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন 3-ফসফেট এবং এক অণু গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট মিলিতভাবে সৃষ্টি
এক অণু **ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট**। **অ্যাল্ডোলেজ** এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৭। ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট এক অণু পানি গ্রহণ করে সৃষ্টি করে **ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট**। এখানে এক অণু ফস
মুক্ত হয়। **ফসফ্যাটেজ** এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৮। ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেটের সাথে মিলিতভাবে (৬+৩ = ৯ কার্বন) সৃষ্টি করে এক
জাইলুলোজ 5-ফসফেট (৫ কার্বন) এবং এক অণু **ইরিথ্রোজ 4-ফসফেট** (৪ কার্বন)। **ট্রান্সকিটোলেজ** এনজাইম এ বিক্রিয়ায়
সহায়তা করে। ইরিথ্রোজ ৪-ফসফেট আরো কয়েকটি বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই চক্রের পরবর্তী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯। জাইলুলোজ 5-ফসফেট **ইপিমারেজ** এনজাইমের সহায়তায় **রাইবুলোজ 5-ফসফেট**-এ পরিণত হয়।

১০। রাইবুলোজ 5-ফসফেট, **রাইবুলোজ 5-ফসফেট কাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় ATP থেকে এক অণু ফস
গ্রহণ করে **রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট** (RuBP) পুনঃউৎপাদন করে। এখানে এক অণু ADP মুক্ত হয়।

রাইবুলোজ 1, 5-বিসফসফেট পুনরায় বায়ুস্থ CO_2 গ্রহণ করে চক্রটি চালু রাখে।

স্টার্চ ও সুকরোজ উৎপাদন : স্টার্চ : সাইটোসোলে (Cytosol) অর্থোফসফেটের (Pi) ঘনত্ব কম থাক
ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে স্টার্চ সংশ্লেষিত হয়। ট্রায়োজ ফসফেট গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটো
3-ফসফেট মিলিতভাবে এক অণু ৬-কার্বনবিশিষ্ট ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট তৈরি করে যা ক্রমান্বয়ে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফে
গ্লুকোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 1-ফসফেট, ADP-গ্লুকোজ হয়ে **স্টার্চ**-এ পরিণত হয়।

সুকরোজ : সাইটোসোলে অর্থোফসফেটের ঘনত্ব বেশি থাকলে Pi-এর বিনিময়ে Pi ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ট্রায়োজ ফস
ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে সাইটোসোলে চলে আসে এবং ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট, ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, গ্লুকোজ 6-ফসফে
গ্লুকোজ 1-ফসফেট, UDP গ্লুকোজ (UDP= ইউরিডিন ডাই-ফসফেট) হয়ে শেষ পর্যন্ত সুকরোজ হিসেবে জমা হ
সুকরোজ সারা উদ্ভিদ দেহে ট্রান্সপোর্ট হয়। স্টার্চ এবং সুকরোজ এই চক্রের উৎপাদন, এই চক্রে অংশগ্রহণকারী নয়।

আলোক শ্বসন (ফটোরেসপিরেশন, Photorespiration) : আলোর সাহায্যে O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করার প্রক্রি
হলো ফটোরেসপিরেশন। সবুজ উদ্ভিদে C_3 চক্র তথা ক্যালভিন চক্র চলাকালে পরিবেশে তীব্র আলো ও উচ্চ তাপমাত্রা সৃ
হলে ফটোসিনথেসিস না হয়ে ফটোরেসপিরেশন ঘটে। ক্লোরোপ্লাস্টে CO_2 এর পরিমাণ কম এবং O_2 এর পরিমাণ বে
হলেই ফটোরেসপিরেশন হয়। তীব্র আলো ও অধিক তাপমাত্রায় (৩০° সে. এর উপর) গাছে পানি সংরক্ষণের জ
পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পাতার অভ্যন্তরে CO_2 গ্যাস সীমিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় RuBP, CO_2 এর পরিবর্তে O_2
এর সাথে বিক্রিয়া করে ২-কার্বনবিশিষ্ট গ্লাইকোলেট (glycolate) তৈরি করে। গ্লাইকোলেট ক্লোরোপ্লাস্ট ত্যাগ ক
সাইটোপ্লাজম-এ এসে পারঅক্সিসোম (Peroxisome)-এ প্রবেশ করে। পারঅক্সিসোমে প্রবেশ করে গ্লাইকোলেট O_2 এ
সাথে বিক্রিয়া করে কিছু দ্রব্য তৈরি করে যা মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং বিক্রিয়া শেষে CO_2 ত্যাগ করে। ক
ফটোরেসপিরেশন প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিসোম এবং মাইটোকন্ড্রিয়া– এ তিনটি অঙ্গাণু অংশগ্রহণ কর
ফটোরেসপিরেশন C_3 উদ্ভিদের ফটোসিনথেসিস হার ২৫% পর্যন্ত কমাতে পারে।

(২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র : C_4 চক্র (Hatch and Slack Cycle : C_4 cycle) : H.P. Kortschak ও তাঁর সহযোগী
$^{14}CO_2$ প্রয়োগ করে ইক্ষু উদ্ভিদে এবং একই পদ্ধতি ব্যবহার করে Y. Karpilov ও তাঁর সহযোগীরা ভুট্টা (Zea
উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে ৪-কার্বনবিশিষ্ট ম্যালিক অ্যাসিড এবং অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে ৭০-৮০ ভাগ চিহ্নিত
দেখতে পান, অর্থাৎ গবেষণায় ব্যবহৃত $^{14}CO_2$ কোনো C_3 পদার্থ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ না করে C_4 পদার্থ সৃষ্টিতে অং

Scanned by CamScanner

করেন। এটি ক্যালভিন চক্রের ব্যতিক্রম। পরবর্তীতে M.D. Hatch ও C.R. Slack নামক দুজন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী ইক্ষু উদ্ভিদ নিয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা করে কার্বন বিজারণের এ ভিন্ন পথকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন (অর্থাৎ ইক্ষু উদ্ভিদেই পূর্ণাঙ্গভাবে এই গতিপথ প্রথম আবিষ্কৃত হয়), যা পরে Hatch & Slack গতিপথ বা C_4 চক্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় (১৯৭০)। ডাইকার্বোক্সিলিক চক্র হিসেবেও এটি পরিচিত। বর্তমানে ১৬টি গোত্রের বহু উদ্ভিদে এ গতিপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাতার মেসোফিল কোষ এবং বান্ডলসীথ কোষ সম্মিলিতভাবে এই গতিপথ সম্পন্ন করে। ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ এবং পাইরুভেট-অর্থোফসফেট ডাইকাইনেজ এনজাইম মেসোফিল কোষে সীমাবদ্ধ থাকে। ডিকার্বোক্সিলেজসমূহ এবং ক্যালভিন চক্রের সকল এনজাইম বান্ডলসীথ কোষে সীমাবদ্ধ থাকে।

নিম্নলিখিত পর্যায়ে এই গতিপথ (চক্র) সমাপ্ত হয় :

১। মেসোফিল কোষে অবস্থিত ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড (৩ কার্বন) এর সাথে বায়ুস্থ CO_2 (HCO_3^- হিসেবে অংশগ্রহণ করে) মিলিত হয়ে ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে। কার্বোক্সিলেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে।

২। অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড পরে ম্যালিক অ্যাসিড অথবা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড (৪ কার্বন)-এ পরিণত হয়। ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। এখানে $NADPH + H^+$ যুক্ত হয়ে NADP তৈরি করে। প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৪-কার্বনবিশিষ্ট বলে এই চক্রকে C_4 চক্র বলা হয়। যেসব উদ্ভিদে C_4 চক্রের মাধ্যমে কার্বন বিজারণ হয় তাদেরকে C_4 উদ্ভিদ বলে।

চিত্র ৯.১৫ : হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র : একটি সাধারণ পথ পরিক্রমা।

Scanned by CamScanner

৩। ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড মেসোফিল কোষ থেকে প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে বান্ডলসীথ কোষে প্র... করে।

৪। বান্ডলসীথ কোষে ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড এক অণু CO_2 উৎপন্ন করে ৩-কার্বনবিশিষ্ট পাইরু... অ্যাসিডে পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় NADP অংশগ্রহণ করে এবং $NADPH + H^+$ তৈরি হয়। উৎপন্ন CO_2 সরাসরি... চক্রে (ক্যালভিন চক্র) প্রবেশ করে (অর্থাৎ রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট কর্তৃক গৃহীত হয়) এবং চক্রটি এখানে পুন... হয়। এ বিক্রিয়ায় ডিকার্বোক্সিলেজ এনজাইম সহযোগিতা করে।

৫। পাইরুভিক অ্যাসিড বান্ডলসীথ কোষ থেকে প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে।

৬। পাইরুভিক অ্যাসিড মেসোফিল কোষে **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ** এনজাইমের সহযোগিতায় ফসফো... পাইরুভিক অ্যাসিড পুনঃউৎপাদন করে এবং চক্রটি চালু থাকে। এখানে একটি ATP থেকে একটি ADP তৈরি হয়।

বান্ডলসীথ কোষে CO_2 এর অভাব হয় না, তাই কোনো ফটোরেসপিরেশন হয় না, ফলে কার্বন বিজারণ হার ব... হয়।

উদ্ভিদে তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ্য করা যায় : (i) বান্ডলসীথ কোষে স্থানান্তরিত C_4 অ্যাসিডের ধরন, (ii) মেসোফিল কোষে স্থানান্তরিত C_3 অ্যাসিডের ধরন এবং (iii) বান্ডলসীথ কোষে ডিকার্বোক্সিলেশন এনজাইমের প্রকার। তিন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ্য করা যায়। যথা :

চিত্র ৯.১৬ : C_4 গতিপথ : NADP-malic enzyme প্রকার
ইক্ষু, ভুট্টা, সরগাম উদ্ভিদে এই চক্র পরিচালিত হয়।

(A) NADP-malic enzyme প্রকার।
ভুট্টা, ইক্ষু, সরগাম, ক্র্যাব ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী (৯.১৬ নং চিত্রে দেখানো হলো)।

(B) NAD-malic enzyme প্রকার। মিল্যাত, কাউন, চিনা ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী।

(C) Phosphoenolpyruvate carboxykinase প্রকার। গিনি ঘাসে (Guinea grass) এ প্রকার কার্যকরী।

বি. দ্র. আমাদের দেশে উপরে উল্লেখিত উদ্ভিদগুলো ছাড়া বাকি অধিকাংশ উদ্ভিদই (পাট, আম, জাম, কলা, লিচু ইত্যাদি) C_3 উদ্ভিদ।

যে সব উদ্ভিদে C_3 চক্র সংঘটিত হয় তাদেরকে বলা হয় C_3 উদ্ভিদ। যে সব উদ্ভিদে C_4 চক্র সংঘটিত হয় তাদের... বলা হয় C_4 উদ্ভিদ।

Scanned by CamScanner

নিচের ছক দুটির প্রতি লক্ষ্য কর

পার্থক্যের বিষয়	C_3 উদ্ভিদ	C_4 উদ্ভিদ
১। তাপমাত্রা	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম নয়।	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম।
২। ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে মেসোফিল কোষের কোনো পৃথক স্তর থাকে না।	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে অরীয়ভাবে সজ্জিত মেসোফিল কোষের ঘন স্তর বিদ্যমান (ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি)।
৩। ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকার	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই রকম।	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই রকম : (i) গ্রানাযুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এবং (ii) গ্রানাবিহীন বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট।
৪। CO_2 এর ঘনত্ব	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ৫০ ppm (parts per million) প্রয়োজন (৫০-১৫০ ppm)।	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ০.১০ ppm প্রয়োজন (০.১০-১০ ppm)।
৫। বিক্রিয়া	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডলসীথ কোষে CO_2 সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।
৬। উৎপত্তি	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_3 উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে।	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_4 উদ্ভিদ উষ্ণমণ্ডলে উৎপত্তি লাভ করেছে।

ক্যালভিন চক্র	হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র
(i) কেবল মেসোফিল কোষে হয়।	(i) মেসোফিল ও বান্ডলসীথ কোষে হয়।
(ii) ফটোরেসপিরেশন ঘটে।	(ii) ফটোরেসপিরেশন ঘটে না।
(iii) প্রাথমিক CO_2 গ্রহীতা RuBP	(iii) প্রাথমিক CO_2 গ্রহীতা PEP
(iv) CO_2 ফিকসিং এনজাইম রুবিস্কো	(iv) CO_2 ফিকসিং এনজাইম PEP-কার্বোক্সিলেজ
(v) প্রথম স্থায়ী দ্রব্য 3PGA (৩-কার্বন)	(v) প্রথম স্থায়ী দ্রব্য অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (৪-কার্বন)।
(vi) CO_2-এর জন্য কার্বোক্সিলেজ-এর দক্ষতা মধ্যম।	(vi) CO_2-এর জন্য কার্বোক্সিলেজ-এর দক্ষতা উচ্চ।
(vii) ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন একই রকম।	(vii) ব্যবহৃত ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন দু'রকম (বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে উন্নত গ্রানাম থাকে না)।
(viii) এ চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ১০° সে. থেকে ২৫° সে.।	(viii) এ চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ৩০° সে. থেকে ৪৫° সে.।
(ix) বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ৫০ ppm পরিমাণ CO_2 থাকা প্রয়োজন।	(ix) বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে নিম্নতম ০.১০ ppm CO_2 থাকলেও চলে।

C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। C_4 উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

২। বান্ডলসীথের কোষগুলো ভাস্কুলার বান্ডলের সাথে অরীয়ভাবে অবস্থান করে।

৩। বান্ডলসীথের মাঝে যে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়, তাতে গ্রানা অনুপস্থিত কিন্তু মেসোফিল কোষে উন্নত প্রকৃতির গ্রানা বিদ্যমান। যেমন-ইক্ষু উদ্ভিদের পাতা।

৪। C_4 উদ্ভিদের মেসোফিল কোষে রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতা অনুপস্থিত।

৫। NADP ম্যালিক অ্যাসিড এনজাইমের উপস্থিতিতে বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে C_3 চক্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিপাকীয় শক্তি $NADPH + H^+$ উৎপাদিত হয়।

উদ্ভিদ চক্রের গুরুত্ব

১। C_4 উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় ($30°C - 45°C$) সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হতে পারে, তাই উচ্চ তাপমাত্রায় এরা কর্মক্ষম থাকে।

Scanned by CamScanner

২। C_4 উদ্ভিদের CO_2 গ্রাহক ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড, C_3 উদ্ভিদের CO_2 গ্রাহক রাইবুলোজ ১,৫-বিসফসফেট অপেক্ষা অধিক কার্যকর থাকে।

৩। উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র আংশিকভাবে বন্ধ থাকলেও C_4 গতিপথ চালু থাকে।

৪। CO_2 এর অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বে C_4 গতিপথ চলতে পারে, তাই CO_2 কমের জন্য কার্বন বিজারণ বন্ধ হয় না।

৫। C_4 উদ্ভিদে প্রস্বেদন ও ফটোরেসপিরেশন কম হয় বলে CO_2 এর বিজারণ বেশি হয়।

৬। C_4 উদ্ভিদের পাতায় Kranz অ্যানাটমির জন্য এর খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা বেশি ও অতি সহজভাবে পরিবাহিত হতে পারে।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন (O_2)-এর উৎস : সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

এতে দেখা যায়, এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে ৬ অণু O_2 নির্গত হয়। বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী CO_2 ও H_2O। অতএব, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের দুটি উৎস হতে পারে– একটি হলো CO_2 এবং অপরটি হলো H_2O। নিম্নবর্ণিত পরীক্ষাগুলো হতে এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সালোকসংশ্লেষণের সময় যে O_2 নির্গত হয় তা H_2O হতে আসে, CO_2 হতে নয়, অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস হলো পানি (H_2O)। পরীক্ষাগুলো নিম্নরূপ :

(i) হিল বিক্রিয়া : ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রবিন হিল (Robin Hill) নামক ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ একটি পরীক্ষা করেন। তিনি CO_2 এর অনুপস্থিতিতে পৃথককৃত ক্লোরোপ্লাস্ট, পানি ও কিছু অজৈব জারক তথা হাইড্রোজেন গ্রাহক (hydrogen acceptor) একত্রে আলোতে রাখেন। পরীক্ষা শেষে দেখা যায় CO_2-এর অনুপস্থিতিতে কোনো শর্করা তৈরি হয় না, কিন্তু অক্সিজেন নির্গত হয়। আসলে পানির হাইড্রোজেন অজৈব জারক তথা হাইড্রোজেন গ্রাহককে বিজারিত (reduced) করে এবং অক্সিজেন বের হয়ে আসে। হিলের এ পরীক্ষা হতে প্রমাণিত হয় যে, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি। হিল বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$A\ (\text{অজৈব জারক}) + H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} AH_2 + \frac{1}{2}O_2$$

(ii) ভ্যান নীল (Van Niel)-এর পরীক্ষা : ভ্যান নীল সালোকসংশ্লেষণকারী সালফার ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখান যে, সালফার ব্যাক্টেরিয়া পানির পরিবর্তে H_2S গ্যাস ও CO_2 ব্যবহার করে শর্করা ও পানি উৎপন্ন করে। কিন্তু সেখানে কোনো অক্সিজেন নির্গত হয় না। তবে সালফার অণু নির্গত হয়। কাজেই এখানেও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি; CO_2 নয়।

$$2H_2S + CO_2 \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} 2S + (CH_2O) + H_2O$$

(iii) রুবেন ও কামেন-এর তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা : ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যামুয়েল রুবেন ও কামেন তেজস্ক্রিয় O_2^{18} (অক্সিজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ) দ্বারা পানির অক্সিজেনকে চিহ্নিত করেন এবং ঐ পানিতে কতগুলো শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ রেখে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলাফল লক্ষ করেন।

$$6CO_2 + 12H_2O^{18} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2^{18}$$

দেখা গেল যে, নির্গত অক্সিজেন তেজস্ক্রিয়। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস পানি। একই পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে O_2^{18} দ্বারা চিহ্নিত করে এবং স্বাভাবিক পানি ব্যবহার করে একই পরীক্ষা করা হলো।

Scanned by CamScanner

$$6CO_2^{18} + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6^{18} + 6H_2O^{18} + 6O_2$$

এবার দেখা গেল যে, শর্করা ও পানিতে তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন বিদ্যমান। কিন্তু সালোকসংশ্লেষণের ফলে নির্গত অক্সিজেন মোটেই তেজস্ক্রিয় নয়। কাজেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত সবটুকু অক্সিজেনের উৎসই পানি। এর সামান্যতম অংশও কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে আসে না।

সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকসমূহ : সালোকসংশ্লেষণ কতগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। প্রভাবকের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, পরিমাণের কম-বেশি সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও কম-বেশি করে থাকে। প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ :

(ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ : বেশ কিছু বাহ্যিক প্রভাবক রয়েছে যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১। আলো : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য প্রস্তুতকরণে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা সূর্যালোক হতে এসে থাকে। সূর্যালোক ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। সূর্যালোকের প্রভাবেই পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, CO_2 পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণে অংশগ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আলোর পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়। আলোক বর্ণালির সাতটি রঙের মধ্যে লাল, কমলা, নীল ও বেগুনি অংশই সালোকসংশ্লেষণে বেশি ব্যবহৃত হয়।

আলোর পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে পাতার অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়, তাই সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

২। কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) : কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কারণ এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারণের ফলেই হয়ে থাকে। উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হতে CO_2 গ্রহণ করে থাকে। বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ শতকরা ০.০৫ ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত CO_2 ব্যবহার করতে পারে, তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণও বেড়ে যায়।

৩। পানি : কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো পানিও এ প্রক্রিয়ার একটি কাঁচামাল। পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারও কমে যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ কমে যেতে পারে। অপরপক্ষে পানির উপস্থিতিই রক্ষীকোষকে স্ফীত করে এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। ফলে CO_2 অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাজেই পানির পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে আসে।

৪। তাপমাত্রা : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সাধারণত অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (0° সে.-এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (৪৫° সে.-এর উপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া ও উষ্ণ প্রস্রবণের নীলাভ-সবুজ শৈবালে ৭০° সে. তাপমাত্রায়ও এ প্রক্রিয়া চলতে পারে। তবে ৪৫° সে.-এর উপরে তাপমাত্রা উঠলে অধিকাংশ উদ্ভিদেই এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ২০° সে. তাপমাত্রার নিচে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমে যায়। উদ্ভিদের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে অপ্টিমাম তাপমাত্রা ২২° সে. হতে ৩৫° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫। অক্সিজেন : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে অধিকাংশ উদ্ভিদেই সালোকসংশ্লেষণের হার কিছুটা কমে যায়। আর ঘনত্ব কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়।

৬। খনিজ পদার্থ : ক্লোরোফিল তৈরির জন্য লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। মাটিতে এসব খনিজ পদার্থের অভাব হলে ক্লোরোফিল তৈরি কমে যায়, ফলে সালোকসংশ্লেষণ হারও কমে যায়।

Scanned by CamScanner

৭। বাইরে থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য : কিছু শৈবাল বা অন্যান্য উদ্ভিদে বাইরে থেকে ভি... বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যদি না পায় তাহলে সালোকসংশ্লেষণ হয় না। কারণ এরা এসব দ্রব্য নিজে তৈরি করতে পারে না। এদেরকে photoauxotroph বলে। photoauxotrophs

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ : কিছু অভ্যন্তরীণ প্রভাবক রয়েছে যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে নানাভাবে নি... করে।

৮। পাতার বয়স : পাতার বয়সও সালোকসংশ্লেষণে একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। একেবারে কচি পাতা ও একেবারে বৃদ্ধ পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। মাঝারি বয়সের পাতাই অধিক পরিমাণে সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৯। পাতার অন্তর্গঠন : পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতি বিশেষ করে মেসোফিল কোষের বিন্যাস ও প্রকৃতি, পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে।

১০। ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিলই সূর্যালোকের শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কার্বন বিজারণে সাহায্য করে থাকে। কাজেই ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতিতে কিছুতেই এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। ক্লোরোপ্লাস্টের অভ্যন্তরে সালোকসংশ্লেষণ হয়ে থাকে।

ব্যস্তানু ১১। শর্করার পরিমাণ : পাতার অভ্যন্তরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

১২। প্রোটোপ্লাজম : প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ও ধরনের উপর সালোকসংশ্লেষণের হার অনেকটা নির্ভরশীল।

১৩। পটাসিয়াম : পটাসিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ কমে যেতে দেখা যায়। কারণ, স্নায়ব... প্রক্রিয়ার অণুঘটক হিসেবে পটাসিয়াম কাজ করে। পত্ররন্ধ্র খোলাতে K^+ ভূমিকা রাখে।

১৪। এনজাইম : বহু ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। কাজেই বিক্রিয়া সম্পন্নে প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপস্থিতি ও পরিমাণও সালোকসংশ্লেষণ হার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

লিমিটিং ফ্যাক্টর (Limiting Factor) বা সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর

বিভিন্ন পরিবেশমূলক ফ্যাক্টর, যথা-CO_2, আলো, তাপ, পানি, অক্সিজেন ইত্যাদি একত্রে সালোকসংশ্লেষণের হারকে প্রভাবিত করে। উপরিউক্ত ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর সালোকসংশ্লেষণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা এককভাবে অন্যান্য ফ্যাক্টর থেকে পৃথক করা কঠিন কাজ। এতদসত্ত্বেও সালোকসংশ্লেষণের উপর প্রভাব সম্পর্কে প্রতিটি ফ্যাক্টরের সর্বনিম্ন (minimum), উপযুক্ত (optimum) এবং সর্বোচ্চ (maximum) প্রভাব কি তার উপর ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ১৮৪৩ সালে লিবিগ (Liebig, 1843) 'ল অব মিনিমাম' (Law of minimum) প্রস্তাব করেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

যদি একটি শারীরবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়া একাধিক ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সবচেয়ে ধীর গতিসম্পন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা শারীরবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রিত হবে। ১৯০৫ সালে ব্ল্যাকম্যান (Blackman, 1905) 'ল অব মিনিমাম' (Law of minimum) এর উপর ভিত্তি করে 'ল অব লিমিটিং ফ্যাক্টর সূত্র' (Law of limiting factor) বা 'সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর সূত্র' প্রস্তাব করেন। এ সূত্র অনুযায়ী যখন কোনো শারীরবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা (rapidity) কয়েকটি পৃথক ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয় সে ক্ষেত্রে নিম্নতম গতিসম্পন্ন ফ্যাক্টর দ্বারাই এ প্রক্রিয়ার গতি সীমাবদ্ধ হবে। ব্ল্যাকম্যানের ভাষায় "When a process is conditioned as to its rapidity by a number of seperate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor."

Scanned by CamScanner

লিমিটিং ফ্যাক্টরের নীতি অনুযায়ী সালোকসংশ্লেষণ যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র একটি ফ্যাক্টর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। সালোকসংশ্লেষণের হার ঐ নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরের সমানুপাতিক (proportional) অর্থাৎ ফ্যাক্টরটির পরিমাণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হারও বাড়বে। কিন্তু এই ফ্যাক্টরটির পরিমাণ অপটিমাম মান (optimum value) থেকে অনেক বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণের হারের উপর এর প্রভাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং এর স্থলে অন্য একটি ফ্যাক্টর সালোকসংশ্লেষণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ২/৩টি উদাহরণ দ্বারা এ নীতিটি বোঝানো যায়।

চিত্র ৯.১৭ : সালোকসংশ্লেষণের উপর সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর হিসেবে তাপের প্রভাব (ব্লাকম্যানের সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর নীতি)।

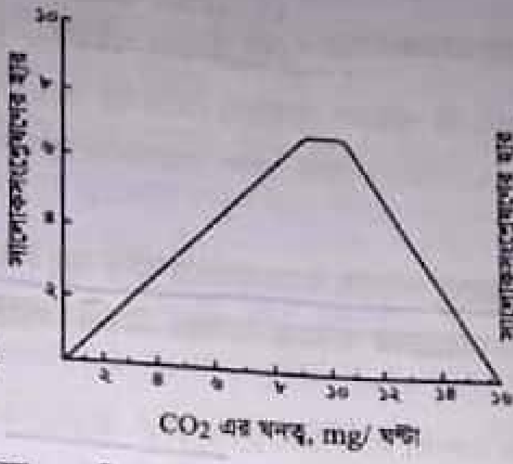

চিত্র ৯.১৮ : সালোকসংশ্লেষণের হারের উপর CO_2 -এর ঘনত্বের প্রভাব।

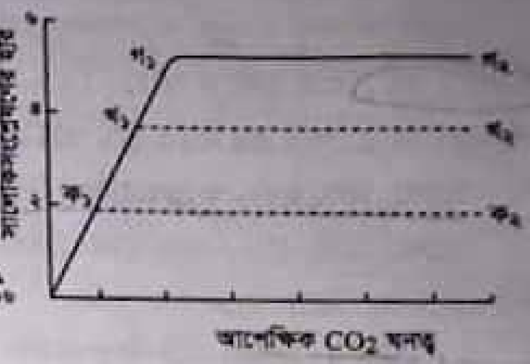

চিত্র ৯.১৯ : সালোকসংশ্লেষণের উপর সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর হিসেবে আলোর প্রভাব।

30-35°C তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি। অতএব 30-35°C সালোকসংশ্লেষণের অপটিমাম তাপমাত্রা। তাপমাত্রা 0°C থেকে ধীরে ধীরে উচ্চতর তাপমাত্রায় উন্নীত করলে সালোকসংশ্লেষণের হার সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং 30-35°C তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি হয়। 35°C এর উপরে তাপমাত্রা বাড়ানো হলে সালোকসংশ্লেষণের হার হঠাৎ এবং দ্রুত কমে যায় (চিত্র ৯.১৭)। এখানে তাপমাত্রা হলো লিমিটিং ফ্যাক্টর।

অনুরূপভাবে, CO_2 এর পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণকারী অপর একটি ফ্যাক্টর। যদি আলোকিত একটি পাতার ঘণ্টায় ১০ মিলিগ্রাম CO_2 ব্যবহার করার সামর্থ্য থাকে কিন্তু ঐ পাতাকে ঘণ্টায় ১ মিলিগ্রাম CO_2 সরবরাহ করা হয় তবে CO_2 লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। যদি CO_2 এর সরবরাহ ধীরে ধীরে ঘণ্টায় ১ হতে ২ মিলিগ্রাম, ২ হতে ৩ মিলিগ্রাম বাড়ানো হয় তবে সালোকসংশ্লেষণের হারও বাড়বে এবং এ বর্ধিত হার সর্বোচ্চ পর্যায় পৌঁছবে যখন ঘণ্টায় ১০ মিলিগ্রাম CO_2 সরবরাহ করা হয়। CO_2 এর ঘনত্ব ঘণ্টায় ১০ মিলিগ্রামের উপরে হলে সালোকসংশ্লেষণের হার হঠাৎ কমে যাবে। এখানে CO_2 হলো লিমিটিং ফ্যাক্টর (চিত্র ৯.১৮)।

নতুন একটি ফ্যাক্টর, ধরা যাক, আলো লিমিটিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। আলোর তির্যকতা (intensity of light) দ্বিগুণ বাড়লে সালোকসংশ্লেষণের হার দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং একটি স্থির হারে (constant rate) সালোকসংশ্লেষণ চলতে থাকে (চিত্র ৯.১৯ খ১-খ২)। আলোর তির্যকতা তিনগুণ বাড়ালে সালোকসংশ্লেষণের হার আরও বাড়ে, খ১ হতে গ১ এ উন্নীত হয় এবং গ১ হতে গ২ লাইনে স্থিতিশীল হয়।

সমুদ্র সমতলে CO_2 এর ঘনত্ব ৩০০ পিপিএম এবং উচ্চ দ্রাঘিমাংশে (high altitude) CO_2 এর ঘনত্ব কমতে থাকে। গম গাছে ০.১৫% CO_2 ঘনত্বে সালোকসংশ্লেষণের হার সবচেয়ে বেশি থাকে। জলজ উদ্ভিদে ১.১% CO_2 ঘনত্ব পর্যন্ত সালোকসংশ্লেষণের হার বাড়তে থাকে। স্টিম্যান নীলসনের (Steemann Nielsen, 1955) মতে *Chlorella* এবং *Scenedesmus*-এ CO_2-এর উচ্চ ঘনত্ব সহ্য করার ক্ষমতা উচ্চ উদ্ভিদের পাতা হতে বেশি। পাতায় বেশি CO_2 সরবরাহ করলে পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-টমেটো উদ্ভিদে বেশি CO_2 সরবরাহ করলে পাতায় ন্যাক্রোটিক অঞ্চল (nacrotic area) সৃষ্টি হয়।

Scanned by CamScanner

সালোকসংশ্লেষণের হার/কোশেন্ট (Photosynthetic Quotient-P.Q) : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে ও O_2 পরিত্যক্ত হয়। প্রক্রিয়ায় শোষিত CO_2 এর প্রায় সমপরিমাণ O_2 পরিত্যক্ত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় O_2 এবং CO_2 এর পরিমাণের অনুপাতকে সালোকসংশ্লেষণ হার বলে। সংক্ষেপে একে P.Q বলে। সালোকসংশ্লেষণের হার নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়।

$$\text{সালোকসংশ্লেষণ হার (P.Q)} = \frac{O_2 \text{ ত্যাগের পরিমাণ}}{CO_2 \text{ গ্রহণের পরিমাণ}} = \frac{1}{1} = 1$$

এ সমীকরণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণে কী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয় তার ধারণা পাওয়া যায়। P.Q এর মান সমান ১ হয়। তবে কোনো কারণে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কম হয়। আবার CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে এর হারও বৃদ্ধি পায়।

আলো, তাপ, CO_2 ও ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ

আলো, তাপ, CO_2 এবং ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। আলো : আলোর ৩টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আলোর প্রকৃতি, তীব্রতা ও আলোকপ্রাপ্তির সময়কাল। আলোর প্রকৃতির মধ্যে কার্যকর বর্ণালি (action spectra) ও শোষণ বর্ণালি (absorption spectra) থেকে দেখা যায় যে সালোকসংশ্লেষণে লাল ও নীল আলো সর্বাধিক সক্রিয়। কিন্তু শুধু এ দুটি আলো প্রয়োগ করে সালোকসংশ্লেষণের হারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। আলোর তীব্রতা পরিবর্তন করে এ হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আলো ১০০ ফুট ক্যান্ডল হতে শুরু করে ৩০০০ ফুট ক্যান্ডল পর্যন্ত বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সালোকসংশ্লেষণকে উন্নীত করা যায়। তীব্র সূর্যালোকে ১০,০০০–১২,০০০ ফুট পর্যন্ত ক্যান্ডল পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরিবেশে বা কাচের ঘরে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ ঘটানো সম্ভব। আলোর সময়কাল, স্থান ও ঋতুভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জানা গেছে, দীর্ঘ অবিরাম আলোর তুলনায় সবিরাম আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। কারণ, দিনের বেলায় অবিরাম আলোতে সংশ্লেষিত সকল উপাদান আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ে একই হারে ব্যবহার করতে পারে না। দীর্ঘদিনের আলো ১৪-১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় পেলেও তা সালোকসংশ্লেষণের কোনো কাজে লাগে না। অবিরাম আলো হলে ১০-১২ ঘণ্টায় সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব। ফলে দীর্ঘ বা ছোট দিনে আলোকপ্রাপ্তি ও আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। তাপ : তাপ সালোকসংশ্লেষণের একটি প্রভাবক এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করে সংশ্লেষণ হার কম-বেশি করা যায়। তাপ কম-বেশি করে আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ের ক্যালভিন চক্রকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণ অবস্থায় ১০°-৩০° সে. তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় (৩০° সে. থেকে ৩৫° সে. পর্যন্ত তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে)। সুতরাং কৃত্রিম পরিবেশে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোক-সংশ্লেষণের হারকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩। CO_2 : বায়ুতে CO_2 এর পরিমাণ ০.০৩-০.০৪% পর্যন্ত ওঠা-নামা করে। CO_2-এর পরিমাণ বাড়িয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করা যায়। পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ০.৯-১% পর্যন্ত CO_2 সালোকসংশ্লেষণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। এ ক্ষমতা বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যেমন-১.১% পর্যন্ত CO_2 এর পরিমাণ বায়ুতে বাড়িয়ে জলজ উদ্ভিদে সর্বোচ্চ সংশ্লেষণ হার পাওয়া গেছে, কিন্তু গম গাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংশ্লেষণ পাওয়া গেছে ০.১৫% CO_2 ঘনত্বে। সুতরাং দেখা গেছে যে, পরিবেশে CO_2 ঘনত্বের পরিমাণ কম-বেশি করে এর হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Scanned by CamScanner

সালোকসংশ্লেষণের হার/কোশেন্ট (Photosynthetic Quotient-P.Q) : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌর... রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে ও O_2 পরিত্যক্ত হয়। প্রক্রিয়ায় শোষিত CO_2 এর প্রায় সমপরিমাণ O_2 পরিত্যক্ত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় O_2 এবং C... এর পরিমাণের অনুপাতকে সালোকসংশ্লেষণ হার বলে। সংক্ষেপে একে P.Q বলে। সালোকসংশ্লেষণের হার নিম্নলি... সমীকরণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়।

$$\text{সালোকসংশ্লেষণ হার (P.Q)} = \frac{O_2 \text{ ত্যাগের পরিমাণ}}{CO_2 \text{ গ্রহণের পরিমাণ}} = \frac{1}{1} = 1$$

এ সমীকরণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণে কী পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য তৈরি হয় তার ধারণা পাওয়া যায়। P.Q এর মান সময় 1 হয়। তবে কোনো কারণে CO_2 এর পরিমাণ কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কম হয়। আবার CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে এর হারও বৃদ্ধি পায়।

আলো, তাপ, CO_2 ও ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ

আলো, তাপ, CO_2 এবং ক্লোরোফিল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কীভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। আলো : আলোর ৩টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আলোর প্রকৃতি, তীব্রতা ও আলোকপ্রাপ্তির সময়কাল। আলোর প্রকৃতির মধ্যে কার্যকর বর্ণালি (action spectra) ও শোষণ বর্ণালি (absorption spectra) থেকে দেখা যায় যে সালোকসংশ্লেষণে লাল ও নীল আলো সর্বাধিক সক্রিয়। কিন্তু শুধু এ দুটি আলো প্রয়োগ করে সালোকসংশ্লেষণের হার তেমন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। আলোর তীব্রতা পরিবর্তন করে এ হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আলো ১০০ ফুট ক্যান্ডল হতে শুরু করে ৩০০০ ফুট ক্যান্ডল পর্যন্ত বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সালোকসংশ্লেষণকে উন্নীত করা যায়। তীব্র সূর্যালোকে ১০,০০০–১২,০০০ ফুট পর্যন্ত ক্যান্ডল পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরিবেশে বা কাচের ঘরে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ ঘটানো সম্ভব। আলোর সময়কাল, স্থান ও ঋতুভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জানা গেছে, দীর্ঘ অবিরাম আলোর তুলনায় সবিরাম আলোতে সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয়। কারণ, দিনের বেলায় অবিরাম আলোতে সংশ্লেষিত সম... উপাদান আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ে একই হারে ব্যবহার করতে পারে না। দীর্ঘদিনের আলো ১৪-১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় পেলেও তা সালোকসংশ্লেষণের কোনো কাজে লাগে না। অবিরাম আলো হলে ১০-১২ ঘণ্টায় সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব। ফলে দীর্ঘ বা ছোট দিনে আলোকপ্রাপ্তি ও আলোর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। তাপ : তাপ সালোকসংশ্লেষণের একটি প্রভাবক এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করে সংশ্লেষণ হার কম-বেশি করা যায়। তাপ কম-বেশি করে আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আলোক-নিরপেক্ষ পর্যায়ের ক্যালভিন চক্রকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণ অবস্থায় ১০°-৩০° সে. তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় (৩০° সে. থেকে ৩৫° সে. পর্যন্ত তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে)। সুতরাং কৃত্রিম পরিবেশে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সালোক-সংশ্লেষণের হারকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩। CO_2 : বায়ুতে CO_2 এর পরিমাণ ০.০৩-০.০৪% পর্যন্ত ওঠা-নামা করে। CO_2-এর পরিমাণ বাড়িয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করা যায়। পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ০.৯-১% পর্যন্ত CO_2 সালোকসংশ্লেষণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। এ ক্ষমতা বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যেমন-১.১% পর্যন্ত CO_2 এর পরিমাণ বায়ুতে বাড়িয়ে জলজ উদ্ভিদে সর্বোচ্চ সংশ্লেষণ হার পাওয়া গেছে, কিন্তু গম গাছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংশ্লেষণ পাওয়া গেছে ০.১৫% CO_2 ঘনত্বে। সুতরাং দেখা গেছে যে, পরিবেশে CO_2 ঘনত্বের পরিমাণ কম-বেশি করে এর হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

Scanned by CamScanner

৪। ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিল সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। পাতায় ক্লোরোফিল-এর পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব

জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একে একটি প্রাকৃতিক জৈব রাসায়নিক শিল্প বলা যেতে পারে। নিচে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

১। **উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত :** এ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ জীবনের মৌলিক চাহিদা মিটায়।

২। **প্রাণিকুলের খাদ্য :** প্রাণিজগৎ তার খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিজগতের সমুদয় খাদ্য উদ্ভিদজগৎ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়ার উপর প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ জগৎ এবং পরোক্ষভাবে মানুষসহ সমস্ত জীবজগৎ নির্ভরশীল।

৩। **শক্তির উৎস :** জীবজগতের শক্তির একমাত্র উৎস হল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। আমরা কাজকর্ম, চলাফেরা, দৌড়, কুস্তি ইত্যাদিতে যে শক্তি খরচ করি তা আসে খাদ্য হতে, আর খাদ্য তৈরির প্রাথমিক বা মূল প্রক্রিয়া হল সালোকসংশ্লেষণ। কিন্তু খাদ্যে ঐ শক্তি কোথা হতে কিভাবে আসে? খাদ্যের মাঝে এ শক্তি আসে সূর্য হতে। সূর্যের এ শক্তি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্যে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে আটকা পড়ে। কাজেই জীবের সকল শক্তির উৎস এ প্রক্রিয়া।

৪। **জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালন :** উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন চক্রে বহু বিপাকীয় প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এ সব বিক্রিয়া না ঘটলে কোন জীবন টিকে থাকতে পারত না। এ সব বিপাকীয় প্রক্রিয়া পরিচালনার সকল শক্তি আসে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ হতে।

৫। **পরিবেশ পরিশোধন :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 শোষিত হয় এবং O_2 উৎপন্ন হয়। প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকারক CO_2 শোষণ করে এবং সকল জীবের শ্বসনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় O_2 সরবরাহ করে এ প্রক্রিয়া পরিবেশ পরিশোধন করে থাকে। এভাবে সবুজ উদ্ভিদের এ প্রক্রিয়া জীবজগতকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে।

৬। **উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি :** সবুজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শক্তি ও অন্যান্য উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই এসে থাকে।

৭। **মানব সভ্যতায় অবদান :** সালোকসংশ্লেষণ না থাকলে মানুষই থাকত না। তবুও বর্তমান মানবসভ্যতায় এ প্রক্রিয়ার অবদান অসীম। মানব সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা, পেট্রোল, রেয়ন, সেলোফেন, ফিল্ম, কাগজ, রবার, কুইনাইন, মরফিন, রেসারপিন ইত্যাদি সব কিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ারই ফল।

মোটকথা উদ্ভিদ ও প্রাণী তথা সমগ্র জীবজগৎ তাদের খাদ্য, শক্তি ও জীবনসত্তার জন্য সম্পূর্ণভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর প্রত্যক্ষ বা-পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কাজেই এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য অপরিসীম ও তুলনাবিহীন।

সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন খাদ্য কোথায় যায়?

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে শ্বেতসার বা স্টার্চ উৎপন্ন হয়। এটি একটি কঠিন পদার্থ। কাজেই উদ্ভিদ এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না, পাতায় তৈরি স্টার্চ প্রথমে গ্লুকোজ ও পরবর্তীতে সুক্রোজ-এ পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চালিত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাইটোসোলে সুক্রোজ উৎপন্ন হয়। সুক্রোজ সরাসরি উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এর এক অংশ বিপাকক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। বাড়তি অংশ সঞ্চয়ী অঞ্চলে ভবিষ্যতের জন্য জমা হয়। বিভিন্ন কাজ-কর্ম চালানোর জন্য শ্বসন প্রক্রিয়ায় তা ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। এক অংশ অন্য প্রকার খাদ্য যথা চর্বি, আমিষ প্রভৃতি তৈরিতে কাজে লাগে।

Scanned by CamScanner

শ্বসন (Respiration)

[ল্যাটিন *Respirae* = to breathe, শ্বাস নেয়া]

সকল সজীব উদ্ভিদকোষে (এবং সকল সজীব প্রাণিকোষে) প্রতিনিয়ত অব্যাহতভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এসব ক্রিয়া-বিক্রিয়ার জন্য চাই শক্তি। আর এ শক্তির উৎস হলো কোষস্থ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ। এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটই হলো শক্তির প্রধান উৎস। স্টার্চ, সুক্রোজ বা গ্লুকোজ-এ যে স্থির শক্তি জমা থাকে তা একই সাথে সবটুকু মুক্ত হয় না, বরং বিভিন্ন এনজাইম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কতিপয় পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে মুক্ত হয়। এ সব রাসায়নিক পদার্থের স্থিরশক্তি কর্মক্ষম গতিশক্তি হিসেবে মুক্ত করতে কোষে যে সব পর্যায়ক্রমিক জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এদেরকে সামগ্রিকভাবে একসাথে শ্বসন নামে অভিহিত করা হয়। কাজেই শ্বসন হলো শক্তি নির্গমনকারী কতিপয় জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমষ্টি। শক্তি উৎপাদনকালে জটিল খাদ্যদ্রব্য সরল দ্রব্যে পরিণত হয়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ জটিল জৈবযৌগ জারিত হয়, ফলে জৈবযৌগে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয়ে রাসায়নিক গতিশক্তিতে পরিণত হয়, তাকে শ্বসন বলে। শ্বসনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তা জীবের বিভিন্ন শক্তি শোষণকারী কার্যকলাপে ব্যয় হয়। গ্লুকোজকে প্রাথমিক শ্বসনিক বস্তু ধরলে শ্বসনের রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + 36\ ADP + 36\ Pi \xrightarrow[\text{কো-এনজাইম, অ্যাকটিভেটর ইত্যাদি}]{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 12H_2O + 36\ ATP\ (38\ ATP\ \text{নয়})$$

শ্বসন অঙ্গ : উদ্ভিদের প্রতিটি জীবন্ত কোষেই দিন-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা শ্বসনকার্য চলতে থাকে। কোষীয় সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াই শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ (মাইটোকন্ড্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

শ্বসনিক বস্তু : শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক বস্তুসমূহ জারিত হয়ে সরল বস্তুতে পরিণত হয় সে সব বস্তুকে শ্বসনিক বস্তু বলে। কার্বোহাইড্রেট (শর্করা), প্রোটিন (আমিষ), চর্বি এবং জৈবিক অ্যাসিডসমূহ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সূর্যালোকের আলোকশক্তিই এসব বস্তুতে রাসায়নিক স্থিরশক্তি হিসেবে জমা থাকে এবং শ্বসনের ফলে স্থিরশক্তি গতিশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। কাজেই সূর্যালোকশক্তিই সকল শক্তির মূল উৎস।

শ্বসনের প্রকারভেদ : অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে শ্বসন প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : (ক) **সবাত শ্বসন** (Aerobic respiration) এবং (খ) **অবাত শ্বসন** (Anaerobic respiration)। যে শ্বসন ক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তাকে সবাত শ্বসন বলে এবং যে শ্বসন ক্রিয়া মুক্ত অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

সবাত শ্বসনে অক্সিজেন শ্বসনিক বস্তুকে সম্পূর্ণ জারিত করে এবং অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করে। অবাত শ্বসনে কোষস্থ কতিপয় এনজাইম শ্বসনিক বস্তুকে আংশিক জারিত করে এবং স্বল্প শক্তি উৎপন্ন করে।

(ক) সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration)

যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে। অক্সিজেনের উপস্থিতি অর্থাৎ বায়ুর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় বলে এ প্রকার শ্বসনের নাম বাংলা ভাষায় করা হয়েছে সবাত (বাতাসসহ) শ্বসন। অধিকাংশ জীব-এর (বহু ব্যাকটেরিয়া, অধিকাংশ ছত্রাক, সকল প্রোটিস্ট, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর) শ্বসন হলো সবাত শ্বসন। সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সংকেত নিম্নরূপ :

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + 36ADP + 36\ Pi \xrightarrow{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6CO_2 + 12H_2O + 36\ ATP\ (38\ ATP\ \text{নয়})$$

[গ্লাইকোলাইসিস-এ উৎপন্ন দুই অণু NADH + H⁺ হতে ৬টি ATP ধরলে শ্বসনে মোট ATP উৎপাদন ৩৮টি হয়। প্রকৃতপক্ষে এই NADH + H⁺ হতে ETC-এ ৪টি ATP তৈরি হয়।]

সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ার ধাপ বা পর্যায়সমূহ

সবাত শ্বসন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলেও বিক্রিয়ার স্থান ও কাজের ধারা অনুযায়ী একে তিনটি ধারাবাহিক ধাপ বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো নিম্নরূপ :

১। প্রথম ধাপ বা প্রথম পর্যায়ে কোষের সাইটোপ্লাজমে ৬-কার্বনবিশিষ্ট প্রতি অণু গ্লুকোজ ভাগ হয়ে ৩-কার্বনবিশিষ্ট দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। গ্লুকোজ অণু ভাগ হয় বলে এই পর্যায়ের নাম দেয়া হয়েছে গ্লাইকোলাইসিস (গ্রিক *Glykos* = sugar এবং *lysis* = splitting)। এই পর্যায়ের সব এনজাইম দ্রবণীয়।

২। দ্বিতীয় ধাপ বা দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে তিন অণু CO_2 উৎপন্ন করে। এটি সংঘটিত হয় মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স-এ। এই পর্যায়ের একটি এনজাইম ছাড়া সবকটি এনজাইম দ্রবণীয় এবং ম্যাট্রিক্স এর তরলে অবস্থান করে। এই পর্যায়ের অধিকাংশ বিক্রিয়া একটি চক্রাকারে আবর্তিত হয়। একে বলা হয় ক্রেবস্ চক্র, ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (TCA) চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র।

৩। তৃতীয় ধাপ বা তৃতীয় পর্যায়ে গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন $NADH + H^+$, $FADH_2$ হতে ইলেকট্রন অক্সিজেন-এ স্থানান্তরিত হয়। মাইটোকন্ড্রিয়নের ভেতর মেমব্রেনের গায়ে সংযুক্ত ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এই কার্য সম্পাদন করে। তাই এই পর্যায়কে বলা হয় ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন পর্যায়। একে রেসপিরেটরি চেইনও বলা হয়।

১। প্রথম ধাপ : গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis)

(একটি সাইটোপ্লাজমিক প্রক্রিয়া)

যে প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে। গ্লাইকোলাইসিসকে EMP (এই প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠাতা তিনজন বিজ্ঞানী Embden, Meyerhof ও Parnas এর নাম অনুযায়ী) পাথওয়ে, শ্বসনের সাধারণ গতিপথ বা সাইটোপ্লাজমিক শ্বসনও বলা হয়। উদ্ভিদে সঞ্চিত শ্বেতসার প্রথমে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে জারিত হয়ে গ্লুকোজ-এ পরিণত হয় এবং গ্লুকোজ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার প্রথম বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়ার জন্য কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে না। গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় প্রকার শ্বসনের প্রথম ধাপ বা পর্যায়।

গ্লুকোজকে শ্বসনিক বস্তু ধরলে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিকভাবে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

(i) **গ্লুকোজ,** ATP হতে একটি ফসফেট গ্রহণ করে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **হেক্সোকাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় এবং একটি ADP সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

(ii) **গ্লুকোজ-৬-ফসফেট,** ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট-এ রূপান্তরিত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফো-গ্লুকোআইসোমারেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(iii) **ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট,** ATP হতে একটি ফসফেট গ্রহণ করে ফ্রুক্টোজ-১,৬-বিসফসফেট-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় এবং একটি ADP সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

(iv) **ফ্রুক্টোজ-১-৬-বিসফসফেট** (৬ কার্বনবিশিষ্ট) ভেঙে এক অণু ৩-ফসফোগ্লিসার্যালডিহাইড (৩ কার্বনবিশিষ্ট) এবং এক অণু ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট (৩ কার্বনবিশিষ্ট) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় **অ্যালডোলেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। **আইসোমারেজ** এনজাইমের কার্যকারিতায় এরা একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হতে পারে। উভয় বিক্রিয়া দ্বিমুখী।

(v) **৩-ফসফোগ্লিসার্যালডিহাইড** এক অণু অজৈব ফসফেট গ্রহণ করে ১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফোগ্লিসার্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়, অজৈব ফসফেট ও NAD অংশগ্রহণ করে এবং $NADH + H^+$ ($NADH_2$) সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(vi) **১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড,** ফসফেট হারিয়ে ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় **ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড কাইনেজ** এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় এবং ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

সুক্রোজ হলো উদ্ভিদে প্রধান ট্রান্সলোকেটেড স্যুগার, তাই সুক্রোজকেই উদ্ভিদে শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ধরা উচিত, গ্লুকোজকে নয়। HSC পর্যায়ের জন্য বিষয়টি অপেক্ষাকৃত জটিল বলে গ্লুকোজকে শ্বসনিক বস্তু ধরে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো।

Scanned by CamScanner

(vii) ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ২-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(viii) ২-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, ইনলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(ix) ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায়, পাইরুভিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। গ্লুকোজ হতে পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টির মাধ্যমেই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

> গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে উদ্ভিদে ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড (PEP) মেটাবোলাইজিং এর অল্টারনেটিভ পথ আছে। PEP, কার্বোক্সিলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায়, অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড-এ (OAA) পরিণত হয়। OAA, ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায়, ম্যালিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। ম্যালিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং বিক্রিয়ার মাধ্যমে পাইরুভিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয় যা পরে ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণ করে।

গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়ার ৯টি বিক্রিয়ার মধ্যে ১ম, ৩য় এবং শেষ—এই ৩টি বিক্রিয়া একমুখী, অন্যসবগুলো দ্বিমুখী।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন : ATP (দুই অণু), NADH + H^+ (দুই অণু) এবং পাইরুভিক অ্যাসিড (দুই অণু)।

গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ-১, ৬-বিসফসফেট হওয়া পর্যন্ত দুই অণু ATP খরচ হয় এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক ট্রায়োজ (৩-কার্বনবিশিষ্ট গ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন) হতে পাইরুভিক অ্যাসিড হওয়া পর্যন্ত দুই অণু ATP এবং এক অণু NADH + H^+ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দু অণু ট্রায়োজ হতে মোট চারটি ATP এবং দুটি NADH + H^+ উৎপন্ন হয়। কাজেই দেখা যায় তৈরিকৃত ৪ অণু ATP হতে প্রথমে ব্যবহৃত দুই অণু ATP বাদ দিলে **গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় নিট দুটি ATP ও দুটি NADH + H^+ জমা হয়।** গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে। এর সবকটি এনজাইম দ্রবণীয়।

গ্লাইকোলাইসিস-এর নিয়ন্ত্রণ

১। গ্লাইকোলাইসিস ত্বরান্বিত হয় ATP-এর ব্যবহার দ্রুত হলে, ATP-এর ব্যবহার হ্রাস পেলে প্রক্রিয়ার হার কমে যায়।

২। গ্লুকোজ-এর প্রাপ্তি তথা সরবরাহের পরিমাণ এ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। অ্যালোস্টেরিক এনজাইম 'ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ' যা ফ্রুক্টোজ ৬-ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ ১, ৬, বিসফসফেট তৈরি করতে সহায়তা করে, তার গতিময়তার উপর গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া বহুলাংশে নির্ভরশীল। ATP দ্বারা এ কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ADP দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়।

গ্লাইকোলাইসিস-এর গুরুত্ব : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া বিপাকক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। (১) গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন উপচিতিমূলক পথে বেশ কিছু সংখ্যক কোষীয় উপাদান সৃষ্টি করে। (২) গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড পর্যন্ত পৌঁছাতে যে ATP বা NADH + H^+ পাওয়া যায় তা মোট সুপ্তশক্তির মাত্র ১৭%। মাত্র ৩% শক্তি তাপশক্তি হিসেবে বেরিয়ে যায় এবং প্রায় ৮০% শক্তি পাইরুভিক অ্যাসিডের মধ্যে তখনও জমা থাকে। (৩) পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টিই এই প্রক্রিয়ার মুখ্য বিষয়। পাইরুভিক অ্যাসিড সৃষ্টি না হলে শ্বসন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। শ্বসন বন্ধ হলে জীব জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।

গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconeogenesis) : গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার উল্টো পথে গ্লুকোজ তৈরি হওয়াকে বলা হয় **গ্লুকোনিওজেনেসিস।** এটি প্রাণীর চেয়ে উদ্ভিদে কম হয়, তবে রেড়ি বীজ, সূর্যমুখী বীজ ইত্যাদিতে জমাকৃত তেল গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সুকরোজ বা গ্লুকোজ-এ পরিণত হয় যা পরবর্তীতে বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

Scanned by CamScanner

২। দ্বিতীয় ধাপ : ক্রেবস্ চক্র (Krebs cycle)
(একটি মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স প্রক্রিয়া)

এ প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে তিন অণু CO_2 উৎপন্ন করে।

পাইরুভিক অ্যাসিডের মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ : পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয় কোষের সাইটোপ্লাজমে এবং সাইটোপ্লাজম থেকে সরাসরি ছিদ্রপথে মাইটোকন্ড্রিয়নের বাইরের মেমব্রেন পার হয়। পরে পাইরুভেট ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে, OH আয়নের বিনিময়ে মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেন পার হয়ে ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ করে।

ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ করার পর পাইরুভিক অ্যাসিড, **অ্যাসিটাইল Co-A** সৃষ্টির মাধ্যমে মূল চক্রে প্রবেশ করে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১। মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স-এ ৩-কার্বনবিশিষ্ট পাইরুভিক অ্যাসিড, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের (একাধিক এনজাইমের একটি কমপ্লেক্স) কার্যকারিতায় (i) এক অণু কার্বন হারায় অর্থাৎ CO_2 উৎপন্ন করে (ডিকার্বোক্সিলেশন), (ii) এক অণু NADH + H^+ উৎপন্ন করে (অক্সিডেশন) এবং (iii) এক অণু দুই কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে যা একটি থায়োএস্টার বন্ধন দ্বারা কো-এনজাইম-A (= Co-A, একটি সালফারযুক্ত কো-ফ্যাক্টর)-এর সাথে যুক্ত হয়ে (Co-A সংযুক্তিকরণ) **২-কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটাইল Co-A**তে পরিণত হয়। এটি একটি তিন পর্ব বিক্রিয়া যার মাধ্যমে এক অণু CO_2, এক অণু NADH + H^+ এবং এক অণু অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টি হয়। **অ্যাসিটাইলCo-A হলো গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস্ চক্রের সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান।**

$$C_3H_4O_3 + HSCoA + NAD \xrightarrow[\text{Lipoic acid}]{\text{TPP}} C_2H_3O - SCoA + CO_2 + NADH + H^+$$

২। অ্যাসিটাইল Co-A, ম্যাট্রিক্স-এ অবস্থানরত চার কার্বনবিশিষ্ট **অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড**-এর সাথে যুক্ত হয়ে ৬-কার্বনবিশিষ্ট **সাইট্রিক অ্যাসিড** সৃষ্টি করে এবং Co-A পৃথক হয়ে যায়। সাইট্রেট সিনথেজ এনজাইম বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী। ম্যাট্রিক্স-এ স্থায়ী অবস্থানের কারণে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে আবাসিক অণু বলা হয়।

৩। সাইট্রিক অ্যাসিড আইসোমারিক পরিবর্তনে **আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। একোনিটেজ (aconitase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

৪। আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড CO_2 ও $2H^+$ হারিয়ে **আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড** এ পরিণত হয়। এক অণু NAD হতে এক অণু NADH+H^+ এবং এক অণু CO_2 সৃষ্টি হয়। আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ (isocitrate dehydrogenase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

৫। আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, Co-A এর সাথে মিলিত হয়ে **সাকসিনাইল Co-A** গঠন করে। এখানে এক অণু NAD হতে এক অণু NADH + H^+ এবং এক অণু CO_2 সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় আলফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ (α-ketogluterate dehydrogenase) এনজাইম সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী।

৬। সাকসিনাইল Co-A, Co-A হারিয়ে **সাকসিনিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশনে এক অণু ATP (ADP + Pi = ATP) সৃষ্টি হয়। Co-A পৃথক হয়ে যায়। সাকসিনাইল Co-A সিনথেটেজ (Succinyl Co-A synthetase) এনজাইম বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি একমুখী। এখানে এক অণু পানি যুক্ত হয়।

৭। সাকসিনিক অ্যাসিড, $2H^+$ হারিয়ে **ফিউমারিক অ্যাসিড**-এ পরিণত হয়। এখানে এক অণু FAD হতে এক অণু $FADH_2$ তৈরি হয়। সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ (Succinate dehydrogenase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

> [উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেন যে, বায়ুর অনুপস্থিতিতে কোষে ইথানল বা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় কিন্তু বায়ুর উপস্থিতিতে কোষ O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। জার্মানিতে জন্ম নেয়া ইংরেজ প্রাণ-রসায়নবিদ Sir Hans Adolf Krebs (1900-1981) অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়ার তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৩৭ সালে। এ জারণ প্রক্রিয়ার অধিকাংশ বিক্রিয়া একটি চক্রের আকারে আবর্তিত হয়। এই চক্রকে সাধারণত **ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (TCA)** চক্র বলা হয়। চক্রটি আবিষ্কারকের নামানুসারে একে ক্রেবস্ চক্র বলা হয়। এই চক্রের প্রথম উৎপন্ন এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড, তাই এই চক্রকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রও বলা হয়। ক্রেবস্ তাঁর এই বিশেষ আবিষ্কারের জন্য ১৯৫৩ সালে রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান।]

বর্তমানে অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টিকে কোনো পৃথক ধাপ ধরা হয় না, কারণ এটি মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সেই সংঘটিত হয়।

Scanned by CamScanner

৯। ম্যালিক অ্যাসিড $2H^+$ হারিয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। এখানে এক অণু NAD হতে এক অণু $NADH + H^+$ উৎপন্ন হয়। ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ (malate dehydrogenase) এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড এই চক্রে পুনঃপুনঃ উৎপাদিত হয় এবং পুনঃপুনঃ অংশগ্রহণ করে।

ক্রেবস্ চক্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক হলো আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম (অ্যালোস্টেরিক এনজাইম)। ADP, NAD হলো এর উদ্দীপক; ATP এবং $NADH + H^+$ হলো ইনহিবিটর। ATP বা $NADH + H^+$ বেশি জমা হলে এই চক্র বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টিকালে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড হতে ২টি $NADH + H^+$ তৈরি হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রেবস্ চক্রের পার্থক্য

১। উদ্ভিদে সাকসিনাইল Co-A সিনথেটেজ ATP তৈরি করে কিন্তু প্রাণীতে GTP তৈরি হয়। GTP পরে একটি এনজাইম বিক্রিয়ার মাধ্যমে ATP-তে রূপান্তরিত হয়।

২। আজ পর্যন্ত পরীক্ষাকৃত সকল উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়াতে NAD-malic enzyme পাওয়া গিয়েছে। এই এনজাইম ম্যালিক অ্যাসিড (ম্যালেট)কে পাইরুভিক অ্যাসিড-এ রূপান্তরিত করে যা অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস্ চক্রে প্রবেশ করে। প্রাণীতে এরূপ বিক্রিয়া ঘটে না।

ক্রেবস্ চক্রের গুরুত্ব : (১) একটি জীবের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ক্রেবস্ চক্র থেকেই পাওয়া যায়। (২) ক্রেবস্ চক্রে উৎপাদিত একাধিক জৈব অ্যাসিড উদ্ভিদের অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (৩) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন সাকসিনিক অ্যাসিড ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টির সাবস্ট্রেট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (৪) ক্রেবস্ চক্র শক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। শ্বসনে উৎপাদিত শক্তির অধিকাংশই এ চক্রের মাধ্যমে ঘটে। (৫) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড সাধারণভাবে উদ্ভিদের জৈব অ্যাসিড বিপাকে অংশগ্রহণ করে। (৬) থাইমিন, সাইটোসিন, পোরফাইরিন, হিম ইত্যাদিও এই চক্র সংশ্লিষ্ট দ্রব্য থেকে তৈরি হয়ে থাকে। (৭) আমরা শ্বসনে CO_2 ত্যাগ করি তা এই চক্র থেকেই উৎপন্ন হয়।

৩। তৃতীয় ধাপ : ইলেক্ট্রন স্থানান্তর ও ATP তৈরি

(একটি মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন প্রক্রিয়া)

কোষীয় কাজের শক্তির স্বরূপ হলো ATP। শ্বসনের প্রথম ধাপে (গ্লাইকোলাইসিস) এবং দ্বিতীয় ধাপে (ক্রেবস্ চক্র) উৎপন্ন $NADH + H^+$ এবং $FADH_2$তে ধারণকৃত উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনকে কার্যোপযোগী শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে তা অবশ্যই ATP-তে রূপান্তরিত হতে হবে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়াটির জন্য অক্সিজেনের দরকার হয় এবং মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেনে অবস্থিত ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রতি অণু গ্লুকোজ থেকে প্রথম ধাপে (গ্লাইকোলাইসিস) ২ অণু $NADH + H^+$ উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ধাপে (ক্রেবস্ চক্র) ৮ অণু $NADH + H^+$ এবং ২ অণু $FADH_2$ উৎপন্ন হয়। এরা বিজারিত যৌগ, এদেরকে অবশ্যই পুনরায় জারিত হতে হবে, নতুবা শ্বসন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যাবে।

ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন : কতগুলো ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন একটি চেইন-এর আকারে চারটি মাল্টি-প্রোটিন কমপ্লেক্স হিসেবে মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনার মেমব্রেনে (শক্তির ক্রম নিম্ন ধারায়) অবস্থান করে এবং ইলেক্ট্রন স্থানান্তর করে শেষ পর্যন্ত অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানি তৈরি করে। ইলেক্ট্রন স্থানান্তরের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তা দিয়ে ADP-এর সাথে ইনঅর্গানিক ফসফেট (Pi) যুক্ত হয়ে ATP তৈরি করে। ATP তৈরির এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। এ ধাপে প্রতিটি $NADH + H^+$ হতে ৩টি ATP এবং প্রতিটি $FADH_2$ হতে ২টি ATP তৈরি হয়।

কারো কারো মতে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ করলে $NADH + H^+$ এর একটি ATP খরচ হয়ে যায় এবং $NADH + H^+$ এর পরিবর্তে $FADH_2$ হিসেবে বিরাজ করে।

Scanned by CamScanner

কাজেই ETC-এ অক্সিজেনই হলো ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতা। এই অক্সিজেন বায়ু থেকে গ্রহণ করা হয়, যা পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ETC সবাত শ্বসনের একটি পর্যায় মাত্র, কাজেই ETC ছাড়া সবাত শ্বসন পূর্ণ হয় না।

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এর বাহক

১। NADH-Q রিডাক্টেজ : একটি ২৬ সাব-ইউনিট যৌগ, আণবিক ওজন ৮৫০০০০

২। সাইটোক্রোম রিডাক্টেজ : একটি ১০ সাব-ইউনিট যৌগ, আণবিক ওজন ২৮০০০০

৩। সাইটোক্রোম অক্সিডেজ : একটি ৮ সাব ইউনিট যৌগ, আণবিক ওজন ১৬০০০০

৪। সাইটোক্রোম-সি : একটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রোটিন।

ইউবিকুইনন : একটি নন-প্রোটিন যৌগ

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের কাজ হলো $NADH + H^+$ এবং $FADH_2$ এর ইলেকট্রন ম্যাট্রিক্স এর অক্সিজেনে প্রবাহিত করা।

উদ্ভিদ মাইটোকন্ড্রিয়নের স্বকীয়তা

১। একটি বহিস্থ (ETC এর বাইরে) $NADH + H^+$ ডিহাইড্রোজিনেজ যা সরাসরি সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন $NADH + H^+$ থেকে ইলেক্ট্রন গ্রহণ করতে পারে। এই ইলেক্ট্রন পরে ETC-এর ইউবিকুইনোন পুল-এ প্রবেশ করে এবং ২টি (৩টি নয়) ATP উৎপন্ন করে।

২। ম্যাট্রিক্স $NADH + H^+$ অক্সিডাইজ করার জন্য দুটি পথ আছে।

৩। অক্সিজেন রিডাকশনের জন্য বিকল্প পথ। এ বিকল্প অক্সিডেজ, সাইটোক্রোম-c অক্সিডেজের মতো নয়। এটি সায়ানাইড, অ্যাজাইড (azide) বা কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা বাধাগ্রস্ত (inhibition) হয় না। তাই এখানে সায়ানাইড প্রতিরোধী শ্বসন হয় যা প্রাণীতে হয় না।

অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা : সবাত শ্বসনের সব পর্যায়ে অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয় না। অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র ETC-এর শেষ পর্যায়ে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ থেকে ম্যাট্রিক্স-এ মুক্ত হওয়া (ধাপ-৩) ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য। এক পরমাণু অক্সিজেন দুটি ইলেকট্রন ও ম্যাট্রিক্স থেকে দুটি প্রোটন ($2H^+$) গ্রহণ করে এক অণু পানি (H_2O) তৈরি করে। কোষে অক্সিজেন-এর অভাব হলে ETC-এর ইলেকট্রনের শেষ বাহক সাইটোক্রোম-সি থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করার কেউ থাকে না, তাই সাইটোক্রোম-সি ইলেকট্রন মুক্ত করতে না পেরে পূর্ববর্তী বাহক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা হারায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে পেছনের সবগুলো বাহকই ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এর ফলে প্রথমে ETC, পরে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র, পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন এবং সর্বশেষ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটিও বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ATP উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, তাই কোষ তার গঠন ও কার্যাবলি চালিয়ে যাবার মতো শক্তি (ATP) না পেয়ে মরে যায়।

আমাদের পেশি কোষগুলো ল্যাকটিক অ্যাসিড ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় সীমিত ATP তৈরি করতে পারে কিন্তু প্রয়োজনীয় এনজাইম না থাকায় স্নায়ুকোষ (ব্রেইনসহ) তা পারে না। ফলে অক্সিজেনের অভাব হলে প্রথমেই স্নায়ু কোষের মৃত্যু ঘটে।

শ্বসনিক বস্তু : সুকরোজ প্রথমে ভেঙে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হয়ে গ্লাইকোলাইসিস-এ প্রবেশ করে। গ্লুকোজ সরাসরি শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য মনোস্যাকারাইড প্রথমে গ্লুকোজ হয়, পরে শ্বসনে প্রবেশ করে। স্টার্চ, গ্লাইকোজেন পালিমার প্রথমে ভেঙে গ্লুকোজ সৃষ্টির মাধ্যমে শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে। ফ্যাট ভেঙে গ্লিসারোল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। গ্লিসারোল গ্লিসারেল্ডিহাইড-৩-ফসফেট হয়ে শ্বসনে অংশগ্রহণ করে, আর ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসিটাইল-Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। প্রোটিন ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়; এর কতক অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে, আর কতক সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রে প্রবেশ করে।

> **কাজ :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফটোফসফোরাইলেশন এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার ETC অংশটি ভালোভাবে পড়। এবার নিজের ছকটি পূরণ করতে চেষ্টা কর।

Scanned by CamScanner

ফটোফসফোরাইলেশন ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন-এর মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	ফটোফসফোরাইলেশন	অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন
১। কোন প্রক্রিয়ায় ঘটে		
২। কোন অঙ্গাণুতে ঘটে		
৩। আণবিক O_2-এর প্রয়োজনীয়তা		
৪। ফটোসিস্টেম		
৫। শক্তির উৎস		

শক্তি উৎপাদনের পরিসংখ্যান

সবাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 ও পানি উৎপাদনকালে নিম্নরূপ শক্তি উৎপাদন করে।

গ্লাইকোলাইসিস	ক্রেবস্ চক্র/TCA চক্র	ETC (ETS)	সর্বমোট ATP
2ATP	....	..............................→	= 2ATP
$2NADH+H^+$	....	4 ATP	= 4ATP
(যা সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ কালে একটি ATP হারিয়ে $FADH_2$ তে পরিণত হয়।	অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টিকালে→ $2NADH+H^+$..........	6 ATP	= 6ATP
	মূল ক্রেবস্ চক্রে.............. $6NADH+H^+$	18 ATP	=18ATP
	$2FADH_2$	4 ATP	= 4ATP
	2ATP..............................	..............................→	= 2ATP
		32 ATP	= 36ATP

এখানে উল্লেখ্য যে, এক মোল গ্লুকোজকে পোড়ালে ৬৮৬ কিলোক্যালরি শক্তি বের হয় কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিস্টে মাত্র ৩৮০ কিলোক্যালরি কার্যকরী শক্তি পাওয়া যায় এবং বাকি শক্তি তাপশক্তি হিসেবে নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন রাসায় বিক্রিয়ায় প্রতিটি ATP হতে মাত্র ১০ কিলোক্যালরি হিসেবে ৩৮টি ATP হতে ৩৮০ কিলোক্যালরি অথবা ৩৬টি ATP হ ৩৬০ Kcal শক্তি সরবরাহ হয়, যার ফলে কার্যক্ষমতা দাঁড়ায় প্রায় ৫৫.৪% বা তারও কম। অনেকের মতে ৪০%।

(খ) অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration)

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সম্ হয় তাকে অবাত শ্বসন বলে।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \underset{\text{ইথানল}}{2\,C_2H_5OH} + 2CO_2 + 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি।}$$

অবাত শ্বসন দুটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়; যথা : ১। গ্লাইকোলাইসিস ও ২। পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।

১। গ্লাইকোলাইসিস : এটি সবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার অনুরূপ, গ্লাইকোলাইসিস উভয় প্রকার শ্বসনে প্রথম পর্যায়। এ ধাপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে ২ অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, ২ অণু $NADH+H^+$ ও ২ অণু ATP উৎ হয়।

২। পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ (পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে ইথানল অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি অবাত শ্বসনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাইরুভিক অ্যাসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথানল ও CO_2 অথবা শুধু ল্যাকটিক অ্যা সৃষ্টি করে।

Scanned by CamScanner

(i) **অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন তথা ইথানল সৃষ্টি** : এটি দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে কার্বোক্সিলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড এক অণু CO_2 বের করে দিয়ে অ্যাসিটালডিহাইড উৎপন্ন করে এবং দ্বিতীয় ধাপে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় অ্যাসিটালডিহাইড, $NADH + H^+$ হতে দুটি হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ইথানল (ইথাইল অ্যালকোহল) উৎপন্ন করে এবং NAD মুক্ত হয়ে যায়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

(I) $CH_3{-}CO{-}COOH \xrightarrow[\text{কার্বোক্সিলেজ}]{\nearrow CO_2} CH_3{-}CHO$

পাইরুভিক অ্যাসিড → অ্যাসিটালডিহাইড

(II) $CH_3{-}CHO \xrightarrow[\text{অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADH + H^+ \curvearrowright NAD} CH_3{-}CH_2OH$

অ্যাসিটালডিহাইড → ইথানল

অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ ভেঙে ২ অণু ইথাইল অ্যালকোহল ও ২ অণু CO_2 উৎপন্ন হয়।

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2CO_2 + 2C_2H_5OH + 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

গ্লুকোজ → ইথাইল অ্যালকোহল

অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিসে $NADH + H^+$ উৎপন্ন হয়েছিল তা এক্ষেত্রে খরচ হয়ে গেল। কাজেই অবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় জমানো দুটি ATP-ই শক্তির একমাত্র উৎস। দুটি ATP হতে শেষ পর্যন্ত ১০ × ২ = ২০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

ইস্ট ছত্রাক হলো সুবিধাবাদী অবায়বীয় ছত্রাক। এটি যখন সবাত শ্বসন থেকে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করে তখন সমপরিমাণ শক্তির জন্য ১৮ গুণ দ্রুত গ্লুকোজ মেটাবলাইজ করে। পুনরায় বায়বীয় অবস্থায় এলে গ্লাইকোলাইসিস হ্রাস পায়। বায়বীয় (aerobic) শ্বসনে ফিরে আসার প্রেক্ষিতে গ্লাইকোলাইসিস হ্রাস পাওয়াকে বলা হয় pasteur effect.

(ii) **ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি** : ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় পাইরুভিক অ্যাসিড $NADH + H^+$ হতে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টিকালে কোনো CO_2 উৎপন্ন হয় না। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয় না। কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া ও প্রাণীতে, বিশেষ করে পেশিতে, ল্যাকটিক অ্যাসিড অধিক উৎপন্ন হয়। অবাত শ্বসন অধিকাংশ আণুবীক্ষণিক জীবেরই শক্তি উৎপাদনের একমাত্র প্রক্রিয়া। কোষের বাইরে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে গ্লুকোজ অণু অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে অ্যালকোহল অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি ও অল্প পরিমাণ শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলা হয়। ফার্মেন্টেশনের ফলে ইথানল (ইথাইল অ্যালকোহল) অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$$CH_3{-}CO{-}COOH \xrightarrow[\text{ল্যাকটিক অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ}]{NADH + H^+ \curvearrowright NAD} CH_3{-}CHOH{-}COOH$$

পাইরুভিক অ্যাসিড → ল্যাকটিক অ্যাসিড

অবাত শ্বসনে ১ অণু গ্লুকোজ হতে ২ অণু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_3H_6O_3 + 20 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

গ্লুকোজ → ল্যাকটিক অ্যাসিড

প্রকৃতকোষী এবং আদিকোষী জীবে শ্বসনের স্থান

প্রকৃতকোষী	আদিকোষী
(ক) মাইটোকন্ড্রিয়নের বাইরে (সাইটোপ্লাজমে) ১। গ্লাইকোলাইসিস ২। ফার্মেন্টেশন (খ) মাইটোকন্ড্রিয়নের ভেতরে ম্যাট্রিক্স-এ : ৩। ক্রেবস চক্র মাইটোকন্ড্রিয়নের ইনারমেমব্রেন-এ ৪। ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন।	(ক) সাইটোপ্লাজমে ১। গ্লাইকোলাইসিস ২। ফার্মেন্টেশন ৩। ক্রেবস চক্র (খ) প্লাজমামেমব্রেনের ভেতরের তল (innersurface) ৪। ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন।

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন শিল্পে অবাত শ্বসনের তথা ফার্মেন্টেশনের ব্যবহার : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক শিল্প। নিচে সংক্ষেপে এর কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো।

(i) বেকারি শিল্পে : ঈস্টের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়াকে এই শিল্পে কাজে লাগানো হয়। ময়দা-চিনির সাথে ঈস্ট যোগ করে পাউরুটি তৈরি করা হয়। ময়দা-চিনি ইত্যাদি উপকরণের সাথে মিশ্রিত ঈস্টের অবাত শ্বসনের ফলে সৃষ্টি হয় CO_2 ও ইথাইল অ্যালকোহল। CO_2 গ্যাস-এর চাপে পাউরুটি ফুলে ফাঁপা হয়; আর অ্যালকোহল তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

(ii) মদ্য শিল্পে : ঈস্টের অবাত শ্বসন তথা ফার্মেন্টেশনকে কাজে লাগিয়ে মদ তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আঙুরের রস থেকে ওয়াইন এবং আপেলের রস থেকে সিডার প্রস্তুত করা হয়।

(iii) অ্যালকোহল প্রস্তুতে : শর্করার সাথে ঈস্টের ফার্মেন্টেশন বিক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়। দর্শনা চিনিকলে চিটাগুড় (molasses) থেকে এই প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় বিউটানল, প্রপানল ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

(iv) দুগ্ধ শিল্পে : দুধের সাথে *Lactobacillus helveticus, Streptococcus lactis* ইত্যাদি ব্যাক্টেরিয়া মিশিয়ে ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে 37–38°C তাপমাত্রায় দই তৈরি করা হয়। এটিও ব্যাক্টেরিয়ার অবাত শ্বসনের ফল। পনির ও মাখন তৈরিতেও একই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

(v) আয়ুর্বেদিক ওষুধ শিল্পে : অনেক আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরিতে বিভিন্ন ড্রাগের মিশ্রণের সাথে চিটাগুড় দিয়ে পাত্রে রেখে দেয়া হয় (এমনকি মাটির নিচে বেশ কিছুদিন রাখা হয়)। এতে চিটাগুড় থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয় যাতে বিভিন্ন ড্রাগের ওষুধিগুণ অ্যালকোহল কর্তৃক শোষিত হয়।

(vi) চা ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে : চা প্রক্রিয়াজাতকরণে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং ফলে সবুজপাতা তাম্র বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। কফি শিল্পেও এর প্রয়োগ আছে।

(vii) মাংস ও মাছ শিল্পে : বিভিন্ন ঈস্ট ও কতিপয় ছত্রাক (*Penicillium, Aspergillus*), ব্যাক্টেরিয়া (*Pedicoccus cerevisiae, Bacillus* sp.) ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে মাংসজাত দ্রব্য, যেমন-দক্ষিণ আমেরিকায় কিউরেডহ্যাম (Curedham), মাছ হতে তৈরি জাপানে কাতসুবুশি (Katsuobushi) প্রভৃতি।

(viii) ভিটামিন তৈরিতে : থিয়ামিন ও রিবোফ্ল্যাবিন নামক ভিটামিন B_1 ও B_2 এই প্রক্রিয়ায় ঈস্টের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

(ix) ভিনেগার উৎপাদন : গুড়ের মধ্যে ঈস্ট মিশিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এতে *Acetobacter aceti* নামক ব্যাক্টেরিয়া দিয়ে জারণ ক্রিয়ায় অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা ভিনেগার উৎপন্ন করা হয়।

(x) কোমল পানীয় শিল্পে : বিভিন্ন প্রকার কোমল পানীয়ের প্রধান উপাদান সাইট্রিক অ্যাসিড গাঁজন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়।

শ্বসনিক হার/কোশেন্ট (Respiratory quotient/R.Q) : শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার (R.Q) বলে। বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তুর জন্য শ্বসনিক হার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্বসনিক বস্তু যদি গ্লুকোজ হয় তবে এটি সবাত শ্বসনের মাধ্যমে ৬ অণু CO_2 ত্যাগ করে এবং ৬ অণু O_2 গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে শ্বসন হার নির্ণয়ের জন্য নিম্নের সমীকরণ ব্যবহার করা হয়।

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6H_2O$$

কাজেই সবাত শ্বসনের শ্বসনিক হার (R.Q) $= \dfrac{\text{নির্গত } CO_2 \text{ এর অণুর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } O_2 \text{ এর অণুর পরিমাণ}}$

$$\therefore R.Q = \frac{6CO_2}{6O_2} = \frac{6}{6} = 1$$

Scanned by CamScanner

শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট, জৈব অ্যাসিড, চর্বি ও আমিষ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে জারিত হয়। শ্বসনিক বস্তু ও শ্বসনের ধরনের উপর শ্বসন হার (R.Q) ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। যেমন-

ম্যালিক অ্যাসিডের $R.Q = \frac{4CO_2}{3O_2} = \frac{4}{3} = 1.33$

ওলিক অ্যাসিডের $R.Q = \frac{36CO_2}{51O_2} = \frac{36}{51} = 0.71$

আমিষে O_2এর পরিমাণ কম থাকে এবং আমিষ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হলে এদের R.Q এর মান 1 এর কম হয়ে থাকে।

শ্বসনের প্রভাবকসমূহ : নিম্নলিখিত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ শ্বসন ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে:

(ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ :

১। **তাপমাত্রা :** শ্বসন ক্রিয়া কতগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি, আর এ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর হার বিভিন্ন উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু উৎসেচকসমূহের কার্যকারিতা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল সেহেতু তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি শ্বসনের হারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাপমাত্রা 0° সে. থেকে 30°C সে. পর্যন্ত বাড়ার সাথে সাথে শ্বসন হারও ক্রমাগত বাড়ে। 0°C শ্বসন হার খুবই কম থাকে। সাধারণত 20°–35°C তাপমাত্রায় শ্বসন প্রক্রিয়া ভালোভাবে চলে। 45°C এর উপরের তাপমাত্রায় উৎসেচকসমূহের বিক্রিয়ার হার তথা শ্বসনের হার বেশ কমে যায়।

২। **অক্সিজেন :** পাইরুভিক অ্যাসিডের পূর্ণাঙ্গ জারণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। সবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। অতএব কেবল সবাত শ্বসনেই অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে।

৩। **পানি :** কতগুলো বিক্রিয়ায় পানির প্রয়োজন হয়, অতএব প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহও শ্বসন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে।

৪। **আলো :** শ্বসনকার্যে আলোর প্রয়োজন পড়ে না সত্যি কিন্তু দিনের বেলায় আলোর উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকায় O_2 গ্রহণ ও CO_2 ত্যাগ করা সহজ হয় বলে শ্বসন হার একটু বেড়ে যায়।

৫। **কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর ঘনত্ব :** বায়ুতে CO_2-এর ঘনত্ব বেড়ে গেলে শ্বসন হার কিঞ্চিৎ কমে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ :

১। **জটিল খাদ্যদ্রব্য :** সরল খাদ্য গ্লুকোজ শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান শ্বসনিক বস্তু। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় কোষস্থ জটিল খাদ্যই গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। কাজেই জটিল খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও ধরন শ্বসন প্রক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **উৎসেচক :** শ্বসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অসংখ্য উৎসেচক অংশগ্রহণ করে, তাদের উপস্থিতির উপরই সম্পূর্ণ শ্বসন প্রক্রিয়াটি নির্ভরশীল।

৩। **কোষের বয়স :** যে কোষে প্রোটোপ্লাজম অধিক (অল্প বয়সের) সে সব কোষ শ্বসন হার অধিক হয়।

৪। **কোষস্থ অজৈব লবণ :** কোষে অজৈব লবণ অধিক পরিমাণে থাকলে শ্বসন হার বেড়ে যায়।

৫। **কোষ মধ্যস্থ পানি :** কোষে প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে শ্বসন হার কমে যায়।

৬। **মাটিতে অজৈব লবণ :** মাটিতে NaCl, KCl, CaCl ও MgCl এর দ্রবণের সরবরাহ বৃদ্ধি ঘটিয়ে শ্বসন হার বৃদ্ধি পা যায়।

৭। **অন্যান্য প্রভাবক :** আঘাতপ্রাপ্ত টিস্যুতে আঘাত নিরাময়ের জন্য কোষ বিভাজন দ্রুততর হয়, ফলে শ্বসন হার বেড়ে যায়। হাত দিয়ে পাতা মৃদু ঘষে দিলে শ্বসন হার বৃদ্ধি পায়।

Scanned by CamScanner

শ্বসনের গুরুত্ব (Importance of Respiration)

যে কোনো জীবের জীবনে শ্বসনের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষেই শ্বসন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া মানেই জীব বা সেই জীব কোষের মৃত্যু হওয়া। নিচে উদ্ভিদ শ্বসনের গুরুত্ব সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১। **জীবের দেহে শক্তি সরবরাহ** : জীবের প্রতিটি প্রক্রিয়া (যা জীবনের বৈশিষ্ট্য) পরিচালনার জন্য শক্তির প্রয়োজন আর এ শক্তি আসে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কাজেই শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবের সকল জৈবিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করার মধ্যেই রয়েছে যে কোনো জীবের জীবনে শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রকৃত গুরুত্ব।

২। **খাদ্য প্রস্তুত** : শ্বসন প্রক্রিয়ায় নির্গত CO_2 প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে খাদ্য উৎপন্ন করে। সে খাদ্য যেমন উদ্ভিদ জীবনকে রক্ষা করে, তেমনই আবার সমগ্র প্রাণী জগতকেও রক্ষা করে।

৩। **খনিজ লবণ পরিশোষণ** : উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণে শ্বসন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্বসন হার কম হলে লবণ পরিশোষণ হার কমে যায় এবং বৃদ্ধি ও অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৪। **কোষ বিভাজন ও দৈহিক বৃদ্ধি** : শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাব কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার উপরও প্রতিফলিত হয়। কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি ও কিছু আনুষঙ্গিক পদার্থ শ্বসন প্রক্রিয়া হতে আসে। তাই এ প্রক্রিয়া জীবের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। **এনজাইম ও জৈব অ্যাসিড উৎপাদন** : এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপক্ষার ও জৈব অ্যাসিড সৃষ্টিতে সহায়তা করার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য জৈবিক কার্যক্রমেও সহায়তা করে।

৬। **বায়ুমণ্ডলে CO_2 ও O_2 এর ভারসাম্য রক্ষা** : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হতে CO_2 গৃহীত হয় এবং O_2 বর্জিত হয় কিন্তু শ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল হতে O_2 গৃহীত হয় এবং CO_2 বর্জিত হয়, তাই বায়ুমণ্ডলে CO_2 ও O_2 এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

৭। **শিল্পে ব্যবহার** : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে অ্যালকোহল, মদ, সিরকা, আচার, মাছ ও মাংসের সস ইত্যাদি উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

৮। **বেকারি ও দুগ্ধজাত শিল্প** : বিভিন্ন অণুজীবের অবাত শ্বসন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় বেকারি (পাউরুটি) ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (দই, পনির) উৎপাদন করা হয়।

> গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার সকল এনজাইম সার্বজনীনভাবে বহু ব্যাকটেরিয়া, সকল প্রোটিস্ট, সকল ছত্রাক, সকল প্রাণী এবং সকল উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় এরা সবাই একই ধরনের জেনেটিক তথ্য তথা একই ধরনের DNA বহন করে। কাজেই এরা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

কাজ : সবাত ও অবাত শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

পার্থক্যের বিষয়	সবাত শ্বসন	অবাত শ্বসন
১। অক্সিজেন		
২। পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ		
৩। CO_2 উৎপাদন		
৪। পানি উৎপাদন		
৫। অ্যালকোহল ও ল্যাকটিক অ্যাসিড		
৬। শক্তি		
৭। কোথায় ঘটে		
৮। রাসায়নিক বিক্রিয়া		

Scanned by CamScanner

সার-সংক্ষেপ

পত্ররন্ধ্র : Stomata-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে পত্ররন্ধ্র। এই রন্ধ্র পাতায় অধিক থাকে বলেই এরূপ প্রতিশব্দ করা হয়েছে। পাতায় (সাধারণত নিম্নত্বকে) অবস্থিত দু'টি রক্ষীকোষ দ্বারা বেষ্টিত রন্ধ্রের নাম পত্ররন্ধ্র। পত্ররন্ধ্র বন্ধ হতে পারে, আবার খুলেও যেতে পারে। পানি শোষণ করে রক্ষীকোষদ্বয় স্ফীত হলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়, আবার পানি হারিয়ে রক্ষীকোষদ্বয় শিথিল হলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। উদ্ভিদ জীবনে পত্ররন্ধ্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রস্বেদন : প্রস্বেদন একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। বাষ্প বের হয়ে যাওয়ার পথের ভিন্নতা অনুযায়ী প্রস্বেদন তিন প্রকার, যথা- পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, লেন্টিকুলার প্রস্বেদন এবং কিউটিকুলার প্রস্বেদন। অধিকাংশ উদ্ভিদে দিনের আলোতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং প্রস্বেদন ঘটে। মরুভূমির মতো প্রখর সূর্যালোকের এলাকায় সাধারণত পত্ররন্ধ্র দিনে বন্ধ থাকে এবং রাত্রে খোলা থাকে, তাই মরু উদ্ভিদে প্রস্বেদন রাতে হয়ে থাকে। এটি উদ্ভিদের একটি অভিযোজন বৈশিষ্ট্য।

ফটোফসফোরাইলেশন : আলোকশক্তির সাহায্যে কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়া হলো ফটোফসফোরাইলেশন। প্রকৃতপক্ষে সূর্যশক্তির সাহায্যে ADP-এর সাথে এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে ATP তৈরি হওয়ার নামই ফটোফসফোরাইলেশন। অচক্রীয় ও চক্রীয়– এই দুই প্রক্রিয়ায় ফটোফসফোরাইলেশন হয়ে থাকে। উদ্ভিদ জীবনে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ATP ব্যবহার করে সবুজ উদ্ভিদ শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাদ্যের উপর উদ্ভিদসহ সমগ্র জীবজগৎ নির্ভরশীল।

সালোকসংশ্লেষণ : সালোকসংশ্লেষণ হলো সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সূর্যালোকের শক্তিকে ATP ও $NADPH + H^+$ নামক রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বোহাইড্রেট তথা শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এ প্রক্রিয়ায় CO_2 গৃহীত হয় এবং O_2 উপজাত হিসেবে বের হয়ে যায়। সালোকসংশ্লেষণের আলোক নির্ভর অধ্যায়ে ATP ও $NADPH + H^+$ তৈরি হয় এবং আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। এ খাদ্যের উপর সমগ্র জীবজগৎ নির্ভরশীল।

গ্লাইকোলাইসিস : শ্বসনের প্রাথমিক ধাপ হলো গ্লাইকোলাইসিস। এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করে। পাইরুভিক অ্যাসিড পরে সবাত শ্বসনে অ্যাসিটাইল Co-A সৃষ্টির মাধ্যমে ক্রেবস্ চক্র ও ETC-এ প্রবেশ করে শক্তি ও O_2 উৎপন্ন করে। গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। কোন উপাদানটি উদ্ভিদ মাটি হতে শোষণ করে ?

(ক) অক্সিজেন (খ) হাইড্রোজেন (গ) নাইট্রোজেন (ঘ) কার্বন

২। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো–

(i) এ উদ্ভিদের পাতার বান্ডলশীথ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(ii) বান্ডলশীথের কোষগুলো ভাস্কুলার বান্ডলের সাথে অরীয়ভাবে অবস্থান করে।

(iii) মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

Scanned by CamScanner

করেছে। এটি ক্যালভিন চক্রের ব্যতিক্রম। পরবর্তীতে M.D. Hatch ও C.R. Slack নামক দুজন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী ইক্ষু উদ্ভিদ নিয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণা করে কার্বন বিজারণের এ ভিন্ন পথকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন (অর্থাৎ ইক্ষু উদ্ভিদেই পূর্ণাঙ্গভাবে এই গতিপথ প্রথম আবিষ্কৃত হয়), যা পরে Hatch & Slack গতিপথ বা C_4 চক্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় (১৯৭০)। ডাইকার্বোক্সিলিক চক্র নামেও এটি পরিচিত। বর্তমানে ১৬টি গোত্রের বহু উদ্ভিদে এ গতিপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাতার মেসোফিল কোষ এবং বান্ডলসীথ কোষ সম্মিলিতভাবে এই গতিপথ সম্পন্ন করে। ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ এবং পাইরুভেট-অর্থোফসফেট ডাইকাইনেজ এনজাইম মেসোফিল কোষে সীমাবদ্ধ থাকে। ডিকার্বোক্সিলেজসমূহ এবং ক্যালভিন চক্রের সকল এনজাইম বান্ডলসীথ কোষে সীমাবদ্ধ থাকে।

নিম্নলিখিত পর্যায়ে এই গতিপথ (চক্র) সমাপ্ত হয় :

১। মেসোফিল কোষে অবস্থিত ফসফোইনল পাইরুভিক অ্যাসিড (৩ কার্বন) এর সাথে বায়ুস্থ CO_2 (HCO_3^- হিসেবে অংশগ্রহণ করে) মিলিত হয়ে ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে। কার্বোক্সিলেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে।

২। অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড পরে ম্যালিক অ্যাসিড অথবা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড (৪ কার্বন)-এ পরিণত হয়। ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। এখানে $NADPH + H^+$ যুক্ত হয়ে NADP তৈরি করে। প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৪-কার্বনবিশিষ্ট বলে এই চক্রকে C_4 চক্র বলা হয়। যেসব উদ্ভিদে C_4 চক্রের মাধ্যমে কার্বন বিজারণ হয় তাদেরকে C_4 উদ্ভিদ বলে।

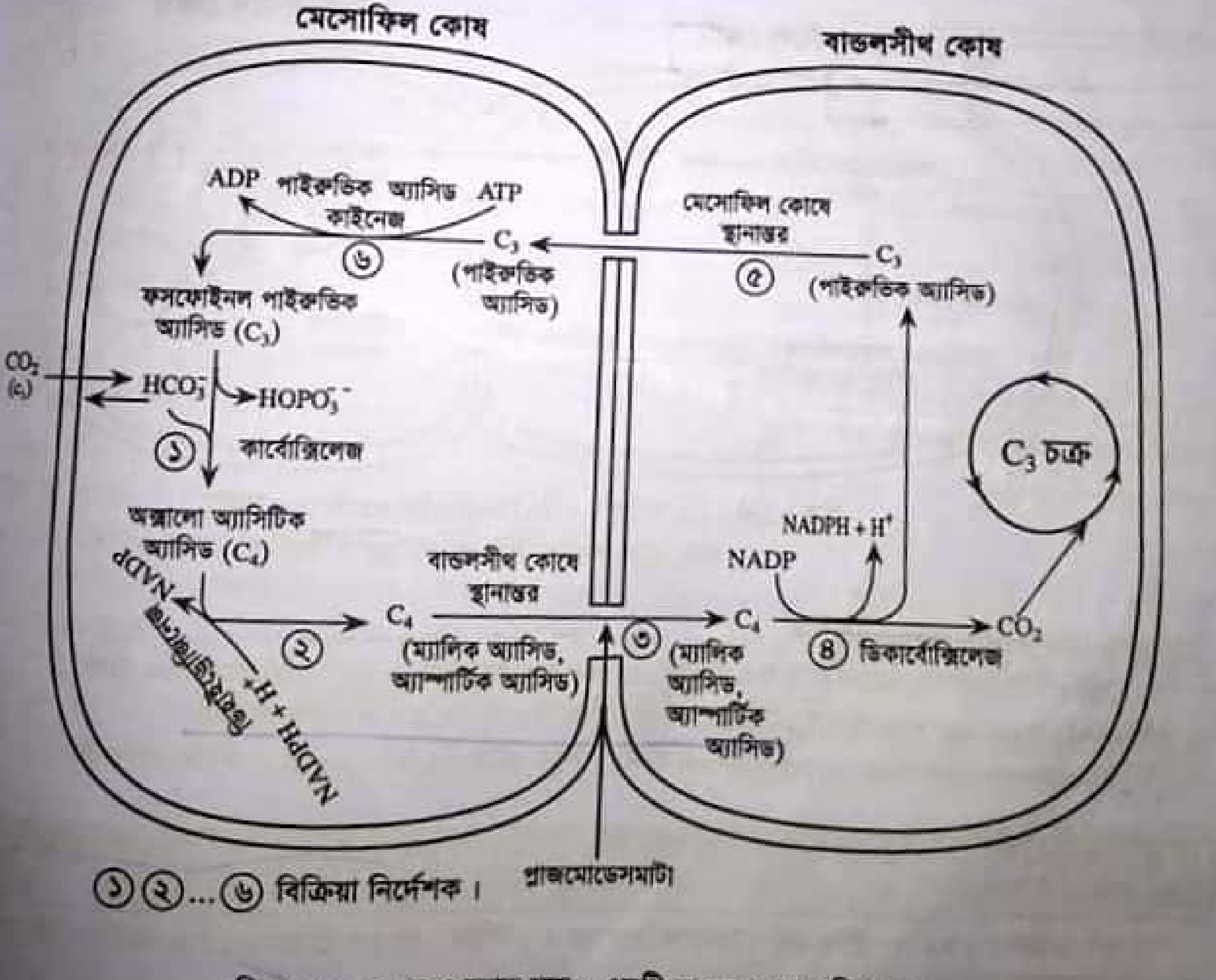

চিত্র ৯.১৫ : হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র : একটি সাধারণ পথ পরিক্রমা।

Scanned by CamScanner

৩। ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড মেসোফিল কোষ থেকে প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে বান্ডলসীথ কোষে প্র... করে।

৪। বান্ডলসীথ কোষে ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড এক অণু CO_2 উৎপন্ন করে ৩-কার্বনবিশিষ্ট পাইরু... অ্যাসিডে পরিণত হয়। এ বিক্রিয়ায় NADP অংশগ্রহণ করে এবং NADPH + H^+ তৈরি হয়। উৎপন্ন CO_2 সরাসরি... চক্রে (ক্যালভিন চক্র) প্রবেশ করে (অর্থাৎ রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট কর্তৃক গৃহীত হয়) এবং চক্রটি এখানে সম্পন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় **ডিকার্বোক্সিলেজ** এনজাইম সহযোগিতা করে।

৫। পাইরুভিক অ্যাসিড বান্ডলসীথ কোষ থেকে প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে।

৬। পাইরুভিক অ্যাসিড মেসোফিল কোষে **পাইরুভিক অ্যাসিড কাইনেজ** এনজাইমের সহযোগিতায় ফসফো... পাইরুভিক অ্যাসিড পুনঃউৎপাদন করে এবং চক্রটি চালু থাকে। এখানে একটি ATP থেকে একটি ADP তৈরি হয়।

বান্ডলসীথ কোষে CO_2 এর অভাব হয় না, তাই কোনো ফটোরেসপিরেশন হয় না, ফলে কার্বন বিজারণ হ্রাস... হয়।

উদ্ভিদে তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ্য করা যায় : (i) বান্ডলসীথ কোষে স্থানান্তরিত C_4 অ্যাসিডের ধরন, ... মেসোফিল কোষে স্থানান্তরিত C_3 অ্যাসিডের ধরন এবং (iii) বান্ডলসীথ কোষে ডিকার্বোক্সিলেশন এনজাইমের প্রকার... তিন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার C_4 গতিপথ লক্ষ্য করা যায়। যথা :

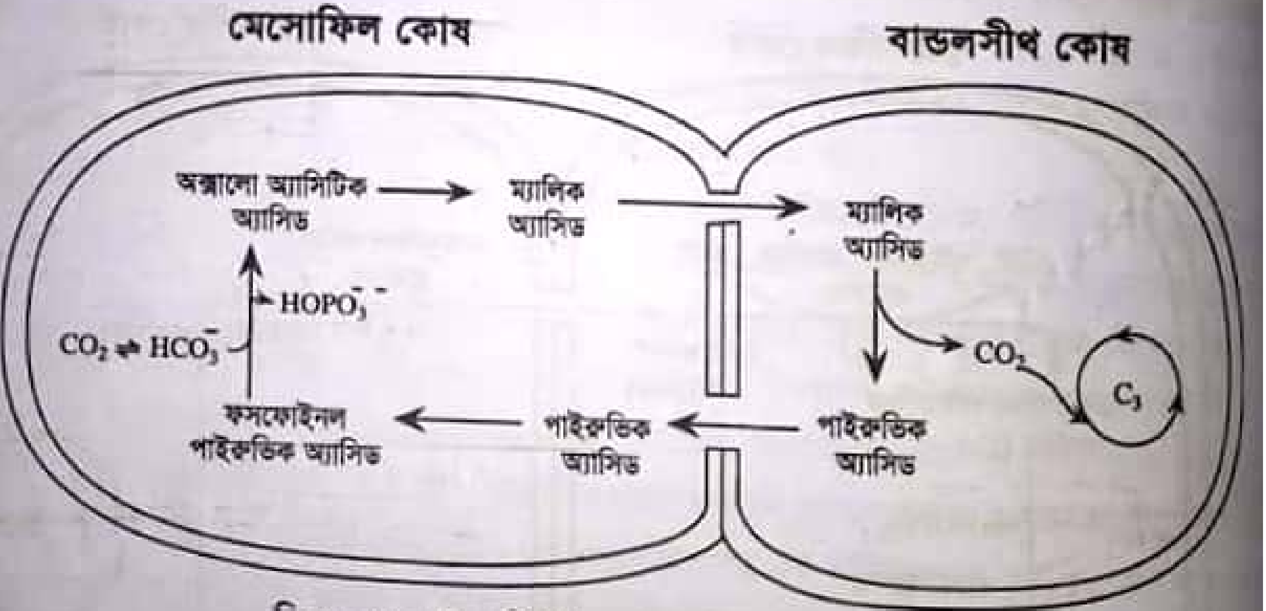

চিত্র ৯.১৬ : C_4 গতিপথ : NADP-malic enzyme প্রকার
ইক্ষু, ভুট্টা, সরগাম উদ্ভিদে এই চক্র পরিচালিত হয়।

(A) NADP-malic enzyme প্রকার।

ভুট্টা, ইক্ষু, সরগাম, ক্র্যাব ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী (৯.১৬ নং চিত্রে দেখানো হলো)।

(B) NAD-malic enzyme প্রকার। মিল্ল্যাত, কাউন, চিনা ইত্যাদি উদ্ভিদে এ প্রকার কার্যকরী।

(C) Phosphoenolpyruvate carboxykinase প্রকার। গিনি ঘাসে (Guinea grass) এ প্রকার কার্যকরী।

বি. দ্র. আমাদের দেশে উপরে উল্লেখিত উদ্ভিদগুলো ছাড়া বাকি অধিকাংশ উদ্ভিদই (পাট, আম, জাম, কলা, লিচু ইত্যাদি) C_3 উদ্ভিদ।

যে সব উদ্ভিদে C_3 চক্র সংঘটিত হয় তাদেরকে বলা হয় C_3 উদ্ভিদ। যে সব উদ্ভিদে C_4 চক্র সংঘটিত হয় তাদেরকে বলা হয় C_4 উদ্ভিদ।

Scanned by CamScanner

নিচের ছক দুটির প্রতি লক্ষ্য কর

পার্থক্যের বিষয়	C_3 উদ্ভিদ	C_4 উদ্ভিদ
১। তাপমাত্রা	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম নয়।	উচ্চ তাপমাত্রায় খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম।
২। ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে মেসোফিল কোষের কোনো পৃথক স্তর থাকে না।	পাতার বান্ডলসীথকে ঘিরে অরীয়ভাবে সজ্জিত মেসোফিল কোষের ঘন স্তর বিদ্যমান (ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি)।
৩। ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকার	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই রকম।	গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই রকম : (i) গ্রানাযুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এবং (ii) গ্রানাবিহীন বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট।
৪। CO_2 এর ঘনত্ব	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ৫০ ppm (parts per million) প্রয়োজন (৫০-১৫০ ppm)।	সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব কমপক্ষে ০.১০ ppm প্রয়োজন (০.১০-১০ ppm)।
৫। বিক্রিয়া	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।	মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডলসীথ কোষে CO_2 সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।
৬। উৎপত্তি	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_3 উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে।	মনে করা হয় বেশির ভাগ C_4 উদ্ভিদ উষ্ণমণ্ডলে উৎপত্তি লাভ করেছে।

ক্যালভিন চক্র	হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র
(i) কেবল মেসোফিল কোষে হয়।	(i) মেসোফিল ও বান্ডলসীথ কোষে হয়।
(ii) ফটোরেসপিরেশন ঘটে।	(ii) ফটোরেসপিরেশন ঘটে না।
(iii) প্রাথমিক CO_2 গ্রহীতা RuBP	(iii) প্রাথমিক CO_2 গ্রহীতা PEP
(iv) CO_2 ফিক্সিং এনজাইম রুবিস্কো	(iv) CO_2 ফিক্সিং এনজাইম PEP-কার্বোক্সিলেজ
(v) প্রথম স্থায়ী দ্রব্য 3PGA (৩-কার্বন)	(v) প্রথম স্থায়ী দ্রব্য অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (৪-কার্বন)।
(vi) CO_2-এর জন্য কার্বোক্সিলেজ-এর দক্ষতা মধ্যম।	(vi) CO_2-এর জন্য কার্বোক্সিলেজ-এর দক্ষতা উচ্চ
(vii) ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন একই রকম।	(vii) ব্যবহৃত ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন দু'রকম (বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে উন্নত গ্রানাম থাকে না)।
(viii) এ চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ১০° সে. থেকে ২৫° সে.।	(viii) এ চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ৩০° সে. থেকে ৪৫° সে.।
(ix) বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ৫০ ppm পরিমাণ CO_2 থাকা প্রয়োজন।	(ix) বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে নিম্নতম ০.১০ ppm CO_2 থাকলেও চলে।

C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। C_4 উদ্ভিদের পাতার বান্ডলসীথ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

২। বান্ডলসীথের কোষগুলো ভাস্কুলার বান্ডলের সাথে অরীয়ভাবে অবস্থান করে।

৩। বান্ডলসীথের মাঝে যে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়, তাতে গ্রানা অনুপস্থিত কিন্তু মেসোফিল কোষে উন্নত প্রকৃতির গ্রানা বিদ্যমান। যেমন-ইক্ষু উদ্ভিদের পাতা।

৪। C_4 উদ্ভিদের মেসোফিল কোষে রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতা অনুপস্থিত।

৫। NADP ম্যালিক অ্যাসিড এনজাইমের উপস্থিতিতে বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে C_3 চক্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিপাকীয় শক্তি $NADPH + H^+$ উৎপাদিত হয়।

উদ্ভিদ চক্রের গুরুত্ব

১। C_4 উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় (30° C – 45° C) সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হতে পারে, তাই উচ্চ তাপমাত্রায় এরা কর্মক্ষম থাকে।

Scanned by CamScanner

সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে চক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। পানির সরবরাহ বন্ধ হলে অচক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে না, চক্রীয় প্রক্রিয়া ঘটে। প্রয়োজন হলে উভয় প্রক্রিয়া একইসাথে চলতে পারে।

(খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (Light independent reactions) : কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা কার্বন বিজারণ পর্যায়। আলোকনির্ভর অধ্যায়ে সৃষ্ট ATP ও NADPH + H^+ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 হতে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ অধ্যায়ে CO_2 বিজারিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে বলে একে কার্বন বিজারণ অধ্যায় বলা হয়। কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় কোনো আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না তাই একে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় বা অন্ধকার অধ্যায়ও বলা হয়। তবে আলোর উপস্থিতিতেই কার্বন বিজারণ হয়ে থাকে। এর কারণ আলোর উপস্থিতিতে ATP ও NADPH + H^+ সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং স্টোম্যাটা খোলা থাকায় CO_2 ও O_2 বিনিময় সহজ হয়। আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (বা কার্বন বিজারণ) এর বিক্রিয়াসমূহ ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে সংঘটিত হয়। আবহমণ্ডলের CO_2 হতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টির তিনটি স্বীকৃত পথ আছে; তা হলো (১) ক্যালভিন চক্র, (২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং (৩) CAM প্রক্রিয়া।

কোষে সংঘটিত মেটাবলিক বিক্রিয়াসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘটে থাকে যাকে বলা হয় গতিপথ (Pathway)। যে গতিপথ চক্রাকারে ঘটে থাকে তাকে চক্রও (cycle) বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ, যেমন-আম, জাম।

(১) ক্যালভিন চক্র : C_3 চক্র (Calvin cycle : C_3 cycle) : ১৯৪৭-১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালভিন ও তাঁর সহযোগীরা (Melvin Calvin,1911-1997, Benson & Bassham) তেজস্ক্রিয় কার্বন (^{14}C-কার্বনের আইসোটোপ) ব্যবহার করে সন্ধানী পদ্ধতিতে (tracer technique) *Chlorella* নামক এককোষী শৈবালে কার্বন বিজারণের যে চক্রাকার গতিপথ আবিষ্কার করেন তা ক্যালভিন চক্র নামে পরিচিত। ক্যালভিন এজন্য ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র নিম্নরূপ :

(ক) কার্বন যোগ (কার্বোক্সাইলেশন) :

১। বায়ুস্থ CO_2 (এক কার্বনবিশিষ্ট) ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে প্রবেশ করে তথায় পূর্ব থেকে অবস্থিত ৫-কার্বনবিশিষ্ট রাইবুলোজ ১,৫-বিসফসফেট (RuBP)-এর সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে ৬-কার্বনবিশিষ্ট সম্পূর্ণ অস্থায়ী কিটো অ্যাসিড। কাজেই ক্যালভিন চক্রের CO_2-এর গ্রহীতা হলো RuBP। রুবিস্কো (rubisco) এনজাইম CO_2-কে RuBP এর সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করে। [পৃথিবীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম হলো রুবিস্কো কারণ এটি প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীবজগতের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে। রুবিস্কো হলো 'রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ/ অক্সিজিনেজ এনজাইমের অ্যাক্রোনিম (acronym)]।

২। ৬ কার্বনবিশিষ্ট কিটো অ্যাসিড এক অণু H_2O গ্রহণ করে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সাথে সাথেই দুই অণু 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3PGA) উৎপন্ন করে। 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ। ক্যালভিন চক্রে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩-কার্বনবিশিষ্ট বলে এ চক্রকে C_3 চক্রও বলা হয়। যে সব উদ্ভিদে C_3 চক্রের মাধ্যমে কার্বন বিজারণ হয় তাদেরকে C_3 উদ্ভিদ বলা হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদই C_3 উদ্ভিদ যেমন- আম, জাম।

[৬ চক্রে ১২ অণু 3PGA তৈরি হয়]

(খ) ফসফেট যোগ (ফসফোরাইলেশন)

৩। ATP থেকে একটি ফসফেট গ্রহণ করে 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড, 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড-এ (BPGA) পরিণত হয়। এখানে একটি ATP খরচ হয় এবং ১টি ADP মুক্ত হয়। এখানে 3-ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইম বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে থাকে।

[১২ অণু 3PGA থেকে ১২ অণু BPGA তৈরি হয়; ১২টি ATP খরচ হয়, ১২টি ADP মুক্ত হয়]

(গ) হাইড্রোজেন যোগ (রিডাকশন)

৪। 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট-এ (G3P) পরিণত হয়। এখানে একটি ফসফেট হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। NADPH+H^+ বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং NADP হিসেবে মুক্ত হয়। গ্লিসারেল্ডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহায়তা করে। G3P একটি ৩-কার্বনবিশিষ্ট কার্বোহাইড্রেট।

অপ্রয়োজনীয় (হার্বিসাইড) আগাছার ফটোসিনথেটিক ইলেকট্রন প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, তাই আগাছা মরে যায়।

Scanned by CamScanner

[১২ অণু BPGA থেকে ১২ অণু G3P তৈরি হয়; ১২টি NADPH + H^+ অংশ গ্রহণ করে, ১২টি NADP ও ১২টি Pi মুক্ত হয়।]

(ঘ) RuBP পুনঃউৎপাদন এবং দ্রব্য (স্টার্চ, সুক্রোজ) উৎপাদন

[১২টি G3P তে (১২ × ৩ = ৩৬) ৩৬টি কার্বন আছে। এর মধ্যে ১০টি G3P (৩০টি কার্বন) বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ৬টি ৫-কার্বনবিশিষ্ট (৫ × ৬ = ৩০) RuBP পুনঃউৎপাদন করে। ২টি G3P (৩ × ২ = ৬ কার্বন) মিলিতভাবে বিভিন্ন বিক্রিয়া শেষে গ্লুকোজ সৃষ্টির মাধ্যমে সুক্রোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ (যা কোষ, টিস্যু ও অঙ্গ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় অথবা জমা হয়) ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করে।]

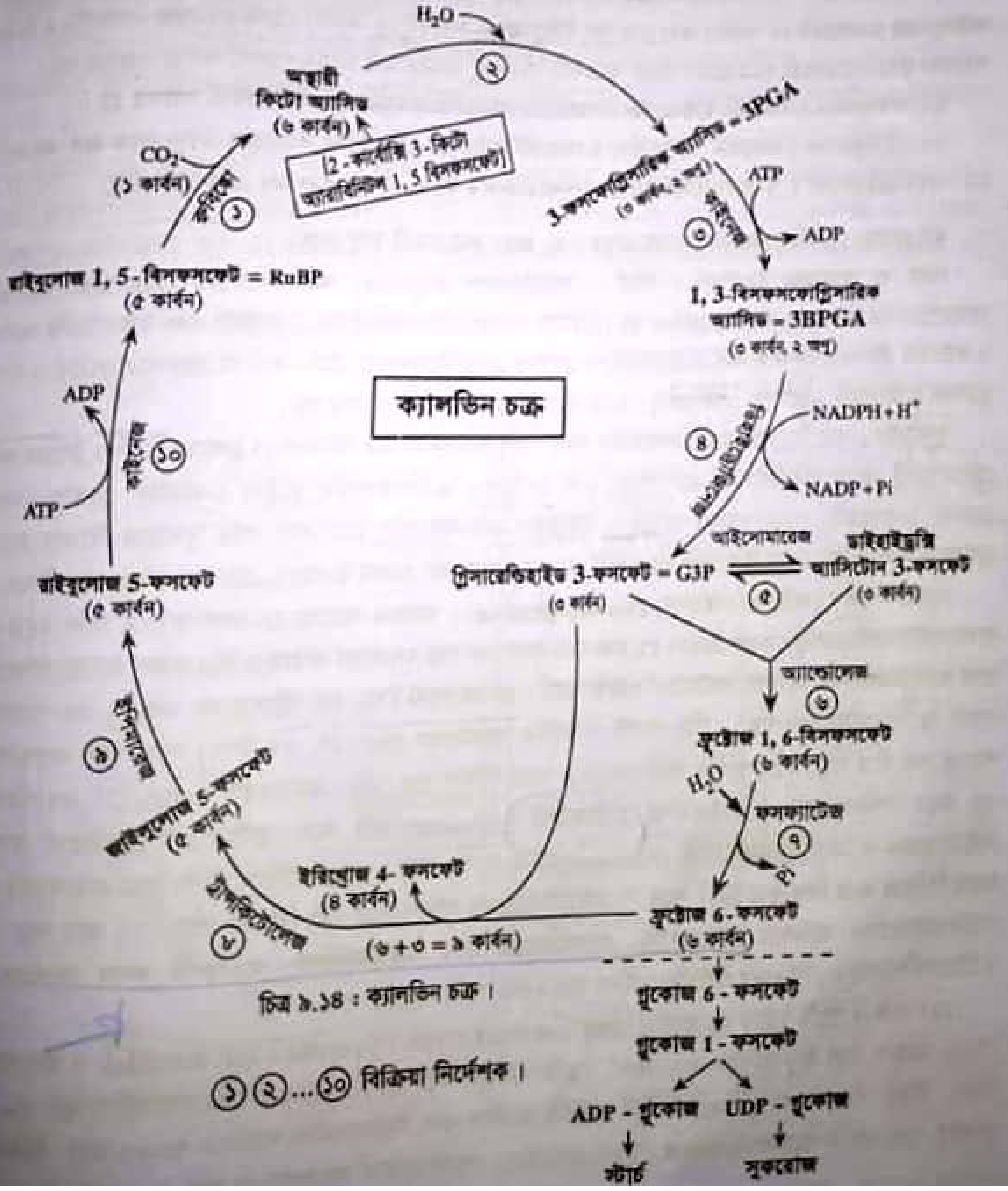

চিত্র ৯.১৪ : ক্যালভিন চক্র।

①②...⑩ বিক্রিয়া নির্দেশক।

Scanned by CamScanner

দশম অধ্যায়

প্রধান শব্দসমূহ।
প্রজনন, নিষেক,

উদ্ভিদ প্রজনন

PLANT REPRODUCTION

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা জীবের প্রজনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করেছ, বিশেষ করে পুষ্পক উদ্ভিদের প্রজ অঙ্গ, ফুলের গঠন, পরাগায়ন, গ্যামিট সৃষ্টি, নিষেক এবং ফল ও বীজ উৎপাদন বিষয়ে জেনেছ। এ অধ্যায়ে বিষয়টি আ একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
২. বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৩. কৃত্রিম প্রজননের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন বর্ণনা করতে পারবে।
৫. কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। প্রতিটি জীবেরই তার অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে। কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল চারা, আমের বীজ থেকে আম চারা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পরিপূর্ণ কাঁঠাল গাছ ও আম গাছে পরিণত হয়। একই ভাবে কলা গাছের গোড়া থেকে কলার চারা (সাকার), বাঁশ গাছের গোড়া থেকে বাঁশের চারা (সাকার) যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ কলা গাছ ও বাঁশ গাছে পরিণত হয়। শিমুল সজিনা, মাদার, জীয়ল ইত্যাদি গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগালে সেই ডাল সজীব হয়ে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয়। পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে তার কিনার থেকে নতুন পাথরকুচি চারা সৃষ্টি হয়। মাতৃ উদ্ভিদ থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াই উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, প্রজনন একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে। এ অধ্যায়ে উদ্ভিদের প্রজনন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভ্রূণ সৃষ্টি, তার বিকাশ ও প্রকাশই উদ্ভিদের যৌন প্রজননের মূল উদ্দেশ্য। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের ভ্রূণ সৃষ্টি ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই উদ্ভিদ ভ্রূণবিজ্ঞান বা Plant Embryology। Embryo-এর বাংলা হলো ভ্রূণ।

প্রজননের প্রকারভেদ : উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। যৌন প্রজনন এবং ২। অযৌন প্রজনন। ৩। এছাড়া কোনো কোনো উদ্ভিদে অন্য এক ধরনের প্রজনন দেখা যায় যা পারথেনোজেনেসিস বা অপুংজনি নামে পরিচিত।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন

আবৃতবীজী উদ্ভিদে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় ডিম্বকে, ডিম্বক সৃষ্টি হয় ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয়ে। শুক্রাণু সৃষ্টি হয় পরাগরেণুতে, পরাগরেণু সৃষ্টি হয় ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে। কাজেই ফুলই আবৃতবীজী উদ্ভিদে জননের কাজ করে। ফুল হলো উদ্ভিদের বংশবিস্তারের (প্রজননের) জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপ (shoot)।

১। যৌন প্রজনন (Sexual reproduction) : দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির গ্যামিটের (পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট) মিলনের মাধ্যমে যে প্রজনন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তাই যৌন প্রজনন। যৌন প্রজননের মাধ্যমে সবীজী উদ্ভিদে বীজের সৃষ্টি হয়, তাই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াই যৌন প্রজনন। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্যামাস ধরনের।

রেণুস্থলী বা পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of Microsporangia) : ফুলের তৃতীয় স্তবক হলো পুংস্তবক। এক বা একাধিক পুংকেশর নিয়ে এ স্তবক গঠিত। প্রতিটি পুংকেশর নিচে দণ্ডাকার পুংদণ্ড (filament) এবং মাথায় স্ফীত পরাগধানী (anther) নিয়ে গঠিত। পরাগধানীর দুটি খণ্ডের মাঝখানে একটি যোজনী (connective) থাকে।

পরিণত পরাগধানী (anther) অনেকটা চারকোণাবিশিষ্ট হয়। প্রতি কোণে ভেতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড় হয়। এদের ঘন সাইটোপ্লাজম এবং বড় নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (archesporial cell) বলা হয়। এ কোষ প্রজাতিভেদে সংখ্যায় এক থেকে একাধিক থাকতে পারে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে দেয়ালকোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষে (primary sporogenous cell) পরিণত হয়। দেয়ালকোষ হতে পরে ৩–৫ স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর গঠিত হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ঘেরা এ অংশকে পরাগথলি (pollen sac) বলে। প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর হলো ট্যাপেটাম।

প্রাথমিক জনন কোষ পরাগমাতৃকোষ হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো পরাগমাতৃকোষে পরিণত হতে পারে। পরাগমাতৃকোষে তখন মায়োসিস (meiosis) বিভাজন হয়, ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগমাতৃকোষ হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। পরাগরেণু বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত হলুদ বর্ণের হয়। ট্যাপেটাম (tapetum) বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে। পরাগমাতৃকোষ হতে সৃষ্ট চারটি পরাগরেণু বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে, তবে পরিণত অবস্থায় পরাগরেণুগুলো পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে। একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর এ বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম (pollinium) বলে।

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার ও ত্রিভুজাকার হয় এবং এদের ব্যাস ১০ থেকে ২০০ µm পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি ত্বক থাকে। বাইরের ত্বকটি কিউটিনযুক্ত এবং পুরু। এটি বহিঃত্বক বা এক্সাইন (axine) নামে পরিচিত। এক্সাইন বিভিন্নভাবে অর্নামেন্টেড থাকে। এক্সাইন-এ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থাকে, প্রধান উপাদান হলো স্পোরোপোলেনিন। ভেতরের ত্বকটি

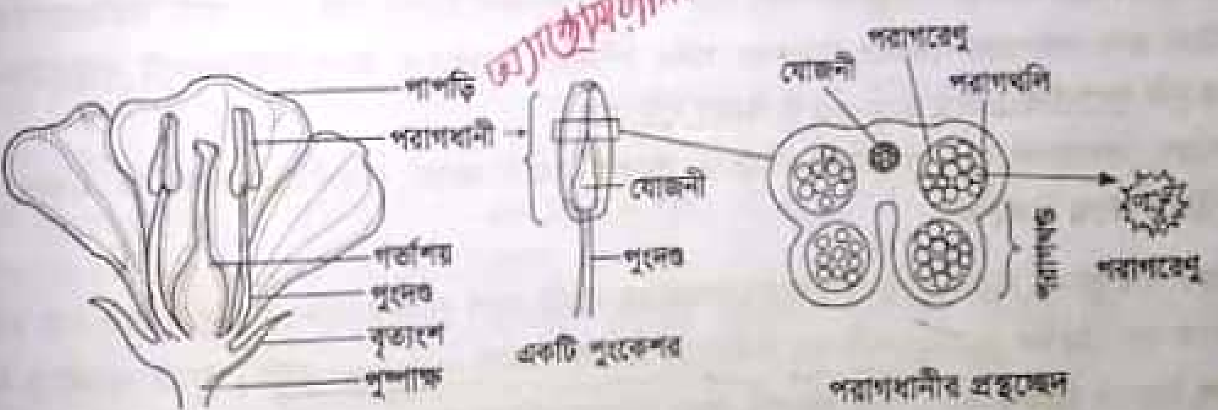

চিত্র ১০.১ : একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ), একটি পুংকেশর, পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ এবং একটি পরাগরেণু।

বেশ পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এর নাম অন্তঃত্বক বা ইনটাইন (intine)। এক্সাইন (বহিঃত্বক) স্থানে স্থানে অত্যন্ত পাতলা থাকে, পাতলা ছিদ্রের ন্যায় অংশকে জনন ছিদ্র, রেণুরন্ধ্র বা জার্মপোর (germpore) বলে। একটি পরাগরেণুতে সাধারণত একাধিক জার্মপোর (২০টি পর্যন্ত) থাকে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে এবং প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসটি মাঝখানে থাকে। পরিণত অবস্থায় কোষগহ্বর সৃষ্টির ফলে নিউক্লিয়াসটি এক দিকে সরে আসে।

পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte) ও গঠন : পরাগরেণু(n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। বড়টিকে বলা

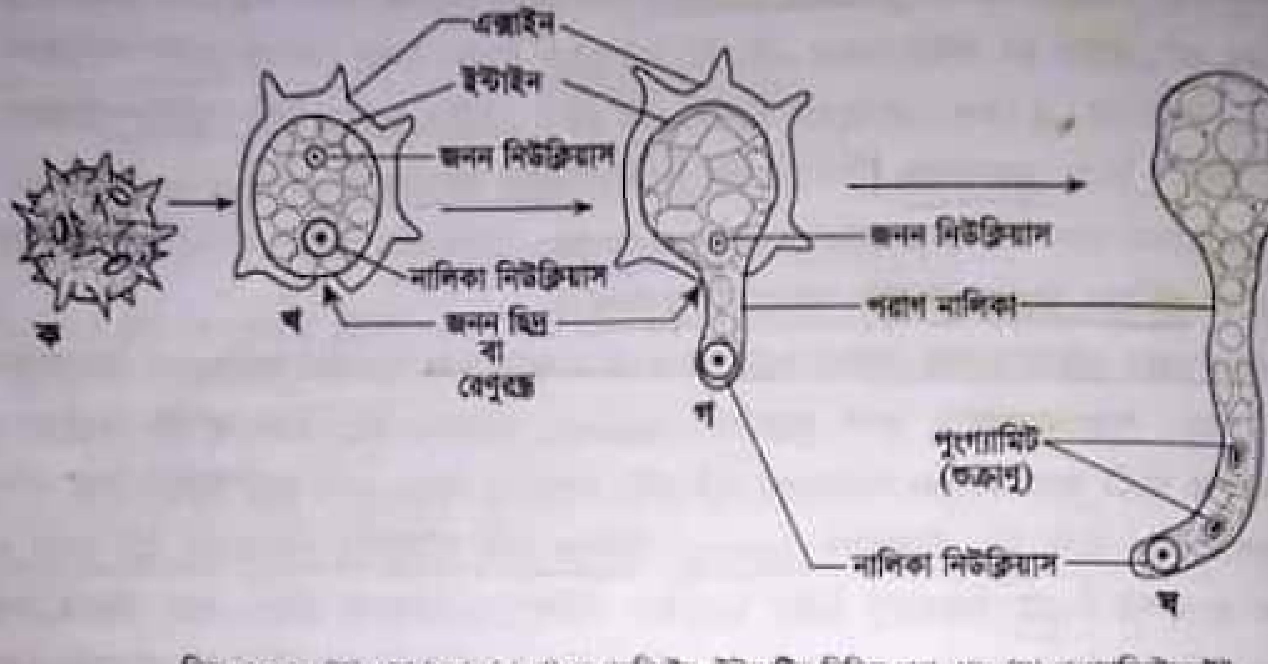

চিত্র : ১০.২: (ক) পরাগরেণু, (খ–গ) পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ এবং (ঘ) পুংগ্যামিটোফাইট।

হয় নালিকা নিউক্লিয়াস (tube nucleus) এবং ছোটটিকে বলা হয় জনন নিউক্লিয়াস (generative nucleus)। পরাগধানীর প্রাচীর ফেটে গেলে সাধারণত এই দ্বি-নিউক্লিয়াস অবস্থায় পরাগরেণু বের হয়ে আসে এবং পরাগায়ন (Pollination) সংঘটিত হয়। উদ্ভিদে পরাগায়নের কারণে কোনো তরল পদার্থ (পানি) ছাড়াই নিষিক্তকরণ (fertilization) সম্ভব হয়। পরাগায়নের মাধ্যমে পরাগরেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ ইনটাইন বৃদ্ধি পেয়ে জার্মপোর (জননছিদ্র) দিয়ে নালিকার আকারে বাড়তে থাকে। এ নালিকাকে পোলেন টিউব (pollen tube) বা পরাগনালিকা বলে। পরাগনালিকার ভেতরে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভেতর ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকরন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ইতোমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি পুংগ্যামিট (male gamete) বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে।

পরাগরেণু, পরাগনালিকা, পুংগ্যামিট–এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হলো পুংগ্যামিটোফাইট, যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

ডিম্বকের পরিস্ফুটন : ডিম্বক হলো ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থ একটি অংশ যা মাতৃ জননকোষ সৃষ্টি করে এবং নিষেকের পর বীজে পরিণত হয়। ডিম্বক (ovule) সৃষ্টি হয় গর্ভাশয়ের ভেতরে অমরা (placenta) হতে। প্রথমে অমরাতে একটি ছোট স্ফীত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্ফীত অঞ্চলটি ক্রমে ডিম্বকে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে ডিম্বকের টিস্যুকে মূলত দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়– চারপাশের আবরণ টিস্যু এবং মাঝের নিউসেলাস (nucellus) টিস্যু। পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের আবরণটির নিচে আর একটি আবরণ তৈরি হয়। বাইরের আবরণটি বহিঃত্বক এবং ভেতরেরটি অন্তঃত্বক হিসেবে পরিচিত। ডিম্বকের অগ্রভাগে নিউসেলাসের একটু অংশ অনাবৃত থাকে, কারণ ত্বক এ অংশকে আবৃত করে না। এটি একটি ছিদ্র বিশেষ, যাকে মাইক্রোপাইল (micropile) বা ডিম্বকরন্ধ্র বলা হয়। ডিম্বকরন্ধ্রের কাছাকাছি নিউসেলাস টিস্যুতে একটি কোষ আকারে বড় হয়। এর নিউক্লিয়াসটিও আকারে অপেক্ষাকৃত বড় থাকে এবং কোষটি ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এ কোষকে প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (primary archesporial cell) বলে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষটি বিভক্ত হয়ে একটি প্রেয়ালকোষ এবং একটি প্রাথমিক জননকোষ (primary sporogenous cell) সৃষ্টি করতে পারে অথবা সরাসরি স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ (megaspore mother cell) হিসেবে কাজ করে।

ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু (megaspore) তৈরি করে। চারটি স্ত্রীরেণুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনটি নষ্ট হয় এবং একটি (নিচেরটি) কার্যকর হয়।

ডিম্বকের গঠন : একটি ডিম্বক (megasporangium = ovule) নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত:

১। **ডিম্বকনাড়ী** (Funiculus) : ডিম্বকের বৃন্তের ন্যায় অংশকে ডিম্বকনাড়ী বলা হয়। এর সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত থেকে শিরার ন্যায় গঠন করে। এই যুক্ত অংশকে র‍্যাফি (raphe) বলে।

২। **ডিম্বকনাভী** (Hilum) : ডিম্বকের যে অংশের সাথে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভী বলে।

৩। **নিউসেলাস** (Nucellus) বা **ভ্রূণপোষক টিস্যু** : ত্বক দিয়ে ঘেরা প্রধান টিস্যুই হলো নিউসেলাস।

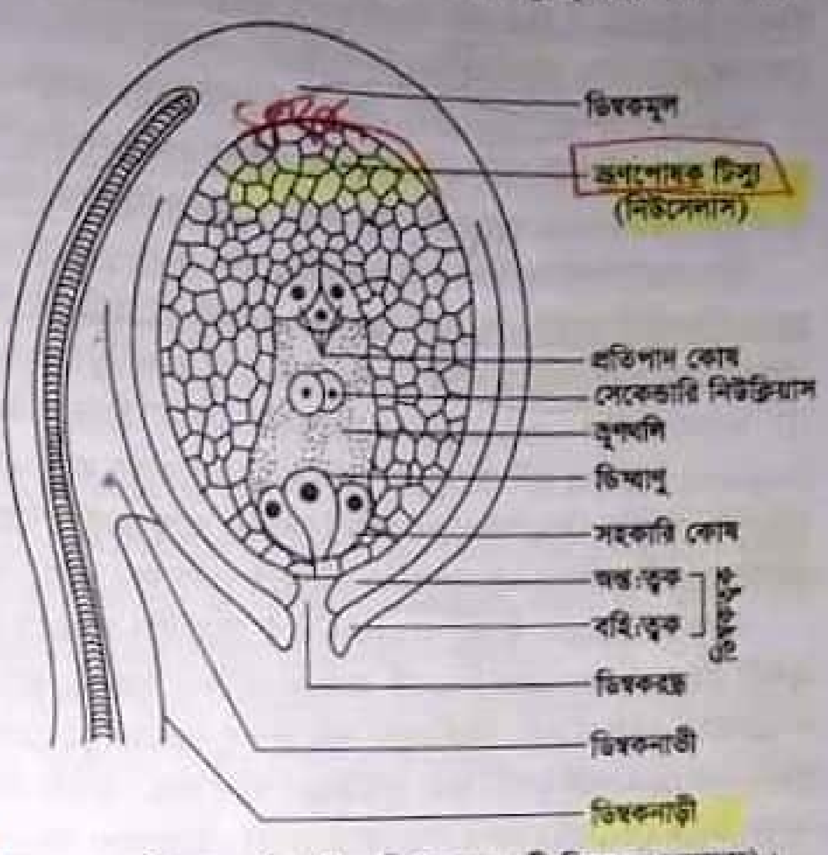

চিত্র ১০.৩ : ডিম্বকের গঠন (নিম্নমুখী বা অধোমুখী ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ)।

৪। **ডিম্বকত্বক** (Integument) : নিউসেলাসের বাইরের আবরণীকেই ডিম্বকত্বক বলা হয়। সাধারণত এটি দুস্তর বিশিষ্ট।

৫। **ডিম্বকরন্ধ্র** (Micropyle) : ডিম্বকের অগ্রপ্রান্তে ত্বকের ছিদ্র অংশই ডিম্বকরন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল।

৬। **ডিম্বকমূল** (Chalaza) : ডিম্বকের গোড়ার অংশ, যেখান থেকে ত্বকের সূচনা হয়, তাকে ডিম্বকমূল বলে।

৭। **ভ্রূণথলি** (Embryo sac) : নিউসেলাসের মধ্যে অবস্থিত থলির ন্যায় অংশকে ভ্রূণথলি বলে। এর ভেতরে প্রতিপাদ কোষ, ডিম্বাণু যন্ত্র ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস থাকে।

বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক : ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বাকনাড়ী, ডিম্বকমূল ইত্যাদি অংশের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বক নিম্নলিখিত প্রকার হয়ে থাকে।

১। **ঊর্ধ্বমুখী** (Orthotropous বা Atropous) : ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ উপরে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় খাড়াভাবে অবস্থিত থাকে। ডিম্বকরন্ধ্র শীর্ষে এবং ডিম্বকমূল গোড়ায় অবস্থান করে। উদাহরণ : বিষকাটালী (পানি মরিচ), গোলমরিচ, পান ইত্যাদি।

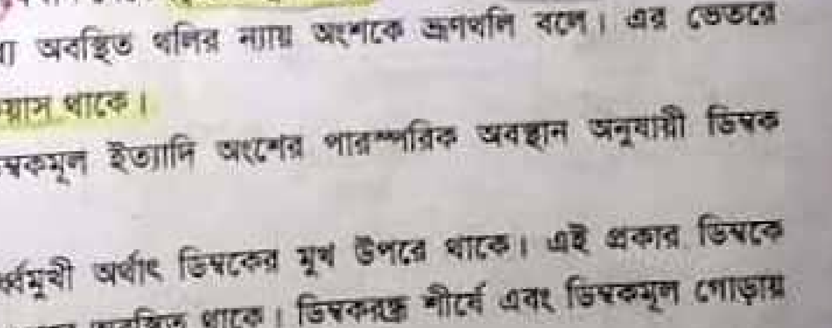

চিত্র ১০.৪ : বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন। (ক) ঊর্ধ্বমুখী; (খ) অধোমুখী; (গ) পার্শ্বমুখী; (ঘ) বক্রমুখী।

২। **অধোমুখী বা নিম্নমুখী** (Anatropous) : অধোমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ নিচে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে, এবং ডিম্বকমূল উপরে থাকে। উদাহরণ : শিম, রেড়ি, ... ইত্যাদি। ঊর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী একটি অপরটির বিপরীত।

৩। **পার্শ্বমুখী** (Amphitropous) : পার্শ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ উপরে বা নিচে নয়, এক পাশে থাকে। এই ধ…
ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল বিপরীতমুখী অবস্থানে দুই পাশে থাকে এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান ক…
উদাহরণ- ক্ষুদিপানা, পপি (আফিম) ইত্যাদি।

৪। **বক্রমুখী** (Campylotropous) : বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ পার্শ্বমুখীর চেয়ে কিছুটা বেঁকে নিচের দিকে …
করানো অবস্থায় থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকমূল ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থিত কিন্তু ডিম্বকত্বক অবশ্য…
বাঁকা হয়ে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি চলে আসে। উদাহরণ- সরিষা, কালকাসুন্দা

স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte) ও গঠন : স্ত্রীরেণু (mega…
হলো স্ত্রীগ্যামিটোফাইট-এর প্রথম কোষ। কার্যকরী স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠন ক…
স্ত্রীগ্যামিটোফাইট এমব্রিয়োস্যাক (embryo sac) বা ভ্রূণথলি নামেও পরিচিত। ভ্রূণথলির গঠন প্রধানত তিন প্রকার, য…
(i) মনোস্পোরিক (monosporic)–এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; (ii) বাইস্পো…
(bisporic)–এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং (iii) টেট্রাস্পোরিক (tetrasporic)–এক্ষেত্রে …
স্ত্রীরেণুই ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। শতকরা প্রায় ৭৫টি উদ্ভিদেই মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। …
এখানে ভ্রূণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াই বর্ণনা করা হলো। এটি *Polygonum* ধরন হিসেবেও পরিচিত।

এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ হতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু গঠিত হয় যার মধ্যে উপ…
তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং নিচেরটি কার্যকরী থাকে। কার্যকরী স্ত্রীরেণু নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দু…
নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস দুটি স্ত্রীরেণু কোষের দুই মেরুতে অবস্থান করে। প্রতিটি মেরুর নিউক্লিয়াস পর…
দুবার বিভাজিত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস অল্প সাইটোপ্লাজম এবং হালকা প্রাচীর দি…
আবৃত থাকে (কাজেই কোষও বলা যেতে পারে)। ইতোমধ্যে স্ত্রীরেণুকোষটি একটি দুইমেরু যুক্ত থলির ন্যায় অঙ্গে পরি…
হয় এবং এর প্রতি মেরুতে ৪টি করে মোট ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে। এ অবস্থায় প্রতি মেরু হতে একটি করে নিউক্লি…
থলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়, যাকে ফিউশন নিউক্লিয়াস বা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (fusi…
nucleus or secondary nucleus) বলা হয়।

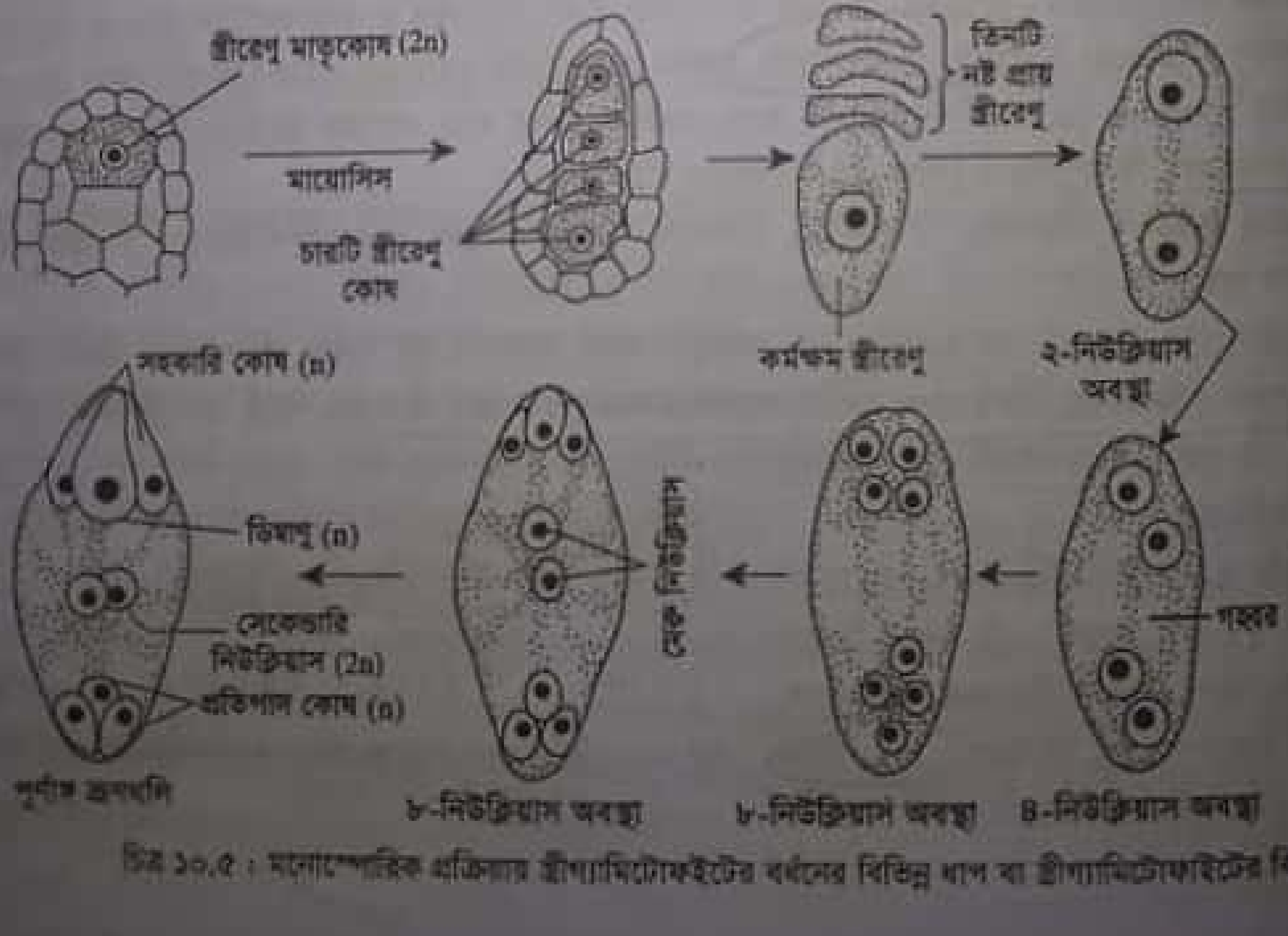

চিত্র ১০.৫ : মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বর্ধনের বিভিন্ন ধাপ বা স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ।

ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে থাকে সে মেরুর তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে এগ অ্যাপারেটাস (egg apparatus) বা ডিম্বাণু যন্ত্র বা গর্ভযন্ত্র বলে। ডিম্বাণু যন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি বড় থাকে, একে এগ, ওভাম বা উস্ফিয়ার (egg, ovum or oosphere) বলা হয়। বাংলায় একে আমরা ডিম্বাণু বলি। ডিম্বাণুর দু'পাশের দুটি নিউক্লিয়াসকে সিনারজিড (synergid) বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বা সাহায্যকারী কোষ বলা হয়। ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকমূলের দিকে থাকে সে মেরুর নিউক্লিয়াস তিনটিকে প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস বা প্রতিপাদ কোষ বলে।

ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস, প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে একত্রে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট বলা হয়। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

নিষেকক্রিয়া (Fertilization) : অপেক্ষাকৃত বড় ও নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের (ডিম্বাণুর) সাথে ছোট ও সচল পুংগ্যামিটের (শুক্রাণুর) যৌন মিলনকে **ফার্টিলাইজেশন** (fertilization) তথা **নিষেকক্রিয়া**, নিষেক বা গর্ভাধান বলে। পরাগধানী থেকে মুক্ত পরাগরেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে যখন একই প্রজাতির পুষ্পের গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন তাকে পরাগায়ন (Pollination) বলে। সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পরাগায়ন ঘটে থাকে।

নিষেকক্রিয়া প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করা যায়: (i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, (ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি, (iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ এবং (iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন।

(i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : প্রথমে পরাগরেণু স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। গর্ভমুণ্ডের বিশেষ প্রোটিন এবং পরাগরেণুর বিশেষ প্রোটিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। স্বপ্রজাতি শনাক্তকরণের পর পরাগরেণু গর্ভমুণ্ড থেকে তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বড় হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে পরাগরন্ধ্র পথে নলাকারে বের হয়ে আসে, একে পরাগনালিকা বলে। সাধারণত স্বপ্রজাতি ছাড়া পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় না।

চিত্র ১০.৬ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া।

(ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি : পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুণ্ড হতে গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বক পর্যন্ত পৌঁছায়। পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ, পেকটিনেজ ইত্যাদি এনজাইম গর্ভমুণ্ডের কোষ বিগলন করে অগ্রসরমান পরাগনালিকার জন্য পথ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে অবস্থিত জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে (যেমন-ধান, আম) পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে porogamy বলে। কিন্তু কিছু উদ্ভিদে (যেমন-*Casuarina*-ঝাউ) পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে chalazogamy বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক

ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে mesogamy বলে। সাধারণত একটি মাত্র নালিকাই ডিম্বকে প্রবেশ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে পোরোগ্যামি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

(iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ : পরাগনালিকা প্রথমে গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে ডিম্বকে অবস্থিত স্ত্রীরেণু হতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু ভ্রূণথলিতেই অবস্থান করে। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। মনে করা হয় কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ পরাগনালীর গতিপথ নির্ধারণ করে। ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এটি সাহায্যকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছে। পরে পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় পরাগনালিকার চাপে অন্তত একটি সাহায্যকারী কোষ ধ্বংস হয়ে যায়।

(iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে একটি এবং গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে একটি শুক্রাণুর মিলন : পরাগনালিকা থেকে ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ প্রকার মিলনকে সিনগ্যামি (syngamy) বলে। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনই হলো নিষেক। অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলে।

দ্বিনিষেকক্রিয়া বা দ্বিনিষেক (Double fertilization) : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেকক্রিয়া (double fertilization) বা দ্বিনিষেক প্রক্রিয়া বলে। দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (নগ্নবীজী উদ্ভিদের *Ephedra*-তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয় ১৯৯০ সালে –এটি ব্যতিক্রম)।

এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপর একটি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়; ফলে ডিম্বাণু জাইগোটে পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ট্রিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলা হয়। কারণ এতে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াস, এ তিনটি নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে।

নিষেকের পরিণতি (After effects of fertilization) : গর্ভাশয় থেকে ফল সৃষ্টি, ডিম্বক থেকে বীজ সৃষ্টি এবং জাইগোট হতে নতুন বংশধর সৃষ্টি হলো নিষেকের চূড়ান্ত পরিণতি। নিচে নিষেকের পরিণতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১। **ভ্রূণের পরিস্ফুটন** : নিষেকের ফলে অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণুর সাথে হ্যাপ্লয়েড (n) শুক্রাণুর যৌন মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড (n + n = 2n) কোষের সূচনা হয়, তাকে জাইগোট বা উস্পোর (zygote or oospore) বলে। নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। জাইগোট তার চারপাশে একটি প্রাচীর নিঃসৃত করে এবং কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রজাতি বিশেষে জাইগোটের সুপ্তিকাল ভিন্নতর হয়। সুপ্ত অবস্থা কেটে গেলে এতে মাইটোটিক বিভাজন শুরু হয়। প্রথম বিভাজন সাধারণত আড়াআড়ি (transversely) ভাবে হয়, ফলে একটি দ্বিকোষী আদিভ্রূণ (proembryo) গঠিত হয়। আদিভ্রূণটি ক্রম বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে পরিণত হয়।

২। **সস্যের উৎপত্তি** : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের (2n) সাথে একটি শুক্রাণুর (n) মিলনের ফলে যে ট্রিপ্লয়েড (3n) এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তা বার বার বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম টিস্যু গঠন করে। এ সময় প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে এসে সস্যটিস্যু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সস্যটিস্যু প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।

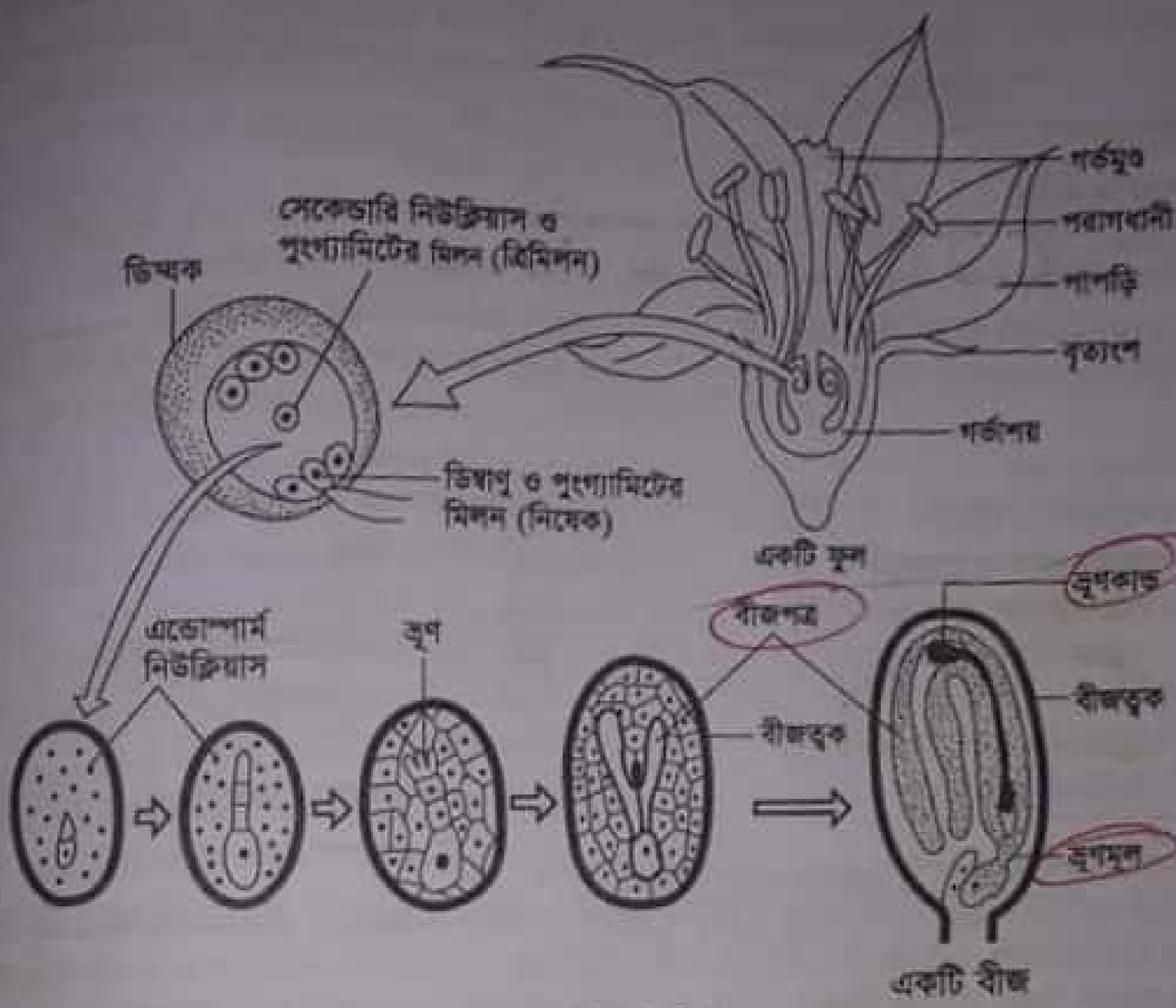

চিত্র ১০.৭ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

৩। **বীজ সৃষ্টি :** ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ডিম্বক (ovule) ক্রমান্বয়ে বীজে পরিণত হয়।

জাইগোটস্থ আদিভ্রূণ ক্রমবিভাজন ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি ভ্রূণ গঠন করে। ভ্রূণে থাকে বীজপত্র (cotyledon), ভ্রূণকাণ্ড (plumule) ও ভ্রূণমূল (radicle)। একই সাথে সস্য বা এন্ডোস্পার্মও (endosperm) গঠিত হয়। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণপোষক টিস্যু (nucellus) ভ্রূণকে পুষ্টি দান করে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পরিভ্রূণ (মাত্র একটি আবরণ) হিসেবে অবস্থান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এন্ডোস্পার্মও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, এরূপ বীজকে অসস্যল বীজ বলে।

নিষেকের পর ডিম্বকের অভ্যন্তরে এরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম্বকের ত্বক দুটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পানি হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয়, যাকে এরিল (aril) বলে। লিচু, কাঠলিচু ও আঁশফলে এরূপ এরিল দেখা যায়। শাপলা বীজেও এরিল আছে। লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।

অতএব নিষেকের পর ডিম্বকটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড়, শক্ত ও শুষ্ক হয়ে একটি বীজে পরিণত হয়। অঙ্কুরোদগমের পর বীজ হতে প্রজাতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করে।

৪। **ফল সৃষ্টি :** ফল হলো রূপান্তরিত গর্ভাশয় যা নিষেকের পর বিকশিত হয়। নিষেকের ফলে গর্ভাশয় উদ্দীপ্ত হয়ে ফলে পরিণত হয়। নিষেক শেষে পুষ্পের স্তবকগুলো নিস্তেজ হয়ে এক সময় ঝরে পড়ে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। ফলের আকার, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে রয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। ফল পরিপক্ব হয়ে মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথকও হয়ে যায়। ফল বীজকে পুষ্টি দান করে এবং বিস্তরণে ... আবৃতবীজী উদ্ভিদের ফল দেখে তার উৎস-উদ্ভিদকে নিশ্চিত করা যায়। ... শ্রেণিবিন্যাসে সাহায্য করে।

নিষেকের পর গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) এবং ডিম্বকের বিভিন্ন পরিবর্তন	
নিষেকের আগে	নিষেকের পরে বিকশিত হলে
১। গর্ভাশয়	১। ফল
২। গর্ভাশয় প্রাচীর	২। ফলত্বক
৩। ডিম্বক	৩। বীজ
৪। ডিম্বক বহিঃত্বক বা এক্সাইন	৪। টেস্টা (বীজ বহিঃত্বক)
৫। ডিম্বক অন্তঃত্বক বা ইন্টাইন	৫। টেগমেন (বীজ অন্তঃত্বক)
৬। নিউসেলাস বা ভ্রূণপোষক টিস্যু	৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিছুটা থাকলে তা পেরিস্পার্ম (পরিভ্রূণ) হয়
৭। ডিম্বাণু বা এগ	৭। ভ্রূণ (embryo)
৮। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	৮। এন্ডোস্পার্ম বা সস্য
৯। সহকারি কোষ বা সিনারজিড	৯। নষ্ট হয়ে যায়
১০। অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদকোষ	১০। নষ্ট হয়ে যায়
১১। মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র	১১। বীজের মাইক্রোপাইল (বীজরন্ধ্র)
১২। হাইলাম বা ডিম্বকনাভী	১২। হাইলাম (বীজনাভী)
১৩। ফিউনিকুলাস বা ডিম্বকনাড়ী	১৩। বীজের বোঁটা (বীজবৃন্ত)
১৪। ক্যালাজা বা ডিম্বকমূল	১৪। নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)

নিষেকক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

জীবজগতে নিষেকক্রিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিটের সাথে পুংগ্যামিটের মিলন ঘটে এবং গ্যামিট দুটির প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের সংযুক্তি ঘটে। কাজেই নিষেকক্রিয়ার ফলে দুটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে একটি ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট হতে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিষিক্ত ডিম্বাণুতে প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং বিপাকের হার বাড়াতেও নিষেকক্রিয়া সাহায্য করে। নিষেকের মাধ্যমে প্রজাতিতে জিন সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে যে প্রকরণ ঘটে তা বিবর্তনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিষেকের ফলে পুষ্পের গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বকগুলো বীজে পরিণত হয় এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যায় নিষেকক্রিয়ার ফলেই বীজ এবং ফলের সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশ রক্ষা করে। বীজের সৃষ্টি না হলে অধিকাংশ পুষ্পক উদ্ভিদই হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেতো। আবার উদ্ভিদের ফল এবং বীজের উপরই খাদ্যের জন্য প্রাণিকুল, বিশেষ করে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কাজেই নিষেকক্রিয়া যত না গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদকুলের জন্য, তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ জাতির জন্য। আমরা আম, কাঁঠাল, লিচু, বেল, পেঁপে, ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা ইত্যাদি যা খেয়ে থাকি তা সবই নিষেকক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি। আবার নিষেকক্রিয়া না ঘটলে উদ্ভিদসমূহ হ্যাপ্লয়েড অবস্থা হতে পুনরায় ডিপ্লয়েড অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। ফলে প্রজাতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যেত। তাই নিষেকক্রিয়ার তাৎপর্য অপরিসীম।

যৌন প্রজননের সুফল

১। যৌন প্রজননের ফলে রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে জেনেটিক ডাইভার্সিটি তৈরি হয়।

২। জেনেটিক ডাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।

৩। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।

৪। আমাদের খাদ্য দানা, তৈলবীজ ইত্যাদি এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

২। অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) : পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন প্রজনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

(a) অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে : নিম্নশ্রেণির বেশকিছু উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের রেণু বা স্পোর (spore) তৈরি হয়। এসব স্পোর অঙ্কুরিত হলে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব স্পোরে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

...দেশের তারতম্যে অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন প্রকার স্পোর গঠন করে। এদের মধ্যে পেনিসিলিয়ামের ...কনিডিয়া (conidia) বা কনিডিওস্পোর (conidiospore), ...স্পোরানজিওস্পোর (sporangiospore) বা গনিডিয়া (gonidia), অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর (basidiospore) ...উল্লেখযোগ্য।

...শৈবালের মধ্যে ক্ল্যামাইডোমোনাস চলরেণু বা ...(zoospore) এবং স্থিররেণু (resting spore) বা ...(akinete) এবং অন্যান্য বহু শৈবালের স্থূল প্রকারাবদ্ধ ...স্পোর (aplanospore) ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের ... স্পোর। এছাড়া ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটাভুক্ত ...রেণুথলিতে (sporangium) উৎপন্ন রেণুগুলো অযৌন ...বংশবিস্তারে সহায়ক। ফার্ন (fern) ও লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*)-এর স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homosporous), কিন্তু সেলাজিনেলা (*Selaginella*), শুষনি শাক (*Marsilea*) ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস (heterosporous)।

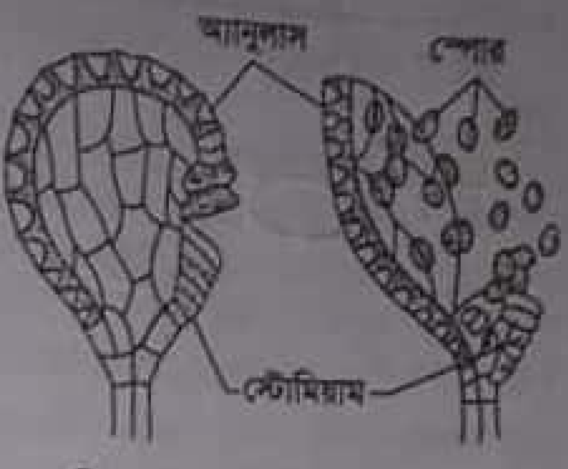

চিত্র ১০.৮ : ফার্নের স্পোরাঞ্জিয়াম (বাঁয়ে) ও এর বিদারণ (ডানে)

(b) দেহ অঙ্গের মাধ্যমে : আবৃতবীজী উদ্ভিদে দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন হয়ে থাকে। এরূপ জননকে অঙ্গজ প্রজনন (vegetative reproduction) বলা হয়। অন্যভাবে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ নতুন জীব সৃষ্টি করলে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্গজ প্রজনন হয়ে থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়েও অঙ্গজ প্রজনন করা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ প্রজনন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

(ক) উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন : নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন ঘটতে পারে।

(i) মূল দ্বারা (By roots) : মিষ্টি আলু, ডালিয়া, শতমূলী, কাঁকরোল, পটল প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল থেকেই নতুন গাছের ...হয়। জমিতে এদের মূল লাগানো হয়।

(ii) কাণ্ড দ্বারা (By stem) : আলু, আদা, পিঁয়াজ, সটি, ওলকচু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। ...পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ এগুলোর সাকার-এর (বিশেষ কাণ্ড) সাহায্যে প্রজনন হয়।

চিত্র ১০.৯ : কয়েকটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন অঙ্গ।

(iii) পাতার মাধ্যমে (By leaf) : পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলেই একটি পাতা থেকে বহু নতুন গাছের জন্ম হয়। এগুলোই হলো স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন-এর উদাহরণ।

(iv) বুলবিল বা কক্ষমুকুল : কোনো কোনো উদ্ভিদে পরিবর্তিত কক্ষমুকুল তথা বুলবিল দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। যেমন- চুপরিআলু।

(v) অর্ধ বায়বীয় কাণ্ড দ্বারা : কচু জাতীয় উদ্ভিদে অর্ধ বায়বীয় কাণ্ড (রানার বা লতি হিসেবে পরিচিত) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। আমরুল শাকের স্টোলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

(vi) মুকুলোদগম (Budding) : ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাকের মাতৃকোষ থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। মুকুলগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

(vii) পর্ণকাণ্ড দ্বারা : ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড থেকে নতুন গাছ হয়।

(খ) উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন : উদ্ভিদের কোনো দৈহিক অঙ্গ যেমন-মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির সাহায্যে বংশবিস্তার করার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন বলে। কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফুল ও ফলের গুণগতমান বজায় রেখে এ ধরনের জনন ঘটানো হয়। যে পদ্ধতিতে এটি সম্ভব তাকে কলম করা বলে। কলম নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়ে থাকে।

(i) শাখা কলম বা কাটিং (Cutting) : জবা, আখ, গোলাপ, পাতাবাহার, সজিনা, আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি গাছের পরিণত কাণ্ডের অংশবিশেষ কেটে সিক্ত বা ভিজে মাটিতে পুঁতলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

চিত্র ১০.১০ : কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন : (কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি)।

(ii) দাবা কলম (Layering) : লেবু, জুঁই প্রভৃতি গাছের মাটি সংলগ্ন লম্বা শাখাকে বাঁকিয়ে মাটিতে চাপা দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাটির মধ্যে অবস্থিত শাখাটির পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। মাটিতে চাপা পড়া অংশের বাকল (ছাল) কেটে দিলে সেখানে দ্রুত মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি কেটে অন্য জায়গায় লাগালে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়।

(iii) জোড়কলম (Grafting) : বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের উন্নতজাত বজায় রাখার জন্য জোড়কলম তৈরি করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদের কোনো শাখা টবে লাগানো অন্য একটি উদ্ভিদের সাথে জুড়ে দিতে হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সাইয়ন (scion) বলে এবং সাইয়নকে যে উদ্ভিদের সাথে জোড়া দেয়া হয় তাকে স্টক (stock) বলে। স্টক যে কোনো বন্য নিম্নমানের উদ্ভিদ হতে পারে। মাটির রস শোষণ করে উপরে পাঠানোই স্টকের কাজ। অন্যদিকে সাইয়ন সাধারণত উন্নত জাতের উদ্ভিদের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ফল ও ফুলের চরিত্র নির্ভর করে সাইয়নের উপর, স্টকের উপর নয়।

(iv) গুটিকলম (Gootee) : শক্ত কাণ্ডযুক্ত যে কোনো ফল গাছ, যেমন- লেবু, আম প্রভৃতি বা গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত অংশের বাকল (ছাল) ছাড়িয়ে সেখানে গোবর মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। নিয়মিত সেখানে পানি দিতে থাকলে ঐ অংশে কিছুদিন পর অস্থানিক মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি বিচ্ছিন্ন করে ভিজে মাটিতে অন্যত্র রোপণ করলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

(v) চোখকলম বা কুঁড়ি সংযোজন (Budding) : এ পদ্ধতিতে একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাঙ্ক্ষিত মুকুল সংযুক্ত করা হয়। যে গাছের কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হবে তার সুবিধা মতো শাখায় ছুরি (নাইফ) দিয়ে T-আকারে খানিকটা তুলে নিয়ে সেই স্থানে কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি মুকুল (অনুরূপ আকারে) নিয়ে বায়ুরোধী করে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েক দিন

কলম মুকুলটি মাতৃ গাছের সাথে সংযুক্ত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। যেমন- কুল (বরই), পেয়ারা গাছে এ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

সার্থক কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের জন্য চাই অভিজ্ঞতা, চাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কিছু রাসায়নিক পদার্থ (মূল তৈরির হরমোন), মোম ইত্যাদি।

৩। পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) বা অপুংজনি : উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে সাধারণত ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন তথা নিষেকের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণ সৃষ্টি করে থাকে। যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বীজে পরিণত হয় তাকে পারথেনোজেনেসিস বা অপুংজনি বলে। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি (parthenocarpy) বলে। উদাহরণ- লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি।

পারথেনোজেনেসিস প্রধানত দু'প্রকার। যথা: (i) হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস এবং (ii) ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস।

(i) হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস (Haploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি হলেও তা নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণের সৃষ্টি করে তখন তাকে হ্যাপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদও হ্যাপ্লয়েড হয় এবং অনুর্বর হয়। *Solanum nigrum, Orchis maculata* উদ্ভিদে অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

(ii) ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস (Diploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ার বদলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু (2n) সৃষ্টি হয় এবং পরে ভ্রূণে পরিণত হয় তাকে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস বলে। *Parthenium argentatum* ও *Taraxacum albidum* উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পারথেনোজেনেসিস হতে দেখা যায়।

Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (androgenesis) বলে।

কৃত্রিম পারথেনোজেনেসিস : বাহ্যিক আবেশের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বহু উদ্ভিদে পারথেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব। পুংগ্যামিট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ উৎপন্ন করা হয়। এক্স-রে প্রয়োগে, ইমাস্কুলেশনের পর পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেলভিটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে পারথেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব।

পারথেনোজেনেসিস-এর গুরুত্ব : উদ্ভিদের প্রজননে পারথেনোজেনেসিস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব উদ্ভিদে পারথেনোজেনেসিস হতে দেখা যায় (যেমন- *Solanum nigrum, Parthenium argentatum*) তাদের স্বাভাবিক প্রজনন যৌন প্রকার।

- কোন উদ্ভিদে অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন না ঘটে কেবল পারথেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম হলে ঐ উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বা বিলুপ্তির হাত থেকে প্রজাতিটি রক্ষা পায়।
- এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না।
- এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সুবিধাজনক মিউট্যান্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
- এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ ব্রিডিং গবেষণায় কাজে লাগানো যায়।

অ্যাপোস্পোরি (Apospory) : ডিম্বকের (ovule) যে কোনো দেহকোষ থেকে (যেমন- ডিম্বক ত্বক, নিউসেলাস) ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলি (embryo sac) সৃষ্টি হতে পারে। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুটি পরে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপোস্পোরি। অ্যাপোস্পোরি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড হয় এবং মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে এরূপ হতে দেখা যায়।

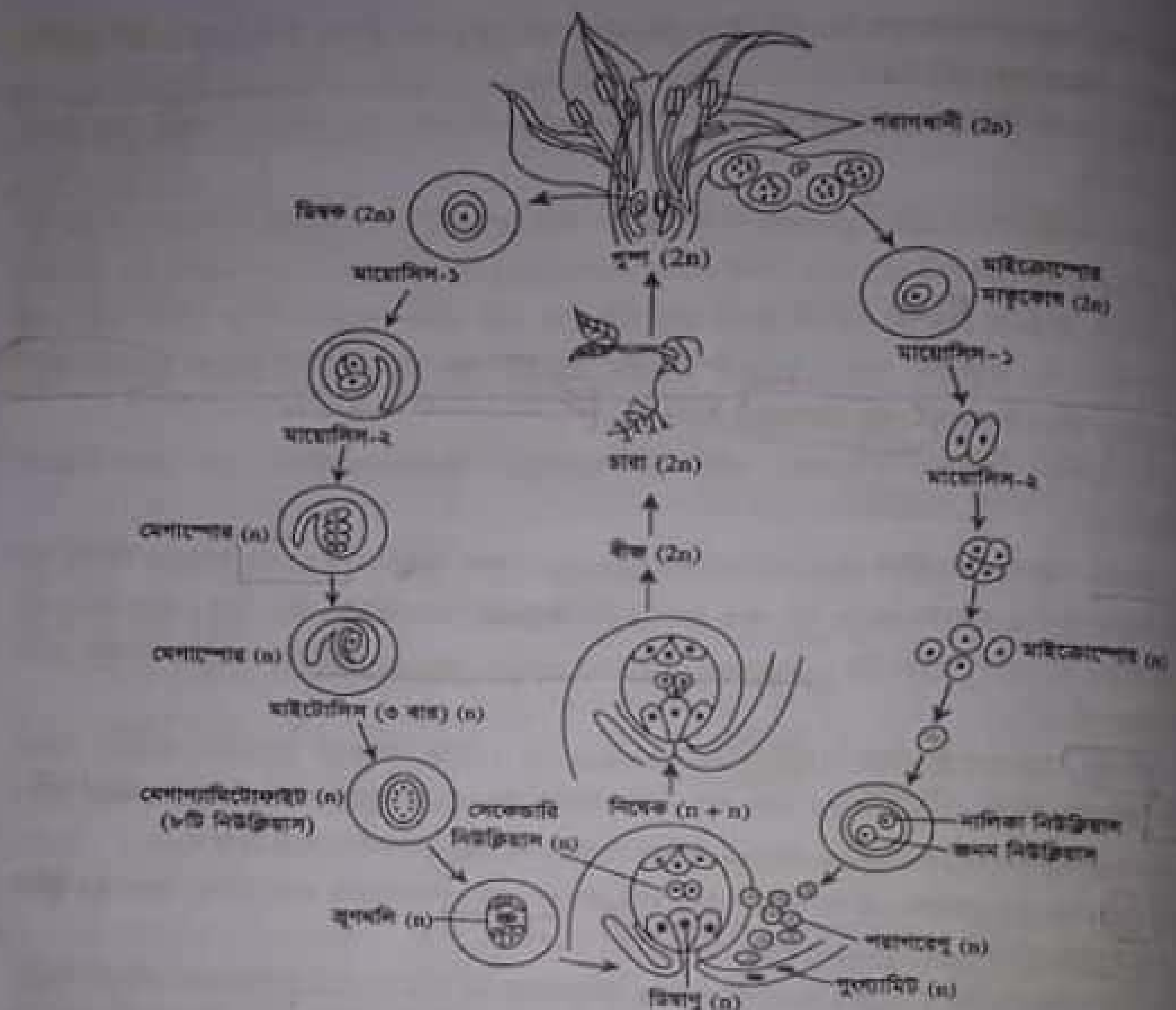

চিত্র ১০.১১ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবন চক্রে জনুক্রম।

ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের যে কোনো কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই (অ্যাপোস্পোরিতে ভ্রূণথলি গঠিত হয়) ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (adventitive embryony)।

অ্যাপোগ্যামি (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যে কোনো কোষ (যেমন- সহকারি কোষ, প্রতিপাদ কোষ ইত্যাদি) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। এক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। *Allium*-এ এরূপ লক্ষ করা যায়।

পারথেনোজেনেসিস, অ্যাপোস্পোরি, অ্যাপোগ্যামি এবং অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি এর প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই নিষেক ছাড়া ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া ভ্রূণ তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যাগামোস্পার্মি (agamospermy)। অ্যাগামোস্পার্মি অণুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যকীয় হলে তাকে বলা হয় সিউডোগ্যামি (Pseudogamy)। শাঁস তৈরির জন্যই পরাগায়নের প্রয়োজন হয়, ভ্রূণ তৈরির জন্য নয়।

অযৌন জনন	যৌন জনন
১। গ্যামিট সৃষ্টি হয় না এবং গ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	১। গ্যামিট সৃষ্টি হয় এবং দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের মিলন ঘটে।
২। মায়োসিস কোষবিভাজনের প্রয়োজন হয় না।	২। মায়োসিস কোষবিভাজনের প্রয়োজন হয়।
৩। সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না।	৩। সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪। সৃষ্ট উদ্ভিদ কম অভিযোজনক্ষম হয়।	৪। সৃষ্ট উদ্ভিদ অধিক অভিযোজনক্ষম হয়।
৫। সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।	৫। নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Reproduction of Plants)

বর্তমানে প্রচলিত ফসল হতে আরো উন্নত বৈশিষ্ট্যের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে ব্রিডিং (breeding) বলা হয়। নির্বাচন (selection), সংকরায়ন (hybridization), মিউটেশন (mutation) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের উন্নত নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়। দুটি বিসদৃশ নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন কোনো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে **উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে **সংকর** (hybrid) উদ্ভিদ বলা হয়। উন্নত-নতুন ফসল সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে **হাইব্রিডাইজেশন** (hybridization) তথা সংকরায়ন অন্যতম। প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবেও কিছু কিছু হাইব্রিডাইজেশন ঘটে থাকে, তবে সাধারণত কৃত্রিম উপায়েই হাইব্রিডাইজেশন ঘটানো হয়। **সংকরায়ন হলো উদ্ভিদ প্রজননের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়।**

ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস (cross) করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (artificial hybridization)। সাধারণত উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি করা হয়।

কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (সংকরায়ন) প্রক্রিয়া বা কৌশল : কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১। **প্যারেন্ট নির্বাচন :** কাদের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন করতে হবে তা নির্বাচন করাই হলো প্যারেন্ট নির্বাচন।

২। **প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন :** প্যারেন্ট স্বপরাগী না হলে এদেরকে কৃত্রিম স্বপরাগায়নের মাধ্যমে হোমোজাইগাস (homozygous) করা হয়।

৩। **প্যারেন্ট উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন :** যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হবে তা যদি উভলিঙ্গ (এবং স্বপরাগী হয় অথবা প্রয়োজনে স্বপরাগী হতে পারে) হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। **পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর মেরে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় ইমাস্কুলেশন।** এতে করে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না।

৪। **ব্যাগিং :** পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে ক্রসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদের পুষ্পিত অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়।

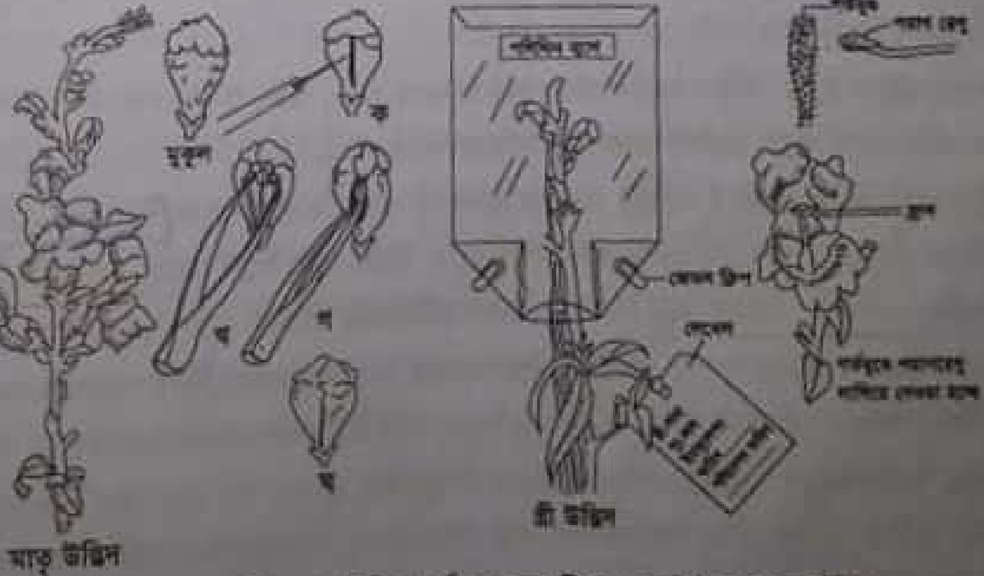

চিত্র ১০.১২ : ক্রসিং-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক-ঘ ইমাস্কুলেশন) বা সংকরায়ন।

৫। ক্রসিং : ব্যাগিং করা পুং উদ্ভিদ হতে পুংরেণু সংগ্রহ করে ব্যাগিং করা স্ত্রী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেটেড পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে ফেলা হয়।

৬। লেবেলিং : ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং-এর তারিখ, মাতৃ ও পিতৃ উদ্ভিদ পরিচিতি সম্বলিত একটি লেবেল উদ্ভিদে লাগিয়ে দেয়া হয়।

৭। বীজ সংগ্রহ : কৃত্রিম পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট ফলটি পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

৮। বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব : পরবর্তী বছর কৃত্রিম ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলো বপন করা হয় এবং F_1-গণ সৃষ্টি হয়। F_1-বংশধরগুলো হলো নির্বাচিত প্যারেন্টের হাইব্রিড। পরে F_2 .....F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি করে নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়।

৯। F_1 বংশধরের ব্যবহার ও নতুন প্রকরণ সৃষ্টি : F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো F_2 বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে এক নতুন প্রকরণ এর জন্ম হয়।

প্রকৃতপক্ষে ৩ হতে ৬ নম্বর ধারাকে মিলিতভাবে কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল বলা হয়।

সংকরায়ন পদ্ধতির সতর্কতা (Precaution)

১। প্যারেন্ট নির্বাচন করার সময় তাদের পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হয়।

২। ইমাস্কুলেশন ও পরাগায়নের সময় হাত, সূঁচ, চিমটা, তুলি প্রভৃতি স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়।

৩। লক্ষ্য রাখতে হবে, ইমাস্কুলেশনের সময় যেন একটি পুংকেশরও থেকে না যায় এবং গর্ভকেশরের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৪। ব্যাগিং ঠিকমতো করতে হবে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে হবে।

৫। সংকর বীজ সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে কলা-কৌশল গ্রহণ সঠিকভাবে নিতে হবে।

বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি : বিবর্তনের আধুনিক ধারণা মতে মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় যার মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন (বৈচিত্র্যের) সৃষ্টি হয়।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত তৈরি : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধক্ষম জাত তৈরি করা যায়। এ জাত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি : শস্যের সর্বোচ্চ ফলনের প্রধান সমস্যা হলো রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমের বিভিন্ন ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (বিআর-১০), গাজী (বিআর-১৪) মোহিনী (বিআর-১৫)। এগুলো রোগ প্রতিরোধী জাত।

গুণগত মান উন্নয়ন : খাদ্য শস্যর ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দীর্ঘ সংরক্ষণ সময় ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে উদ্ভিদের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায়।

আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ : বন্যার কারণে অনেক নিম্নভূমির আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার খরা, শৈত্যপ্রবাহে অনেক ফসল নষ্ট হয়। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে ফসলের আবাদকাল ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এতে বন্যার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে অসংখ্য উন্নত ফলনশীল জাত। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই আবার রোগ ও খরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফসল বেড়ে চলেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(১) উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, (২) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৩) প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৪) উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড উদ্ভাবন, (৫) দৃষ্টিনন্দন অর্কিড উদ্ভাবন, (৬) দৃষ্টিনন্দন গোলাপ উদ্ভাবন, (৭) নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন (৮) বীজহীন ফলের জাত উদ্ভাবন, (৯) অধিক ফলনশীল শাক-সবজির জাত উদ্ভাবন এবং (১০) প্রাণির কৃত্রিম প্রজননে বহু উন্নত জাত উদ্ভাবন। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

□ **উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত সৃষ্টি :** ১৯৬০ এর দশকে ফিলিপিনসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (IRRI-International Rice Research Institute) বিজ্ঞানিগণ ইরি ধান উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান ইরি-২০, ইরি-৮, ইরি-৫, ইরি-২৮, ইরি-২৯ ইত্যাদি। একরপ্রতি এদের ফলন বেড়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে (BRRI-Bangladesh Rice Research Institute) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ধান চান্দিনা, বিরিশাইল, ইরিশাইল ইত্যাদির ফলনও অনেক বেশি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি উফশী জাতের নাম হলো- চান্দিনা (বিআর-১), মালা (বিআর-২), শাহী বালাম (বিআর-১৫) এবং শ্রাবনী (বিআর-২৬)। গত ৪০ বছরে এশিয়ায় ধানের উৎপাদন কমপক্ষে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিক ফলনশীল ইরি বা বিরি ধান উদ্ভাবনের আগে পৃথিবীর এ অঞ্চলে, বিশেষ করে আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে বছর বছর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, অথচ তখন লোকসংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম এবং ধান চাষের জমিও ছিল অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ হলো তখন ধানের ফলন একরপ্রতি খুবই কম ছিল, ফলে কোনো বছর আগাম বন্যা বা খরা দেখা দিলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। তখনকার সময়ে চাষকৃত জাতগুলোর একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন ছিল ৩০-৩৫ মণ। বর্তমানে চাষকৃত উচ্চফলনশীল জাতের একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন হয় ৭০-৯০ মণ।

ইরি-৮, ইরি-৫, ইরিশাইল এগুলো উচ্চফলনশীল ধানের জাত। ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান ও তাইওয়ানের ডি. জি. উজেন ধানের মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে ইরি-৮। এর একরপ্রতি ফলন ৯০-১০০ মণ। ইরি-৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটা ধান ও টোংকোই ধান এর সংকর করে। ইরি-৫ এর ফলন একরপ্রতি ৭০-৭৫ মণ। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ইরিশাইল উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান, ভারতের টি. কে. এম-৬ ধান এবং তাইওয়ানের টাইচু-১ এর মধ্যে সংকর করে। এর একরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ মণ। এমনিভাবে বিআর-২০ এবং বিআর-৩ এর মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিরিশাইল। বিআর-২৮ এবং ২৯ আরও উন্নত জাত।

□ **উচ্চ ফলনশীল গমের জাত তৈরি :** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষকৃত গমও কৃত্রিম প্রজননের ফসল। আগে গমের ফলন ছিল খুবই কম। তাছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। ফসল রক্ষার জন্য তখন লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ প্রয়োগ করতে হতো। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বর্তমান গমের ফলনও বেশি। আবার রোগ প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় ওষুধ প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। এর ফলে খরচ কম হয়, অথচ ফসল বেশি পাওয়া যায়।

অনেক আগে যে গমের চাষ হতো তার ফলন ছিল খুবই কম, তাছাড়া এর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও ছিল কম। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে উন্নতজাতের গম, যা বর্তমানে চাষ করা হয় বিশ্বব্যাপী। মেক্সিকোর (CIMMIT) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ১৭ জাতের উফশী গম উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের মধ্যে বলাকা, কাঞ্চন, আনন্দ, আকবর, বরকত ও সওগাত বেশ জনপ্রিয় জাত। উচ্চফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman Earnest Borlaug ১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

☐ **উন্নত জাতের ভুট্টা উৎপাদন :** আমেরিকার বিজ্ঞানী G. H. Shull ১৯০৮ সালে ভুট্টার সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টির মাধ্যমে ভুট্টার দানা উৎপাদনে দারুণভাবে সফল হন। এরপর ভুট্টার দ্বি-সংকর পদ্ধতিতে এর উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে।

☐ **উন্নত জাতের ফুল ও অর্কিড উৎপাদন :** বর্তমান সময়ে চাষকৃত অধিকাংশ ফুলই সংকরায়নের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বছর বহু অর্কিড সৃষ্টি করা হচ্ছে সংকরায়নের মাধ্যমে। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে যে জাত তৈরি হচ্ছে তার ফলে ফুল চাষে বিপ্লব ঘটেছে। যেমন- গোলাপের হাইব্রিড-টি, ফ্লোরিবান্ডা, মেরিগোল্ড, গ্লাডিওলাস, রজনীগন্ধা ইত্যাদি প্রায় সব জাতই হাইব্রিড।

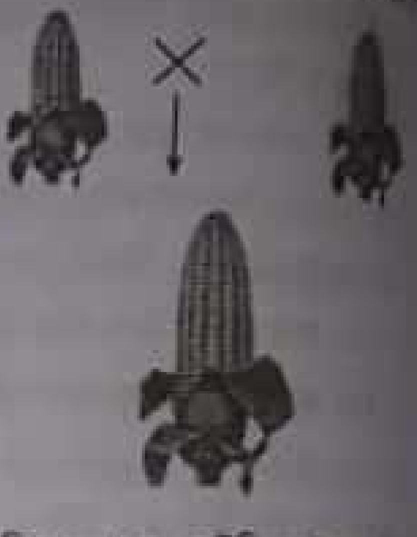

চিত্র ১০.১৩ : হাইব্রিড ভুট্টার সৃষ্টি

☐ **হাইব্রিড ফল ও সবজি উৎপাদন :** কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে আম, তরমুজ, আপেল, বরই ইত্যাদি ফল এবং মিষ্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, ঝিঙা, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। বীজহীন ফল ও সবজি কৃত্রিম প্রজননের সুফল।

☐ **রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন :** বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবাদি ফসলের ফলনহানি হয়ে থাকে। বুনো প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সংকরায়নের মাধ্যমে এ বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে কৃত্রিমভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন করা সম্ভব। গাজী (BR-14), মুক্তা (BR-11), মোহিনী (BR-15) হলো ধানের রোগ প্রতিরোধী জাত।

এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে কয়েক লক্ষ জাত বা প্রকরণ। ফলে সমৃদ্ধি ঘটেছে মানবসভ্যতার।

সার-সংক্ষেপ

প্রজনন : জীব থেকে নতুন শিশু জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়াই প্রজনন। প্রজনন জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মাতৃউদ্ভিদ থেকে নতুন শিশু উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো উদ্ভিদ প্রজনন। উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন করতে পারে। উপায়গুলো হলো অঙ্গজ জনন, যৌন জনন, পারথেনোকার্পিক জনন। মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন উপবৃদ্ধি থেকে যে জনন হয় তা হলো অঙ্গজ জনন। ফুল সৃষ্টির মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তা হলো যৌন প্রজনন। ফুল থেকে বীজ হয়, তাই বীজ দ্বারা যে প্রজনন হয় তা যৌন প্রজনন।

নিষেক : নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের সাথে সচল পুংগ্যামিটের মিলনকে নিষেক বা নিষেকক্রিয়া বলা হয়। নিষেক ক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো পরাগায়ন। পরাগায়নের মাধ্যমে একই উদ্ভিদের অথবা একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের পরাগধানী হতে পরাগরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার পর পরাগরেণু পরাগনালিকা সৃষ্টির মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। পরাগনালিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভদণ্ড পার হয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। শুক্রাণু ভ্রূণথলিস্থ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। একই সময়ে অপর একটি শুক্রাণু ভ্রূণথলিতে অবস্থিত সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে দ্বিনিষেক সম্পন্ন করে। নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বাণু পরিপূর্ণ হয়ে বীজে পরিণত হয়।

সংকরায়ন : কোনো ভালো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছের পরাগরেণু একই প্রজাতির ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছের গর্ভমুণ্ডে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংকরায়ন (hybridization)। অন্যভাবে বলা যায়, সংকরায়ন হলো এমন প্রজনন পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন উন্নত ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করা হয়। ধানের ইরি বা বিভিন্ন বিভিন্ন উন্নত ফলনশীল প্রকরণ এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

BIOTECHNOLOGY

প্রধান শব্দসমূহ :
টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাসমিড, ইনসুলিন, জিনোম সিকোয়েন্সিং

নতুন শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণিতে জীবপ্রযুক্তি, টিস্যুকালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাস্তবক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমরা সংক্ষিপ্তভাবে জেনেছ। এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. জিন ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. জীব প্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. জীব প্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগমুখী শাখা। বায়োটেকনোলজি (জীবপ্রযুক্তি) শব্দটি আজ থেকে বহু পূর্বে ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky)। Biology এবং Technology শব্দ দু'টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology নামক বিশেষ অর্থবোধক শব্দটি।

বর্তমান বিশ্বউন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। বলা হয়ে থাকে এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যতটা উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তিতে ততটা উন্নত। কিন্তু সব প্রযুক্তিই জীবপ্রযুক্তি নয়। মাটি দিয়ে ইট তৈরিও একটি প্রযুক্তি, মাটির গভীর থেকে তেল, গ্যাস উঠানোও প্রযুক্তিনির্ভর, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে মুহূর্তেই যোগাযোগ স্থাপন, মোবাইল ফোনের নানাবিধ ব্যবহার ইত্যাদি সবই প্রযুক্তিনির্ভর। কিন্তু এগুলো জীবপ্রযুক্তি নয়।

উত্তম ব্যাকটেরিয়া প্রকরণ নির্বাচন করে উত্তম গুণমানের দই তৈরি করা একটি সহজ জীবপ্রযুক্তি। অ্যালকোহল তৈরিও এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। এগুলো প্রাচীনতম জীবপ্রযুক্তি। ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে পচনশীল জৈববস্তু থেকে বায়োগ্যাস তৈরি এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। গবেষণাগারে ছোট একখণ্ড ভাজক টিস্যু থেকে হাজার হাজার চারা তৈরি করার প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি। ১৯৭০ দশকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি তথা জিন-প্রকৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর জীবপ্রযুক্তি বিরাট নতুনমাত্রা লাভ করেছে।

জীবপ্রযুক্তির পরিধি (Scope of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

(i) ব্লু বায়োটেকনোলজি (Blue Biotechnology) : এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির জলীয় ও সামুদ্রিক প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(ii) গ্রিন বায়োটেকনোলজি (Green Biotechnolog): এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(iii) রেড ও হোয়াইট বায়োটেকনোলজি (Red & White Biotechnolog): এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

Scanned by CamScanner

জীবপ্রযুক্তি কী?

কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে, জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি।

জীবপ্রযুক্তির অবদান/গুরুত্ব (Importance of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির বহু পদ্ধতি ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে। নিচে কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

১। **জিন প্রযুক্তিতে :** (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষের) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) বিভিন্ন প্রকার জিনগত ব্যাধি শনাক্তকরণ ও রোগ নিরাময়। (iii) বিভিন্ন জীবাণু প্রয়োগে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার। (iv) বিভিন্ন টিউমার কোষকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ।

২। **এনজাইম প্রযুক্তিতে :** (i) উন্নতমানের এনজাইম উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার। (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত পেপটাইড, নির্দিষ্ট ওষুধ, সঞ্চয়ী প্রোটিন প্রভৃতি জৈবযৌগের উৎপাদন।

৩। **কৃষিক্ষেত্রে :** (i) উদ্ভিদকোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কালচার। (ii) সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন। (iii) রোগ-পতঙ্গ-বালাইনাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ জাত উৎপাদন। (iv) বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী সুস্থ ও সবল গবাদিপশু উদ্ভাবন। (v) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

৪। **চিকিৎসা শাস্ত্রে :** (i) বিভিন্ন জটিল রোগের প্রতিষেধক এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন। (ii) ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরনসহ নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন। (iii) মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। (iv) মস্তিষ্কে, হৃদপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে ব্যাকফার্মের মাধ্যমে হরমোন, অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরি করা হচ্ছে।

৫। **শিল্পক্ষেত্রে :** (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদন বাড়ানো। (ii) জৈবশক্তি উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন।

৬। **পরিবেশ রক্ষায় :** (i) কলকারখানায় নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজীবের ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও পরিবেশ নির্মল করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) জিন ব্যাংকে স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

স্টার্টার কালচার →

উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant tissue culture)

উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন-শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা বা পাপড়ি ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত (sterile) অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ (এবং পূর্ণাঙ্গ চারাউদ্ভিদ সৃষ্টি) করাকে টিস্যু কালচার বলে। অর্থাৎ গবেষণাগারে কোনো টিস্যুকে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করাই হলো টিস্যু কালচার। বহু পূর্ব থেকেই এ ধরনের ধারণা অনেকে পোষণ করতেন। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী Morgan (1901) সর্বপ্রথম মত প্রকাশ করেন যে প্রতিটি সজীব উদ্ভিদ কোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাকে তিনি টটিপোটেন্সি (Totipotency) বলে অভিহিত করেন। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় এজন্য একে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলা হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন প্রজন্ম বা ক্লোন তৈরি করা হয় বলে একে ক্লোনিং প্রযুক্তিও বলা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে পৃথকীকৃত অংশকে এক্সপ্ল্যান্ট বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে অণুচারা (Plantlet) বলা হয়। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt (1902-)-কে টিস্যু কালচারের জনক বলা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম টিস্যু

Scanned by CamScanner

কালচার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিকে **In-vitro** কালচারও বলা হয়। কারণ এ প্রক্রিয়াটি কাচপাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ১৯৩০ এর দশকে ফরাসি বিজ্ঞানী Gautheret (১৯৩৯), আমেরিকান বিজ্ঞানী White (১৯৩৯) এবং অন্য একজন ফরাসি বিজ্ঞানী Nobercourt (১৯৩৯) পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের টিস্যু নির্দিষ্ট পুষ্টি মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভাবে আবাদ করতে সক্ষম হন।

টিস্যু কালচার, জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন শাখা হলেও ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত উদ্ভিদ প্রকরণ উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই বিশেষ অবদান রাখতে শুরু করেছে।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ : টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে; যেমন- কক্ষমুকুল কালচার (axillary bud culture), মেরিস্টেম কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, ক্যালাস কালচার-এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন (somatic embryogenesis), পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার ইত্যাদি।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ : নিম্নলিখিত ধাপে টিস্যু কালচার পদ্ধতির বর্ণনা করা যায় :

১। মাতৃউদ্ভিদ বা এক্সপ্লান্ট নির্বাচন : এক্সপ্লান্ট হলো ঐ উদ্ভিদাংশ, টিস্যু কালচারে ব্যবহারের জন্য যাকে কোনো উদ্ভিদ থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। কাজেই এক্সপ্লান্ট নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত কাণ্ডের শীর্ষমুকুল, পার্শ্বমুকুল এক্সপ্লান্ট হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। পর্ব বা পাতার শীর্ষও ব্যবহৃত হয়। যে উদ্ভিদ থেকে এক্সপ্লান্ট নেয়া হয় বা হবে সেটি হলো মাতৃউদ্ভিদ। মাতৃউদ্ভিদটি অবশ্যই নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। টিস্যু কালচারের জন্য সুস্থ, নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত টিস্যুকে **এক্সপ্লান্ট** (explant) বলে।

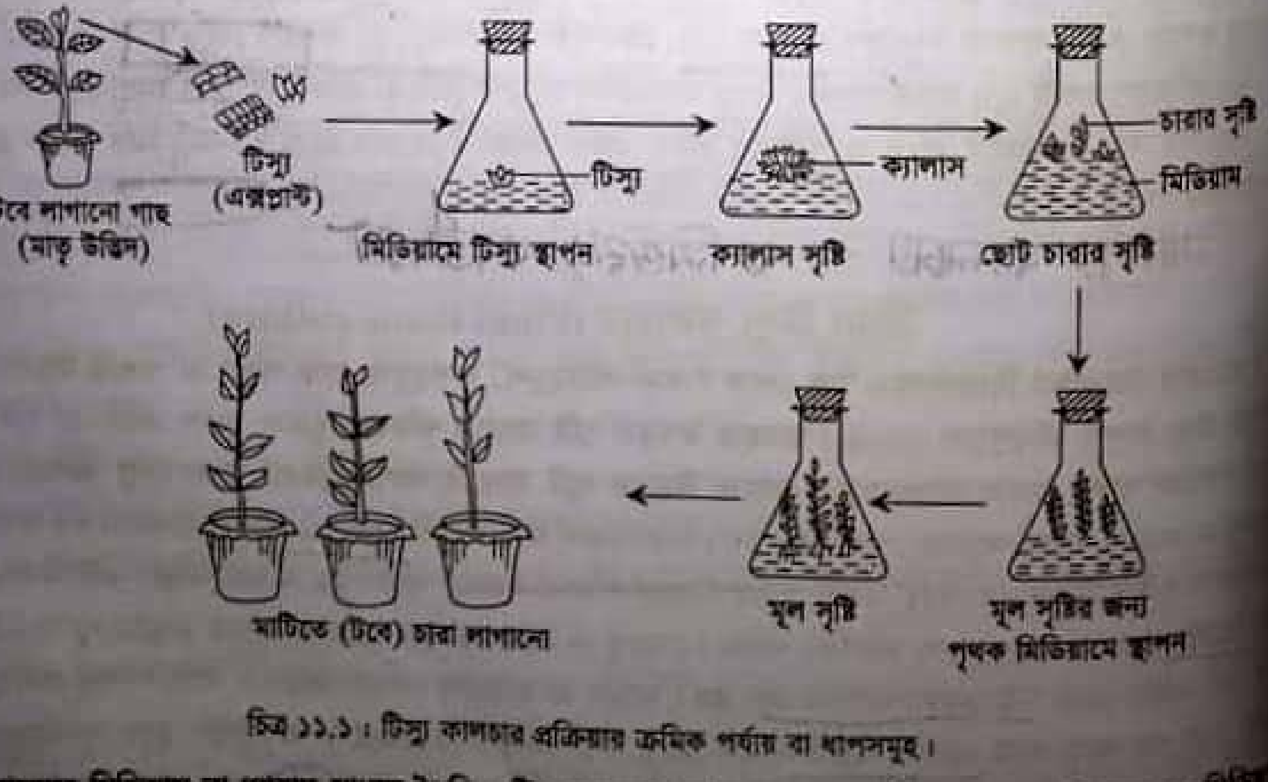

চিত্র ১১.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায় বা ধাপসমূহ।

২। কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি : টিস্যু কালচার কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি কালচার মিডিয়াম তৈরি করা আবশ্যক। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়ে এ মিডিয়াম

Scanned by CamScanner

প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মুখ্য ও গৌণ উপাদান (macro and micro elements), ভিটামিন, সুক্রোজ (২-৪%), ফাইটোহরমোন প্রভৃতি এ মিডিয়ামে থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমকে ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন- অ্যাগার সঠিক মাত্রায় মেশাতে হয়। মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ আবাদ মাধ্যমকে ব্যাসাল মিডিয়াম বলে। মিডিয়ামের pH ৫.৫-৫.৮ এর মধ্যে রাখা হয়।

৩। **জীবাণুমুক্তকরণ বা নির্বীজকরণ :** কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান, ফলে এতে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্লান্ট সবই জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই মিডিয়ামকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্ট টিউবে ঢেলে নির্বীজকৃত তুলা দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে বায়ু ঢুকতে না পারে। এরপর পাত্রটিকে নির্বীজকরণ যন্ত্র (autoclave) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। মিডিয়ামকে অটোক্লেভ যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপ (১২১° সে.), চাপ (১৫ পাউন্ড) ও সময় (২০ মিনিট) রাখা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট থেকে অণুচারা তৈরির পদ্ধতিই হলো **ইন-ভিট্রো কালচার**।

চিত্র ১১.১.১ : একটি টিস্যু কালচার ও বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার (আংশিক)

৪। **মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট বা টিস্যু স্থাপন :** এক্সপ্লান্টকে নির্বীজ করে (সাথে হাত, চিমটা ইত্যাদিকে অ্যালকোহল দিয়ে নির্বীজ করতে হয়) সম্পূর্ণ নির্বীজ অবস্থায় কাচপাত্রে রাখা মিডিয়ামে স্থাপন করা হয়।

৫। **ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি :** মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট তথা টিস্যু স্থাপনের পর পাত্রটিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো (৩,০০০-৫,০০০ লাক্স), তাপমাত্রা (১৭°-২০° সে.) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৭০-৭৫%) নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়। কয়েকদিন পর টিস্যুটি বার বার বিভাজিত হয়ে একটি কোষীয় মণ্ডে পরিণত হয়। মণ্ড হলো অবয়বহীন অবিনাস্ত টিস্যুগুচ্ছ। এক্সপ্লান্ট মিডিয়ামে স্থাপন করার পর আলো ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখলে যে অবয়বহীন অবিনাস্ত টিস্যুগুচ্ছ সৃষ্টি হয় তাই ক্যালাস। ক্যালাস থেকে এক সময় অসংখ্য মুকুল সৃষ্টি হয়।

৬। **মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন :** মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুল, মূল সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছে পরিণত হয়।

Scanned by CamScanner

৭। চারা টবে স্থানান্তর : উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল সৃষ্টি হলে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে ...র প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে টবে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন ...রা হয়।

৮। প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর : টবসহ চারাগাছকে কিছুটা আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়, তবে রোপিত ...চারাগাছগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগাছগুলো সজীব ও সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে অনেক ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যভেদে টিস্যু কালচার বিভিন্ন রকম হয়। কী ধরনের উদ্ভিদ থেকে কোন প্রকৃতি ও আকারের টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কালচারের উদ্দেশ্যের উপর। উপরে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

কাজ : টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ ক্রমধারায় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার (Application of tissue culture technology)

টিস্যু কালচার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রজননবিদরা অনেক সাফল্যও অর্জন করেছেন। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ১১.২ : টিস্যু কালচারের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ

১। হুবহু মাতৃ-গুণাগুণসম্পন্ন চারা উৎপাদন : যে সব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না (যেমন- খুজা, সাগর কলা) সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারাগাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

ফুল, ফল বা শস্য উৎপাদনকারী কোনো ভালো জাতের উদ্ভিদ থেকে যদি অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভালোজাতের একটি উদ্ভিদ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার করে অনেক সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদিত চারাগাছসমূহ হুবহু এদের মাতৃ-উদ্ভিদের মতো হয়ে থাকে। কাজেই একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ উৎপাদন করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর প্রক্রিয়া। তাই এ পদ্ধতি মাইক্রোপ্রোপাগেশন নামেও পরিচিত।

Scanned by CamScanner

২। **বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণে :** বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উদ্ভিবিত উদ্ভিদ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারেই সম্ভব।

৩। **ভ্রূণ কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হলো ভ্রূণকালচার। ভ্রূণকালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতি সংকরের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ না করায় সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর ভ্রূণকালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হয় না এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে। এভাবে উৎপাদিত সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

৪। **সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাস্ট মিলন বা ফিউশন :** এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্তি ও তা থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ সংকরায়নের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলনের সময় পুংগ্যামিটে সাইটোপ্লাজম খুবই কম থাকে এবং তা স্ত্রীগ্যামিটের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে সোমাটিক হাইব্রিড তৈরি হলে সেখানে দুটি প্রজাতির সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। এভাবে যখন দুটি কোষের মিলনে নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে না শুধু সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে তখন তাকে সাইব্রিড (cybrid) বলে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের মাধ্যমেই সাইটোপ্লাজমের বিশেষ গুণ স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানান্তর ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আলু ও টমেটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন করে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদের নাম দেয়া হয়েছে পোমাটো।

৫। **মেরিস্টেম কালচার :** মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোনো রোগ-জীবাণু থাকে না।

৬। **অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটিমাত্র উদ্ভিদ থেকে অল্প সময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট্ট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৭। **হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন :** পরাগরেণু এবং পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হলে তা থেকে সহজেই ইপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

৮। **কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ :** কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ কৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন দৈহিক ভ্রূণ থেকে বীজ উৎপন্ন করা যায়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উন্নতজাত যেমন- Adhl নামক গম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। যে কোনো আবাদী কোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে বলে সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন। এর মাধ্যমে উন্নত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হয়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আবাদী গ্যামিট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে বলে গ্যামিটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।

৯। **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি :** প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদে সংযোজন করা সম্ভব হয় না। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষে

Scanned by CamScanner

প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ কোষ বা ভ্রূণ হতে পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। আগাছানাশকরোধী, পতঙ্গরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ যেমন- আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, স্বর্ণধান (golden rice) ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রয়োগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচারের কাজের সূত্রপাত হয় এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগেই টিস্যু কালচার কাজ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ কাজ প্রসার লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে টিস্যু কালচার গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

(১) বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন।

(২) কলার চারা উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।

(৩) চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৪) কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, বক ফুল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৫) বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় ফসল ও বাদামের টিস্যু কালচার।

(৬) পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।

(৭) টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোল আলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারেও টিস্যু কালচার বিষয়ক উন্নতমানের গবেষণা চলছে। উন্নতমানের বেলের চারা উৎপাদন এদের একটি সাফল্যজনক কাজ। শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ। আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁঠালের চারা উৎপাদনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে। তন্মধ্যে রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবীজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, লালপাতা ও নানাধরনের অর্কিডের চারা উৎপাদন। ইপিল-ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদি কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে দেশি ও বিদেশি নানা প্রকার অর্কিডের চারা উৎপাদন, মুগ কলাই ও মাষ কলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বর্তমানে বহু প্রাইভেট সংস্থা (NGO) তথা ব্র্যাক কর্তৃক *Stevia*, প্রশিকার বিদেশি অর্কিড ও গোল আলুর চারা উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রসার এবং সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ : নিচে টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো-

সুবিধাসমূহ

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু চারা সৃষ্টি করা যায়।

২। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া যায়।

৪। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুত করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫। ক্লোনে অক্ষম উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

Scanned by CamScanner

৬। অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন।

৭। উদ্ভিদের যে কোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন।

৮। অতি সস্তায় বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন।

৯। বিদেশী জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশী আবহাওয়া উপযোগী জাত সৃষ্টি করা।

১০। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারা প্রাপ্তি ও স্বল্প খরচে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

১১। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ পুনঃউৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অসুবিধাসমূহ

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন-ল্যামিনার ফ্লো, অটোক্লেভ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো মূল্যবান হলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

২। কোনো কারণে যদি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় প্রাথমিক অবস্থায় আবাদকৃত টিস্যু জীবাণু দ্বারা (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক) আক্রান্ত হয় তবে বহুসংখ্যক সম্ভাবনাময় চারা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। সঠিকভাবে টিস্যু কালচার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজ করার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয়।

৪। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো বেশ ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় এদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে।

৫। উৎপন্ন চারাগুলো মাতৃ-উদ্ভিদের গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জীববিজ্ঞানের একটি নবীনতম ও প্রয়োগমুখী শাখা। এর মূল লক্ষ্য কোনো কাঙ্ক্ষিত 'জিন' স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নতমানের নতুন জীবপ্রকরণ সৃষ্টি করা। কোনো জীবকোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্যকোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GEO (Genetically Engineered Organism) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic organism)। মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করিয়ে এখন ঐসমস্ত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনসুলিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সায়েন্স ফিকশন লেখক Jack Williamson তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Dragon's Island-এ সর্বপ্রথম Genetic engineering শব্দটি ব্যবহার করেন।

একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে নিয়ে অন্য কোষের DNA এর সাথে সংযুক্ত করার ফলে যে নতুন (মিশ্রিত) DNA উৎপন্ন হয় তাকে **Recombinant DNA** বলে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য যে পদ্ধতি বা টেকনোলজি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (recombinant DNA technology)। এ সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

Scanned by CamScanner

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জিন প্রকৌশলের যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত বংশগতীয় পরিবর্তন আনা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট জিনসহ DNA অণুর অংশকে কোষের বাইরে এনে ... করে ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে গঠিত নতুন জিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়। একে জিন ক্লোনিং বলা হয়। এভাবে ক্লোন করা জিনটি চাহিদা অনুসারে ব্যবহার করা হয়, যেমন- (i) প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং (ii) অন্য কাঙ্ক্ষিত জীবে বিশেষ করে উদ্ভিদ বা প্রাণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উৎপাদন করা। পরবর্তীতে ঐ জীবে নতুন জিনের বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এর শুরু, কিন্তু ইতোমধ্যে মানব সমাজ এর থেকে লাভবান হতে শুরু করেছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ও ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন প্রক্রিয়া অণুজীবের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উক্ত অণুজীবসমূহের মধ্যে *E. coli*, *Agrobacterium tumefaciens* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ছোট বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, একে বলা হয় প্লাসমিড (plasmid)। প্লাসমিড-এর মাধ্যমে নতুন জিন-এর সন্নিবেশন এবং সন্নিবেশিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

প্লাসমিড (Plasmid) : ক্রোমোসোম বহির্ভূত বৃত্তাকার DNA অণুকে প্লাসমিড বলা হয় (Lederberg, 1952)। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান। অধুনা কিছুসংখ্যক প্রকৃত কোষেও প্লাসমিডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেমন- ইস্ট। প্লাসমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে অনুলিপন (replicate) করতে পারে। মূল ক্রোমোসোমের বাইরে অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্রাকার DNA (ক্রোমোসোম) হিসেবে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াতে প্লাসমিড অবস্থিত। এদের সংখ্যা কোষপ্রতি ১-১০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

প্লাসমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। প্লাসমিড বৃত্তাকার (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু।
২। এর আণবিক ভর হয় 10^6 – 200×10^6 dalton.
৩। প্লাসমিড অল্পসংখ্যক জিন বহন করে থাকে।
৪। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাসমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।
৫। এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হয়।

চিত্র ১১.৮ : *Agrobacterium tumefaciens*-এর প্লাসমিড DNA।

৬। কোনো কোনো প্লাসমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন- colicin, vibriocin ইত্যাদি।

প্লাসমিডের প্রকারভেদ: প্লাসমিড প্রধানত তিন প্রকার, যথা-

(i) **F এবং F′-প্লাসমিড :** এসব প্লাসমিড একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করার জন্য দায়ী (Fertility)। F′-প্লাসমিড ব্যাকটেরিয়া দেহে Pili তৈরি করে, যা যৌনজননে সাহায্য করে।

(ii) **R-প্লাসমিড :** এসব প্লাসমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন জিন থাকে। R_1-প্লাসমিড ৫টি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধে ক্ষমতাসম্পন্ন।

(iii) **কোল প্লাসমিড :** যে সব প্লাসমিডে কোলিসিন (Colicin) উৎপাদনকারী জিন থাকে তাদেরকে কোল প্লাসমিড বলে। কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E. coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কোল প্লাসমিডের মতো আরেক ধরনের প্লাসমিড আছে যাতে ভিব্রিওসিন (Vibriocin) উৎপাদনকারী জিন থাকে। ভিব্রিওসিন সংবেদনশীল *Cholerae* কোষকে ধ্বংস করে দেয়।

Scanned by CamScanner

প্লাসমিডের ব্যবহার : আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাসমিড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে প্লাসমিড অত্যন্ত উপযোগী বাহক (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাসমিড DNA ব্যবহার করে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে; যেমন, মানুষের ইনসুলিন জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (টারগেট DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডটি প্রতিস্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্লাসমিড DNA কে ব্যবহার করা হয়।

(গ) বাহকের DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খণ্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) সংযুক্ত করার জন্য DNA লাইগেজ এনজাইম দ্বারা জোড়া লাগানো।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA-এর অনুলিপনের জন্য একটি পোষক (host) নির্বাচন (যেমন- *E. coli*)।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, রিকম্বিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করানো।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে কাঙ্ক্ষিত জিনকে *Agrobacterium* দ্বারা স্থানান্তর করানো।

রিকম্বিনেন্ট DNA-এর ধাপসমূহের বর্ণনা :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন ও পৃথকীকরণ : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হলো কাঙ্ক্ষিত DNA অণু নির্বাচন। নির্বাচনের পর কাঙ্ক্ষিত জীবের কোষ থেকে DNA-কে পৃথক করতে হবে। প্রথমে কোষকে লাইসিস (lysis) করা হয় এবং কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড প্রভৃতি অণু হতে DNA অণুকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। এই DNA-এর সাথে কিছু পরিমাণ RNA ও প্রোটিন মিশ্রিত থাকে। পরবর্তীতে সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুকরোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে উক্ত মিশ্রণকে নির্দিষ্ট ব্যান্ড আকারে পৃথক করা হয় এবং কাঙ্ক্ষিত DNA ব্যান্ডকে পৃথকভাবে আহরণ করে নেয়া হয়। বর্তমানে সিলিকা নির্ভর কিট ব্যবহার করে এই কাজটি অনেক সহজে করা যায়।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme) : যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স-এর একটি অংশ কেটে নেয়া যায় ঐ এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে। এদেরকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজেস (endonucleases)ও বলা হয়। এরা DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স, যাকে রেস্ট্রিকশন সাইট (restriction site বা recognition site) বলা হয়, তা কেটে দিতে সক্ষম। এ ধরনের এনজাইম প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাকটেরিয়া কোষে বিদ্যমান থাকে। এদের কাজ হলো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাল DNA কেটে দেয়া। স্বাভাবিকভাবে এরা ভাইরাল DNA কেটে থাকে, তবে যে কোনো উৎস থেকে পাওয়া যে কোনো DNA সূত্রের নিউক্লিয়োটাইডের ঐ একই সিকোয়েন্স (রেস্ট্রিকশন সাইট) সমান দক্ষতার সাথে কাটতে সক্ষম। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ কমপক্ষে একটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন করে থাকে। শত শত প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষে শত শত ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন হয়। এরা DNA সূত্র কাটার জন্য নিজস্ব সিকুয়েন্স শনাক্ত করতে পারে এবং ঐ রেস্ট্রিকশন সাইট কেটে দিতে পারে।

(খ) বাহক নির্বাচন : কাঙ্ক্ষিত DNA-এর প্রয়োজনীয় অংশ বহন করার জন্য একটি বাহক (vector) নির্বাচন করতে হয়। ব্যাকটেরিয়াতে অবস্থিত প্লাজমিড-DNA-কে কাঙ্ক্ষিত DNA বহন করার জন্য বাহক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই বাহক প্লাসমিড DNA-কে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন (modify) করে নেয়া হয়। যেমন- (i) কাঙ্ক্ষিত DNA থেকে রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন তৈরি করতে চাইলে বাহকের ভেতর কাঙ্ক্ষিত DNA-র 5′-প্রান্তে প্রোমোটার ও 3′-প্রান্তে টারমিনেটর

Scanned by CamScanner

সিকোয়েন্স যোগ করতে হয়। (ii) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে উদ্ভিদ কোষে প্রতিস্থাপন করতে হলে কাঙ্ক্ষিত DNA *Agrobacterium tumefaciens*-এর Ti-প্লাসমিডের T-DNA-র ভেতরে প্রোমোটার ও টারমিনেটরসহ স্থাপন করতে হয়। (iii) সাধারণভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হলে সাধারণ প্লাসমিডে স্থাপন করতে হয়।

(গ) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) **ছেদন :** সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত DNA-এর নির্দিষ্ট অংশকে খণ্ড করা হয়। একই এনজাইম প্রয়োগ করে বাহক DNA তেও (যেমন-*A. tumefaciens*-এর Ti প্লাসমিড DNA) ছেদন করে নেয়া হয় (চিত্র : ১১.৪, ১১.৫)।

[কাঙ্ক্ষিত DNA-ই এ সংক্রান্ত DNA খণ্ড বহন করে। বিভিন্ন জীবের জন্যই লাইব্রেরি আছে, যেমন- *E. coli* লাইব্রেরি, মানব জিনোম লাইব্রেরি ইত্যাদি। এখন আবার কমপ্লিমেন্টারি DNA (cDNA) লাইব্রেরিও আছে। cDNA হলো mRNA-এর কমপ্লিমেন্টারি কপি। যে সব জিন বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম সে সব জিন cDNA লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। একজন গবেষক cDNA লাইব্রেরি থেকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড পেতে পারেন। DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব (কাঙ্ক্ষিত DNA সিকোয়েন্সের সম্পূরক একক খণ্ডক রেডিওঅ্যাকটিভ DNA খণ্ড) ব্যবহার করে (কারণ এই প্রোব কাঙ্ক্ষিত DNA-এর সাথে হাইব্রিডাইজ করবে) লাইব্রেরি থেকে ক্লোন শনাক্ত করে PCR-এর মাধ্যমে সেই কাঙ্ক্ষিত সিকোয়েন্স খণ্ড বের করে আনা যাবে। বর্তমানে জিন মেশিনের (automated chemical Synthesis apparatus) সাহায্যে সহজেই DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব ও PCR-এ ব্যবহৃত প্রাইমার তৈরি করা যায়।]

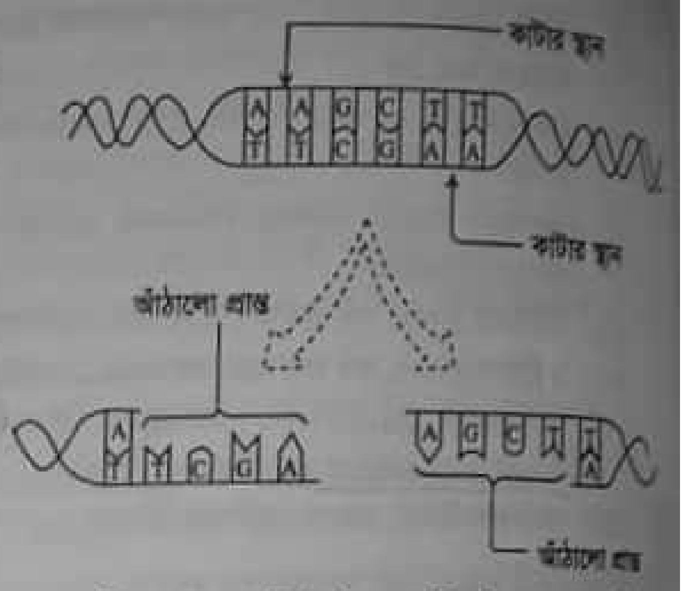

চিত্র ১১.৪ : রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে DNA কর্তন।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে; যেমন- Eco RI (*Escherichia coli* Ry 13), Hind III (*Haemophilus influenzae* Rd), Bam HI (*Bacillus amyloliquefaciens* H) প্রভৃতি। রেস্ট্রিকশন এনজাইমসমূহ DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান পদ্ধতির (specific base sequences) অংশে কেটে দেয় এবং একই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা প্লাসমিডের ঐ একই বেস সিকোয়েন্সবিশিষ্ট অংশকে কাটা যায়। সাধারণত এরা ৪–৬ জোড়া বেস অংশ কেটে থাকে। রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে DNA অণু কর্তনের সূক্ষ্ম ছুরি (molecular scissors-আণবিক কাঁচি বা বায়োলজিক্যাল নাইফ) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও এদের রেস্ট্রিকশন স্থান নিচে দেখানো হলো :

এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান	এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান
Bam HI	G ⌊GATCC CCTAG⌉ G	Hpa II	C⌊CGG GGC⌉C
Hind III	A ⌊AGCTT TTCGA⌉ A	Mbo I	⌊GATC CTAG⌉
Eco RI	G⌊AATTC CTTAA⌉ G		

⌊ ⌉ দিয়ে DNA অণুর কাটার স্থান দেখানো হয়েছে।

(ঘ) ছেদনকৃত কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে বাহক প্লাসমিড DNA-তে স্থাপন : প্লাসমিড DNA হতে বের করে নেয়া অংশের ফাঁকা স্থানে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। DNA-ligase এনজাইম ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্লাসমিড DNA-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। ফলে প্লাসমিড DNA-টি কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড বহন করে। কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড প্লাসমিড DNA-তে সংযুক্ত হবার ফলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হলো।

Scanned by CamScanner

(ঙ) পোষক (host) নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড DNA পোষকদেহে প্রবেশ করানো : রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পরে কোনো পোষক ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া অন্য প্লাসমিড গ্রহণ করে না। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ করে heat shock-এর মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করলে প্লাসমিড গ্রহণ করতে পারে। প্লাসমিড গ্রহণ করলে ঐ ব্যাকটেরিয়ামকে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়াম (transformed bacterium) বলে। পরবর্তীতে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডটিও সংখ্যাবৃদ্ধি করে বলে একে ক্লোনিংও বলা হয়। DNA অনুপ্রবেশের অন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো electroporation।

চিত্র ১১.৫ : রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি।

(চ) রিকম্বিনেন্ট DNA-এর মূল্যায়ন : সাধারণত রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার কাজটি সফলভাবে হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ঐ ব্যাকটেরিয়াম (পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকৃত) অ্যাগার মিডিয়ামে জন্মিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে পোষক ব্যাকটেরিয়া recombinant plasmid বহন করছে কিনা তা শনাক্ত করার জন্য অ্যাগার মিডিয়ামে নির্দিষ্ট antibiotic ব্যবহার করতে হয় কারণ বাহক প্লাসমিডে ঐ antibiotic এর resistance gene রয়েছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA কাঙ্ক্ষিত জিন বহন করছে কিনা তা শনাক্তকরণ : এটি করা হয় (i) PCR পদ্ধতিতে, (ii) Restriction digestion-এর মাধ্যমে এবং (iii) জেনেটিক প্রোব-এর মাধ্যমে। জেনেটিক প্রোব (genetic probe) device মেটাল ডিটেক্টর-এর তুলনীয় একটি উপায়। জেনেটিক প্রোব হলো রেডিও অ্যাকটিভলি চিহ্নিত টার্গেট জিনের (কাঙ্ক্ষিত জিনের) পরিপূরক এক স্ট্র্যান্ডবিশিষ্ট DNA বা mRNA।

(ছ) রিকম্বিনেন্টকে DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করে থাকলে ঐ DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করতে হয়।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো : কাঙ্ক্ষিত জিন সমৃদ্ধ কোনো কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে হলে কাঙ্ক্ষিত জিনকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে *Agrobacterium tumefaciens*-এর মাধ্যমে বা অন্য পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে হবে এবং পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় ঐ কোষ থেকে নতুন ও কাঙ্ক্ষিত জিনসহ নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। এরূপ উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ (transgenic plant) বলে। এখানেই টিস্যু কালচারের সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক।

Implanta পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। *Arabidopsis* উদ্ভিদের পুষ্পমঞ্জরীকে *Agrobacterium* সাসপেনসনে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রেখেও সহজে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় টিস্যু কালচারের দরকার পড়ে না।

জিন ক্লোনিং (Gene cloning)

একই জিনোটাইপ বিশিষ্ট একাধিক জীব বা জীবাংশকে ক্লোন বলা হয়। একটি জবা গাছ থেকে ১০টি ডাল কেটে চারা করলে এরা হবে হুবহু একই জিনোটাইপ সম্পন্ন এবং এরা হলো ক্লোন। ক্লোন মাতৃউদ্ভিদের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। সাধারণত কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ থেকে এই ক্লোনিং করা হয়। মনে করি একটি চা গাছের চা উত্তম মানের হয়, কাজেই ঐ গাছটি হলো কাঙ্ক্ষিত গাছ। ঐ গাছ থেকে ক্লোন করে বাগান বৃদ্ধি করলে পুরো বাগান থেকেই উন্নতমানের চা পাওয়া যাবে। বর্তমানে চা বাগানে ক্লোনাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

জিন ক্লোনিং হলো কোনো জীবের DNA পৃথক করে তা থেকে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কাঙ্ক্ষিত জিন চিহ্নিত করে জিনকে হুবহু কপি করা। সহজ কথায় কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যাবৃদ্ধি করাই হলো জিন ক্লোনিং।

Scanned by CamScanner

একটি ক্রোমোসোমের DNA-তে অসংখ্য জিন থাকতে পারে। এর সবগুলোই কাঙ্ক্ষিত জিন নয়। কেননা, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রথমে কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন খোঁজা হয় এবং ঐ প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন খুঁজে বের করা হয়। সাধারণত বিজ্ঞানিগণ জীবের DNA-এর ক্যাটালগের জিন লাইব্রেরি তৈরি করেন এবং ঐ জিন লাইব্রেরি থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করেন।

গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা উন্নতমানের প্রোটিন তৈরির জন্যই হোক রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির একটি উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ জিনের বহু কপি তৈরি করা। একটি জিনের বহু সংখ্যক হুবহু কপি তৈরি করাই হলো জিন ক্লোনিং।

জিন ক্লোনিং-এর জন্য জিন-এর উৎস : তিনটি উৎস থেকে তা পাওয়া যায়–

i. বিনা ক্রাইটেরিয়ায় (random) তৈরি ক্রোমোসোমের খণ্ড যা ভেক্টর-এ অন্তর্ভুক্ত করা। এগুলো জিন-লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

ii. সুনির্দিষ্ট mRNA থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে করা কমপ্লিমেন্টারি DNA।

iii. গবেষণাগারে অর্গানিক কেমিস্টগণ কর্তৃক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত DNA খণ্ড।

PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) : ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis কোষ বহির্ভূতভাবে DNA ক্লোনিং এর দ্রুততম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা PCR বলা হয়। একটি টেস্ট টিউবে একটি জিনের বহু কপি করা যায় PCR এর মাধ্যমে। প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA-কে ৯০° সে. তাপমাত্রায় একক সূত্রক করা হয়। DNA রেপ্লিকেশনের জন্য ৫-প্রান্তে একটি প্রাইমার যুক্ত করা হয়। একটি আদর্শ প্রাইমার ১২ থেকে ২০ বেইস পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। DNA পলিমারেজ তখন সম্পূরক সূত্র তৈরি করে দেয়। কয়েক মিনিটেই কপি তৈরি হয় এবং অল্পসময়ে অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে যায়। এটি খুবই সহজ একটি উপায়। সাধারণত এই সূত্র তৈরির হার ১০০০ বেস প্রতি মিনিটে। তবে বর্তমানে মিউটেশন পদ্ধতি দ্বারা এই হার আরো বাড়ানো হয়েছে, ১০০০ bp প্রতি সেকেন্ডে।

বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং : বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং পদ্ধতি আছে। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(i) **DNA ক্লোনিং :** রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে DNA ক্লোনিং করা হয়। এটি জিন ক্লোনিং নামেও পরিচিত। কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড কেটে উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে প্লাসমিড DNA টি একটি রিকম্বিনেন্ট DNA-তে পরিণত হয়। উপযুক্ত মাধ্যমে এই রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ব্যাকটেরিয়াম আবাদ করলে অল্প সময়ে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি ব্যাকটেরিয়ামে ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন থাকবে। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত জিনের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করা হয়।

(ii) **রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং :** জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হলো রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। ডলি নামক ভেড়ার সৃষ্টি এই পদ্ধতিতে করা হয়েছে। একটি ভেড়ার স্তন গ্রন্থি থেকে কোষ নিয়ে (একটি দাতা কোষ বা দাতা ভেড়া) তাকে আবাদ মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পরে একটি ভেড়ার ডিম্বাণু কোষ (গ্রহীতা কোষ) নিয়ে তা থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে তদস্থলে দাতা কোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়। ডিম্বাণুটি দাতা কোষের নিউক্লিয়াস নিয়ে বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছায়। এ ভ্রূণ তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। তৃতীয় ভেড়াটি নির্দিষ্ট সময় পর দাতা ভেড়ার চেহারা সম্পন্ন একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এর নাম দেয়া হয়েছিল ডলি (১৯৯৬ সালে ডলির জন্ম হয়)। ডলির জন্মই রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর উদাহরণ। একইভাবে মানব ক্লোন করাও সম্ভব হচ্ছে।

জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি বিজ্ঞান। জীবন-জীবিকার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। নিচে এই প্রযুক্তির কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। **কৃষিক্ষেত্রে :** কৃষিক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন-

(ক) **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ :** আমেরিকান তুলা গাছে পোকার (Cotton bollworm) আক্রমণের ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পেতো। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাই ব্যবহার করতে হতো ইনসেক্টিসাইড

Scanned by CamScanner

(insecticides = পতঙ্গনাশক)। *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ট্রান্সজেনিক তুলা গাছে পোকার জন্য বিষাক্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয় যার ফলে এখন আর ঐ পোকার আক্রমণ ঘটে না। এর ফলে ঐ তুলার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার পতঙ্গনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমে গেছে এবং জমির উপরের মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় চাষকৃত ভুট্টার ৪০ ভাগ, তুলার ৫০ ভাগ এবং সয়াবিনের ৪৫ ভাগই ট্রান্সজেনিক প্রকরণ। বাংলাদেশেও এখন Bt cotton, গোল্ডেন রাইস, লেটব্লাইট রোগ প্রতিরোধক্ষম আলু চাষের ট্রায়াল চলছে, কৃষক পর্যায়ে এখনও দেয়া হয় নি।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, পেঁপে, ভুট্টা, রাই, সূর্যমুখী, তুলা, নাশপাতি, গম, আঙ্গুর ইত্যাদি।

আগাছা নিধনকারী পদার্থ সহনশীল উদ্ভিদ

গ্লাইকোসেট একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮ আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি আগাছার সাথে ফসল উদ্ভিদও নষ্ট করে ফেলে। কাজেই ফসল লাগানোর আগেই জমিতে আগাছানাশক দেয়া ভালো। কিন্তু ফসল লাগানোর পরও জমিতে পুনরায় আগাছা জন্ম নেয়, তখন অতি সাবধানে এটি ব্যবহার করতে হয়।

কতক ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইম তৈরি করে থাকে যা গ্লাইকোসেট ভেঙ্গে দিতে পারে। বিজ্ঞানিগণ ব্যাকটেরিয়া থেকে এই জিন পৃথক করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তুলা ও সয়াবিন উদ্ভিদে অন্তর্ভুক্ত করে ট্রান্সজেনিক তুলা ও ট্রান্সজেনিক সয়াবিন উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ফসলের জমিতে এখন নিশ্চিন্তে গ্লাইকোসেট হার্বিসাইড (herbicide) প্রয়োগ করা চলে।

wPÎ 11.6 : U'vY‡RwbK Dw™¢` m„wó cxwZ|

(খ) গুণগত মান উন্নয়নে : অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন একটি উত্তম ব্যবসা। ভেড়া থেকে পাওয়া যায় পশম এবং মাংস। এরা ক্লোভার জাতীয় ঘাস খায়। ঐ ঘাসের প্রোটিনে সালফারের অভাব আছে। এর ফলে যে ভেড়া ক্লোভার ঘাস খায় এদের লোম নিম্নমানের হয়। লোমকে উন্নতমানের করতে হলে এদেরকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্লোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিন সমৃদ্ধ ক্লোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

(গ) সুপার রাইস (Super rice) বা গোল্ডেন রাইস (Golden rice) : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিটামিন-A এর অভাব রয়েছে। এর ফলে কেবল বাংলাদেশেই প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ভিটামিন-A সমৃদ্ধ খাবারের অভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। এশিয়ার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাতের মাধ্যমে ভিটামিন-A এর অভাব পূরণ করতে পারলেই আমাদের সন্তানেরা আর রাতকানা বা অন্ধ হবে না। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুইডেনের বিজ্ঞানী Ingo Potrykus (1999) ও তাঁর সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন সুপার রাইস। তাঁরা *Japonica* টাইপ ধানে, ড্যাফোডিল থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এই ধানের ভাত খেলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাতপ্রিয় জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মায়েরা দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। এখন সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস চাষ শুরু হয়েছে।

(ঘ) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ফলে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস-এর কোট প্রোটিন (CP) জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ হতে নিজেকে প্রতিরোধ করছে। ইতোমধ্যে একইভাবে পেঁপের রিংস্পট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(ঙ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে 'নিফ জিন' (যা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী) *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন' বাহী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে। ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।

(চ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টি : জোনাকি পোকার দেহে লুসিফারেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে 'লুসিফেরিন' নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই জোনাকি পোকা উড়ার সময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ লুসিফেরিন পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন তামাক গাছে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে তামাক গাছের পাতা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাই রাতের বেলা অন্ধকার স্থানে এরা বেশ শোভাবর্ধক।

(ছ) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে সারা বিশ্বের অনেক দেশে বীজহীন ফল সৃষ্টি করা হচ্ছে; যেমন- জাপানে বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই এক প্রতিফলন।

(জ) ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি (Production of insect pest resistant plant) : অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যারা ফসল উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এর ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। এরা হলো ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ insect pest। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এসব ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী ফসল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

(i) ইউরোপিয়ান কর্নবোরার (European corn-borer) এক প্রকার মথ। এদের লার্ভা ভুট্টা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে, ফলে ভুট্টার ফলন শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে *Bacillus*

Scanned by CamScanner

thuringiensis-এর একটি জিন ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এই ক্ষতিকারক কর্নবোরার প্রতিরোধী ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। *Bacillus thuringiensis* ব্যাকটেরিয়াতে একটি প্রোটিন তৈরি হয় যা কীট-পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত প্রোটিন তৈরিকারী 'জিন'কে ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন জাত তৈরি করা হয়েছে যা পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত ঐ প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে ভুট্টার ঐ নতুন উদ্ভাবিত জাত কর্নবোরার দ্বারা আক্রান্ত হয় না (কর্নবোরার নিজেরাই মরে যায়)। এর ফলে ভুট্টার ফলন হ্রাস পায় না, ফলন বাড়লে অথবা ফলন হ্রাস না পেলে উৎপাদন খরচ কম পড়ে, ক্ষতিকারক রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করতে হয় না, তাই উৎপাদন খরচ আরও কমে যায়। এছাড়া ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড বৃষ্টির পানির সাথে গড়িয়ে পুকুর, ডোবা, নদী-নালায় পড়ে জলজ ইকোসিস্টেমের যে মারাত্মক ক্ষতি করে তা থেকেও পরিবেশ রক্ষা পায়। ইনসেক্টিসাইড ছিটানো ফসল থেকে মানুষের দেহে ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড প্রবেশ করে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তা থেকেও মানুষ রক্ষা পায়।

কাজেই পতঙ্গনিরোধী ফসল উদ্ভিদ চাষে খরচ কম পড়ে, উৎপাদন বাড়ে, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা পায়।

(ii) *Bacillus thuringiensis* (Bt) একটি মৃত্তিকাবাসী বড় আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এটি বিরাজমান আছে। গবেষণাগারে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে বায়ো-ইনসেক্টিসাইড হিসেবে ফসলে (যেমন বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদিতে) প্রয়োগ করলে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা পায়, ফলন হ্রাস পায় না, পরিবেশের এবং মানবদেহেরও কোনো ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ মোটামুটি সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(iii) **স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (Sterile Insect Technique = SIT) :** এটি একটি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি (যদিও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নয়)। SIT হলো একটি পরিবেশ বান্ধব ক্ষতিকারক পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। Edward Kripling ও Raymond Bushland ১৯৩৭ সালে এই পদ্ধতির প্রস্তাবক। ফসলে বা জমিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পতঙ্গনাশক প্রয়োগ না করে বায়োলজিক্যাল ইনসেক্ট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক পতঙ্গের পুরুষগুলোকে বন্ধ্যা করে দেয়া হয় (প্রধানত রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে)। এর ফলে স্ত্রী পতঙ্গসমূহ কার্যকর ডিম উৎপাদনে অক্ষম হয়, ফলে নতুন প্রজন্ম বিকশিত হতে পারে না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ক্ষতিকারক পতঙ্গটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মশা নিয়ন্ত্রণের এটি একটি কার্যকরী উপায়। আবার শাকসবজি ও ফলমূলের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গও এই পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি এখনো প্রয়োগ সম্ভব না হলেও ব্রাজিল, জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি একদিকে যেমন কৃষিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, অন্যদিকে পতঙ্গবাহিত (যেমন-মশা) রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন Insect Biotechnology গবেষণাগারে SIT নিয়ে গবেষণা চলছে।

বাংলাদেশের প্রথম GM (Genetically Modified) খাদ্য ফসল

জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে GM ফসল বলে। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৩০টি দেশ GM ফসল (Genetically Modified crop) উৎপাদন করছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৪, বাংলাদেশে প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (Bt-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

Bt-বেগুন কী? *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন (Cry1Ac) বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন।

সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচিডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজন-এ ৬০-১৮০ বার পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হবে না, তাই পোকানাশক ওষুধও স্প্রে করতে হবে না।

পোকানাশক স্প্রে করলে কী হয়? বেগুন ক্ষেতে পোকানাশক স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ থেকে গাছ ও ফসল রক্ষা পায়, তবে-

(i) বেগুনের সাথে ওষুধ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং পরিণামে ক্যান্সার-এর মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) ফসলের জমি থেকে বৃষ্টির পানির সাথে পোকানাশক বিষ নিকটস্থ নদী-নালা-খাল-বিলে জমা হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়।

(iv) কৃষকের হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বহু কর্মঘণ্টা ব্যয় করে ওষুধ স্প্রে করতে হয়।

(v) ওষুধ স্প্রেকারী ব্যক্তিও এক সময় এই বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। **এতে কেবলমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাভবান হয়, আর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**

Bt-বেগুন চাষ করলে কী লাভ হবে?

Bt-বেগুন চাষ করলে কৃষক নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হবেন।

(i) পোকানাশক ওষুধ কিনতে হবে না ও স্প্রে করতে হবে না। এতে হাজার হাজার টাকা উৎপাদন খরচ কম হবে।

(ii) আমরা যারা বেগুন খাই তারাও ঐ বিষ দ্বারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবো না এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকবো।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষমুক্ত থাকবে।

(iv) আশেপাশের জলাশয় বিষমুক্ত থাকবে এবং জলজ পরিবেশের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

(v) উৎপাদন বাড়বে।

GM-ফসল কি ক্ষতিকর?

পরিবেশবাদীরা বরাবরই এর বিরোধিতা করে আসছে। যদিও তাদের কাছে এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আমরা জানি প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে এবং ঐ প্রোটিনই ঐ জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। কাজেই Bt-ক্রিস্টাল জিনও একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করবে। ঐ প্রোটিন আমাদের দেহে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কিনা সেটাই প্রধান প্রশ্ন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, Bt-জিন বিশেষ পোকার জন্য বিষাক্ত হলেও মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। এছাড়া Bt-বেগুন উদ্ভাবনের পর পৃথিবীর উন্নত দেশে ১০টির অধিক গবেষণাগারে মাছ, মুরগি, ছাগল, খরগোশ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর উপর গবেষণায় কোনো ক্ষতিকর প্রভাব প্রতীয়মান হয়নি। কাজেই আমরা দ্বিধাহীন মনে Bt-বেগুন খেতে পারবো।

২। চিকিৎসা বিজ্ঞানে : চিকিৎসা বিজ্ঞানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টিকা, হরমোন, অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন। রোগ শনাক্তকরণেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিন প্রযুক্তি। সুস্থ সবল শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রেও এ প্রযুক্তি নিয়ে আসছে আশার আলো।

মানুষের দেহের প্রতিটি কোষ ২৫০০০ পর্যন্ত কর্মক্ষম জিন বহন করে (আরো বহু জিন মানবদেহে আছে যাদের কাজ এখনো জানা সম্ভব হয়নি)। এর যেকোনো একটি নির্দিষ্ট জিন-এ ভ্রম (error) দেখা দিলে দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের এরূপ ৩৫০০টি জেনেটিক ডিসঅর্ডার জানা গেছে। আশা করা হচ্ছে এগুলো রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করা যাবে।

Scanned by CamScanner

(i) **ইনসুলিন (Insulin) :** ইনসুলিন হলো এক ধরনের হরমোন যা মানব অগ্ন্যাশয়ে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর বিটা কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। কোনো কারণে অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে অথবা কম নিঃসৃত হলে অথবা নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ হয়। এমতাবস্থায় ডায়াবেটিক রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাই ইনস্যুলিনের চাহিদাও ব্যাপক।

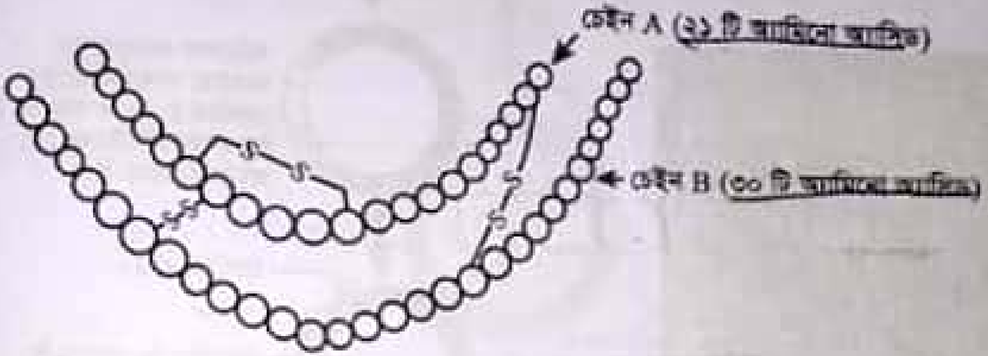

ইনসুলিনের A ও B চেইন। দুটি সিস্টিনের মধ্যে ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয়

ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (২১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-A এবং ৩০টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-B) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। এর রাসায়নিক সংকেত হলো : $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_{6}$, আণবিক ভর ৫৭৩৪। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন *E. coli*-তে স্থানান্তর করে ব্যাপক হারে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম কোষে প্রায় দশ লক্ষ অণু ইনসুলিন তৈরি হয়ে থাকে।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিতে এত ইনসুলিন কোথায়? একসময় গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ করে তা মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। কিন্তু গরু বা শূকর থেকে নেয়া ইনসুলিন মানুষের জন্য ততটা উপযোগী নয়। কাজেই জিন প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জিনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এক সময় তা সফল হয়। প্রথমেই মানুষের DNA-তে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তা হলো ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে। এতে ১৫৩টি নাইট্রোজেন-বেস নিয়ে গঠিত ইনস্যুলিনের জেনেটিক কোড বিদ্যমান।

জিন প্রকৌশল তথা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lily & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় 'হিউমুলিন' নামে।

ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

১। **ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ :** মানবদেহে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটির অবস্থান বর্তমানে শনাক্তকৃত। ১১নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA-তে এই জিন অবস্থিত। এটি ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত।

Scanned by CamScanner

২। **DNA সূত্র থেকে ইনসুলিন জিন অংশ পৃথককরণ :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে মানব DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ বিশেষ উপায়ে কেটে পৃথক করা হয়।

৩। **বাহক প্লাসমিড পৃথককরণ :** ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E. coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে বিশেষ কৌশলে প্লাসমিড পৃথক করা হয়।

৪। ***E. coli* প্লাসমিড DNA-এর একাংশ কর্তন :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে ইনসুলিন জিনের সমপরিমাণ প্লাসমিড DNA অংশ কেটে স্থান ফাঁকা করা হয়।

৫। **প্লাসমিড DNA-তে ইনসুলিন জিন স্থাপন :** প্লাসমিড DNA-এর কর্তিত ফাঁকা স্থানে মানুষের ইনসুলিন জিন (DNA অংশ) বসিয়ে দেয়া হয় এবং লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাসমিড DNA এবং মানব DNA সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এবার তৈরি হলো রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড।

৬। **রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড একটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো :** এটি করা হয় ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায়। এটি হিট শক মেথড অথবা ইলেক্ট্রিক পাল্স মেথডে করা হয়। যে ব্যাকটেরিয়া রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড বহন করবে তাকে Vector (বাহক) বলা হয়। বাহক অবশ্যই নিজস্ব প্লাসমিড মুক্ত হতে হবে। প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য ভেক্টরকে Competent (উপযুক্ত) হতে হয়। হিট শক মেথড অনুসারে ভেক্টরকে (*E. coli*) প্রথমে $CaCl_2$ দ্রবণে ডুবিয়ে ১৪-১৬ ঘন্টা বরফে রাখা হয়। এতে *E. coli*-এর কোষ প্রাচীরে Ca লেগে থেকে *E. coli* কোষকে প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য Competent করে থাকে। এরপর *E. coli* কোষ এবং রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডকে একত্রে মিকচার করে একটি পাত্রে আধা ঘন্টা বরফে, পরে ৪২°C তাপে ৯০ সেকেন্ড এবং পুনরায় ২ মিনিট বরফে রাখলে *E. coli* কোষ শোষণ করে প্লাসমিড দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। এবার *E. coli* কোষ ইনসুলিন জিনসহ **GMO *E. coli*-**এ পরিণত হলো।

৭। **ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে GMO *E. coli* সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ :** এবার GMO *E. coli* তথা ট্রান্সজেনিক *E. coli* কে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াযুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক *E. coli* সৃষ্টি হয় এবং সাথে প্রতি কোষে উৎপাদিত ইনসুলিন জমা হয়।

৮। **ইনসুলিন পৃথকীকরণ :** ইনসুলিন তৈরি হয়ে কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তাই *E. coli* কোষসমূহকে lysis (বিগলিত) করে ইনসুলিন আহরণ করা হয়।

৯। **ইনসুলিন বিশুদ্ধকরণ :** ব্যাকটেরিয়াকে বিগলন করার মাধ্যমে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তাতে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব অনেক প্রোটিনও থাকা স্বাভাবিক। তাই আহরিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করা হয়।

বাজারজাতকরণ : উৎপাদন পরবর্তীতে উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত করা হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে পুশ করা হয়। দেহে ইনসুলিন রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

> **কাজ।** জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি একটি পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে ক্লাসে/তোমার পড়ার ঘরে টানিয়ে দাও।

(ii) ইন্টারফেরনস (Interferons) : ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিন যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে, তেমনই বহিরাগত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, বিষ, অন্য কোনো বস্তু ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি মানবদেহে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে, এটি দেহের ইমিউন সিস্টেম (immune system)। ইন্টারফেরন হলো প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র (chemical defence) যা দেহের ইমিউন সিস্টেমের অস্ত্র

গত। এক কথায়, ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন (defence protein)। কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসৃত করে। নিঃসৃত ইন্টারফেরন আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, ফলে ভাইরাসটি আর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না, ফলে পরবর্তী কোষগুলোকে আর আক্রমণ করতে পারে না। কাজেই সংক্রমিত কোষের চারপাশের কোষগুলো ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, অধিকন্তু এরা ভাইরাস-প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। কাজেই ইন্টারফেরনের কাজ হলো আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়া এবং সুস্থ কোষগুলোকে ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম করে তোলা ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Alick Isaacs & Jean Lindermann ১৯৫৭ সালে ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন।

ইন্টারফেরনের ব্যবহার : ইন্টারফেরন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির হরমোন, এমনকি একই দেহের বিভিন্ন টিস্যু থেকে বিভিন্ন প্রকার ইন্টারফেরন তৈরি হয়। ভাইরাস আক্রান্ত লিউকোসাইট থেকে এক ধরনের ইন্টারফেরন, ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে অন্য ধরনের ইন্টারফেরন নিঃসরণ হয়। ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কোষ কর্তৃক ইন্টারফেরন নিঃসৃত হলেও বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণে ইন্টারফেরন উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে জটিল হেপাটাইটিস-B, কতক হার্পিস সংক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের প্যাপিলোমা (Papilloma) চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জলাতঙ্ক (rabies) রোগের চিকিৎসায়ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গবেষকগণ ধারণা করছেন যে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রহিত করতে ইন্টারফেরন সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে।

ইন্টারফেরন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ

১। মানুষের ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে DNA আহরণ করা হয় এবং তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন পৃথক করা হয়।

২। একটি উপযুক্ত প্লাসমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।

৩। এবার ইন্টারফেরন জিন অংশকে DNA লাইগেজ এনজাইম দিয়ে প্লাসমিডের কাটা (ফাঁকা) অংশে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একটি রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরি করা হয়।

৪। ইন্টারফেরন জিনসহ রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়।

৫। এবার আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA বিশিষ্ট *E. coli*-এর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি করা হয়। *E. coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টারফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।

৬। আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।

৭। বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এরূপ একটি ইন্টারফেরনের বাণিজ্যিক নাম Betaferon.

(iii) টিস্যু প্লাসমিনোজেন অ্যাকটিভেটর (Tissue Plasminogen Activetor = TPA) : মানুষের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক করতে পারে অথবা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সাথে সাথে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে নিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যাকটেরিয়া কোষ থেকে Streptokinase এনজাইম পাওয়া গেল যা দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এ প্রোটিনটি মানুষের নিজস্ব প্রোটিন নয় বিধায় দেহে বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মানুষের রক্তে এমনিতেই প্লাজমিন এনজাইম (Plasmin enzyme) থাকে যা Plasminogen অবস্থায় বিরাজ করে। প্লাজমিনোজেন নিষ্ক্রিয় (inactive) অবস্থায় থাকে। প্লাজমিনোজেনকে কর্মক্ষম অবস্থায় আনতে হলে TPA-এর দরকার হয়।

TPA তৈরি প্রক্রিয়া :

(i) মানুষের কোষ থেকে TPA জিন এর mRNA পৃথক করা হয়েছে।

(ii) mRNA থেকে cDNA তৈরি করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

(iii) cDNA-কে উপযুক্ত প্লাসমিডে অন্তর্ভুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয়েছে।

(iv) রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

(v) আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli*-কে আবাদ করে হাজার হাজার কপি (ক্লোনিং) করা হয়েছে।

(vi) *E. coli* থেকে TPA প্রোটিন পৃথক করে ওষুধ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

(vii) হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর রোগীর রক্ত নালিতে TPA ইনজেক্ট করলে রক্তের ক্লট বিগলিত হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।

(viii) TPA নিঃসরণকারী জিন মানুষের দেহ থেকে নেয়া বলে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

(iv) ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO) তৈরি : আমাদের কিডনি ইরিথ্রোপোইটিন (EPO) নামক একটি হরমোন তৈরি করে যা রক্ত প্রবাহের সাথে বোনম্যারো (bone marrow)-তে প্রবেশ করে। EPO, বোনম্যারো কোষকে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে এবং প্রচুর RBC (লোহিত রক্ত কণিকা) উৎপন্ন হয়। যাদের কিডনি বিকল হয়ে যায় বা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে তাদের নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয়। ডায়ালাইসিস-এর সময় এই হরমোনও (EPO) রক্ত থেকে বের হয়ে যায়, ফলে রোগীর দেহে RBC একেবারেই কমে যায়, রোগী তাই রক্তশূন্যতায় ভোগে।

EPO তৈরি প্রক্রিয়া : নিম্নে EPO তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(i) মানুষের দেহ থেকে EPO জিন পৃথক করা হয়েছে। (ii) পরে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে এবং লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করে এই জিনকে উপযুক্ত বাহকে (প্লাসমিড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (iii) পরে এই রিকম্বিনেন্ট DNA-কে অপর ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করানো হয়েছে। (iv) রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে হাজার হাজার কপি করা হয়েছে। (v) *E. coli* থেকে EPO প্রোটিন নিষ্কাশন করে ওষুধ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে হাজার হাজার কিডনি রোগীকে রক্তশূন্যতা দূরীকরণার্থে *E. coli*-তে উৎপন্ন EPO ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে।

(v) জিন থেরাপি (Gene therapy) : কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সঠিক করার (to correct) পদ্ধতি হলো জিন থেরাপি। ত্রুটিপূর্ণ জিনটিকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সরিয়ে দিয়ে ঐ জায়গায় corrected জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। দু'টি উপায়ে এটি করা হয়ে থাকে, যথা : (i) গবেষণাগারে corrected জিন সম্বলিত কোষকে জন্মিয়ে রোগীর দেহে ইনজেক্ট করা হয়, অথবা (ii) একটি বাহক (vector), সাধারণত একটি ভাইরাসকে corrected জিনসহ মানুষের DNA বহন করার জন্য পরিবর্তন করা হয় এবং তাকে সরাসরি মানুষের টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়। টার্গেট কোষে তখন corrected DNA সংযুক্ত হয়ে যায় এবং রোগ মুক্ত করে।

৩। মলিকুলার ফার্মিং : ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদেরকে বায়ো-রিঅ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা হয়ে থাকে।

৪। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environmental Management) : যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা যায়, পরিবেশ দূষণকারী উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায় তাকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে। জীবজগতের বসবাসের জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(ক) কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য : কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কলকারখানা থেকে নির্গত সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার এবং ভিন্ন ভিন্ন অন্যান্য বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী দূষিত পদার্থ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন অণুজীব জন্মায় এবং বর্জ্য পদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে। জাপান, তাইওয়ান এবং ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা

Scanned by CamScanner

single cell protein হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবের সহায়তায় দুধের (dairy) কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য (whey) থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কাগজ ও কাগজের মণ্ড (pulp এবং paper industry) থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে *Torula* নামক ঈস্ট জন্মায় যার মধ্যে প্রচুর আমিষ থাকে। *Saccharomyces cerevisiae* এবং *Torula utilis* বর্জ্য পদার্থের মধ্যে জন্মায়। এদের থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

কাগজ শিল্পের কাঁচামাল ব্লিচ করতে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। এ ক্লোরিনজনিত দূষণ থেকে পরিবেশকে বিভিন্ন ছত্রাক ব্যবহার করে সহজেই মুক্ত করা যায়। পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্যকেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে উপকারী সরল দ্রব্যে রূপান্তর করা যায়, ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন- বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি), ইথানল, প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যাসিটোন, গ্লিসারিন, বুটানল ইত্যাদি।

(খ) সমুদ্রে তেল নির্গমন : দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নানা উপায়ে সমুদ্রে তেল-এর মাধ্যমে দূষণ (pollution) ঘটতে পারে এবং তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। তেল পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানি অপেক্ষা হালকা বলে তা পানির উপর ভাসতে থাকে এবং চকচকে একটি স্তরের সৃষ্টি করে। তেলের এ স্তর সমুদ্রে বসবাসকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু সমুদ্রে যে সমস্ত হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব বাস করে তারা অদ্রবণীয় তেল দানার সাথে লেগে থেকে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তেলকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে এবং তেল দূষণ থেকে মুক্ত করে। তবে কোনো উপায়ে তেল সমুদ্রের তলায় চলে আসলে বছরের পর বছর তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কারণ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এ অণুজীবগুলো কাজ করে না। *Pseudomonas, Nocardia, Mycobacteria,* বিশেষ ধরনের ঈস্ট ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে।

জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন প্রকরণের *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে যা তেল ও হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত নষ্ট করে দিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে পারে।

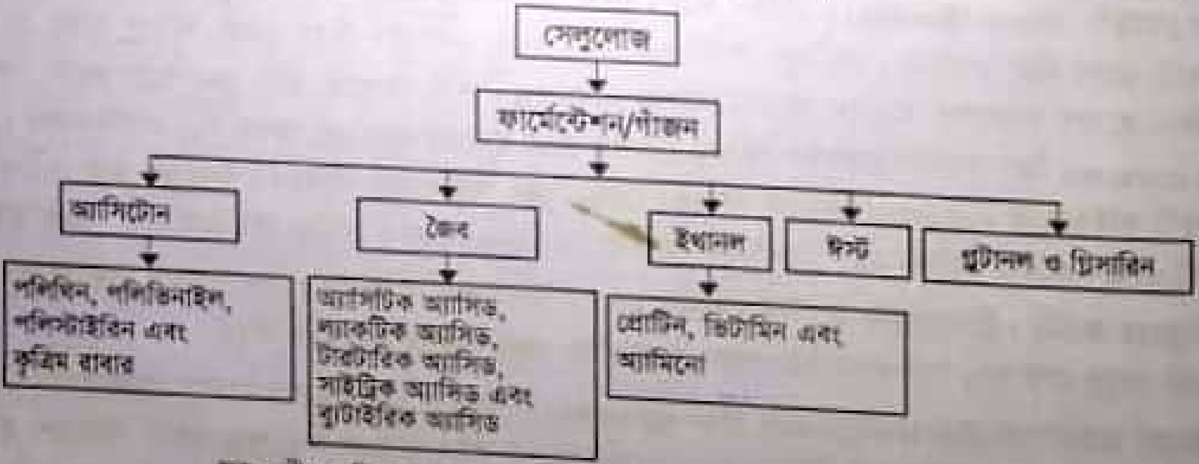

ছক : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন।

(গ) পয়ঃবর্জ্য বা সিউয়েজ আবীকরণ : ঘরবাড়ি, মহল্লা বা কৃষিখামার হতে নির্গত মলমূত্র ও জঞ্জালকে সিউয়েজ (sewage) বা নর্দমার ময়লা বলে। অনেক সময় ঝড়বৃষ্টির পরিত্যক্ত পানিও ভূগর্ভস্থ নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিউয়েজে পরিণত হয়। রোগ উৎপাদনকারী পরজীবীসহ জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে সিউয়েজ গঠিত। অজৈব পদার্থ যেমন- কাদা, বালি এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আলাদা করা হয়। জৈব পদার্থ পানি দূষণের অন্যতম কারণ। তাই সিউয়েজ পানি যাতে খাবার বা ব্যবহার্য পানির সাথে মিশতে না পারে সেজন্য উন্নত দেশে জৈবিক উপায়ে পরিশোধন করা হয়। বায়বীয় বা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়াসহ শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

Scanned by CamScanner

এরা জৈব পদার্থকে ভেঙে CO_2 ও CH_4 -এ পরিণত করে। CH_4 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং প্রথমটি গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে ছাড়া পায়। জৈবিক বিক্রিয়ার পর মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ করে পানি নদী বা সাগরে ফেলা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে সিউয়েজ বিশুদ্ধকরণ করা হয় না বললেই চলে।

বর্তমানে সিউয়েজ আত্তীকরণের সুবিধার জন্য কিছু নির্বাচিত অণুজীবের স্টার্টার কালচার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া সিউয়েজ আত্তীকরণের কিছু প্লান্টও উদ্ভাবিত হয়েছে। এসবের উদ্ভাবনের ফলে সিউয়েজ আত্তীকরণ আরও সহজসাধ্য হয়েছে।

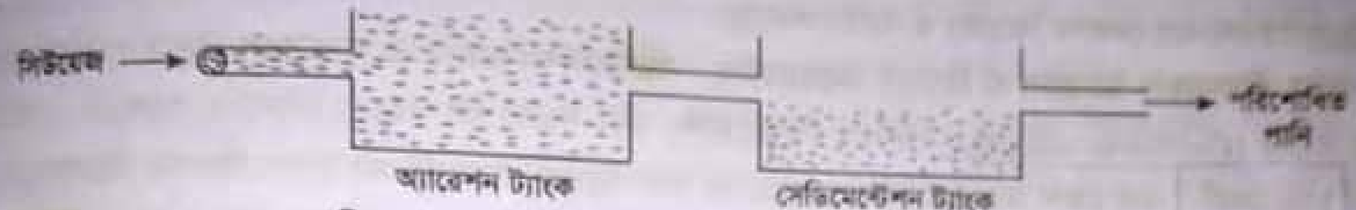

চিত্র ১১.৮ : এক্টিভেটেড স্লাজ পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন।

বর্তমানে সারা বিশ্বে **একটিভেটেড স্লাজ** (activated sludge) পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন করে পরিশোধিত পানি নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। এটি একটি সহজ জীবজ পদ্ধতি, ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে। এ পদ্ধতিতে **আরেশন ট্যাংক** ও **সেডিমেন্টেশন ট্যাংক** নামক দুটি ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। প্রথম ট্যাংকে বিভিন্ন অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) যুক্ত থাকে যারা জৈব বস্তুকে ভেঙে CO_2 ও পানিতে পরিণত করে। দ্বিতীয় ট্যাংকে পানিকে স্থিতিশীল রাখা হয় ফলে নিচে তলানি জমা হয় এবং উপরে পরিশোধিত পানি থাকে, যা নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। তলানি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকটেরিয়াম হলো *Zooglea ramigera.*

জিনোম সিকোয়েন্সিং
(Genome sequencing)

জিনোম সিকোয়েন্সিং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণত ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন গঠন বা ধরনের হয়। কোনো একটি প্রজাতির একটি নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোসোমের একটি সেটকে বলা হয় জিনোম (genome)। হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে একটি জিনোম থাকে, আর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি জোড়ার একটি করে ২৩টি ক্রোমোসোম মিলিতভাবে গঠন করে মানুষের জিনোম। কাজেই মানুষের দেহকোষে এক জোড়া জিনোম আছে।

ক্রোমোসোমের মূল উপাদান DNA এবং DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে। কাজেই বলা যায়, কোনো জীবে এক সেট ক্রোমোসোমে অবস্থিত সকল জিনসহ পূর্ণাঙ্গ DNA-ই জিনোম। সহজভাবে একটি জীবকোষে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে একত্রে জিনোম বলা হয়। একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের 'মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট' বলা হয়।

আমরা জানি অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড বিভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে DNA অণু গঠন করে। এক অণু ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, এক অণু নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডিনিন = A, গুয়ানিন = G, থাইমিন = T এবং সাইটোসিন = C) এবং এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক একটি নিউক্লিয়োটাইড গঠিত হয়। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলো কোন অনুক্রমে (কোনটির পর কোনটি) সজ্জিত থাকে তা হলো জিনোম সিকোয়েন্স, আর এই সিকোয়েন্সটি (সাজান পদ্ধতি) উদঘাটন করাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং।

জিনোম সিকোয়েন্সিং কাজটি উন্নত প্রযুক্তি ও বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি নির্ভর। লম্বা DNA অণুটি একসাথে সিকোয়েন্সিং করা সম্ভব হয় না, তাই DNA অণুকে উপযুক্ত দূরত্বে কেটে নেয়া হয় এবং খণ্ডগুলোর সিকোয়েন্সিং করে একসাথে মিলিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্সিং উপস্থাপন করা হয়। তবে প্রথম দিকে প্রক্রিয়াটি যত ব্যয়বহুল ছিল বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যয় বহুলাংশে কমে এসেছে।

Scanned by CamScanner

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রবর্তক হলেন Dr. F. Sanger, যিনি পরবর্তীতে এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল
পুরস্কার লাভ করেন। প্রক্রিয়াটি এরূপ : (i) প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট DNA অণুকে রিএজেন্ট সমৃদ্ধ চারটি টিস্টটিউবে ...
করে দেয়া হয়, যেখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি DNA খণ্ডের A.T.G.C রেসিডিউ শনাক্ত করবে। (ii) জেল
ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পাশাপাশি চারটি বিক্রিয়ার প্রতিটিকে পৃথক করা হয় এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ ব্যান্ড-এর স্থান ও
পরিমাণ (size) থেকে সিকোয়েন্স নির্ণয় করা হয়। (iii) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত X-ray স্ক্যানার ব্যবহার করে
ইলেক্ট্রোফোরেসিস-এর রেজাল্ট বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বা জিনোম সিকোয়েন্সিং : বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহযোগীরা
তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের জেনোমে
পেয়ার ১২০ কোটি এরা কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা জিনোম সিকোয়েন্সিং জানার
ফলে এখন উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, শীতকালীন পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট,
ওষুধী পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। কিছুদিন আগে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

ফসলী উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং : মুগডাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম ডাল
উৎপাদনকারী উদ্ভিদ। কিন্তু হলুদ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণে এই ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও গবেষণা সহযোগী দল বাংলাদেশে
মুগের হলুদ রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন এবং RNAi পদ্ধতি ব্যবহার করে হলুদ মোজাইক
ভাইরাস প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণা করছেন। তাঁর দল ICGEB-র আর্থিক সহায়তায় টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো
(Tomato leafcurl) রোগ সৃষ্টিকারী ToLCV ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ToLCV
প্রতিরোধী টমেটো জাত উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিকতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য

জীবের নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	ক্ষারজোড়
E. coli	১	৩২০০	৪.৬ মিলিয়ন
Haemophilus influenzae	১	১৭০০	১.৮ মিলিয়ন
C÷	৩২	৬০০০	১২.১ মিলিয়ন
Arabidopsis thaliana (পুষ্পক উদ্ভিদ)	১০	২৫০০০	১০০ মিলিয়ন
মানুষ	৪৬	২৫০০০ (+ বহু অপ্রকাশিত)	৩.২ বিলিয়ন

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger print) : DNA finger prints বুঝতে হলে প্রথমে finger prints সম্পর্কে একটু
ধারণা থাকা প্রয়োজন। ফিঙ্গার প্রিন্টস বলতে সাধারণত মানুষের হাতের আঙুলের
ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ একই রকম হয় না
(ক্লোনিং ও আইডেনটিক্যাল টুইন ব্যতীত)। তাই জমিজমা হস্তান্তর বা রেজিস্ট্রি,
কাবিন নামা রেজিস্ট্রি, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সীম নিবন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিঙ্গার
প্রিন্ট রাখা হয়। দুজন মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের ভিন্নতা হয় জিন তথা DNA
(A.T.G.C) এর ভিন্নতার কারণে। কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন

মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট

এনজাইম দিয়ে কর্তন করে জেল ইলেকট্রোফোরোসিস (Gel electrophorosis)-এর মাধ্যমে (উক্ত DNA এর) যে
ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় তাকে **DNA finger print** বা **DNA profile** বলে। প্রথমে কোনো জীব তথা
মানুষের সম্পূর্ণ DNA সংগ্রহ করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস
এর মাধ্যমে জেল স্তরের উপর চালনা করা হয়। ফলে সেখানে DNA খণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে বড় থেকে ছোট হিসেবে কতগুলো

Scanned by CamScanner

পরিবর্ত ব্যান্ড হিসেবে জমা হবে। বিশেষ ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যান্ডগুলোর প্রকৃতি ও পারস্পরিক অবস্থান জানা যায়। প্রত্যেক জীব তথা মানুষের DNA খণ্ডগুলোর এমন ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা চিত্রকে DNA finger print বা DNA profile বলে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ (Application of genome sequencing)

কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে জানা যায় ঐ প্রজাতির DNA অণুতে অবস্থিত ATGC গুলো কোনটার পর কোনটার অবস্থান অর্থাৎ এদের অনুক্রম। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে সব অংশে ATGC একই অনুক্রমে অবস্থান করে না, কখনো কখনো একই সাথে পরপর একাধিক A বা একাধিক T থাকতে পারে।

কোনো জীবের জীবনরহস্য জানার প্রথম ধাপ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং। জিনোম সিকোয়েন্সিং জানলেই জীবের সব জেনেটিক তথ্য জানা যায় না। সিকোয়েন্সিং এর পর জানা সহজ হয় কোথায় কোন জিনের অবস্থান, জিনের গঠন, জিনের পরিধি এবং কোন জিনের কি কাজ। কোনো জিনের অবস্থান, গঠন, পরিধি ও কাজ জানতে পারলেই ঐ জিনটিকে ব্যবহার করা যায়।

DNA ফরেনসিক্স (DNA Forensics)

(১) অপরাধী শনাক্তকরণে : ভিক্টিম বা অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান থেকে আলামত সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। এর পর সন্দেহভাজন তালিকা ধরে তাদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। যার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে আলামত থেকে নেয়া সিকোয়েন্সিং এর মিল হবে সেই প্রকৃত অপরাধী। অজ্ঞাত বা খুন হওয়া ব্যক্তির পরিচয় জানতে DNA সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মৃত অজ্ঞাত জঙ্গীর DNA সিকোয়েন্সিং করে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

(২) পিতৃত্ব নির্ধারণে : অনেক সময় সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে পিতৃত্ব দাবিকৃত ব্যক্তিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিলিয়ে দেখা হয়। যার জিনোমের সাথে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিল সম্পন্ন হবে, তিনিই হবেন সন্তানের প্রকৃত পিতা।

(৩) স্বজন নির্ধারণে : সাভারে রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনায় পরিচয়হীন শ্রমিকদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে তার সাথে তার দাবিকৃত আত্মীয়দের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে মিল পাওয়ার পর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকাও দেয়া হয়েছে।

(৪) শ্রেণিবিন্যাসে স্তর নির্ধারণ : জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা হলো আর্কিব্যাক্টেরিয়া, ব্যাক্টেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকেও পৃথক, কারণ ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন অন্যান্য সকল জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক অধিরাজ্য (Domain) করা হয়েছে।

(৫) শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্যের মিল নির্ধারণে : আর্কিব্যাক্টেরিয়ার rRNA এর বেস সিকোয়েন্স ব্যাক্টেরিয়ার সাথে মিল সম্পন্ন। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়া ও ব্যাক্টেরিয়া ঘনিষ্ঠতম।

জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

১। যে কোনো প্রকৃতির জীব থেকে বিশেষ কোনো জিনকে শনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে পৃথক করা; যেমন– মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন। এটি ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে অবস্থিত। (চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

২। উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বা প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী জিন অনুসন্ধান করা; যেমন– Bt toxin জিন CryIAC এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন PDH 45 (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

৩। উদ্ভিদের মান উন্নয়নের জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন অনুসন্ধান এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে সফলভাবে ব্যবহার করা; যেমন– গোল্ডেন রাইস এর বিটা-ক্যারোটিন জিন। (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)

Scanned by CamScanner

৪। জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য উদ্ভিদ বা অণুজীবের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ; যেমন- ধান, পাট, ভুট্টা ইত্যাদি ফসলের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য অন্যান্য মৌলিক গবেষণায় প্রয়োগ।

৫। গবাদি পশুর মাংস, দুধের পুষ্টি গুণাগুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে জিনোম সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬। মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং দ্বারা মানব জিনোমের অনেক তথ্যই এখন উন্মোচিত হয়েছে, ফলে এই তথ্যসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে; যেমন- ইনসুলিন জিন-এর প্রয়োগ।

৭। যে কোনো জীবে জিনের প্রকাশ (expression of gene) কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং এই তথ্যসমূহ গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ।

৮। জীবতথ্য বিদ্যার (Bioinformatics) জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিনোম সিকোয়েন্সিং উপাত্ত থেকে গ্রহণ/সংগ্রহ করা।

৯। বন্য জীবজন্তু যেমন-সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে প্রজননের ক্ষেত্রে DNA সিকোয়েন্সিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১০। এছাড়া জৈব জ্বালানী উদ্ভাবন, ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ, ইন্টারফেরন উৎপাদন ও ক্যান্সার গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিং সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কাজ : জীবপ্রযুক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগসমূহ নিয়ে একটি চার্ট তৈরি কর।

জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা (Biosafety) বিধানসমূহ

সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্যাণের জন্যই অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভারসাম্য অবস্থা। তাছাড়া হাজার হাজার বছরের ব্যবহারের মাধ্যমে জানা হয়েছে কোনটি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, আর কোনটি ক্ষতিকারক নয়। এর পরও কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কোনো প্রাকৃতিক বস্তু গ্রহণ বা ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য অন্য কাউকে অভিযুক্ত করার উপায় নেই।

জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহার করার পূর্বে জেনে নিতে হবে এটি মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি না, বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন Bt. cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে এই বেগুন খেলে মানুষের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিনা। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে এই Bt বেগুন মানুষের ইমিউন সিস্টেমের বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতি করবে না।

জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত GMO সমূহের উপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Guidelines বলে। এই নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। **এই নির্দেশিকার মূল বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।**

এই Biosafety Guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (National Committee on Biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (Institutional Biosafety Committee) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি (Biosafety Core Committee), মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (Field Level Biosafety Committee) এবং জীব নিরাপত্তা অফিসার (Biological Safety Officer) গঠন করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

Biosafety Guidelines এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১। জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

২। GMO প্রয়োগের/ ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

৩। জীববৈচিত্র্য প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর GMO-এর ক্ষতিকারক দিক নির্ণয় করা এবং তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৪। GMO ক্ষতিকারক নয় প্রমাণিত হলে তবেই প্রবর্তন করা।

সার-সংক্ষেপ

টিস্যু কালচার : গবেষণাগারে কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যুর সংখ্যাবৃদ্ধিই টিস্যু কালচার। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময়ে হাজার হাজার চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো একই বয়সের হয় এবং গুণগত মান বজায় থাকে, ফলে ফলন বাড়ে। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাইরাসমুক্ত বীজ তৈরি করা হয়, ফলে ফসল ভাইরাস আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে এবং ফলন হ্রাস পায় না, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো জিন পৃথক করে নিয়ে অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত জীবকোষে প্রতিস্থাপন করাই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল। এতে দুটি পৃথক DNA-এর অংশের সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতির DNA তৈরি হয়, যাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA। রিকম্বিনেন্ট DNA দিয়ে তৈরি নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকে বলা হয় GMO (genetically modified organism)। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে পতঙ্গবিরোধী ভুট্টা, ভাইরাস বিরোধী পেঁপে, সুপার রাইস, ইনসুলিন প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে।

প্লাসমিড : বিভিন্ন অণুজীবে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া কোষে তাদের মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও এক বা একাধিক বৃত্তাকার DNA থাকে। ক্রোমোসোম বহির্ভূত এসব বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় প্লাসমিড। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান Laderberg ১৯৫২ সালে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্লাসমিড অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপাদান। প্লাসমিড বিভিন্ন রকম হতে পারে।

ইনসুলিন : ইনসুলিন একটি হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রা থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। দেহে ইনস্যুলিনের অভাব হলে ডায়াবেটিস রোগ হয়। ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন দুটি ডাই-সালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ইনসুলিন গঠন করে। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন নিঃসরণকারী জিনকে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। ডায়াবেটিক রোগ চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হলো ইনস্যুলিন।

জিনোম সিকোয়েন্সিং : কোনো জীবের জিনোমস্থ DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে নিউক্লিওটাইডসমূহ (ATGC) কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং। কোনো জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন হলে তার বিভিন্ন জিনের অবস্থান ও কার্যকারিতা জানা সহজ হয়। জিনের অবস্থান ও কাজ জানা গেলে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করা সম্ভব হয়। GMO=Genetically Modified Organism; LMO = Living Modified Organism।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। DNA-কে খণ্ডিত করে—
(ক) লাইগেজ এনজাইম (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম (গ) প্রোটিয়েজ এনজাইম (ঘ) অ্যামাইলেজ এনজাইম

২। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপ হলো—
(i) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন
(ii) নির্দিষ্ট স্থানে DNA অণুকে ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন
(iii) ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি

Scanned by CamScanner

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

ENVIRONMENT, DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF LIVING ORGANISMS

প্রধান শব্দসমূহ :
প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী, বায়োম
জীববৈচিত্র্য, কনজারভেশন

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব বাস করে। সব পরিবেশে সব জীব প্রজাতি বাস করতে পারে না। মাছের জন্য চাই জলজ পরিবেশ, মানুষের জন্য চাই স্থলজ পরিবেশ। সব মাছ কি একই জলজ পরিবেশে পাওয়া যায়? না, খাল বিলের মাছ সাধারণত খরস্রোতা নদীতে পাওয়া যায় না, ইলিশ মাছ খাল-বিল-পুকুর-ডোবায় পাওয়া যায় না, তিমি মাছ খরস্রোতা নদীতেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ আছে, যার বাইরে এরা বাস করতে পারে না। জীবের পরিবেশ কি? কোনো জীবের চারপাশের জড় (মাটি, পানি, আলো, বাতাস ইত্যাদি) এবং জীবজ (যেমন অন্যান্য জীব তথা উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) বস্তু দিয়েই ঐ জীবের পরিবেশ গঠিত। আর পরিবেশ অনুযায়ী এদের বিস্তার ঘটে। কতক উদ্ভিদ আছে যা বাংলাদেশের সব জেলাতেই পাওয়া যায়, আবার এমন উদ্ভিদও আছে যা কেবল চট্টগ্রাম অথবা কেবল সুন্দরবনে পাওয়া যায়। জীবের বিস্তার ঘটে তার উপযোগী পরিবেশ অনুযায়ী। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রজাতির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়, তখন দরকার পড়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে H. Reiter নামক জার্মান বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম Ecology শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রিক Oikos (অর্থ বাসস্থান) এবং logos (অর্থ জ্ঞান) হতে Ecology শব্দটি এসেছে। ইকোলজি হলো পরিবেশের আন্তঃক্রিয়াদির অধ্যয়ন যা জীবের বণ্টন, প্রাচুর্য, উৎপাদন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে এদের মঙ্গল সাধন করে। এ অধ্যায়ে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের মধ্যে তুলনা করতে পারবে।
৪. জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারবে।
৫. বিভিন্ন ধরনের বায়োম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৬. প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তার বর্ণনা করতে পারবে।
৮. বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৯. বিভিন্ন বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম উল্লেখ করতে পারবে।
১০. উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
১১. উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২. বিলুপ্তপ্রায় জীব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৩. জীব বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৪. বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
১৬. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।
১৭. বিলুপ্তপ্রায় জীবের সংরক্ষণের বিষয়ে নিজে সচেতন হবে এবং অন্যকেও সচেতন করবে।

প্রজাতি (Species)

বিজ্ঞানীদের কাছে জীবের পরিচিতি সব সময়ই প্রজাতি নির্ভর। পৃথিবীতে কত জীব আছে তা বলা হয় না, বা জানতে চাওয়া হয় না, জানতে চাওয়া হয় কত প্রজাতির জীব আছে। বাংলাদেশে কত প্রজাতির মাছ আছে, বা কত প্রজাতির পুষ্পক উদ্ভিদ আছে তাই জানতে চাওয়া হয়। পৃথিবীর সকল মানুষ এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তা হলে প্রজাতি কি? প্রজাতি বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল জীবকে (উদ্ভিদ, প্রাণী) বোঝায় যারা নিজেদের মধ্যে মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু অন্যদলের সদস্যের সাথে মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। একই প্রজাতির সদস্যসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। সাধারণত একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি জীব তাদের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়। দুটি জীবের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপন্ন না হলে ধরে নেয়া হয় জীব দুটি

একই প্রজাতিভুক্ত নয়, তারা পৃথক প্রজাতিভুক্ত। এটাকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল স্পিশিস, আর প্রজাতির এই ধারণা বলা হয় বায়োলজিক্যাল স্পিশিস কনসেপ্ট।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রজাতির গতানুগতিক ধারণা ভিন্ন রকম, কারণ দুটি মিলসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস করে তাদের উর্বর সন্তান সৃষ্টি হয় কিনা তা পরীক্ষা করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই শ্রেণিবিন্যাসবিদগণ কেবল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রজাতি নির্ণয় করতে চান। প্রজাতি নির্ণয়ে এক সময় কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ধরা হলেও বর্তমানে প্রয়োজনে অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোসোমাল বৈশিষ্ট্য, এমনকি DNA, RNA ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যও আমলে নেয়া হয়।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্নজীবকে কখন পৃথক প্রজাতিভুক্ত করা হবে? এর মধ্যেও মতের ভিন্নতা আছে। বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে জীব দুটি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্যমণ্ডিত হতে হবে এবং এই পার্থক্য হতে হবে বিচ্ছিন্ন, এদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বা মাধ্যমিক পর্যায় থাকলে পৃথক প্রজাতিতে বিভক্ত করা যাবে না।

একটি সহজ উদাহরণ দিলে এটি বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলাদেশে পাটের দুটি প্রজাতি চাষ করা হয়। প্রজাতি দুটি হলো *Corchorus capsularis* (সাদা পাট) এবং *Corchorus olitorius* (তোষা পাট)। গঠন বৈশিষ্ট্যে প্রজাতি দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি, সাধারণ মানুষ এদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারবে না। এদের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য ফলের আকৃতি ও আকারে।

প্রজাতি দুটির ফলের পার্থক্য বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ একটির সাথে অপরটি একেবারেই আলাদা। চিত্রে প্রদর্শিত মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোর অস্তিত্ব থাকলে প্রজাতি দুটিকে আলাদা করা হতো না, দুটি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হতো। যেহেতু এদের মধ্যে কোনো নিরবচ্ছিন্নতা নেই (continuity নেই) সেহেতু প্রজাতি দুটি পৃথক। *C. capsularis*-এর সাথে *C. capsularis* ইন্টারব্রিডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। *C. olitorius*-এর সাথে *C. olitorius* ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু *C. capsularis*-এর সাথে *C. olitorius* ইন্টারব্রিড করে না বা ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। কাজেই এরা দুটি পৃথক প্রজাতি। তাহলে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

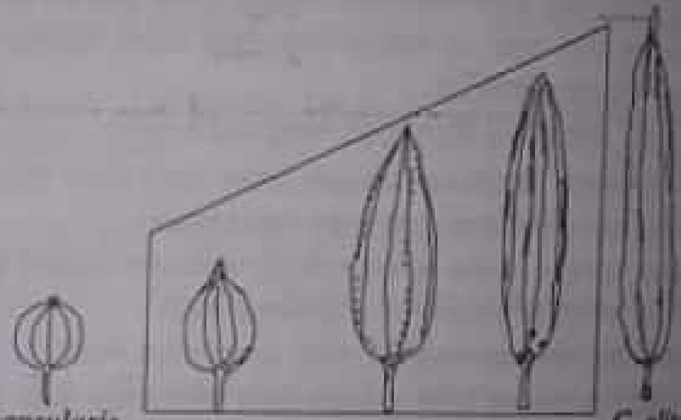

C. capsularis *C. olitorius*

(i) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিল সম্পন্ন এক দল জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, ছত্রাক)।

(ii) একই প্রজাতিভুক্ত জীব একটির সাথে অপরটি ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্য প্রজাতিভুক্ত কোনো জীবের সাথে ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

(iii) একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলে তা হবে নিরবচ্ছিন্ন (continuous)।

(iv) একটি প্রজাতিভুক্ত জীবসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সর্বনিম্ন একক যা দুটি পদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যেমন *Corchorus capsularis*, *C. olitorius* (গণ নাম একবার পূর্ণ লেখার পর পরবর্তীতে প্রথম অক্ষর নিয়ে সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম আছে), *Artocarpus heterophyllus* (কাঁঠাল), *Mangifera indica* (আম) ইত্যাদি।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

পৃথিবীতে বর্তমান বর্ণনাকৃত (described) ও অনুমিত (estimated) প্রজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ (sourcse : Jeffries. M.J. 1997; Prance, G.T. 1992)

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
ব্যাকটেরিয়া	৪,০০০	১০,০০,০০০
ছত্রাক	৭২,০০০	১৫,০০,০০০
শৈবাল	৪০,০০০	২,০০,০০০

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
লাইকেন	১৩,৫০০	২০,০০০
মস	৮,০০০	৯,০০০
লিভারওর্টস	৬,০০০	৭,০০০
ফার্ন ও ফার্নতুল্য	১২,০০০	১২,৫০০
জিমনোস্পার্ম	৬৫০	৬৫০
অ্যানজিওস্পার্ম	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০

বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

'বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ' অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বর্ণনাকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির (প্রকরণসহ) সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্যাকটেরিয়া	১৭১	ব্রায়োফাইটা	২৪৮
সায়ানোব্যাকটেরিয়া	৩০০	টেরিডোফাইটা	১৯৫
ছত্রাক	২৭৫	নগ্নবীজী উদ্ভিদ	০৫
শৈবাল	২,২৪৫	আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৩,৬১১

এ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর গত পাঁচ-ছয় বছরে শৈবাল ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের আরো কিছু প্রজাতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সংখ্যা উদ্ধৃত সংখ্যার চেয়ে একটু বেশি হবে।

জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন (Population)

অসংখ্য প্রজাতির জীব নিয়ে এই জীবজগৎ গঠিত। সময়ের ব্যবধানে এসব প্রজাতির সংখ্যা ও ধরন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে যেসব জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) লক্ষ করা যায়, কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে জীবের সংখ্যা ও ধরন অন্য রকম ছিল। জীবসমূহ সাধারণত **জীবগোষ্ঠী** তথা **পপুলেশন**-এ (population) বিন্যস্ত থাকে।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে বলা হয় পপুলেশন বা জীবগোষ্ঠী (Population is a set of organisms belonging to the same species and occupying a particular area at the same time)। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল সব প্রজাতির সব পপুলেশন মিলে গঠন করে একটি **জীব সম্প্রদায় বা কমিউনিটি** (community)।

সব জীবের সব কমিউনিটি মিলিতভাবে তৈরি করে **জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার** (biosphere)। বায়োস্ফিয়ারের জীবসমূহ একদিকে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, অপরদিকে পৃথিবীর ভৌত পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল। ভৌত পরিবেশের মধ্যে আছে (i) **বায়ুমণ্ডল** (atmosphere), (ii) **বারিমণ্ডল** (hydrosphere) এবং (iii) **অশ্মমণ্ডল** (lithosphere)। বায়োস্ফিয়ার ও বায়োস্ফিয়ারের সাথে বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের আন্তঃক্রিয়াকে বলা হয় ইকোস্ফিয়ার (ecosphere)।

জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Population)

১। **ঘনত্ব বা বিস্তার** : পপুলেশন ছোট হতে পারে, আবার বেশ বড়ও হতে পারে, তবে পপুলেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর অন্তর্ভুক্ত জীবের **ঘনত্ব** ও **বিস্তার** (density and dispersion)। পপুলেশন এতো বড় হতে পারে যে সামগ্রিকভাবে এটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না, পর্যবেক্ষণ করতে হয় নমুনা অংশের। বিভিন্ন নমুনা অংশের পর্যবেক্ষণের পর ঘনত্বের বিচারে তা প্রকাশ করা হয়। একটি সময়ে একটি একক আয়তন জায়গায় কোনো প্রজাতির কতটি সদস্য থাকে তা হলো পপুলেশনের ঘনত্ব (population density)। যে কোনো প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতর হয়ে থাকে। আবার একই অবস্থানের বিভিন্ন ঋতুতে বা ভিন্ন ভিন্ন বছরে কোনো প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব ভিন্নতর হতে পারে না।

কোনো পপুলেশন বণ্টনের ভৌগোলিক বিস্তারের সীমাকে বলা হয় ঐ পপুলেশনের বিস্তার পরিসর (range)। বিস্তার পরিসরে কোনো প্রজাতির বিস্তার সমপ্রকৃতির (uniform) হতে পারে, অসমপ্রকৃতির (random) হতে পারে, আবার গুচ্ছাকারেও (clustered) হতে পারে।

২। **জন্ম-মৃত্যুর হার :** প্রতিটি পপুলেশনের জন্ম ও মৃত্যু হার থাকে। সময়ের সাথে পপুলেশনের পরিবর্তন ঘটে আবার পৃথিবীর অঞ্চলভেদেও এর পরিবর্তন ঘটে। জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রতি হাজারে কতটি শিশু জন্ম নিল তাকে জন্ম হার বলা হয়। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান হলে পপুলেশন বৃদ্ধি শূন্য (zero population growth) হয়।

৩। **সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি :** প্রতিটি পপুলেশনের একটি **প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি** (biotic potential) থাকে। সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশে কোনো পপুলেশন সর্বাধিক কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে তাকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি ভিন্নতর হয়ে থাকে। দেখা গেছে একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ দশ ঘন্টায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭,৩৭,৪১,৮২৪টি হতে পারে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

৪। **সীমিতকরণ শক্তি :** প্রকৃতিই পপুলেশনের বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। কাজেই কোনো পপুলেশনই তার প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তিকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে লাগাতে পারে না। পরিবেশীয় প্রভাবকসমূহ পপুলেশনের বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। বিবর্তনের কার্যক্রম পপুলেশনেই শুরু হয়।

পপুলেশন বা উদ্ভিদ প্রজাতি বণ্টনে প্রধান প্রভাবকগুলো হলো-

১। **জলবায়ুগত প্রভাবক :** যেমন- সূর্যালোক, পানি ও বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি।
২। **মৃত্তিকাজনিত প্রভাবক :** যেমন- মাটিতে পানির পরিমাণ, মাটির তাপমাত্রা, মাটির বিক্রিয়া, মাটির জৈব পদার্থ, মাটির বাতাস ইত্যাদি।
৩। **ভূ-স্থান সম্পর্কিত প্রভাবক :** যেমন- সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, পাহাড়ের ঢাল ইত্যাদি।
৪। **জীব সম্পর্কিত প্রভাবক :** যেমন- উদ্ভিদের সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্ক, ধারক উদ্ভিদ ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ ইত্যাদি।

জীব সম্প্রদায় (Biotic Community)

সাধারণত পৃথিবীর কোনো স্থানে বা কোনো পরিবেশেই এককভাবে কোনো জীব বা জীবগোষ্ঠী বাস করে না বা বাস করতে পারেও না। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের জীবসমূহ একই পরিবেশে একই স্থানে মিলেমিশে বাস করে। একই পরিবেশে, একই স্থানে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব প্রজাতিকে একত্রে বলা হয় জীব সম্প্রদায়। **জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ, যারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহনশীল ও নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল** (A biotic community is a naturally occurring assemblage of plants and animals that live in the same environment are mutually sustaining and interdependent and are constantly fixing and dissipating energy- Smith 1966)। সহজভাবে বলা যায়, জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থান। একটি বড় মরুভূমি বা তৃণভূমির যেমন নির্দিষ্ট জীব সম্প্রদায় থাকে, আবার ছোট একটি ডোবা, তারও একটি জীব সম্প্রদায় থাকে।

জীব-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য

১। **প্রজাতির বিভিন্নতা :** প্রত্যেক জীব সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত। এদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্প্রদায়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভিন্নতর হয়। প্রত্যেক জীব সম্প্রদায়ের জীবসমূহ খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন ইত্যাদি ব্যাপারে একে অন্যের উপর ও জড় পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়।

২। **বৃদ্ধির ধরন ও গঠন :** একটি জীব সম্প্রদায়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের বৃদ্ধির ধরন ও গঠন বিভিন্ন রকম হয়।

৩। **আধিপত্য :** জীব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত সব প্রজাতি সমান ভূমিকা পালন করে না। সম্প্রদায়ভুক্ত বহু প্রজাতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি এদের সংখ্যা, আকার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা পুরো সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

৪। **স্তরবিন্যাস :** প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুযায়ী লম্বালম্বি স্তরবিন্যাস থাকে, যেমন একটি বন সম্প্রদায়ে (forest community)– (i) ওভারস্টোরি স্তর- সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষগুলো এই স্তর গঠন করে থাকে এবং অন্যদের উপর ছায়া দিয়ে থাকে। এই স্তরে বসবাসকারী পাখিও ভিন্ন প্রজাতির হয়। (ii) আন্ডারস্টোরি- ওভারস্টোরি থেকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার বৃক্ষ প্রজাতিগুলো নিয়ে এই স্তর গঠিত। এরাও তেমন ছায়াপ্রিয় নয়। (iii) গুল্মজাতীয় স্তর- ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো নিয়ে এই স্তর গঠিত। (iv) চারাস্তর- বড় বৃক্ষের চারা এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে এই

...। (v) ভূ-সংলগ্ন স্তর- এই স্তরে প্রচুর হিউমাস থাকে এবং এই স্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ... ইত্যাদি থাকে। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো বিয়োজক অর্থাৎ জৈব বস্তুর পচনে সাহায্য করে।

২। ক্রমাগমন : কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জীব সম্প্রদায় বহুদিন বসবাসের কারণে ঐ পরিবেশের পরিবর্তন ... পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে কোনো কোনো জীবপ্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে আর কোনো কোনো জীবপ্রজাতির আবির্ভাব ... একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত এমন হতে থাকে। একটি পুকুর বহুদিনের ব্যবধানে একটি জঙ্গলে পরিণত ... পারে।

৩। খাদ্য স্তর গঠন ও পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা : একটি সম্প্রদায়ভুক্ত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি খাদ্য শৃঙ্খল ও ... শক্তি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এতে উৎপাদনকারী, তৃণভোজী, মাংসভোজী, পচনকারী সব ধরনের জীবেরই সমাবেশ ...।

৪। সময়ের সাথে সম্প্রদায়ের পরিবর্তন : সময় ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতিরও পরিবর্তন ...। তাই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জীব প্রজাতির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীত, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে এই পরিবর্তন ...নীয়।

বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুসংস্থান (Ecosystem)

কোনো স্থানের (একটি পুকুর, তৃণভূমি, চারণভূমি, জঙ্গল) জীব সম্প্রদায় ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম। জড় (মাটি, পানি, আলো, জৈব ও অজৈব বস্তু) এবং জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, অণুজীব) উপাদান দিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়। একটি বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান হলো :

১। উৎপাদক (Producer) : উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদ। পুকুর বা বিলের প্রধান উৎপাদক হলো ফাইটোপ্লাংকটন (ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ = *Spirulina, Eudorina, Pandorina* etc.)। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে। এই খাদ্যই প্রাণিজগতকে টিকিয়ে রাখে। প্রকৃতপক্ষে সবুজ উদ্ভিদ তাদের উৎপাদিত খাদ্যের ভেতরে শক্তি ধরে রাখে যা পরে খাদকে প্রবাহিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে) সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি বন্ধন হয় তাকে বলা হয় মোট উৎপাদন (Gross production) এবং শ্বসন কার্যে শক্তি ব্যয় হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় প্রকৃত উৎপাদন (Net production)। প্রতি ইউনিট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় সেই হারকে বলা হয় Productivity।

২। খাদক (Consumer) : উৎপাদক খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারাই খাদক। খাদক হলো প্রাণিকুল। পুকুরে জুপ্লাংকটন (ক্ষুদ্রকায় প্রাণী = *Cyclops, Cypris, Daphnia*) সরাসরি ফাইটোপ্লাংকটন খেয়ে থাকে, তাই জুপ্লাংকটন হলো প্রাথমিক খাদক (Primary consumer)। তিতপুঁটি, মলা, খলিশা ইত্যাদি জুপ্লাংকটন খেয়ে থাকে, তাই এরা হলো সেকেন্ডারি খাদক। গজার, শোল, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মলা, খলিশা খেয়ে থাকে তাই এরা হলো টারশিয়ারি খাদক। মাছরাঙা, বক এরাও টারশিয়ারি খাদক হতে পারে।

৩। বিয়োজক (Decomposer) : বাস্তুতন্ত্রের মৃত জীবদেহ বা দেহাংশ পচিয়ে জৈব ও অজৈব পদার্থরূপে রূপান্তর করে কতক ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক। তাই ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো বিয়োজক। মৃত জীবের জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে বলে এদেরকে বলা হয় স্যাপ্রোফায (saprophage)। এদেরকে ট্রান্সফরমারও বলা হয়। অবশ্য এরা খাদ্য শৃঙ্খলের অংশ নয়, তবে বিয়োজক না থাকলে খাদ্য শৃঙ্খল বন্ধ হয়ে যায়। উৎপাদক থেকে বিভিন্ন জীবস্তরের মধ্য দিয়ে খাদ্যশক্তির প্রবাহকে খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন বলে। ফুড চেইনের বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে ট্রফিক লেভেল (Trophic level) বলে। প্রকৃতিতে যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত থাকে যাকে ফুড ওয়েব (food web) বা খাদ্যজাল বলে। ... *Spirulina* (উৎপাদক), মলা মাছ (সেকেন্ডারি খাদক), শোল, গজার, বোয়াল মাছ (টারশিয়ারি খাদক) সবই খায়।

...টি খাদ্য শৃঙ্খল :

...	→ প্রাথমিক খাদক →	সেকেন্ডারি খাদক	→ টারশিয়ারি খাদক
ফাইটোপ্লাংকটন	→ জুপ্লাংকটন →	ছোট মাছ (মলা, তিতপুঁটি)	→ শোল, গজার, বোয়াল বা মাছরাঙা, বক
		ছোট মাছ (হেরিং ফিশ)	→ হাঙর
ফাইটোপ্লাংকটন	→ জুপ্লাংকটন →	ব্যাঙ	→ বাজপাখি
... উদ্ভিদ	→ ঘাসফড়িং		

ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological Pyramid)

সাধারণত দেখা যায় একটি ইকোসিস্টেমে উৎপাদকের (সবুজ উদ্ভিদ) তুলনায় প্রাথমিক খাদকের (যারা সরাসরি সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে) সংখ্যা কম থাকে, আবার প্রাথমিক খাদকের তুলনায় সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা কম থাকে; সেকেন্ডারি খাদকের তুলনায় টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম থাকে। খাদ্যস্তরগুলোর মধ্যকার এরূপ সম্পর্ক নিয়ে নকশা আঁকলে দেখা যাবে একটি পিরামিডের আকৃতি ধারণ করেছে। বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে। ইকোলজিক্যাল পিরামিড নিম্নরূপ হতে পারে: ১। সংখ্যার পিরামিড, ২। বায়োমাস-এর পিরামিড এবং ৩। শক্তির পিরামিড।

১। **সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers)** : সাধারণত প্রারম্ভিক খাদ্যস্তরে (প্রডিউসার) জীবের সংখ্যা পরবর্তী খ্যাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি থাকে। **কোনো ইকোসিস্টেমে খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যাভিত্তিক সম্পর্ক দেখানোর জন্য অঙ্কিত নকশাকে সংখ্যার পিরামিড বলে।** তৃণভূমির একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদের সংখ্যার তুলনায় ঐ তৃণসমূহের উপর নির্ভরশীল প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম হবে। আবার ঐ খাদকের সংখ্যার তুলনায় এদের উপর নির্ভরশীল সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হবে। সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যার তুলনায় টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হবে। সর্বোচ্চ খাদকের সংখ্যা সবচেয়ে কম। **সংখ্যার পিরামিডে প্রতিটি খাদ্যস্তরে** (trophic level) **জীবের সংখ্যা দেখানো হয়।**

চিত্র ১২.২ : তৃণভূমির একটি সংখ্যার পিরামিড।

চিত্র ১২.৩ : একটি বায়োমাস-এর পিরামিড।

২। **জীবভর বা বায়োমাস-এর পিরামিড (Pyramid of biomass)** : বায়োমাস (biomass) হলো কোনো একটি ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থিত সকল জৈববস্তুর মোট ভর (mass) বা মোট পরিমাণের (amount) হিসাব (Biomass is a quantitative estimate of the total mass or amount of living material)। অর্থাৎ, **জীবজ পদার্থের মোট শুষ্ক ওজনই হলো বায়োমাস।** বায়োমাস, মোট ঘনফল হিসেবে (total volume), শুষ্ক ওজন হিসেবে (dry weight) এবং তাজা ওজন হিসেবে (fresh weight) প্রকাশ করা যায়। কোনো একটি ইকোসিস্টেমের খাদ্যস্তরগুলোর বায়োমাস নির্ণয় করে এদের ফলাফল দিয়ে অঙ্কিত রৈখিক চিত্রকে **বায়োমাস-এর পিরামিড** বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বৃক্ষের বায়োমাস, এর উপর নির্ভরশীল পাখির বায়োমাস হতে বেশি। আবার পাখিগুলোর বায়োমাস, তাদের উপর নির্ভরশীল পরজীবী পোকামাকড়গুলোর বায়োমাস অপেক্ষা বেশি। **বায়োমাসের পিরামিডে প্রতিটি খাদ্যস্তরে** (trophic level) **মোট বায়োমাসের পরিমাণ দেখানো হয়।**

৩। **শক্তির পিরামিড (Pyramid of energy) :** একটি ইকোসিস্টেমের নির্দিষ্ট এলাকাতে এবং নির্দিষ্ট সময়কালে প্রতি খাদ্যস্তরের জীব কর্তৃক ব্যবহৃত মোট শক্তির হিসাব অনুযায়ী অঙ্কিত নকশাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়। সাধারণত কোনো ইকোসিস্টেমের এক বর্গমিটার এলাকা এবং এক বছর সময়কালের একক হিসেবে ব্যবহৃত শক্তির হিসাব করা হয়।

km নয়

চিত্র ১২.৪ : পুকুরের একটি শক্তির পিরামিড।

চিত্র ১২.৫ : সমুদ্রের খাদ্য পিরামিড।

কোনো ইকোসিস্টেমের এক বর্গমিটার এলাকায় এক বছর সময়কালে প্রথম খাদ্যস্তরের জীব তথা উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে, তা দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি। আবার দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি তৃতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি। চতুর্থ স্তরের জীব সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে। শক্তির পিরামিডে প্রতি খাদ্যস্তরের বায়োমাসে শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

শক্তি প্রবাহ (Energy flow) : ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে সূর্য শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ (energy flow, ... সৌর আলোক শক্তির মাত্র ০.০১ ভাগ) বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধৃত হয় এবং গ্লুকোজের মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরে উত্তাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয় ... চূড়ান্ত পর্যায়ে এই শক্তি শূন্যে (space) চলে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। শক্তি প্রবাহিত হয় ... একমুখী (linear)। কাজেই শক্তি প্রবাহ একমুখী ... এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করতে পারে না। ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ ঘটে খাদ্য শৃঙ্খলে (food chain)। যে গতিপথে খাদ্য এক স্তর ... ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে। ... (trophic or feeding level) থেকে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হয় সেই গতিপথকে খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন (food chain) বলে। খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তি পর্যায়ক্রমে খাদ্যের মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয়। প্রকৃতিতে যে কোনো ইকোসিস্টেমে উৎপাদক সূর্য শক্তিকে গ্রহণ করে খাদ্য শৃঙ্খল তথা ফুড চেইন-এর সূচনা করে। প্রকৃতিতে ... একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। পরস্পর একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের জটিল সংযোগ অবস্থাকে ফুড ওয়েব (food web) বলে।

শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য : ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। শক্তি প্রবাহ একমুখী।

২। শক্তির মূল উৎস সৌরশক্তি।

৩। সৌরশক্তি প্রথমে উৎপাদকের দেহে আহরিত হয় এবং পরে তা বিভিন্ন খাদকে স্থানান্তরিত হয়।

(i) সূর্য → (ii) উৎপাদক → (iii) খাদক (প্রাথমিক → সেকেন্ডারি → টারশিয়ারি)।

৪। খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় ঘটে।

শক্তি ইকোসিস্টেমে (খাদ্য হিসেবে) নিম্নরূপে প্রবাহিত হয় :

১। উৎপাদক (Producer) → ২। তৃণভোজী খাদক (Herbivores) → ৩। মাংসাশী খাদক (Carnivores)

শক্তি প্রবাহের দশমাংশ নিয়ম : খাদকরা যত উৎপাদককে ভক্ষণ করে তার দশমাংশ মাত্র ব্যবহারকারীর (খাদকের) দেহ গঠনের কাজে লাগে। যেমন- ১টি হরিণ যদি ১০০ কেজি তৃণ আহার করে তাহলে মাত্র ১০ কেজি তার দেহ গঠনের কাজে লাগে। ১টি বাঘ যদি হরিণের ১০ কেজি মাংস খায় তাহলে ঐ মাংসের মাত্র ১ কেজি বাঘের দেহ গঠনে কাজে লাগে। শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যায় এটি ১০ শতাংশ নিয়ম নামে পরিচিত। Lindenmann (1942) এ মতবাদের প্রবর্তক।

বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন

পরিবেশ থেকে জীবদেহে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ ও জমা হতে পারে। দেহে জমাকৃত বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্ব নিম্নস্তরের জীবদের (যেমন-উৎপাদক) তুলনায় পরবর্তী স্তরের জীবদেহে অধিক থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অবস্থানরত জীবদেহে বিষের ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন (Biological Magnification)। আমেরিকাতে (১৯৫০ দশকে) ফসলে DDT প্রয়োগের বিষক্রিয়ায় ঈগল (খাদ্য শৃঙ্খলে সর্বোচ্চ স্তরে) প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। পরবর্তীতে সরকার DDT নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

> **কাজ :** সংখ্যার পিরামিড ও বায়োমাসের পিরামিড দুটির মধ্যে তুলনা কর। লক্ষ কর একটি অপরটির উল্টো। সংখ্যার পিরামিড-ও শক্তির পিরামিড এর মিল খুঁজে দেখ। তোমার মতো করে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

জীবের অভিযোজন (Adaptation of organisms)

পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সব পরিবেশে সব ধরনের জীব বাস করতে পারে না। প্রতিটি জীব তখনই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যখন সে তার সুবিধা অনুযায়ী একটি সুন্দর পরিবেশ পায়। **একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনো জীবের খাপ খাইয়ে নেয়াটাই হলো ঐ জীবের অভিযোজন।** কোনো নিবাসে বসবাসের জন্য একটি জীব যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তাকে অভিযোজন বলে। কতক জীব মিঠা পানিতে বাস করে, কতক জীব লোনা পানিতে বাস করে, কতক জীব মরুভূমিতে বাস করে, আবার কতক জীব স্বাভাবিক স্থলভাগে বাস করে। বাসস্থানে পানির প্রাপ্যতার ধরন এখানে একটি বড় নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পানিতে বাসকারী জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য এক রকম, স্থলে বাসকারী জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য অন্য রকম। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বাসকারী জীবের গঠন ও আচরণ মরুভূমিতে বাসকারী জীবের গঠন ও আচরণ থেকে পৃথক ধরনের। কাজেই দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশীয় অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য (অভিযোজনের জন্য) ঐ পরিবেশে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের গঠনগত ও আচরণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ ঐ জীব সম্প্রদায়ের গঠনগত ও আচরণগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা ঐ বিশেষ পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। জলাময় (জলজ), মরুময় (মরুজ) এবং লবণাক্ত পরিবেশে বাস করতে গিয়ে পরিবেশ অনুযায়ী জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। ওয়ার্মিং (Warming-1909) মাটির প্রকৃতি ও মাধ্যমে পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদগুলোকে প্রধানত তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করেন; যেমন-হাইড্রোফাইট, জেরোফাইট এবং মেসোফাইট। লোনা পানির অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার জন্য বিশেষ ধরনের লবণ সহনীয় উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। এরা **হ্যালোফাইট** বা লোনা মাটির উদ্ভিদ। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

জলজ উদ্ভিদ (Hydrophytes)

জলে (পানিতে) যাদের জন্ম তারাই জলজ। যেসব উদ্ভিদ পানিতে জন্মে এবং পানিতে বিস্তার লাভ করে সেসব উদ্ভিদকে বলা হয় জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট্স (hydro = পানি, phyte = উদ্ভিদ)। জলজ উদ্ভিদ পানিতে নিমজ্জিত, পানিতে ভাসমান বা উভচর হতে পারে। পানিতে জন্ম ও সফল বৃদ্ধির জন্য জলজ উদ্ভিদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

জলজ উদ্ভিদের প্রকারভেদ

বর্ণনা বা পাঠদানের সুবিধার জন্য জলজ উদ্ভিদসমূহকে তাদের সঠিক অবস্থা ও অবস্থানের ভিত্তিতে চার প্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Submerged hydrophytes) : যেসব উদ্ভিদ মূল দ্বারা পানির নিচে মাটিতে আবদ্ধ থাকে এবং সম্পূর্ণ দেহটিই পানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সেসব উদ্ভিদকে নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। হাইড্রিলা (*Hydrilla verticillata*), পাতা শেওলা (*Vallisneria spiralis*), ঝাঁঝি (*Potamogeton nodosus*), সিরাটোফাইলাম (*Ceratophylum demersum*) ইত্যাদি নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

২। মুক্ত-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Free floating hydrophytes) : জলাশয়ে পানির নিচে মাটির সাথে যেসব উদ্ভিদের কোনো সংযোগ থাকে না, ফলে পানির উপরিতলে মুক্তভাবে ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করে তাদেরকে মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে। কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), ক্ষুদিপানা (*Lemna minor*), গুঁড়িপানা (*Wolffia microscopica*), টোপাপানা (*Pistia stratiotes*), কুতিপানা (*Azolla*), মুসাকানিপানা (*Salvinia*) এসব মুক্ত-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ। পানা

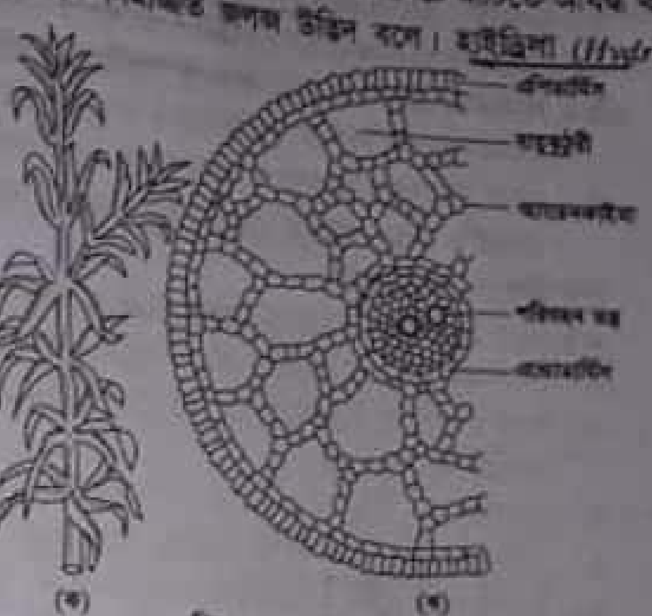

চিত্র ১২.৭ : *Hydrilla verticillata* (একটি জলজ উদ্ভিদ) (ক) বহিঃস্থ গঠন, (খ) কান্ডের অন্তর্গঠন।

৩। মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Rooted floating hydrophytes) : যেসব জলজ উদ্ভিদের মূল জলাশয়ের পানির নিচে মাটিতে সংযুক্ত থাকে কিন্তু দীর্ঘ বোঁটার কারণে পাতাগুলো পানির উপরে ভাসমান থাকে তাদেরকে বলা হয় মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। সাদা শাপলা (*Nymphaea pubescens*), লাল শাপলা (*Nymphaea rubra*), নীল শাপলা (*Nymphaea nouchali*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*), পানিকলা (*Ottelia alismoides*) কয়েকটি মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

৪। উভচর উদ্ভিদ (Amphibious plants) : যেসব উদ্ভিদ জলাশয়ের কিনারে মাটিতে শিকড়াবদ্ধ থাকে এবং কাণ্ডের অধিকাংশই পানিতে ভাসমান থাকে সেসব উদ্ভিদকে উভচর উদ্ভিদ বলে। কলমিলতা (*Ipomoea aquatica*), হেলেঞ্চা (*Enhydra fluctuans*), কেশরদাম (*Ludwigia repens*) কয়েকটি উভচর উদ্ভিদের উদাহরণ।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা মধ্যপর্ব বিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙরাবদ্ধ ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।

২। জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে মূল থাকে না বললেই চলে।

৩। কাণ্ড ও পাতার বহিস্ত্বক কিউটিনযুক্ত থাকে না; পত্ররন্ধ্র থাকে না, বা কম থাকে। পত্ররন্ধ্রে প্রহরী কোষ নাও থাকতে পারে।

৪। এদের মূল ও কাণ্ডে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে। বায়ুকুঠুরী বিশিষ্ট গঠনকে অ্যারেনকাইমা বলে।

৫। জলজ উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে, অনেক সময় জাইলেম অনুপস্থিত থাকে। মেকানিক্যাল টিস্যুই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব শক্ত হয় না।

৬। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of hydrophytes)

অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন

১। মূল সুগঠিত হয় না, সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়। অনেক উদ্ভিদের (যেমন- গুঁড়িপানা = *Wolffia*) মূল থাকেই না।

২। মূলে মূলরোম অনুপস্থিত (কারণ পানি শোষণের জন্য মূলরোমের দরকার হয় না)।
৩। কোনো কোনো উদ্ভিদের অস্থানিক ভাসমান মূল (যেমন- কেশরদাম- *Jussiaea repens*) থাকে। জলজ উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।
৪। নিমজ্জিত উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও স্পঞ্জী হয়, মধ্যপর্ব লম্বা হয়। ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় ও নরম হয়।
৫। পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম থাকে। তাই পানির টানে ছিঁড়ে যায় না। অনেক উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত স্ফীত যা উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। যেমন- কচুরিপানা।

অন্তর্গঠনগত অভিযোজন

১। ত্বকে কিউটিকল থাকে না, অথবা খুবই পাতলা থাকে। কারণ পানির অপচয় রোধ করার প্রয়োজন হয় না।
২। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।
৩। কাণ্ড ও পাতার অভ্যন্তরে বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে। বায়ুকুঠুরী বায়ু (O_2, CO_2) ধরে রাখে। বায়ুকুঠুরী উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।
৪। মেকানিক্যাল টিস্যু থাকে না বা কম থাকে। তাই সহজে পানির টানে ভেঙ্গে যায় না।
৫। পরিবহন টিস্যু থাকে না বা অগঠিত, কারণ পানি পরিবহনের প্রয়োজন পড়ে না।
৬। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতায় স্টোম্যাটা থাকে না, অন্যান্য উদ্ভিদেও স্টোম্যাটা কম থাকে। কারণ, গ্যাস নিয়ন্ত্রণে তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন

১। সব অঙ্গ দিয়েই পানি শোষণ করতে পারে (ত্বকে কিউটিকল না থাকায়), পানি শোষণের জন্য মূল ও মূলরোমের প্রয়োজন হয় না।
২। কাণ্ড ও পাতার ত্বকেও ক্লোরোফিল থাকে, তাই পানির নিচে কম আলোতে ও কম CO_2 যুক্ত পরিবেশে প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।
৩। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে (কারণ পরাগায়ন অনিশ্চিত)।
৪। কাণ্ড ও পাতার বায়ুকুঠুরীতে বায়ু জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণের অসুবিধা হয় না।
৫। প্রস্বেদন হার কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রস্বেদনের টান দরকার হয় না।

জলজ প্রাণীর অভিযোজন

জলজ প্রাণীরা জলে বাস করতেই বিশেষভাবে অভিযোজিত। জলজ প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই হলো মাছের বিভিন্ন প্রজাতি। পানিতে থাকার সুবিধার জন্য এদের দেহের ভেতরে পটকা নামক বায়ু থলি থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ফুলকা থাকে। পানিতে চলাচলের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাখনা থাকে। দেহের আকৃতিও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ব্যাঙ, কাছিম, কুমির, সাপ এগুলোও পানিতে বাস করতে পারে। এদের দেহের বিশেষ গড়ন, লোমহীন পিচ্ছিল ত্বক, পা বা লেজ দিয়ে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা এবং পানির নিচে অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

মরুজ উদ্ভিদ (Xerophytes)

মরু পরিবেশে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেসব উদ্ভিদই মরুজ উদ্ভিদ। মরু অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত সাধারণত ২৫ সেমির (১০ ইঞ্চি) কম, তাই মাটিতে পানির পরিমাণও অনেক কম। অধিকাংশ মরু অঞ্চল কংকর ও বালিময়, মাটি প্রায় পানিশূন্য অবস্থায় থাকে, তারপরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তেমন প্রতিকূল পরিবেশেও কিছু উদ্ভিদকে জন্মাতে দেখা যায়। এসব উদ্ভিদ সাধারণ বৃষ্টিশূন্য খরা অঞ্চলেও সহজেই জন্মাতে পারে। আবার আমাদের দেশের মতো স্বাভাবিক পরিবেশেও জন্মাতে পারে। দেহে পানি সংরক্ষণ, অল্প আয়াসে মূল দিয়ে পানি শোষণ এবং কাণ্ড বা পাতার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধকরণ— এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটি বা সবকটি বৈশিষ্ট্যই একটি মরু উদ্ভিদে থাকতে পারে।

খেজুর (*Phoenix dactylifera*), শতমূলী (*Asparagus racemosus*), শতাব্দী উদ্ভিদ (*Agave americana*), আকন্দ (*Calotropis procera*), ঘৃতকুমারী (*Aloe vera*), করবী (*Nerium indicum*), ফণিমনসা (*Opuntia dillenii*), শাকরকুটি (*Euphorbia antiquorum*), বিভিন্ন ক্যাক্টাস প্রজাতি ইত্যাদি মরু উদ্ভিদের কতিপয় উদাহরণ। এর সবকটিই বাংলাদেশে স্বাভাবিক জন্মে থাকে।

মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of xerophytes)

বাহ্যিক অভিযোজন

১। মরুজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত আকারে ছোট ও ঝোপযুক্ত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ বালির ঝাপটা ও বায়ুর ঝাপটা সহ্য করতে পারে, তাই ভেঙে যায় না।

২। মূল মাটির উপরিতলের কাছাকাছি অথবা খুবই গভীরে প্রলম্বিত। তাই উপর থেকে সামান্য বৃষ্টির পানি যেমন শোষণ করতে পারে, দ্রুত মাটির গভীরে চলে যাওয়া পানিও শোষণ করতে পারে। অর্থাৎ এদের মূল সুগঠিত।

৩। অনেক উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড চ্যাপ্টা, রসালো ও সবুজ থাকে। তাই পানি ধরে রাখতে পারে।

৪। পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট, পুরু বা কাঁটায় রূপান্তরিত। তাই পানির অপচয় রোধ হয়।

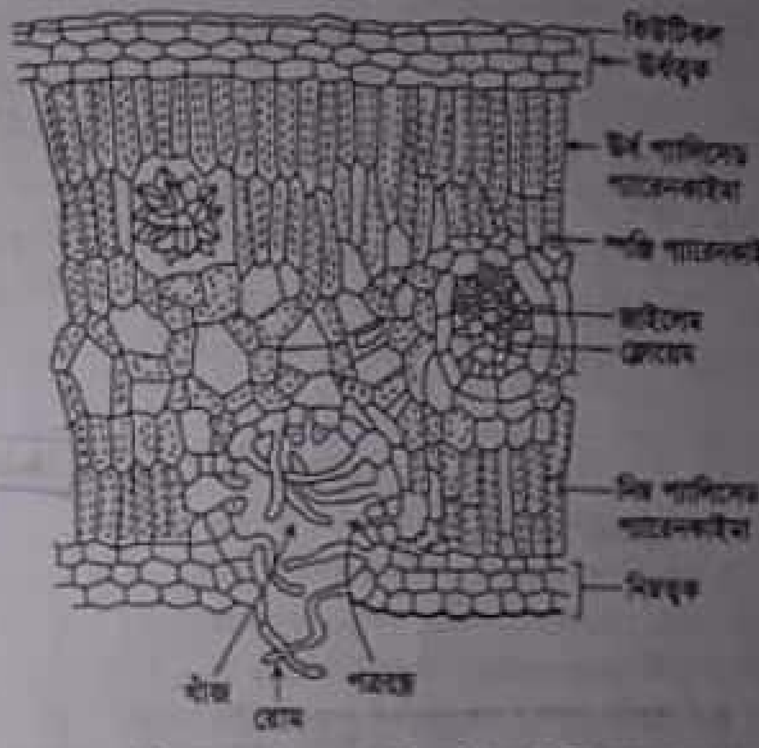

চিত্র ১২.৭ : *Nerium* (করবী- একটি মরু উদ্ভিদ) পাতার প্রস্থচ্ছেদ।

অন্তর্গঠনিক অভিযোজন

১। পাতার কিউটিকল পুরু, কাণ্ড ও পাতায় মোমের আবরণ থাকে। তাই প্রস্বেদন হ্রাস পায়।

২। পাতার প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঘন ও সুদৃঢ়, স্টোম্যাটা (পত্ররন্ধ্র) ত্বকের গভীরে (লুকায়িত) অবস্থিত, অনেক সময় লম্বা রোম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাই পানি বাষ্পায়ন ও নির্গমন কম হয়।

৩। প্যারেনকাইমা কোষ স্ফীতিশীল ও রসালো। তাই প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে পারে।

৪। এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট। তাই পানির অপচয় রোধ ও খরায় নেতিয়ে পড়ে না।

৫। কাণ্ডের মেকানিক্যাল টিস্যু ও পরিবহন টিস্যু সুগঠিত, মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট ও ঘন সন্নিবেশিত। এটি পানির অপচয় রোধ, পানি ধরে রাখা এবং গাছকে খরা সহিষ্ণু করার কৌশল।

শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন

১। মরু উদ্ভিদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি। তাই পানি শোষণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পানি শোষণ সহজ হয়, খরচ কম হয় এবং অপচয় রোধ হয়।

২। প্রস্বেদনের হার খুবই কম। তাই শোষিত পানির পরিমাণ কম হলেও তা দেহাভ্যন্তরে ধরে রাখতে পারে।

৩। বৃষ্টির সাথে সাথে পানি শোষণ করে নিতে সক্ষম।

৪। মরু উদ্ভিদসমূহ বৃষ্টির পরপরই অতি অল্প সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সক্ষম।

৫। কম পানি, অতি উত্তাপ ইত্যাদি কারণে এনজাইমের ক্রিয়া কিছুটা কম থাকে তাই অধিকাংশে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীর গতি হয়।

৬। পাতার ভেতরের দিকে অর্থাৎ নিম্নত্বকে পত্ররন্ধ্র থাকে।

মরুজ প্রাণীর অভিযোজন

মরুজ পরিবেশ চরমভাবাপন্ন। এখানে খুব কম সংখ্যক প্রাণী প্রজাতিই বাস করে। তীব্র আলো, উচ্চতাপ, উষ্ণ পাথর এবং স্বল্পপানি—এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা। উট, সাপ, বিশেষ ধরনের ইঁদুর, মরু গিরগিটি, পাখি, মরু বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী মরু অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

এদের অনেকেই দিনের বেলায় গর্তে লুকানো থাকে এবং রাত্রিতে বাইরে বের হয়। এরা অধিকাংশই ... মরুবাসী প্রাণী দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকতে পারে। এদের অধিকাংশই রসালো খাদ্যে বিদ্যমান পানি দ্বারা পানির অভাব পূরণ করে। এদের অনেকের গায়ের ত্বক পুরু থাকে যাতে পানির অপচয় কম হয় এবং তাপ সহ্য করতে পারে। মরু ঝড়ের বালি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদের অনেকের নাকের ছিদ্র অত্যন্ত সরু থাকে, কানের ছিদ্র ... লোমাবৃত থাকে। চোখ ঢেকে রাখার আবরণ থাকে, অনেকের পায়ের তলায়ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। দিনের ... এড়ানোর জন্য অধিকাংশ প্রাণী নিশাচর প্রকৃতির হয়। উটের দেহাভ্যন্তরে পানি জমা করে রাখার ব্যবস্থা আছে। ... গাছের কচি পাতা ও বাকল চিবিয়ে পানি পান করে।

লোনা মাটির উদ্ভিদ (Halophytes)

লোনা পরিবেশে অধিকাংশ উদ্ভিদই জন্মাতে পারে না, তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কতিপয় উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মাতে পারে। যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে (মাটিতে ও পানিতে) সহজেই জন্মাতে ও বিস্তার লাভ করতে পারে সেসব উদ্ভিদই লোনা মাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophytes)। সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ারভাটা অঞ্চলে যে বিশেষ ধরনের হ্যালোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে সেসব উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে।

চিত্র ১২.৮ : লোনা মাটি উদ্ভিদের শ্বাসমূল।

লোনামাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। লোনামাটির উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রসালো থাকে।

২। এদের স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল থাকে যা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত থাকে।

৩। মাটিতে O_2 কম থাকায় অনেক উদ্ভিদে শ্বাসমূল বা নিউমেটোফোর (pneumatophore or breathing root) সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের শাখা মূল থেকে শ্বাসমূল মাটির উপরে উঠে আসে। এদের গায়ে শ্বাসছিদ্র থাকে, যা দিয়ে বায়ু থেকে O_2 গ্রহণ করে।

৪। মূলের অভ্যন্তরে (কর্টেক্স-এ) বড় বড় বায়ুকুঠরী থাকে।

৫। লোনামাটির উদ্ভিদে প্রস্বেদন কম হয়।

৬। অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (viviparous germination) হয়, যেমন *Rhizophora* গণের প্রজাতি।

৭। এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং এদের অভিস্রাবণিক চাপ বেশি থাকে।

৮। উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট হয়।

বোরা (*Rhizophora conjugata*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), পশুর (*Zylocarpus moluccensis*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হারগোজা (*Acanthus illicifolius*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*) কয়েকটি লোনামাটির উদ্ভিদ।

লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptaion of halophytes)

১। মাটির গভীরতার সাথে সাথে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের মূলতন্ত্র মাটির খুব গভীরে না গিয়ে ... উপরের স্তরেই বিস্তৃত থাকে।

২। অধিক লবণাক্ত পানি শোষণ করতে অসুবিধা হয়, তাই বৃষ্টির সময় ... কিছুটা কমে আসলে উদ্ভিদ দ্রুত পানি শোষণ করে তাদের ...কাইমা কোষে সঞ্চয় করে রাখে। এ কারণে এদের কাণ্ড, পাতা ও মূলকে ... রসালো দেখায়।

৩। জোয়ার-ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ... উদ্ভিদে স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল থাকে।

৪। শ্বাসমূলের ভেতরে বায়ুকুঠুরী থাকে এবং সে কুঠুরীতে বায়ু (O_2) ধরে ... পারে। শ্বাসমূলের কারণে মূল ও বাইরের সাথে গ্যাসের বিনিময় সহজ ...।

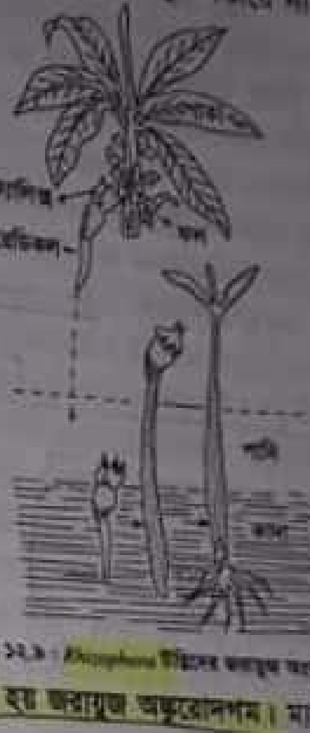

চিত্র ১২.৯ : Rhizophora উদ্ভিদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম।

৫। লবণাক্ত মাটিতে এবং জোয়ার-ভাটার স্থানে বীজ এক স্থানে টিকে ... কঠিন। তাই বহু উদ্ভিদে গাছে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু ... লম্বা ভ্রূণমূল সৃষ্টি হয়। মূল একটু বড় ও ভারী হলে মাটিতে পড়ে এবং ... কাদা মাটিতে ঢুকে যায় ও স্থায়ী হয়। ফলে জোয়ার-ভাটার টানে তা ... যায় না। উদ্ভিদে থাকা অবস্থায় ফলের অভ্যন্তরে বীজের অঙ্কুরোদগমকে বলা হয় জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম। ম্যানগ্রোভ ...জের অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম লক্ষ্য করা যায়।

৬। শ্বাসমূলের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

৭। যথেষ্ট পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে না বলে প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রিত থাকে।

...ণাক্ত পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন

লবণাক্ত পরিবেশ বলতে এখানে সুন্দরবনের পরিবেশকে ধরে নেয়া হয়েছে, বিশাল সমুদ্রকে নয়। এখানে আছে ...সংখ্য প্রজাতির মাছ, পাখি, সাপ, হরিণ, বাঘ, বানর, বনমোরগ, শুকর, কাছিম, কাঁকড়া ইত্যাদি। লোনা পানিতে যেসব ... বাস করে তারা লোনা পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। স্তন্যপায়ীরাও অধিক সময় পানির নিচে থাকতে পারে এবং ...নির উপরিতলে এসে শ্বাস নেয়। সুন্দরবনের অন্যান্য প্রায় সব প্রাণীই প্রচুর খাদ্য প্রাপ্তির উপর অভিযোজিত। এরা ...দ্যের অভাব হলে স্থান ত্যাগ করতে পারে। কাছিম ডাঙ্গায় এসে বালির গর্তে ডিম পাড়ে। পানিতে সাঁতার কাটতে এরা ...ভিযোজিত।

মেসোফাইট (Mesophytes)

যে মাটিতে মিষ্টি পানি (লোনা পানি নয়) প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে সে মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদই হলো ...মেসোফাইট (Mesophyte)। আমাদের অধিকাংশ ফলদ বৃক্ষ, ফসল উদ্ভিদ, বাড়ির আশপাশের ঝোপ, রাস্তার ধারের ...গুলো হলো মেসোফাইট। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, শাল, সেগুন এসব মেসোফাইটের উদাহরণ।

বি. দ্র. উদ্ভিদ নিশ্চল, প্রাণী সচল এবং প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করতে পারে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন একই রকম নয়।

কাজ : একটি ছকের মাধ্যমে জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা করে ...খাও। তুলনা করার আগে বিষয়টি বার বার ভালোভাবে পড় এবং বুঝে নাও। মাটিতে পানির পরিমাণ, লবণাক্ততা, ...র গঠন, কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন, স্টোম্যাটা, জনন ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা কর।

জীবভূমি/বায়োম (Biome)

একটি বড় বাস্তুতন্ত্র তথা ইকোসিস্টেমই একটি বায়োম। তুন্দ্রা অঞ্চল একটি বায়োম, মরুভূমি একটি বায়োম, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট একটি বায়োম। একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলা হয় বায়োম। প্রধানত ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান ভেজিটেশন (উদ্ভিজ্জ) মিলিতভাবে এক একটি বায়োম সুনির্দিষ্ট করে। সারা বিশ্বে অনেক বায়োম আছে। নিচে বায়োম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(ক) স্থলজ বায়োম (Terrestrial biome) : যেসব বায়োম স্থলভাগে অবস্থিত তাদের স্থলজ বায়োম বলে। স্থলজ বায়োম প্রধানত নিম্নরূপ :

১। মরুভূমি বায়োম : (Desert biome) : মরুভূমি হলো এমন ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি)-এর কম। এখানে বাষ্পায়ন হার অনেক বেশি। এখানে জলীয় বাষ্প থাকে না। মাটিতে জৈব পুষ্টি খুব কম। মাটিতে পুষ্টি থাকলেও পানির খুব অভাব।

এ ধরনের মরুভূমি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের 30°C ল্যাটিচুডে অবস্থিত। সব মরুভূমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত নয়। সবচেয়ে বড় মরুভূমি সাহারা, যা আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মরুভূমি আছে। মরুভূমিতে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য 30°C পর্যন্ত হতে পারে। মরুভূমিতে অভিযোজিত উদ্ভিদকে জেরোফাইট বলা হয়। মরুভূমিতে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উভয় প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। সাধারণত বছরে একবারই বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির সাথে সাথেই আগের বছরের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং খুব অল্প দিনেই বিকশিত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে যায়। সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে এরা মরেও যায়। মরুভূমির উদ্ভিদের স্টোমাটা সাধারণত রাত্রিতে খোলে, তাই পানির অপচয় হয় না। এরা অধিকাংশই CAM উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, বাবলা, খেজুর, কিছু ইউফরবিয়া, কিছু লিলিয়েসি এবং অ্যাস্টারেসির কিছু উদ্ভিদ জন্মে থাকে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট, দুম্বা, ক্যাঙ্গারু, র‍্যাবিট, খেকশিয়াল প্রধান। সরীসৃপের মধ্যে হর্ণ লিজার্ড, কোরাল সাপ, গিলা মনস্টার ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে শকুন, দাঁড়কাক, মরু পাখি উল্লেখযোগ্য। প্রাণীরা সাধারণত রাত্রে বেশি চলাফেরা করে।

২। তৃণভূমির বায়োম (Grassland biome) : এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫-৭৫ সেমি (১০-৩০ ইঞ্চি), সাধারণত বছরে এক মৌসুমেই বৃষ্টিপাত হয়। ঘাস হলো তৃণভূমি বায়োমের প্রধান ভেজিটেশন। মধ্য কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। তৃণভূমি নানাবিধ তৃণভোজী প্রাণীর চারণ ক্ষেত্র। ঘাসের পাতা সরু এবং খাড়াভাবে থাকে, তাই প্রস্বেদন কম হয়। মাটি হিউমাস সমৃদ্ধ। দিনে ও রাতে তাপমাত্রা কম-বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীতকালে তাপমাত্রা 15°C এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে 32°C এর উপরে উঠে আসে। বহু ঘাস ১২-১৫ সে.মি. লম্বা হয়। যব, গম, রাই বেশি জন্মে। প্রধান প্রাণী হলো বাইসন, জেব্রা, জিরাফ, ঘোড়া, এন্টিলোপ, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি তৃণভোজী। এদের ভক্ষক হলো সিংহ, হায়না ও খেকশিয়াল। কীটপতঙ্গের মধ্যে উঁইপোকা, ঘাসফড়িং, মৌমাছি, প্রজাপতি এবং এদের খাদক হিসেবে পাখি, টিকটিকি, সাপ ও ব্যাঙ বাস করে।

৩। সাভানা বায়োম (Savanna biome) : এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৫০ সেমি (৪০-৬০ ইঞ্চি)। সাভানা এক বিশেষ ধরনের তৃণভূমি, মাঝে মাঝে ছোট বৃক্ষ বা ঝোপ থাকে, যা তৃণভূমিতে থাকে না। সাভানাতে দীর্ঘ শুকনো মৌসুম থাকে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের সীমানায় সাভানা সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াতে সাভানা আছে।

৪। তুন্দ্রা বায়োম (Tundra biome) : সবচেয়ে উত্তরের স্থলজ ভাগের বায়োম হলো তুন্দ্রা। সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, গ্রীনল্যান্ড, আলাস্কা ও উত্তর মেরু অঞ্চল নিয়ে তুন্দ্রা বায়োম গঠিত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কখনো ১৫ সেমি (৫ ইঞ্চি) বা তারও কম, যা বরফ হিসেবে পড়ে। দীর্ঘ শীতকালে এখানে বরফ জমা হয়ে থাকে। ছয় থেকে আট সপ্তাহের গ্রীষ্মকাল দেখা যায় যখন উপরের কিছু বরফ গলে যায় এবং ছোট ছোট জলাভূমি সৃষ্টি হয়। এখানে সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। মৃত জীবদেহ পুষ্টির প্রধান উৎস, যা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ।

তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ মস ও লাইকেন। এখানে বৃক্ষ প্রজাতি কম। উঁচু পর্বতশৃঙ্গে এরূপ অঞ্চল আছে, যাকে আলপাইন তুন্দ্রা বলে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বলগা হরিণ, খরগোস, নেকড়ে, মেরুভাল্লুক প্রধান। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন,

বাজপাখি, হাঁস, পেঁচা, স্যান্ড পাইপার প্রধান। গ্রীষ্মকালে কিছু মশা ও মাছির আগমন ঘটে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শামুক, জোঁক, জলজ বিটল উল্লেখযোগ্য।

৫। বনভূমি বায়োম (Forestland biome) : পৃথিবী পৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি দিয়ে আবৃত থাকে। এটা বৃষ্টিপাত প্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রধান জীবগোষ্ঠি হলো বৃক্ষ এবং কাষ্ঠল উদ্ভিজ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমি বায়োম বিভিন্ন ধরনের :

(i) ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট (Tropical rain forest) : বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ২৫০ সেমি থেকে ৪৫০ সেমি (১০০ ইঞ্চি থেকে ১৮০ ইঞ্চি)। বৃষ্টিপাত প্রায় সারা বছরই হয়, তবে বর্ষাকালে অধিক। সবচেয়ে বড় ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অববাহিকা, দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এরপর আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা এবং ফিলিপাইনের অংশবিশেষে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির উঁচু বৃক্ষ জন্মে। বনের মেঝে (floor) অন্ধকার ও ভেজা থাকে। এসব বনে কোনো একক প্রজাতির উদ্ভিদ আধিপত্য বিস্তার করে না। বনের উপরে ক্যানোপি (canopy) তৈরি হয় ৩০-৪৫ মিটার উঁচু বৃক্ষের প্রজাতি দিয়ে। কিছু উঁচু বৃক্ষ (৬০ মিটার বা বেশি) এই ক্যানোপি ভেদ করে উপরে উঠে যায়, যাদেরকে ইমার্জেন্ট (emergent) বলে। বৃক্ষকে অবলম্বন করে প্রচুর কাষ্ঠল লতা ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে স্পিশিস ডাইভারসিটি অধিক। এ সব ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির পতঙ্গ, পাখি, সরিসৃপ, স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী বাস করে।

(ii) ট্রপিক্যাল সিজনাল ফরেস্ট (Tropical seasonal forest) : ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অঞ্চল থেকে এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কিছুটা কম, তবে এখানকার বৃষ্টিপাত সারাবছর না হয়ে বিশেষ মৌসুমে (বর্ষাকালে) হয়ে থাকে। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় এই বন ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের মতোই, শীতকালে কিছু বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বন এ জাতীয়। বার্মার (মায়ানমার) সেগুন বন এ জাতীয়।

(iii) পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) : ডেসিডুয়াস ফরেস্টে বৃক্ষের পাতা বছরে একবার (বিশেষত শীতকালে বা শুকনো মৌসুমে) ঝরে যায়। ডেসিডুয়াস ফরেস্ট আবার দু'ধরনের, টেম্পারেট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট এবং ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(a) টেম্পারেট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট : এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১০০ সেমি (৩৯ ইঞ্চি), কিন্তু তাপমাত্রা কম। শীতকালে সব বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। উঁচু বৃক্ষের মধ্যে ওক (Oak), ম্যাপল (maple), বীচ (Beech), বার্চ (Birch), চেস্টনাট প্রধান। আমেরিকা (পূর্ব দিক), কানাডা (উত্তর-দক্ষিণ দিক) ইউরোপ (মধ্য ও উত্তর ব্রিটেন, নরওয়ে, সুইডেন), রাশিয়া, পূর্ব এশিয়া, চায়না, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে এ বন আছে। এ অঞ্চলে তুষারপাত হয়।

(b) ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট : এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি (২০০ সেমি, ৭০-৭৫ ইঞ্চি); শীত অপেক্ষাকৃত কম, বরফ পড়ে না। এ বনের অধিকাংশ বৃক্ষই পত্রঝরা। বাংলাদেশের শালবন ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট।

(iv) কনিফার ফরেস্ট (Conifer forest) : এ অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সেমি (২০-৪০ ইঞ্চি); দীর্ঘ শীতকাল ও সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকাল থাকে। তাপমাত্রা –30°C থেকে 30°C মাটি উর্বর এবং লিটার সমৃদ্ধ তাই অস্ট্রীয়া। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কনিফার ফরেস্ট আছে। প্রধান বৃক্ষ পাইন, স্প্রুস, ফার, রেডউড, হেমলক ইত্যাদি। এদের অধিকাংশই চিরসবুজ। প্রাণীর মধ্যে শিয়াল, নেকড়ে, সিংহ, হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর এবং অসংখ্য পোকামাকড় এখানে জন্মে। সামান্য কিছু সরীসৃপ প্রাণীও আছে।

(v) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest) : এ ধরনের বনাঞ্চল ৩২° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণ এর মধ্যবর্তী উপকূলীয় গড়ান অঞ্চলে (intertidal zone) জন্মে। বাংলাদেশের সুন্দরবন এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের বন আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আছে। প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার কারণে মাটি সিক্ত, কর্দমাক্ত এবং লবণাক্ত হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬০-২০০ সেমি। এজন্য বনভূমি তেমন সমৃদ্ধ নয়। এমন পরিবেশে বিশেষ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায় (যেমন-শ্বাসমূল, জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম, ঠেসমূল ও স্তম্ভমূল)। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী, কেওড়া, গরান, গেওয়া, হিজল, গোলপাতা, বাইন ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া হেঁতাল, টাইগার ফার্ন, বিভিন্ন ধরনের আরোহী লতা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাণীগুলো হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মেছো বাঘ, চিত্রা হরিণ, কুমীর, বন্য শুকর, বানর, নানা ধরনের শামুক, সাপ ও পাখি।

(খ) জলজ বায়োম (Aquatic biome) : পৃথিবীপৃষ্ঠে জলময় পরিবেশের বায়োমগুলো একত্রে জলজ বায়োম নামে পরিচিত। জলজ বায়োম মিঠা পানি এবং সাগরে পৃথক প্রকৃতির। মিঠাপানির বায়োম নদী, হ্রদ, হাওড়, বাওড়, জলাভূমি (wetlands) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। ম্যানগ্রোভস্ (mangroves) বনাঞ্চল ওয়েটল্যান্ড বায়োমের অন্তর্গত। ম্যানগ্রোভ ... উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ ল্যাটিচুডের মাঝামাঝি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

জলজ বায়োম প্রধানত দু'প্রকার। মিঠাপানির (স্বাদুপানির) ও লোনাপানির বায়োম।

১। মিঠাপানির বায়োম (Freshwater biome) : পৃথিবীর প্রায় এক শতাংশ মিঠাপানির বায়োম নিয়ে গঠিত। এগুলো ছোট, অগভীর এবং বিচ্ছিন্ন। এগুলো কয়েক ধরনের।

(i) নদী (River) : নদীতে সাধারণত একমুখী স্রোত থাকে। ঝর্ণা, হ্রদ বা হিমবাহ থেকে নদীর উৎপত্তি হয়। নদীর উৎসে প্রচুর পরিমাণে নুড়ি পাথর থাকে। সেখানে পানির স্রোত বেশি থাকে। তাপমাত্রা কম থাকে। পানি ... প্রচুর O_2 থাকে। মাঝামাঝি সমতল অংশ বেশ চওড়া এবং শেষ দিকে পানিতে প্রচুর পলিমাটি থাকায় পানি ঘোলাটে। মাঝামাঝি সমতল অংশে প্রচুর শৈবাল এবং সবুজ উদ্ভিদ জন্মে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নানা ধরনের মাছ, ... সরীসৃপের মধ্যে কুমির, ঘড়িয়াল, সাপ, কাছিম আর স্তন্যপায়ীর মধ্যে শুশুক।

(ii) জলাভূমি (Wetlands) : রামসার কনভেনশন (১৯৭১) অনুসারে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত জলাভূমি সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওড়। এছাড়া সারাদেশে ছোট-বড় অনেক জলাভূমি আছে। এগুলো স্থায়ী বা অস্থায়ী, মিঠাপানি বা লোনাপানির জলাধার, এদের স্রোত বা বদ্ধ জলাশয় থাকে। সারা বিশ্বের জলাভূমিতে ৫০০০ এর বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মে ... বাংলাদেশে এর সংখ্যা প্রায় ১৫৪টি। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জলজ উদ্ভিদ হলো-পানিফল, মাখনা, পদ্ম, শাপলা, ... অ্যাজুলা, স্যালভিয়া, কচুরীপানা ইত্যাদি। প্রাণীর মধ্যে ৭৫০ প্রজাতির পাখি, ৭৬০ প্রজাতির মিঠা ও লোনাপানির মাছ, ঝিনুক, শামুক, সাপ ও বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণী বসবাস করে।

(iii) হ্রদ ও পুকুর (Lakes & Ponds) : এমন জলাশয়ের আয়তন কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গভীরতাও বেশ তারতম্য হয়ে থাকে। অনেক পুকুর শীতকালে শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতা অনেক (বৈকাল হ্রদ ৪৭৪২ ফুট) এবং স্থায়ী জলাধার। গভীর হ্রদগুলো আনুভূমিক তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।

(a) বেলা অঞ্চল (Litoral zone) : এটি হ্রদের কিনারার উষ্ণ অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন ধরনের শৈবাল, মূলযুক্ত, ভাসমান উদ্ভিদ জন্মে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে স্লেইল, পতঙ্গ, কাস্টাশিয়ান, মাছ ও উভচর প্রাণী বাস করে। পতঙ্গের মধ্যে ড্রাগন ফ্লাই এবং মিজেস প্রধান। এ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো ডাহুক, সাপ ও কচ্ছপের খাদ্য।

(b) অগভীর অঞ্চল Limnetic zone) : এটি হ্রদের উপরের মুক্ত অঞ্চল। এ অঞ্চল আলোকিত এবং প্রচুর ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন থাকে। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্রাকার মাছও এখানে দেখা যায়।

(c) গভীর অঞ্চল (Profundal zone) : হ্রদের নিচে ক্ষীণ আলোকিত অঞ্চলকে বোঝায়। এখানকার পানি ঠাণ্ডা এবং বেশ ঘন। প্রাণীগুলো পরভোজী প্রকৃতির কারণ এরা মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে।

২। লোনাপানির বায়োম (Oceans & Seas) : মহাসাগর, সাগর ও মোহনা মিলে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৩/৪ ভাগ জুড়ে করে আছে লোনাপানির বায়োম। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং প্রথম বায়োম। সাগরের লবণাক্ততা প্রায় ৩৫ ppt এবং pH_8। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা 27°C আর মেরু অঞ্চলে 3°C। সাগরের ৪টি অঞ্চলে ... জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান।

(i) গড়ান অঞ্চল (Intertidal zone) : যেহেতু এ অঞ্চলটি প্রতিদিন দু'বার জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয় তাই এখানে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। উপরের অংশে কয়েকটি প্রজাতির ডায়াটম, বাদামি শৈবাল, লোহিত শৈবাল ও সবুজ শৈবালও জন্মে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে স্লেইল, ক্লাবস, ছোট ছোট মাছ থাকে। এছাড়া ক্রাস্টাশিয়ান ও ... প্রাণী থাকে।

(ii) পেলাজিক অঞ্চল (Pelagic zone) : সাগরের পৃষ্ঠীয় মুক্ত অঞ্চলকে বোঝায়। এ অঞ্চলে আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এর পাশাপাশি প্লাংকটনও থাকে। প্রাণীদের মধ্যে নানা ধরনের মাছ, ডলফিন, হাঙ্গর ও তিমি থাকে।

(iii) বেনথিক অঞ্চল (Benthic zone) : পেলাজিকের নিচে অল্প আলো বা আলোহীন অঞ্চলকে বোঝায়। এখানে পুষ্টি এবং মৃতদেহ থাকে। মূলত সামুদ্রিক আগাছা, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, শঙ্খ, সি-স্টার মাছ থাকে।

(iv) এবিসাল অঞ্চল (Abyssal zone) : এটি সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে বোঝায়। তাপমাত্রা প্রায় 3°C। পানির চাপ অধিক। পুষ্টি খুব কম থাকে। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী, মাছ এবং কেমোসিনথেটিক ব্যাক্টেরিয়া থাকে।

প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল (Zoogeographical regions)

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র একই রকম নয়। এর কোথাও বরফ শীতল, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ, আবার কোথাও উষ্ণ; এর কোথাও তৃণভূমি, কোথাও জলাভূমি, কোথাও মরুভূমি বা গভীর অরণ্যভূমি। এসব পরিবেশ কোনোটাই কোনো জীবপ্রজাতি বিহীন নয়। প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবেশেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু জীবপ্রজাতি রয়েছে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিকাংশ জীবপ্রজাতিই মরু অঞ্চলে পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ তার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারে না, কাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মাতে দেখা যায়। প্রাণীরা প্রয়োজনে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে এদিক ওদিক যেতে পারে, তারপরও ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী লক্ষ্য

চিত্র ১২.১০ : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ।

করা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থান ও বিস্তৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বুকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অবস্থান ও বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে P. L. Sclater ১৮৫৭ সালে পৃথিবীকে মোট ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে A. R. Wallace সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে ঐ ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলকে সমর্থন করেন। ছয়টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল নিম্নরূপ :

১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল, ২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল, ৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল, ৪। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল, ৫। ইথিওপিয়ান অঞ্চল, ৬। নিয়ার্কটিক অঞ্চল।

নিচে A. R. Wallace কর্তৃক প্রদত্ত ছক অনুসারে পৃথিবীর প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর নাম, সেই অঞ্চলের প্রধান এলাকাসমূহের নাম এবং সেসব অঞ্চলের প্রধান কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম দেয়া হলো।

অঞ্চলের নাম	অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের নাম	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম
১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region)	ইউরোপের সমগ্র অংশ, আফ্রিকার উত্তরাংশ, এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, হিমালয়ের উত্তর অংশ, চীন, জাপান ও কোরিয়ার উত্তর অংশ, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশসমূহ।	হরিণ, ভাল্লুক, ভোঁদড়, বলগা হরিণ, উট, [illegible] কবুতর, ফ্লেমিংগো, উটপাখি, পেলিকান, টার্কি, এলিগেটর, প্যাডেল ফিস, সাকারফিস, ক্যাটফিস
২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental region)	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ভুটান, ফিলিপাইন, তাইওয়ান ইত্যাদি।	হাতি, বাঘ, গিবন, ভাল্লুক, [illegible] চিতা, বাদুর, কবুতর, ফিঙে, কোকিল, ব্লু বার্ড, ময়ূর, কুমির, গুইসাপ, রুই, কাতলা, মৃগেল, ক্যাটফিস।
৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region)	অস্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপ।	ক্যাঙ্গারু, ওয়ালাবি, কোয়ালা, ওমব্যাট, প্লাটিপাস, অপোসাম, লায়ার বার্ড, ক্যাসোয়ারি, কাকাতুয়া, টিয়া, এমু, বার্ডস অব প্যারাডাইস, কাঠঠোকরা, কিউই, স্ফেনোডন, টিফলপস,
৪। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical region)	মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইত্যাদি।	ভাল্লুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসাম, টাপির, রিয়া, অস্ট্রিচ, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিংবার্ড, কুমির, কচ্ছপ, কোরাল, সাপ, বোয়া, আইগুয়ানা, বাইন মাছ, ক্যাটফিস, লাংফিস।
৫। ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian region)	আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ অঞ্চল, আরবের দক্ষিণ অঞ্চল, মাদাগাস্কার (বা মালাগাছি) ও মাদাগাস্কারের নিকটবর্তী কিছু মহাসাগরীয় দ্বীপ।	গরিলা, শিম্পাঞ্জী, লেমুর, হাতি, ভোঁদড়, হায়েনা, গণ্ডার, আর্মাডিলো, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখি, বাজ, শকুন, সারস, ফিঙে, কুমির, গুইসাপ, বোয়াপাইথন, ক্যাটফিস, লাংফিস
৬। নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic region)	গ্রীনল্যান্ড, মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল, কানাডা, উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ, আইসল্যান্ড ইত্যাদি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়ানাকো, নেকড়ে, মেকশিয়াল, ভাল্লুক, ক্যাঙারু, বাইসন, শাখহরিণ, পেলিকান, শকুন, টার্কিস, হামিংবার্ড, ফিঙে, কচ্ছপ, এলিগেটর, কুমির, প্রবাল, সাপ, স্যালামান্ডার, প্যাডেল ফিস, বো ফিন, সাকার ফিস, ক্যাটফিস ইত্যাদি।

পৃথিবীর ছয়টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্য থেকে এখানে কেবল ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental Region)

ভৌগোলিক সীমানা : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উত্তরে আফগানিস্তান ও চীন, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে ইরান ও আরব এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ : ক্রান্তীয় এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন, শ্রীলংকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্গত।

এ অঞ্চলটি প্রধান চারটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত; যথা-

১। **ভারতীয় উপ-অঞ্চল (Indian subregion) :** এ উপ-অঞ্চলটি সিন্ধুনদ ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে গোয়া হয়ে পূর্বঘাট পর্যন্ত সমগ্র মধ্য ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশ ভারতীয় উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

২। **সিংহলীয় উপ-অঞ্চল (Ceylonese subregion) :** ভারতীয় উপদ্বীপের অংশবিশেষ এবং সমগ্র শ্রীলংকা এই উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

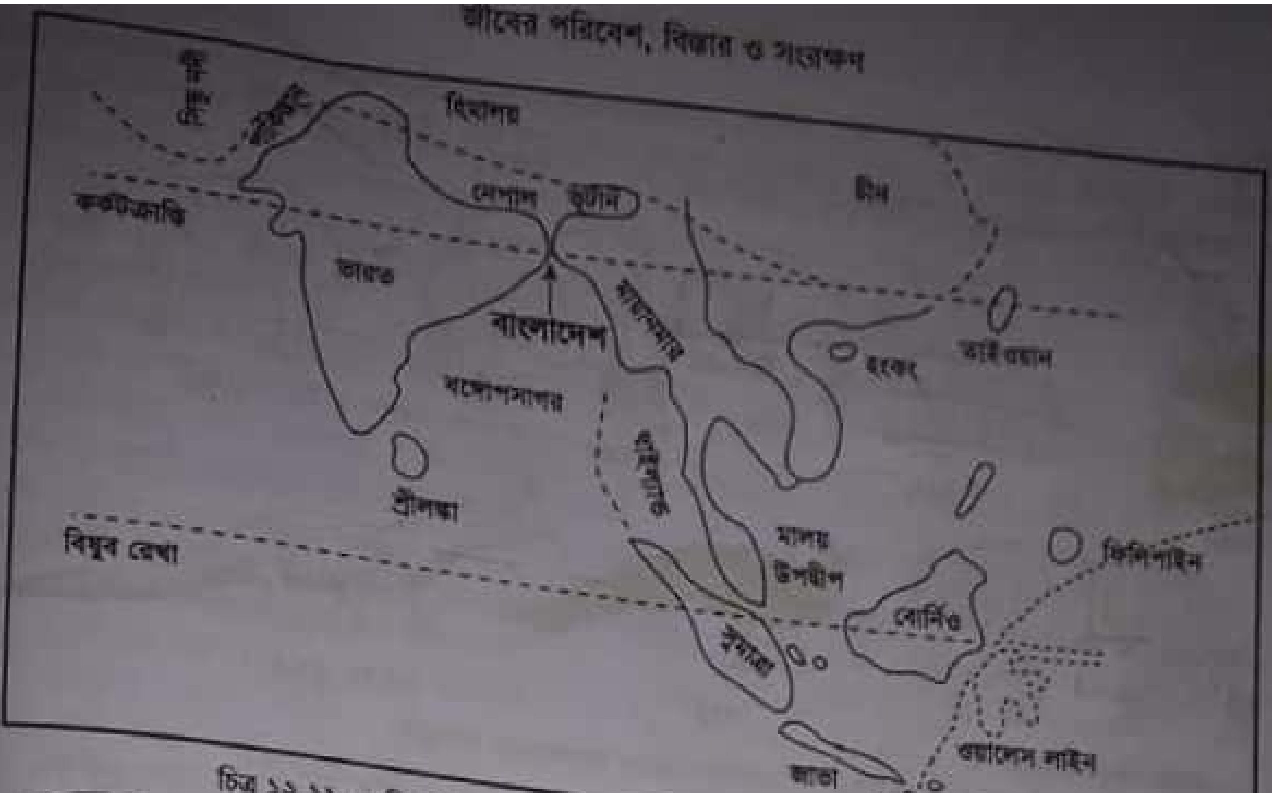

চিত্র ১২.১১ : ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (ডট চিহ্ন দ্বারা অঞ্চলের সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে)।

৩। **ইন্দোচীন উপ-অঞ্চল (Indo-China subregion)** : চীনের প্যালিআর্কটিক সীমানার দক্ষিণাংশে, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, আন্দামান ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৪। **ইন্দোমালয় উপ-অঞ্চল (Indo-Malayan subregion)** : মালয় উপদ্বীপ ও ইস্ট ইন্ডিজের কতগুলো দ্বীপ যেমন বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা এবং নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রায় সমগ্র অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। এ অঞ্চলের পূর্বাংশে স্টেপ ও প্রেইরি তৃণভূমি, মধ্যভাগে মৌসুমি উদ্ভিদবিশিষ্ট সাভানা তৃণভূমি এবং সীমিত অঞ্চলে ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের দিনরাত্রি প্রায় সমান।

উদ্ভিদকুল (Flora) : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানকার জলবায়ু আর্দ্র ও গরম বিধায় এখানে চিরসবুজ বৃক্ষের গভীর বনাঞ্চল এবং সিক্ত পত্রঝরা বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সে.মি.। এ অঞ্চলে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট, ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, ট্রপিক্যাল গ্রাসল্যান্ড এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায়। এখানে প্রচুর শাল (*Shorea robusta*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), পশুর (*Zylocarpus granatum*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), বেত (*Calamus rotung*), নারিকেল (*Cocos nucifera*), সুপারি (*Areca catechu*), রাবার (*Hevea brasiliensis*), হেন্তাল (*Phoenix paludosa*), আম্র (*Mangifera indica*), জাম (*Syzygium cumini*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), সিঙ্কোনা (*Cinchona officinalis*), কফি (*Coffea arabica*), চা (*Camellia sinensis*), পাট (*Corchorus capsularis*), কার্পাস তুলা (*Gossypium herbaceum*) ইত্যাদি গাছ জন্মে। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপকূলে গরান (*Ceriops decandra*) বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায়।

প্রাণিকুল (Fauna) : এ অঞ্চলে বহু ধরনের প্রাণি রয়েছে। এদেরকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাজানো যায় :

মিঠা বা স্বাদুপানির মাছ : ইলিশ (*Tenualosa ilisha*), রুই মাছ (*Labeo rohita*), মাগুর মাছ (*Clarius batrachus*), লইট্যা মাছ (*Harpodon nehereus*), হাঙ্গর মাছ (*Scoliodon sorrakowah*), কই মাছ (*Anabus testudineus*), ফলি মাছ (*Notopterus notopterus*) পাবদা মাছ (*Ompok pabda*), তারাবাইন (*Macrognathus aral*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উভচর : কুনোব্যাঙ (*Duttaphrynus melanostictus*), সোনাব্যাঙ (*Haplobatrachus tigerinus*), গেছোব্যাঙ (*Rhacophorus fergusonil*), স্যালামান্ডার (*Tylotoriton vercossa*), ইকথিওফিস্ (*Ichthyophis*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সরীসৃপ : গোখরা (*Naja naja*), স্থল কচ্ছপ (*Indotestudo elongata*), গুইসাপ (*Varanus bengalensis*), কমোডোড্রাগন, গিরগিটি, ড্রাকো, রক্তচোষা (*Calotes versicolor*), কেউটে, উড়ুক্কু টিকটিকি (*Draco maculatus*), চন্দ্রবোড়া, অজগর (*Python morulus*) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

চিত্র ১২.১২ : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণিকুল।

পক্ষীকুল : টিয়া (*Psittacula eupatria*), কবুতর (*Columba livia*), শ্বেত কাকাতুয়া (*Cacatua alba*), ফিঙে, কোকিল (*Phaenicopheus sp*), ময়ূর (*Pavo cristatus*), ব্রু বার্ড, বনমোরগ (*Gallus gallus*), বাবুই, শালিক, দোয়েল (*Copsychus saularis*), পাহাড়ী ঘুঘু (*Columba puncicea*), হলদে পাখি, রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*), বুলবুলি, হাঁস, প্যাঁচা (*Bubo bubo*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

স্তন্যপায়ী : এ অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*), চিতাবাঘ (*Banis javanica*), হাতি (*Elephas maximus*), উল্লুক (*Hylobates hoolock*), ভালুক (*Melarsus ursinus*), ওরাং ওটাং (*Pongo pygmaeus*), বানর (*Macaca mulatta*), বুনো মহিষ (*Bubalus bubalis*), দ্বিশৃঙ্গী গন্ডার (*Dicerorhinus sumatrensis*), চিত্রা হরিণ (*Axis axis*), খরগোশ, শুশুক (*Platanista gangetica*), সজারু, টাপীর, বাদুর (*Pteropus sp*), বন্যশূকর, সিংহ (*Panthera leo*), চশমাপড়া হনুমান (*Trachypithecus phayrei*), হায়েনা (*Hyaena sp*), বড় বেজী (*Herpestes edwardsi*), বনরুই (*Manis crassicaudata*), পান্ডা (*Ailuropoda melanoleuca*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

Endemic (আঞ্চলিক) : কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ উদ্ভিদ বা প্রাণীকে উক্ত অঞ্চলের এন্ডেমিক উদ্ভিদ/প্রাণী বলে।

Exotic (বিদেশী) : এক ভৌগোলিক অঞ্চল (দেশ) থেকে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চল (দেশ) এ প্রবর্তনকারী উদ্ভিদ বা প্রাণীকে আগত অঞ্চলের Exotic উদ্ভিদ/প্রাণী বলে; যেমন-পেঁপে, আনারস, তেলাপিয়া ও সিলভার কার্প মাছ বাংলাদেশে Exotic (পরদেশী)।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কয়েকটি এন্ডেমিক ফনা (প্রাণী)

শ্রেণি	সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
Osteichthyes (মাছ)	নাপতি কই সবুজ রুই	*Badis badis* *Lubeo fisheri*
Amphibia (উভচর)	গারো পাহাড়ি ব্যাঙ ড্যানিয়েল এর ব্যাঙ	*Rana garoensis* *Rana daniel*
Reptilia (সরীসৃপ)	ঘড়িয়াল সিলেটি কাছিম	*Gavialis gangeticus* *Kachuga sylhetensis*
Aves (পাখি)	বর্মী ময়ূর শ্বেত কাকাতুয়া	*Pavo muticus* *Cacatua alba*
Mammalia (স্তন্যপায়ী)	সিংহলেজী বানর শুশুক	*Macaca silenus* *Orcaella brevirostris*

বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

বাংলাদেশ ২০°৩৫´ থেকে ২৬°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° থেকে ৯২°৫৬´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি জনবহুল ছোট দেশ। এর আয়তন ১,৪৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। এর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব– তিন দিকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাংশে নাফ নদী দ্বারা মায়ানমার (বার্মা) থেকে পৃথক। দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ছয় ঋতুর দেশ হলেও বাংলাদেশে তিনটি ঋতু উল্লেখযোগ্য। ঋতু তিনটি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। সবচেয়ে গরম (অধিক তাপমাত্রা) এপ্রিল-মে এবং সবচেয়ে বেশি শীত (জানুয়ারি) মাসে। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে অধিক বৃষ্টি হয়।

চিত্র ১২.১২.১ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল।

বাংলাদেশের বড় অংশ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। বাকি অংশে ছোট বড় অনেক বন দেখা যায়। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা উচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চল কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগের মতো। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ অনেক কম।

বনের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের বনকে তিনটি উপায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

১। চিরসবুজ অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল, ২। পত্রঝরা বা শালবন বনাঞ্চল এবং ৩। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

১। চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল (Evergreen and semi-evergreen forest)

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বন অবস্থিত।

বনের বৈশিষ্ট্য

(i) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২৫ সেমি (চট্টগ্রামে) থেকে ৫০০ সেমি (সিলেট), তাই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে।

(ii) মাটিতে হিউমাস অধিক, মাটি অ্যাসিডিক (অম্লীয়)।

(iii) বন অপেক্ষাকৃত ঘন।

(iv) ভূমিরূপ : ছোট ছোট পাহাড় ও মাঝে মাঝে খাদ।

(v) অধিকাংশ উদ্ভিদ চিরসবুজ প্রকৃতির।

বনের প্রধান উদ্ভিদ

সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে সিভিট (*Swintonia floribunda*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), চন্দুল (*...ndes nudiflora*); দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর (*Mesua ferrea*), বাটনা (*Quercus spp.*), পিতরাজ (*... wallichii*) প্রধান। পত্রঝরা বৃক্ষের মধ্যে কড়ই (*Albizia procera*), গামার (*Gmelina arborea*), জলি (*... coromandelica*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), উদাল (*Sterculia vilosa*) ইত্যাদি প্রধান। এ বনে ...পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, কচু জাতীয় উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন জন্মে থাকে।

...পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম ও বিস্তর এলাকা নিয়ে বাঁশবন অবস্থিত। অধিকাংশ বাঁশই মুলী বাঁশ (*Melocanna ...*)। খাড়া ঢাল ও অগভীর খাতের কারণে কৃষি কাজের অনুপযোগী। তবে কোনো কোনো এলাকায় জুম চাষ

(Jhum cultivation) হয়ে থাকে। জুম চাষের পর দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এলাকায় ছনবন সৃষ্টি হয়। ছন বনের প্রধান উদ্ভিদ ছন (*Imperata cylindrica*) এবং খাগড় বা কাশ (*Saccharum spontaneum*)।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সেগুন বন লাগানো। ১৮৬১ সালে বার্মা থেকে বীজ এনে প্রথম সেগুন বাগান করা হয় কাপ্তাই এলাকায়।

চিত্র ১২.১৩ : সিলেটের রেমা-কেলেঙ্গা বনের অংশবিশেষ।

সোয়াম্প ফরেস্ট হলো মিঠাপানি বা স্বাদুপানির জলাশয় দ্বারা জলাবদ্ধ বন। সিলেটের উত্তরাংশে জলাবদ্ধ বন (Swamp forest) আছে। এটি রাতারগুল জলাবন হিসেবে পরিচিত। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ নল খাগড়া (*Phragmitis karka*), কাশ (*Saccharum spontaneum*) এবং ইকড়া ঘাস (*Erianthus ravennae*)। বৃক্ষের মধ্যে হিজল (*Barringtonia acutangula*) এবং করচ গাছ (*Pongamia pinnata*) প্রধান। বাংলাদেশের একমাত্র বন্য গোলাপ (*Rosa involucrata*) এখানে পাওয়া যায়। রাতারগুল বন দেখার জন্য প্রচুর পর্যটক এসে থাকে। এখানে একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে।

বৃহত্তর সিলেটের বনাঞ্চলের মধ্যে রেমা-কেলেঙ্গা, লাওয়াছড়া, সাতছড়ি উল্লেখযোগ্য নাম। সিভিট ও গর্জন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট পাওয়া গেলেও সিলেটের বনে এগুলো কম। সিলেটে প্রচুর বেত জন্মে।

প্রাণিকুলের মধ্যে আসামী বানর, চশমা হনুমান, মুখপোড়া হনুমান, উল্লুক, গেছোভাল্লুক, বুনো শুকর, উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, শেয়াল ইত্যাদি প্রধান।

২। পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) : যে বনের সকল বৃক্ষের পাতা একসাথে ঝরে যায় তাদের দিয়ে গঠিত বনকে পর্ণমোচী বন বলে। এ বন ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কুমিল্লার ময়নামতি ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। ময়নামতির বন শালবন বিহার নামে, শেরপুর জেলার উত্তরে পাহাড়ী এলাকায় রাংটিয়া ও গজনী বন নামে পরিচিত।

বরেন্দ্র বনাঞ্চল : রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত।

মধুপুর বনাঞ্চল : টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।

রাজেন্দ্রপুর বনাঞ্চল : গাজীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত।

চন্দ্রা বনাঞ্চল : গাজীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে এটি অবস্থিত।

লালমাই শালবন অঞ্চল : এটি কুমিল্লা জেলায় লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত।

চিত্র ১২.১৪ : শালবন।

বনের বৈশিষ্ট্য

(i) বসন্তকালে গাছে নতুন পাতা গজায় আর শীতকালে এ বনের বৃক্ষরাজির পাতা ঝরে যায়।

(ii) বার্ষিক বৃষ্টিপাত কম, ১২৫ সেমি (বরেন্দ্র অঞ্চলে) থেকে ১৭৫ সেমি (ঢাকায়), তাই বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত কম।

(iii) লৌহের (আয়রন-অক্সাইড হিসেবে) পরিমাণ অধিক থাকায় মাটির বর্ণ লাল বা হলুদাভ, মাটি বেশ অ্যাসিডিক, বর্ষায় কর্দমাক্ত ও শীতে শুকনো।

(iv) বন তুলনামূলকভাবে কম ঘন, তবে মধুপুর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ঘন।
(v) উঁচু 'চালা' এবং ফাঁকে ফাঁকে সমতলভূমি 'বাইদ' অবস্থিত। চালায় বন এবং বাইদে ধান চাষ হয়।
(vi) গড় তাপমাত্রা শীতকালে 17.8°C এবং গ্রীষ্মকালে 26.70°C।

বনের প্রধান উদ্ভিদ

এ বনের প্রধান বৃক্ষ শাল। শাল বৃক্ষের পরিমাণ কোনো কোনো স্থানে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পর্যন্ত। তাই এই বনের অপর নাম শালবন। বর্তমানে অধিকাংশ মূল শালবৃক্ষই কর্তিত। মূল বৃক্ষের গোড়া থেকে গজানো চারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বন, তাই এ বনের আরেক নাম গজারী বন।

প্রধান বৃক্ষ শাল (*Shorea robusta*)। এ ছাড়াও চালতা (*Dillenia pentagyna*), কড়ই (*Albizia procera*), বনসোরাজী (*Miliusa velutina*), কুম্ভী (*Careya arborea*), বহেড়া (*Terminalia bellirica*), কুরচি (*Holarrhena antidysenterica*) ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে থাকে। শতমূলী (*Asparagus racemosus*), উলট চণ্ডাল (*Gloriosa superba*) এবং সর্পগন্ধা (*Rouvolfia serpentina*) তিনটি বিপদাপন্ন ভেষজ উদ্ভিদ এ বনে দেখা যায়।

এ বনে প্রাণীদের মধ্যে মায়া হরিণ (*Muntiacus muntjak*), বানর (*Macaca mulatta*), মুখপোড়া হনুমান, শেয়াল (*Canis aureus*), বুনো শূকর, সজারু, বাদুর, বেজি, খাটাস (*Viverricula indica*) ভুতুম পেঁচা (*Bube zeylonensis*) মেছো বিড়াল (*Felis viverrinus*) প্রধান।

৩। **ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় বনাঞ্চল (Mangrove or Tidal forest)** : লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ম্যানগ্রোভ বনের বড় অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা পাড় হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাছে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশ সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া মাতামুহুরী নদীর মোহনায় চকোরিয়া সুন্দরবনও ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত এবং নাফ নদীর তীরে কিছু ম্যানগ্রোভ বন দেখা যায়। সুন্দরবনের অর্থাৎ ম্যানগ্রোভের ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ৬২% বাংলাদেশে অবস্থিত। সুন্দরবনের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেমি. এ বনাঞ্চলে প্রজাতির সংখ্যা স্থলভাগে ২৮৯টি এবং জলভাগে ২১৯টি প্রজাতি রয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য

(i) এ বন চিরসবুজ বন।
(ii) বনের নিম্নাঞ্চল দৈনিক দু'বার জোয়ারের পানিতে সিক্ত হয়।
(iii) মাটি এবং পানি লবণাক্ত। মাটির pH ৭ এর কাছাকাছি।
(iv) মাটিতে অক্সিজেনের অভাব থাকায় অধিকাংশ বৃক্ষের শ্বাসমূল বা নিউমেটোফোর হয়।
(v) লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের ১০-৫০ ভাগ।
(vi) জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়।
(vii) অসংখ্য নদী-উপনদী ও চ্যানেল দ্বারা সুন্দরবন ছোট ছোট অংশে বিভক্ত।

বনের প্রধান উদ্ভিদ

নদীপাড়ের কম লবণাক্ত (হালকা) পানিতে গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হিতাল (*Phoenix paludosa*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), আমুর (*Amoora cucullata*), গরান (*Ceriops decandra*) জন্মে থাকে। অধিক লবণাক্ত (চরম) অঞ্চলে কাঁকড়া (*Bruguiera gymno rrhiza*), বাইন (*Avicennia officinalis*), পশুর (*Xylocarpus moluccensis*), ধুন্দুল (*Xylocarpus granatum*) জন্মে থাকে। প্রধান গুল্ম সুন্দরীলতা (*Brownlowia lanceolata*), এবং গুল্মজাতীয় বোলা (*Hibiscus tiliaceous*) ও হড়গোজা (*Acanthus ilicifolius*) প্রধান। সুন্দরবনে টাইগার ফার্নের (*Acrostichum aureum*) ঝোপ আছে। সুন্দরবনে কোনো বাঁশ জন্মে না। বিভিন্ন রকমের অর্কিড জন্মে।

(১) গোলপাতা

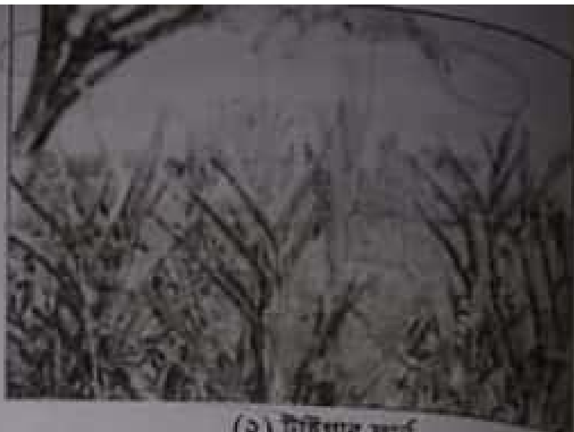

(২) টাইগার ফার্ন

চিত্র ১২.১৫ : সুন্দরবনের (১) গোলপাতা, (২) টাইগার ফার্ন।

প্রাণিকূল : উদ্ভিদের মতো সুন্দরবন প্রাণিকূলেও সমৃদ্ধ। এখানকার স্থলভাগে ২৮৯টি প্রাণী এবং জলভাগে ... প্রাণী প্রজাতি রয়েছে। এছাড়া এখানে ৩১৫টি প্রজাতির পাখিও রয়েছে।

(১) হিতাল

(২) হরিণ

চিত্র ১২.১৫.১ : সুন্দরবনের (১) হিতাল, (২) হরিণ।

সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ২০১৩ সালের হিসাব মতে যার সংখ্যা ৪৪০টি। এখানে ... হরিণ আছে ৮০-৮৫ হাজার, বানর ৪০-৫০ হাজার, লোনাপানির কুমির ২০০-২৫০টি। এখানে ১২০ প্রজাতির মাছ ... ২৭০ প্রজাতির পাখি আছে। এছাড়াও আছে বনমোরগ, অজগর, বাদামি কাঠবিড়ালী, বুনোশূকর, পেরাবন সাপ ইত্যাদি।

সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা) : সুন্দরবনের তিনটি বন্যজীব অভয়ারণ্য নিয়ে ... হেরিটেজ সাইট গঠিত। এর আয়তন ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৯১০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি আর ... কিলোমিটার জলাভূমি। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে UNESCO-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি ১৯৯৭ সালে ... ২১তম সেশনে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর অংশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ ... একে ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী (Costal Tidal forest & green belt)

বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থল বেষ্টিত কিন্তু দক্ষিণ দিকে রয়েছে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণের ... জেলাগুলো, বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ... জেলা সরাসরি সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়াও সাগরবক্ষে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, উড়িরচর, চর ... মুকড়িসহ অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ ও চর এলাকা রয়েছে। সম্পূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় ৭১০ কিমি, লম্বা।

[illegible] ভিত্তিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল : বাংলাদেশের পূর্ব দক্ষিণে বদর মোকাম থেকে ফেনী নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে [illegible]। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৪৫ কিমি. দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত আছে। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ [illegible] অবস্থিত। এখানে বাইন, গরান, গেওয়া প্রধান উদ্ভিদ। এছাড়া গোলপাতা, টাইগার ফার্ন, হারগোজা ইত্যাদি [illegible]।

২। মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল : ফেনী নদীর মোহনা থেকে সুন্দরবনের পূর্ব পর্যন্ত সমতল বিস্তৃত অংশ। এখানে ৬০টির [illegible] এবং প্রধান উদ্ভিদ কেওড়া। এছাড়া এখানে বাইন, গেওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

৩। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল : সম্পূর্ণ সুন্দরবন এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলে বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে [illegible]। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, বাইন, গোলপাতা, হাড়গোজা, টাইগার ফার্ন প্রভৃতি প্রধান উদ্ভিদ।

[illegible] অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ একটি ঝড়প্রবণ এলাকা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, টর্নেডো প্রতি বছরই [illegible] আঘাত হানে। এর ফলে ব্যাপক প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে। সমুদ্রের দ্বীপ ও চর এলাকা বসতে গেলে [illegible]। আমাদের এ বিস্তীর্ণ এলাকাকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, ঘূর্ণিঝড় এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা [illegible] উপায় হলো উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টিকরণ। সবুজ বেষ্টনী হলো উপকূলীয় বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে [illegible] মজবুত সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা।

[illegible] সালে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর [illegible] উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষ ও তাদের সম্পদ রক্ষার প্রচেষ্টায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার [illegible] নেয়া হয় এবং উপকূলীয় বনবিভাগ নামে একটি বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম [illegible] ৩০০ কিলোমিটার উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী (Costal Tidal green belt)

বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ঋতু পরিবর্তনের সময় বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে তা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। [illegible], বড় বড় গাছপালা ও প্রাণিসম্পদের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়। তাই ঝড়ের কবল থেকে ঘরবাড়ি, ফসল, কৃষিজমি ও [illegible] রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবেশতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে [illegible] এবং প্রধান বায়ু প্রবাহের সমকোণে রোপিত একফালি শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ বৃক্ষকে বায়ু প্রবাহ রোধক বা [illegible] যে একফালি ভূখণ্ডের উপর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয় সেই ভূ-খণ্ডকে আশ্রয় ফালি (Shelter [illegible]) বলে। আর যে একফালি ভূখণ্ডের উপর সবুজ বেষ্টনী হিসেবে অধিক কার্যকর। তবে আশ্রয় ফালির মধ্যভাগে কেন্দ্রাংশে [illegible]। চিরহরিৎ বৃক্ষের উঁচু প্রজাতিগুলো সবুজ বেষ্টনী হিসেবে অধিক কার্যকর। তার উভয় পাশে ক্রমশ কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম, উপগুল্ম ও তৃণলতা রোপণ [illegible] বৃক্ষ রোপণ করতে হয় এবং [illegible]। এর ফলে বনের ক্যানোপির (Canopy) প্রস্থচ্ছেদ ত্রিকোণাকার হয়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of tid l green belt)

১। সবুজ বেষ্টনী সমুদ্র থেকে আসা জলোচ্ছ্বাসকে প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করে এবং জলোচ্ছ্বাসের গতি, প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়।

২। জলোচ্ছ্বাসকালীন ভাটার টানে মানুষ, পশু ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

৩। ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

৪। বসতস্থল গভীর পানিতে তলিয়ে গেলে বৃক্ষের উপর উঠে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে।

৫। সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো বৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি, কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে।

[illegible] বেষ্টনীর বৃক্ষের ধরন বা বৈশিষ্ট্য

১। উপকূলীয় অঞ্চল জোয়ারের পানিতে নিয়মিত সিক্ত হয় এবং পানি লবণাক্ত। এখানে উঁচু জায়গাতেও মাঝে মাঝে জোয়ারের পানি ঢুকে যায়। কাজেই লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২। মূলতন্ত্রের মাধ্যমে মাটি ধরে রাখতে পারে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৩। ঝড়ের ঝাপটায় ভেঙে না যায় বা মূলোৎপাটিত না হয় এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৪। সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ থেকে খাদ্য, পশুখাদ্য, পানীয়, জ্বালানি, কাঠ ও অন্যান্য অর্থকরী সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে।

কেওড়া, সুন্দরী, বাইন, বাইজোকোরা, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, বিলাতি গাব ইত্যাদি বৃক্ষ-বনানি [illegible] যেতে পারে। মৃদু লবণাক্ত পানি এদের জন্য অসুবিধা হয় না। কেওড়া পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য, এর মূল [illegible] পারে, এ থেকে জ্বালানি ও কাঠ পাওয়া যায়। সুন্দরী থেকে কাঠ পাওয়া যায়। গাব থেকে জ্বালানি, মাছের জাল [illegible] উপাদান এবং খাওয়ার যোগ্য ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গাব গাছ অত্যন্ত শক্ত, ঝড়ের ঝাপটা সামাল দিতে [illegible] পারে। ভেতরের দিকে লাগানো নারিকেল এবং সুপারি বাগান খাদ্য, পানীয় ও অর্থ যোগান দিতে পারে।

রেইনট্রি, শিশুন শিরিষের মতো কম শক্ত কাঠের বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত নয়। প্রচণ্ড ঝড়ে বা জলোচ্ছ্বাসে নিজেরাই ভেঙে যায় এবং বসতবাড়ি, মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুহার বাড়িয়ে দেয়।

অর্থের লোভে যেন কেউ সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ নিধন না করতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীবের পরিচিতি

প্রকৃতিতে যে সকল জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) পূর্বে ছিল কিন্তু বর্তমানে তাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না সেসব জীবদের বলা হয় **বিলুপ্ত জীব**। বিভিন্ন কারণে সময়ের ব্যবধানে কিছু কিছু প্রজাতি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে এবং পৃথিবীর বুক থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের বিলুপ্তিকে নেপথ্য বিলুপ্তি বলে। হঠাৎ করে পৃথিবীব্যাপী বিপুল [illegible] প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ইতিহাস আছে। এ ধরনের বিলুপ্তিকে বলা হয় **গণবিলুপ্তি** (mass extinction)। গণবিলুপ্তি পৃথিবীতে পাঁচ বার ঘটেছে। যে উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাকে **এন্ডেমিক উদ্ভিদ বা প্রাণী** বলে। ৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে (অর্ডোভিসিয়ান যুগেরও শেষ দিকে) প্রথম গণবিলুপ্তি ঘটে [illegible] শতকরা ৮৫ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সর্বশেষ গণবিলুপ্তি ঘটেছে প্রায় ৭০-৮০ মিলিয়ন বছর আগে ক্রিটেসিয়াস [illegible] যখন শতকরা ৭৬ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আর কোনো গণবিলুপ্তি ঘটেনি বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রজাতির উন্মেষ ঘটেছে।

জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড শুরু হয় কার্যত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। এর পূর্বে কোনো দেশেরই জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি হয়নি, এখনও পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যাদের জীববৈচিত্র্যের তালিকা করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়েছে। তালিকাভুক্ত অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু প্রজাতি বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রজাতি আছে যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক জীব প্রজাতি আছে যা পূর্বে সচরাচর দেখা গেলেও এখন আর দেখা যায় না।

বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

শ্রেণি	বৈজ্ঞানিক নাম	স্বরূপ	প্রাপ্তিস্থান
ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ	১। *Psilotum triquetrum*	পরাশ্রয়ী	বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা
	২। *Tectaria chattagramica*	স্থলজ	চট্টগ্রাম
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	১। *Cycas pectinata*	গুল্ম	চট্টগ্রাম, বাড়িয়াঢালা, গারো পাহাড়
	২। *Podocarpus nerifolia*	বৃক্ষ	চট্টগ্রাম
	৩। *Gnetum funiculare*	লতা গুল্ম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	১। *Aldrovanda vesiculosa* (মক্ষিকা ঝাঁঝি)	জলজ, পতঙ্গভুক	রাজশাহী, পাবনা
	২। *Aquillaria agallocha* (আগর)	বৃক্ষ	পাথারিয়া বন-মৌলভীবাজার
	৩। *Corypha taliera* (তালিপাম)	তাল জাতীয় বৃক্ষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
	৪। *Knema bengalensis* (ফুলে বড়লা)	বৃক্ষ	দুলাহাজরা-কক্সবাজার (এন্ডেমিক)
	৫। *Licuala peltata* (কোরুদ)	তাল জাতীয় বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, কাসালং-রাঙামাটি, সিলেট
	৬। *Rotala simpliciuscula* (রোট্যালা)	উভচর জাতীয় উদ্ভিদ	চট্টগ্রাম (এন্ডেমিক)
	৭। *Rosa involucrata* (জংলি গোলাপ)	জলজ, গুল্ম	সিলেট এর হাওড়

* আগর বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে, তাই আর বিলুপ্তপ্রায় নয় এবং *Chlorophytum repaleuse* (কেঁওন) [illegible] বাংলাদেশে আর পাওয়াই যাচ্ছে না। *তালিপামটি এখন নাই, এর অনেক চারা বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে।

১। তালিপাম (Tali palm)

...দেশের বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের মধ্যে তালিপাম অন্যতম। এর ...নাম *Corypha taliera* Roxb. গাছটি দেখতে প্রায় তাল গাছের ...এর বাংলা নাম হলো তালি বা তালিপাম। এটি Arecaceae ...গোত্রের অন্তর্গত।

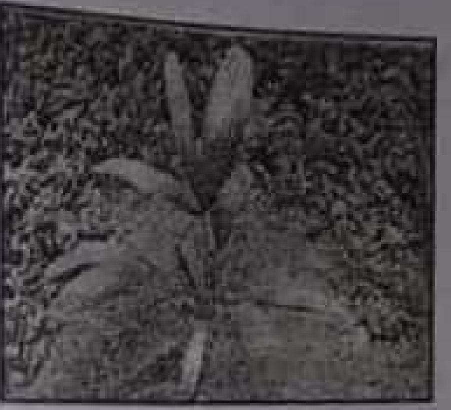

তালিপামের চারা

...পশ্চিম বঙ্গের শান্তিনিকেতনের কাছে অবস্থিত তালিপাম গাছটি ১৯৭৯ সালে কেটে ফেলার পর বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত তালিপাম গাছটিই ছিল বিশ্বের একমাত্র বন্য তালিপাম গাছ। তালিপাম জীবনে মাত্র একবারই ফুল ও ফল উৎপাদন করে এবং পরে তার মৃত্যু ঘটে। ঢাকার গাছটিও ২০১০ সালে ফুল ও ফল উৎপাদন শেষে ২০১২ সালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে মৃত্যুর আগে গাছটি বহু ফল উৎপাদন করে গেছে যা থেকে অসংখ্য চারা করে বন বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাগানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনেও একটি চারা লাগানো হয়েছে।

মঞ্জরীসহ তালিপাম (*Corypha taliera*)

বর্তমানে বিশ্বের কোথাও বন্য অবস্থায় আর কোনো তালিপামের খবর জানা নেই। আমাদের লাগানো চারাগুলোর প্রতি ...যত্ন নেয়া আবশ্যক, যাতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ৬০-৭০ বছর পর মৃত্যুর আগে প্রচুর ফল উৎপাদন ...তে পারে। বাংলার বাইরে এ গাছ নেই। এটি বৃহত্তর বাংলার এন্ডেমিক।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা ইতোমধ্যেই তালিপামের পুষ্পায়ন, বীজের অঙ্কুরোদগম, কচি ফলের ...কেমিক্যাল বিশ্লেষণ, ব্যাক্টেরিয়া বিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শেষে ফলাফল প্রকাশ ...তে সক্ষম হয়েছি, যা আগামী ৬০-৭০ বছরে আর সম্ভব হবে না।

২। মল্লিকা ঝাঁঝি (Malacca Jhangi)

মল্লিকা ঝাঁঝি (*Aldrovanda vesiculosa*)

মল্লিকা ঝাঁঝি বাংলাদেশের আরেকটি বিলুপ্ত প্রায় ...। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aldrovanda vesiculosa* Linn. ...গোত্র Droseraceae। মল্লিকা ঝাঁঝি একটি জলজ ...এবং পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মল্লিকা ...পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে রাজশাহীর পুঠিয়া ...অন্তর্গত একটি বিল থেকে। পরবর্তীতে চলন ...(পাবনা) থেকেও একবার সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু এর ...পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো জায়গা থেকে মল্লিকা ...করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ ...এটি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে সতর্ক পর্যবেক্ষণে হয়ত কেউ এটি পেয়েও যেতে ...। ...এশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়াতেও মল্লিকা ঝাঁঝি জন্মে থাকে।

৩। ক্ষুদে বড়লা (Khude barala)

ক্ষুদে বড়লা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে এন্ডেমিক অর্থ হলো বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে এখনো এটি পাওয়া যায়নি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Knema bengalensis* de Wilde, গোত্র Myristicaceae। এই উদ্ভিদটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয় ১৯৫৭ সালে কক্সবাজার জেলার ভুলাহাজরা বনাঞ্চল থেকে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে কক্সবাজার জেলার আপার রিজু বনবিট অফিসের কাছে একটি গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্ষুদে বড়লা (*Knema bengalensis*)

ক্ষুদে বড়লা একটি মধ্যম আকারের বৃক্ষ, কাণ্ডে ক্ষত হলে রক্ত বর্ণের কস বের হতে থাকে। ক্ষুদে বড়লার পুরুষ ও স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। এখনো কোনো স্ত্রী বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আপার রিজু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে এর স্ত্রী বৃক্ষ আবিষ্কার করতে হবে এবং ঐ বৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারা করার মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অথবা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা করতে হবে। এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

কোরুদ (*Licuala peltata*)

৪। কোরুদ(Kurud)

কোরুদ একটি পাম জাতীয় উদ্ভিদ যা চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি (কাসালং) এবং সিলেটের গহীন বনে জন্মে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Licuala peltata* Roxb। গোত্র Arecaceae. এটি ছোট আকৃতির পাম, মাত্র ২-৩ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এর পাতা দিয়ে এক রকম ছাতা তৈরি করা হয়, আবার ঘরের ছাউনিও দেয়া হয়। বাংলাদেশের বাইরে মায়ানমার এবং ভারতের বিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এটি দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। এর ইন-সিটু ও এক্স-সিটু উভয় প্রকার সংরক্ষণ অতি জরুরি। বন বিভাগ এ দিকে নজর দিবেন আশা করি।

৫। রোট্যালা (Rotala)

রোট্যালা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Rotala simpliciuscula* (S. Kurz) Koehne, গোত্র Lythraceae. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন হুকার ও থমসন (Hooker and Thomson) এবং সেই নমুনার উপর ভিত্তি করে S. Kurz এর নামকরণ করেছিলেন।

রোট্যালা একটি উভচর জাতীয় উদ্ভিদ, জল সিক্ত স্থানে জন্মে থাকে। তবে হুকার ও থমসনের সংগ্রহের পর আর দ্বিতীয় বার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, কাজেই এটি বাংলাদেশ থেকে এমনকি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনুমান করা যায়।

রোট্যালা (*Rotala simpliciuscula*)

আমাদেরকে এ গাছটিকে খুঁজতে হবে এবং পাওয়া গেলে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের বিপদাপন্ন (বিলুপ্তপ্রায়) কতিপয় প্রাণী (Endangered Animals)

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১। রয়েল বেঙ্গল টাইগার	Royal Bengal Tiger	*Panthera tigris*
২। রাজশকুন	King Vulture	*Sarcogyps calvus*
৩। ঘড়িয়াল	Gavial	*Gavialis gangeticus*
৪। মিঠা পানির কুমির	Mugger Crocodile	*Crocodylus palustris*
৫। নীল গাই	Blue Bull	*Boselaphus tragocamelus*
৬। শুশুক	Inawaddy Dolphin	*Orcaella brevirostris*
৭। বন রুই	Chinese Pangolin	*Manis pentadactyla*
৮। বেঙ্গল রুফ কাইট্টা	Bengal Roof Turtle	*Kachuga kachuga*

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*)

১। রাজশকুন (Red-headed vulture)

রাজশকুন বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই একটি বিপন্ন পাখি, বাংলাদেশে এটি মহাবিপন্ন বলে চিহ্নিত। এটি বাংলাদেশের প্রাক্তন আবাসিক পাখি, তবে বর্তমানে আর দেখা যায় না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তৃতি।

রাজশকুনের বৈজ্ঞানিক নাম *Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786); ইংরেজি নাম Red-headed Vulture or King Vulture. এর মাথা লাল, পালক কাল। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। অন্যান্য শকুনের মতো এরা দলবদ্ধ নয়, একা বা জোড়ায় দেখা যায়। খাবারের তালিকায় মৃত পশুর দেহ। উঁচু গাছের ডালে পাতা দিয়ে বাসা বানায় এবং একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ৪৫ দিনে ডিম ফোটে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এটি সংরক্ষিত প্রজাতি।

২। ঘড়িয়াল (True gavial)

ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*)

ঘড়িয়াল বাংলাদেশে একটি অতি বিপদাপন্ন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে এটি প্রায় বিলুপ্ত, যদিও ভারতের থেকে আসা ঘড়িয়াল কদাচিৎ নদীতে দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus* (Gmelin, 1789).

ঘড়িয়াল পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক, পুরুষ ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৬.৫ মিটার এবং স্ত্রী ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৪.৫ মিটার। ঘড়িয়াল গভীর ও দ্রুত প্রবাহমান পানিতে বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। নভেম্বর-জানুয়ারি এদের প্রজনন মাস। স্ত্রী ঘড়িয়াল বালুতে তৈরি গর্তে ৩০-৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম অনেক বড়। ৩ মাস তা দেয়ার পর ডিম থেকে বাচ্চা হয়।

এদেরকে ব্রহ্মপুত্র নদে (ভারত ও ভুটান), সিন্ধু নদ (পাকিস্তান), গঙ্গা নদী (ভারত ও নেপাল) এবং মহানদীতে (ভারত) পাওয়া যায়। মায়ানমার ও পাকিস্তানেও এই প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত।

সাধারণত জেলেদের মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে এদের জীবনাবসান ঘটে এবং এটি বিলুপ্তির একটি বড় কারণ। এ ... অবশ্যই জেলেদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩। মিঠাপানির কুমির (Freshwater crocodyle)

মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*)

মিঠাপানির কুমির বাংলাদেশে বিলুপ্ত, প্রাকৃতিকভাবে আর দেখা যায় না। বাগেরহাটের খান জাহান আলী (র) মাজারের সাথের পুকুরে কয়েকটি কুমির আছে। সম্প্রতি ভারত থেকে সাফারি পার্কে পালনের জন্য কয়েকটি কুমির আনা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris* (Lesson, 1768)।

প্রাপ্তবয়স্ক কুমিরের দেহের দৈর্ঘ্য ৩-৫ মিটার। এরা নদী, পুকুর ইত্যাদি মিঠা পানিতে বাস করে, সাধারণত জোয়ার-ভাটা এলাকায় প্রবেশ করে না। এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। এরা নদীর তীরে গর্তে ডিম পাড়ে, ৫০-৫৫ দিনে ডিম ফোটে। যে কয়টি মিঠাপানির কুমির এখন বাংলাদেশে আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

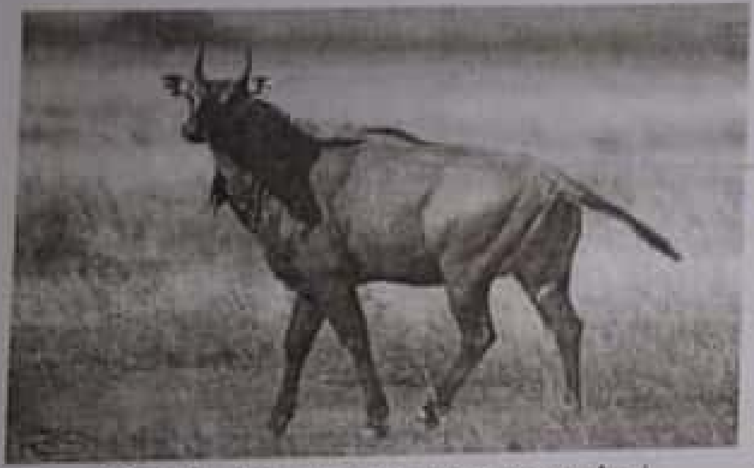

নীলগাই (*Boselaphus tragocamelus*)

৪। নীলগাই (Nilgai)

নীল গাই বাংলাদেশের আর একটি বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। ১৯৪০ সালের দিকে বর্তমান বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া অঞ্চলে নীল গাই পাওয়া যেতো বলে জানা যায়, তবে বর্তমানে বাংলাদেশের কোথাও নীল গাই দেখা যায় না, অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত। এরা সমতল ভূমিতে বাস করে। নীল গাইয়ের বৈজ্ঞানিক নাম *Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766)। প্রজনন সময় ছাড়া সাধারণত বছরের অন্যান্য সময় ষাঁড় ও গাভী পৃথকভাবে বিচরণ করে। গাভীর লোম হলুদ বাদামি, প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের লোম নীল-ধূসর।

৫। শুশুক (River dolphin)

শুশুক একটি স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। বাংলাদেশে শুশুক এখন বিপন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত এরা উপকূল ও সমুদ্রে বিচরণ করে। বর্ষায় বড় বড় নদী দিয়ে অনেক ভেতরেও চলে আসে। বাংলাদেশে দু'ধরনের শুশুক পাওয়া যায়, একটির বৈজ্ঞানিক নাম *Orcaella brevirostris* এবং অপরটির বৈজ্ঞানিক নাম *Neophocaena phocaenoides*। দ্বিতীয়টির পিঠে পাখনা নেই। এরা মাঝে মাঝে পানি থেকে উপরে লাফ দেয় এবং দল বেঁধে চলে। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। এরা শুশুক মাছ, শিশু বা শিশু মাছ, হউম মাছ, হচ্ছুম মাছ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত।

শুশুক (*Orcaella brevirostris*)

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

পৃথিবীতে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজাতির জীব ও অনুজীব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এযাবত শনাক্ত হয়েছে মাত্র ১৭.৫ লক্ষ প্রজাতির জীব। প্রকৃতিতে প্রত্যেকটি প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। জীববৈচিত্র্য হলো জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে

কেওড়া, সুন্দরী, বাইন, রাইজোফোরা, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, বিলাতি গাব ইত্যাদি বৃক্ষ-প্রজাতি নির্বাচিত হতে
পারে। মৃদু লবণাক্ত পানি এদের জন্য অসুবিধা হয় না। কেওড়া পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য, এর মূল মাটি ধরে রাখতে
পারে, এ থেকে জ্বালানি ও কাঠ পাওয়া যায়। সুন্দরী থেকে কাঠ পাওয়া যায়। গাব থেকে জ্বালানি, মাছের জাল রং করার
উপাদান এবং খাওয়ার যোগ্য ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গাব গাছ অত্যন্ত শক্ত, ঝড়ের ঝাপটা সামাল দিয়ে টিকে থাকতে
পারে। ভেতরের দিকে লাগানো নারিকেল এবং সুপারি বাগান খাদ্য, পানীয় ও অর্থ যোগান দিতে পারে।

রেইনট্রি, শিরীষ শিরিষের মতো কম শক্ত কাঠের বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত নয়। প্রচণ্ড ঝড়ে বা জলোচ্ছ্বাসে এগুলো
নিজেরাই ভেঙে যায় এবং বসতবাড়ি, মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুহার বাড়িয়ে দেয়।

অর্থের লোভে যেন কেউ সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ নিধন না করতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীবের পরিচিতি

প্রকৃতিতে যে সকল জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) পূর্বে ছিল কিন্তু বর্তমানে তাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না সেসব জীবদের বলা হয় **বিলুপ্ত জীব**। বিভিন্ন কারণে সময়ের ব্যবধানে কিছু কিছু প্রজাতি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে এমনকি পৃথিবীর বুক থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের বিলুপ্তিকে **নেপথ্য বিলুপ্তি** বলে। হঠাৎ করে পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ইতিহাস আছে। এ ধরনের বিলুপ্তিকে বলা হয় **গণবিলুপ্তি** (mass extinction)। গণবিলুপ্তি পৃথিবীতে পাঁচ বার ঘটেছে। যে উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাকে **এন্ডেমিক উদ্ভিদ বা প্রাণী** বলে। ৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে (অর্ডোভিসিয়ান যুগেরও শেষ দিকে) প্রথম গণবিলুপ্তি ঘটে এবং শতকরা ৮৫ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সর্বশেষ গণবিলুপ্তি ঘটেছে প্রায় ৭০-৮০ মিলিয়ন বছর আগে ক্রিটেসিয়াস যুগে যখন শতকরা ৭৬ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আর কোনো গণবিলুপ্তি ঘটেনি বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রজাতির উন্মেষ ঘটেছে।

জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড শুরু হয় কার্যত ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। এর পূর্বে কোনো দেশেরই জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি হয়নি, এখনও পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যাদের জীববৈচিত্র্যের তালিকা করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়েছে। তালিকাভুক্ত অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু প্রজাতি বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রজাতি আছে যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক জীব প্রজাতি আছে যা পূর্বে সচরাচর দেখা গেলেও এখন আর দেখা যায় না।

বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

শ্রেণি	বৈজ্ঞানিক নাম	স্বরূপ	প্রাপ্তিস্থান
ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ	১। *Psilotum triquetrum*	পরাশ্রয়ী	বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা
	২। *Tectaria chattagramica*	স্থলজ	চট্টগ্রাম
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	১। *Cycas pectinata*	গুল্ম	চট্টগ্রাম, বাড়িয়াডালা, গারো পাহাড়
	২। *Podocarpus nerifolia*	বৃক্ষ	চট্টগ্রাম
	৩। *Gnetum funiculare*	লতা গুল্ম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	১। *Aldrovanda vesiculosa* (মল্লিকা ঝাঁঝি)	জলজ, পতঙ্গভুক	রাজশাহী, পাবনা
	২। *Aquillaria agallocha* (আগর)	বৃক্ষ	পাথারিয়া বন-মৌলভীবাজার
	৩। *Corypha taliera* (তালিপাম)	তাল জাতীয় বৃক্ষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা*
	৪। *Knema bengalensis* (ফুলে বড়লা)	বৃক্ষ	দুলাহাজরা-কক্সবাজার (এন্ডেমিক)
	৫। *Licuala peltata* (কোরুদ)	তাল জাতীয় বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, কাসালং-রাঙামাটি, সিলেট
	৬। *Rotala simpliciuscula* (রোটালা)	উভচর জাতীয় উদ্ভিদ	চট্টগ্রাম (এন্ডেমিক)
	৭। *Rosa involucrata* (জংলি গোলাপ)	জলজ, গুল্ম	সিলেট এর হাওড়

* আগর বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে, তাই আর বিলুপ্তপ্রায় নয় এবং *Chlorophytum repalense* (ঢিকল) উদ্ভিদটি এখন বাংলাদেশে আর পাওয়াই যাচ্ছে না। *তালিপামটি এখন নাই, এর অনেক চারা বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে।

১। তালিপাম (Tali palm)

...দেশের বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদের মধ্যে তালিপাম অন্যতম। এর ... নাম *Corypha taliera* Roxb. গাছটি দেখতে প্রায় তাল গাছের ... এর বাংলা নাম হলো তালি বা তালিপাম। এটি Arecaceae ... গোত্রের অন্তর্গত।

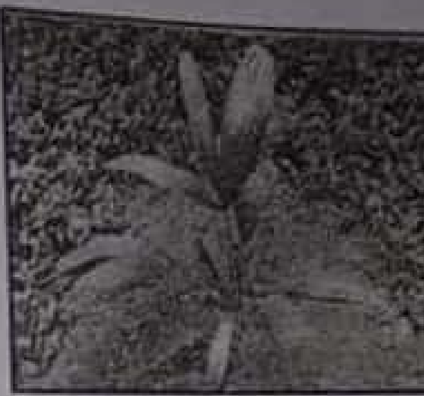

তালিপামের চারা

...পশ্চিম বঙ্গের শান্তিনিকেতনের কাছে অবস্থিত তালিপাম গাছটি ১৯৭৯ সালে কেটে ফেলার পর বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত তালিপাম গাছটিই ছিল বিশ্বের একমাত্র বন্য তালিপাম গাছ। তালিপাম জীবনে মাত্র একবারই ফুল ও ফল উৎপাদন করে এবং পরে তার মৃত্যু ঘটে। ঢাকার গাছটিও ২০১০ সালে ফুল ও ফল উৎপাদন শেষে ২০১২ সালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে মৃত্যুর আগে গাছটি বহু ফল উৎপাদন করে গেছে যা থেকে অসংখ্য চারা করে বন বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাগানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনেও একটি চারা লাগানো হয়েছে।

মঞ্জরীসহ তালিপাম (*Corypha taliera*)

বর্তমানে বিশ্বের কোথাও বন্য অবস্থায় আর কোনো তালিপামের খবর জানা নেই। আমাদের লাগানো চারাগুলোর প্রতি ...যত্ন নেয়া আবশ্যক, যাতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ৬০-৭০ বছর পর মৃত্যুর আগে প্রচুর ফল উৎপাদন ...করতে পারে। বাংলার বাইরে এ গাছ নেই। এটি বৃহত্তর বাংলার এন্ডেমিক।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা ইতোমধ্যেই তালিপামের পুষ্পায়ন, বীজের অঙ্কুরোদগম, কচি ফলের ...কেমিক্যাল বিশ্লেষণ, ব্যাক্টেরিয়া বিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শেষে ফলাফল প্রকাশ ...সক্ষম হয়েছি, যা আগামী ৬০-৭০ বছরে আর সম্ভব হবে না।

২। মল্লিকা ঝাঁঝি (Malacca Jhangi)

মল্লিকা ঝাঁঝি (*Aldrovanda vesiculosa*)

মল্লিকা ঝাঁঝি বাংলাদেশের আরেকটি বিলুপ্ত প্রায় ...। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aldrovanda vesiculosa* Linn. ...গোত্র Droseraceae। মল্লিকা ঝাঁঝি একটি জলজ ... এবং পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মল্লিকা ... পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে রাজশাহীর পটিয়া ...র অন্তর্গত একটি বিল থেকে। পরবর্তীতে চলন ...(পাবনা) থেকেও একবার সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু এর ... পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো জায়গা থেকে মল্লিকা ... সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ ... এটি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে সতর্ক পর্যবেক্ষণে হয়ত কেউ এটি পেয়েও যেতে ...। ...এশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়াতেও মল্লিকা ঝাঁঝি জন্মে থাকে।

৩। ক্ষুদে বড়লা (Khude-barala)

ক্ষুদে বড়লা (*Knema bengalensis*)

ক্ষুদে বড়লা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে এন্ডেমিক অর্থ হলো বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে এখনো এটি পাওয়া যায়নি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Knema bengalensis* de Wilde, গোত্র Myristicaceae। এই উদ্ভিদটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয় ১৯৫৭ সালে কক্সবাজার জেলার ভুলাহাজরা বনাঞ্চল থেকে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে কক্সবাজার জেলার আপার রিজু বনবিট অফিসের কাছে একটি গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্ষুদে বড়লা একটি মধ্যম আকারের বৃক্ষ, কাণ্ডে ক্ষত হলে রক্ত বর্ণের কস বের হতে থাকে। ক্ষুদে বড়লার পুরুষ ও স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। এখনো কোনো স্ত্রী বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আপার রিজু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে এর স্ত্রী বৃক্ষ আবিষ্কার করতে হবে এবং ঐ বৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারা করার মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অথবা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা করতে হবে। এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

কোরুদ (*Licuala peltata*)

৪। কোরুদ(Kurud)

কোরুদ একটি পাম জাতীয় উদ্ভিদ যা চট্টগ্রাম, রাঙামাটি (কাসালং) এবং সিলেটের গহীন বনে জন্মে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Licuala peltata* Roxb। গোত্র Arecaceae. এটি ছোট আকৃতির পাম, মাত্র ২-৩ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এর পাতা দিয়ে এক রকম ছাতা তৈরি করা হয়, আবার ঘরের ছাউনিও দেয়া হয়। বাংলাদেশের বাইরে মায়ানমার এবং ভারতের বিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এটি দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর ইন-সিটু ও এক্স-সিটু উভয় প্রকার সংরক্ষণ অতি জরুরি। বন বিভাগ এ দিকে নজর দিবেন আশা করি।

৫। রোট্যালা (Rotala)

রোট্যালা (*Rotala simpliciuscula*)

রোট্যালা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Rotala simpliciuscula* (S. Kurz) Koehne, গোত্র Lythraceae. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন হুকার ও থমসন (Hooker and Thomson) এবং সেই নমুনার উপর ভিত্তি করে S. Kurz এর নামকরণ করেছিলেন।

রোট্যালা একটি উভচর জাতীয় উদ্ভিদ, জল সিক্ত স্থানে জন্মে থাকে। তবে হুকার ও থমসনের সংগ্রহের পর আর দ্বিতীয় বার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, কাজেই এটি বাংলাদেশ থেকে এমনকি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনুমান করা যায়।

আমাদেরকে এ গাছটিকে খুঁজতে হবে এবং পাওয়া গেলে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের বিপদাপন্ন (বিলুপ্তপ্রায়) কতিপয় প্রাণী (Endangered Animals)

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১। রয়েল বেঙ্গল টাইগার	Royal Bengal Tiger	*Panthera tigris*
২। রাজশকুন	King Vulture	*Sarcogyps calvus*
৩। ঘড়িয়াল	Garial	*Gavialis gangeticus*
৪। মিঠা পানির কুমির	Mugger Crocodile	*Crocodylus palustris*
৫। নীল গাই	Blue Bull	*Boselaphus tragocamelus*
৬। শুশুক	Inawaddy Dolphin	*Orcaella brevirostris*
৭। বন রুই	Chinese Pangolin	*Manis pentadactyla*
৮। বেঙ্গল রুফ কাইট্টা	Bengal Roof Furtle	*Kachuga kachuga*

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*)

১। রাজশকুন (Red-headed vulture)

রাজশকুন বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই একটি বিপন্ন পাখি, বাংলাদেশে এটি মহাবিপন্ন বলে চিহ্নিত। এটি বাংলাদেশের প্রাক্তন আবাসিক পাখি, তবে বর্তমানে আর দেখা যায় না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তৃতি।

রাজশকুনের বৈজ্ঞানিক নাম *Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786); ইংরেজি নাম Red-headed Vulture or King Vulture. এর মাথা লাল, পালক কাল। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। অন্যান্য শকুনের মতো এরা দলবদ্ধ নয়, একা বা জোড়ায় দেখা যায়। খাবারের তালিকায় মৃত পশুর দেহ। উঁচু গাছের ডালে পাতা দিয়ে বাসা বানায় এবং একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ৪৫ দিনে ডিম ফোটে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এটি সংরক্ষিত প্রজাতি।

২। ঘড়িয়াল (True gavial)

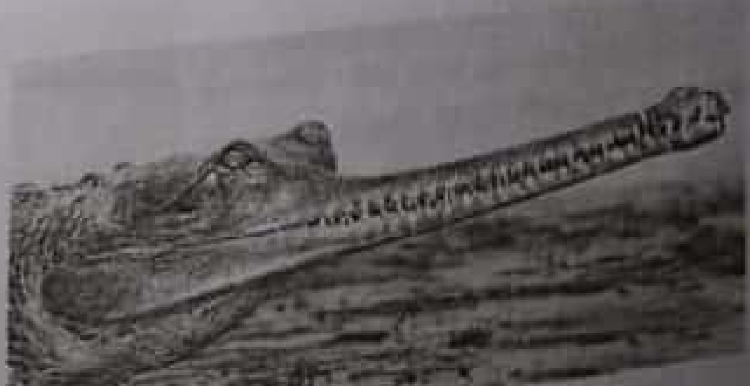
ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*)

ঘড়িয়াল বাংলাদেশে একটি অতি বিপদাপন্ন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে এটি প্রায় বিলুপ্ত, যদিও ভারতের ...জন থেকে আসা ঘড়িয়াল কদাচিৎ নদীতে দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus* (Gmelin, 1789).

ঘড়িয়াল পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক, পুরুষ ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৬.৫ মিটার এবং স্ত্রী ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৪.৫ মিটার। ঘড়িয়াল গভীর ও দ্রুত প্রবাহমান পানিতে বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। নভেম্বর-জানুয়ারি ...এর প্রজনন মাস। স্ত্রী ঘড়িয়াল বালুতে তৈরি গর্তে ৩০-৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম অনেক বড়। ৩ মাস তা দেয়ার পর ডিম ...থেকে বাচ্চা হয়।

এদেরকে ব্রহ্মপুত্র নদে (ভারত ও ভুটান), সিন্ধু নদ (পাকিস্তান), গঙ্গা নদী (ভারত ও নেপাল) এবং মহানদীতে ...(ভারত) পাওয়া যায়। মায়ানমার ও পাকিস্তানেও এই প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত।

সাধারণত জেলেদের মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে এদের জীবনাবসান ঘটে এবং এটি বিলুপ্তির একটি বড় কারণ। এ ...জেলেদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩। মিঠাপানির কুমির (Freshwater crocodyle)

মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*)

মিঠাপানির কুমির বাংলাদেশে বিলুপ্ত, প্রাকৃতিকভাবে আর দেখা যায় না। বাগেরহাটের খান জাহান আলী (র) মাজারের সাথের পুকুরে কয়েকটি কুমির আছে। সম্প্রতি ভারত থেকে সাফারি পার্কে পালনের জন্য কয়েকটি কুমির আনা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris* (Lesson, 1768)।

প্রাপ্তবয়স্ক কুমিরের দেহের দৈর্ঘ্য ৩-৫ মিটার। এরা নদী, পুকুর ইত্যাদি মিঠা পানিতে বাস করে, সাধারণত জোয়ার-ভাটা এলাকায় প্রবেশ করে না। এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। এরা নদীর তীরে গর্তে ডিম পাড়ে, ৫০-৫৫ দিনে ডিম ফোটে। যে কয়টি মিঠাপানির কুমির এখন বাংলাদেশে আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪। নীলগাই (Nilgai)

নীলগাই (*Boselaphus tragocamelus*)

নীল গাই বাংলাদেশের আর একটি বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। ১৯৪০ সালের দিকে বর্তমান বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া অঞ্চলে নীল গাই পাওয়া যেতো বলে জানা যায়, তবে বর্তমানে বাংলাদেশের কোথাও নীল গাই দেখা যায় না, অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত। এরা সমতল ভূমিতে বাস করে। নীল গাইয়ের বৈজ্ঞানিক নাম *Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766)। প্রজনন সময় ছাড়া সাধারণত বছরের অন্যান্য সময় ষাঁড় ও গাভী পৃথকভাবে বিচরণ করে। গাভীর লোম হলুদ বাদামি, প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের লোম নীল-ধূসর।

৫। শুশুক (River dolphin)

শুশুক একটি স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। বাংলাদেশে শুশুক এখন বিপন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত এরা উপকূল ও সমুদ্রে বিচরণ করে। বর্ষায় বড় বড় নদী দিয়ে অনেক ভেতরেও চলে আসে। বাংলাদেশে দু'ধরনের শুশুক পাওয়া যায়, একটির বৈজ্ঞানিক নাম *Orcaella brevirostris* এবং অপরটির বৈজ্ঞানিক নাম *Neophocaena phocaenoides*। দ্বিতীয়টির পিঠে পাখনা নেই। এরা মাঝে মাঝে পানি থেকে উপরে লাফ দেয় এবং দল বেঁধে চলে। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। এরা শুশুক মাছ, শিশু বা শিশু মাছ, হউম মাছ, হচ্ছুম মাছ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত।

শুশুক (*Orcaella brevirostris*)

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

পৃথিবীতে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজাতির জীব ও অণুজীব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এযাবত শনাক্ত হয়েছে মাত্র ১৭.৫ লক্ষ প্রজাতির জীব। প্রকৃতিতে প্রত্যেকটি প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। জীববৈচিত্র্য হলো জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে

...বিভিন্ন আঙ্গিকের পার্থক্য। Bio অর্থ জীব, diversity অর্থ ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য। কাজেই Biodiversity এর বাংলা ...করা হয়েছে জীববৈচিত্র্য। T.E. Lovejoy (1980) তাঁর "Changes in Biological Diversity" প্রবন্ধে এবং E. Norse and R.E. McManus (1980) তাঁর "Ecology and Living resources–Biological Diversity" প্রবন্ধে ...Biological Diversity শব্দ প্রয়োগ করেন। বিজ্ঞানী Walter G. Rosen (1986) সর্বপ্রথম Biological Diversity ...সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে Biodiversity শব্দটি ব্যবহার করেন। অধ্যাপক Hamilton এর মতে, পৃথিবীর মাটি, পানি ও ...বসবাসকারী সব উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবনের মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও পরিবেশগত (বাস্তুতান্ত্রিক) বৈচিত্র্য ...যায় তাকেই জীববৈচিত্র্য বলে। UNCED (1992) এর সংজ্ঞানুযায়ী–পৃথিবীর স্থলজ, সামুদ্রিক ও অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র ...এর সম্পর্কিত সকল স্তরের সদস্য হিসেবে বসবাসকারী জীবদের মধ্যে বিদ্যমান সকল ধরনের বৈচিত্র্যই জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশে ভাস্কুলার উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় ৩,৮৬৬টি। ২০০১ সালের রেড ডাটা বুক অনুযায়ী ১০৬টি বিপন্ন অবস্থায় ...। বাংলাদেশে ৬৫০টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ১২টি প্রজাতি বিলুপ্ত আর ৩০টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ৩৪টি উভচর ...মধ্যে ৮টি, ১৫৪টি সরীসৃপের মধ্যে ১৪টি প্রায় বিলুপ্তির পথে। যেমন-সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বুনোমহিষ, সোয়াম্প ...হরিণ, গন্ডার, চিতা বাঘ ও গাউর পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সারাবিশ্বে ১০–৩৭% জীব আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আগামী ৪০ ...এর মধ্যে ৫০% শৈবাল ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রতি বছরে জীব প্রজাতির বিলুপ্তির হার হলো ৭,০০০ (০.৫%)।

জীব বিলুপ্তির কারণ (Causes of extinction of organism)

বহুবিধ কারণে বিভিন্ন জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে। জীববিলুপ্তির ...প্রধান কারণসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো।

(ক) ইকোলজিক্যাল কারণ

১। **কম পপুলেশন ও কম বিস্তৃতি অঞ্চল :** কোনো প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা কম হলে এবং বিস্তৃতি অঞ্চল সংকীর্ণ হলে তার বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২। **গুচ্ছ বণ্টন :** স্থানে স্থানে গুচ্ছবণ্টিত জীব প্রজাতির সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। **বড় দেহ এবং খাদ্যশৃঙ্খলে উপরে অবস্থান :** খাদ্যশৃঙ্খলে যার অবস্থান যত উপরে তার বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

৪। **কলোনিকরণের ক্ষমতা :** যে সব প্রজাতি নতুন পরিবেশে বংশবিস্তারের মাধ্যমে কলোনি সৃষ্টি করতে পারে না সে সব প্রজাতি সহজে বিলুপ্ত হয়।

৫। **পরিবেশীয় নিয়ামকের অস্থিরতা :** পরিবেশীয় নিয়ামক (খাদ্য সরবরাহ, আবহাওয়া ইত্যাদি) সমূহের অস্থিরতায় দুর্লভ প্রজাতিগুলো টিকে থাকতে পারে না।

৬। **প্রাকৃতিক বিপর্যয় :** ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, হিমবাহ, ভূমিধস, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে সহজেই দুর্লভ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

(খ) **মানব সৃষ্ট কারণ :** বর্তমানকালে মানুষের কার্যকলাপই প্রজাতি ধ্বংসের মূল কারণ।

১। **বাসস্থান ধ্বংস :** জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস। বর্তমানে প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৫০ একর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। জলাভূমি ভরাট জলজ প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ।

২। **এক্সপ্লয়টেশন :** সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ বহু জীব প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩। **অতি মাত্রায় পশুচারণ :** তৃণভূমিতে অতিমাত্রায় পশুচারণের ফলে অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে।

৪। **পলিনেটর ধ্বংস :** মৌমাছিসহ বহু কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। অতিমাত্রায় কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ব্যবহারের ফলে পরাগায়নের এই বাহকগুলো কমে গিয়েছে, ফলে পরাগায়নের অভাবে প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

৫। **পরিবেশ দূষণ :** পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির একটি বড় কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
Importance of conserving endangered species

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রথম নীতিমালা হলো "জীবের প্রতিটি ধরনই অনন্য এবং সমাজ বা মানবতার কাছ থেকে
ন্যায্যতার দাবিদার"। এই নীতিমালার আলোকে কেবল বিলুপ্তপ্রায় জীব নয়, সকল জীব প্রজাতিকে সংরক্ষণ
অপরিহার্য। প্রতিটি জীব তার পরিবেশের একটি উপাদান এবং এর সাথে পরিবেশের অন্যান্য নিয়ামকের একটি নিবিড়
সম্পর্ক রয়েছে। একটি জীব প্রজাতি নয়, একটি জীব প্রজাতির কোনো একটি ইনডিভিজুয়েলের বিলুপ্তিও পরিবেশের
কিঞ্চিৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়া সম্মিলিতভাবে একদিন পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিতে
পারে। কাজেই সঠিকভাবে সকল প্রজাতির জীবকে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের অসচেতনতার কারণে ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।
বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে আছে হাজার হাজার প্রজাতি। এখনই সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে এগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যে জীব প্রজাতিগুলো সহসা বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেগুলোও সংরক্ষণের তালিকায় রাখতে হবে, তবে
সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রতি। পৃথিবীর বুক থেকে একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে
তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এখনো সকল জীব প্রজাতির উপকারি দিক আমাদের জানা সম্ভব হয়নি, হয়তো সে
যাবে আজকের এ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিটি হতেই ভবিষ্যতে আমার কোনো বংশধরের জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ আবিষ্কৃত হবে।
বিলুপ্তপ্রায় কোনো জীব প্রজাতির মধ্যে এমন একটি 'জিন' থাকতে পারে যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের কৃষি ও চিকিৎসা
বিজ্ঞান বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে; ঘটাতে পারবে কৃষি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লব। কাজেই আমরা পৃথিবীর বুক থেকে একটি
জীব প্রজাতিও আর হারিয়ে যেতে দেবো না।

মনে রাখতে হবে এমনিতেই কোনো জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে এগোয়নি। এর পেছনে বহু যুক্তিসংগত কারণ
রয়েছে। প্রথমেই ঐ কারণগুলো জানতে হবে। প্রতিটি জীবের নিজস্ব পরিবেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ঐ রকম পরিবেশ সৃষ্টি
করতে হবে। এরূপ প্রতিটি জীবের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা যায়
কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সব রকম অসুবিধা দূর করে এবং সব রকম সুবিধা প্রদান করে আমরা বিলুপ্তপ্রায়
জীব প্রজাতিগুলোকে পৃথিবীর বুকে কেবল টিকিয়েই রাখবো না, এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবো।

সামগ্রিকভাবে বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে নিম্নলিখিত বিষয় অনুযায়ী দেখা যায়।
(১) কৃষিজজীব ও তাদের বন্য আত্মীয় সংরক্ষণ, (২) ভেষজউদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ, (৩) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ,
(৪) ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ, (৫) অগ্রসরমান অর্থনীতি সংরক্ষণ, (৬) নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং (৭) প্রতিটি জীবের বেঁচে
থাকার অধিকার সংরক্ষণ।

> কাজ : বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি চার্ট তৈরি কর।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity conservation)

বিশ্বকে মহা বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন
দেশ ও সংস্থা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, শুরু হয়েছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ। জীববৈচিত্র্য
সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোই হটস্পট নামে পরিচিত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা কনজারভেশন বলতে বোঝায় বর্তমান জীবকুলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও
বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, যাতে করে একদিকে বর্তমান প্রজন্ম তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে
এবং অপরদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এমনিভাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা
সমুন্নত থাকবে।

অন্যভাবে বলা যায়, কনজারভেশন হলো মানুষ কর্তৃক জীবমণ্ডলের ব্যবহার সংক্রান্ত এমন ব্যবস্থাপনা যাতে করে
জীবমণ্ডল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সুফল প্রদান করতে পারে অথচ একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের
সকল প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাও সমভাবে অক্ষুণ্ন থাকে।

৫। লাউয়াছড়া ন্যাশনাল পার্ক	মৌলভীবাজার	১২৫০	১৯৯৬
৬। কাপ্তাই "	রাঙামাটি	৫৪৬৪	১৯৯৯
৭। নিঝুমদ্বীপ (সবচেয়ে বড়)	নোয়াখালী	১৬৩৫২	২০০১
৮। মেধাকচ্ছপিয়া "	কক্সবাজার	৩৯৫	২০০৮
৯। সাতছড়ি "	হবিগঞ্জ	২৪২	২০০৫
১০। খাদিমনগর "	সিলেট	৬৭৮	২০০৬
১১। বাড়ইয়াঢালা "	চট্টগ্রাম	২৯৩৩	২০১০
১২। নবাবগঞ্জ "	দিনাজপুর	৫১৭	২০১০
১৩। সিংড়া "	দিনাজপুর	৩০৫	২০১০
১৪। কাদিগড় "	ময়মনসিংহ	৩৪৪	২০১০
১৫। আলতাদিঘি "	নওগাঁ	২৬৪	২০১১
১৬। বীরগঞ্জ "	দিনাজপুর	১৬৮	২০১১

২। ইকোপার্ক (Ecopark) : ইকোলজিক্যাল পার্ক-এর সংক্ষিপ্তরূপ ইকোপার্ক। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্যের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে চিত্তবিনোদনের সব ব্যবস্থা করা হয় ইকোপার্কে। সাধারণত প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত বনাঞ্চলের অংশবিশেষকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এনে ইকোপার্ক তৈরি করা হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফ্লোরাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (ii) বিলুপ্ত ও দুর্লভ উদ্ভিদ সংরক্ষণ, (iii) বিরাজমান জীববৈচিত্র্য ও তাদের বাসস্থান সংরক্ষণ, (iv) বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ব্রিডিং ও উন্নয়ন, (v) পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামো নির্মাণ, (vi) স্থানীয় বাসিন্দাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং (vii) শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইকোপার্ক

(a) সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক : সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম। ঐতিহাসিক চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মন্দিরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়তন ১৯৯৬ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৯। প্রাকৃতিক *Cycas* এখানে জন্মে থাকে। প্রায় ১৫৪ প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে পাওয়া যায়।

(b) মধুটিলা ইকোপার্ক : নালিতাবাড়ি উপজেলা, শেরপুর। বাংলাদেশ-ভারতের বর্ডার সংলগ্ন গারো পাহাড়ের পাদদেশে এটি অবস্থিত। আয়তন ৩৮০ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৯। ঘন বন, পাহাড়, ঝর্ণা, লেক এবং বহু টিলা নিয়ে এই পার্ক গঠিত।

(c) মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক : বড়লেখা উপজেলা, মৌলভীবাজার। পাথারিয়া হিল-রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত। আয়তন ৫০০ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০১। দৃষ্টিনন্দন মাধবছড়া ঝর্ণা এখানে অবস্থিত। দুর্লভ সোনালী বৃক্ষ এখানে দেখা যায়।

(d) বাঁশখালি ইকোপার্ক : বাঁশখালি উপজেলা, চট্টগ্রাম। জলদি অভয়ারণ্য রেঞ্জের বামের ছড়া ও ডানের ছড়া এলাকা নিয়ে এই ইকোপার্ক গঠিত। আয়তন প্রায় ৩০০০ একর। এই পার্বত্য এলাকায় বহু দৃষ্টিনন্দন কাঠামো (লেক, ঝুলন্ত সেতু) এবং হাতি, ভাল্লুক, হরিণ, অজগর দেখা যায়। প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৩।

(e) কুয়াকাটা ইকোপার্ক : পটুয়াখালির কলাপাড়া উপজেলা এবং বরগুনার আমতলি উপজেলার অংশ নিয়ে কুয়াকাটা ইকোপার্ক গঠিত। প্রায় ১৩ হাজার একর আয়তনের এই বিশাল ইকোপার্ক ২০০৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এবং ম্যানগ্রোভ বন এই ইকোপার্কের অন্তর্ভুক্ত। পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থা আছে।

(f) টিলাগড় ইকোপার্ক : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে টিলাগড় ইকোপার্ক গঠিত। আয়তন ১১২ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৬।

(g) জাফলং ইকোপার্ক : সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার কৌলাখাল রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে এই ইকোপার্ক গঠিত। সিলেট-তামাবিল হাইওয়ের দু'পাশে স্ট্রিপ গার্ডেন (strip gardens) করে দেয়া হয়েছে।

…বৈচিত্র্য সংরক্ষণ (preservation), রক্ষণাবেক্ষণ (maintenance), সহনীয় মাত্রায় প্রয়োগ (sustainable …), পুনরুদ্ধার (restoration) এবং ব্যবহারের (using biodiversity) মাধ্যমে গঠিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে …সিটি কনজারভেশন বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।

…দেশের সংরক্ষিত অঞ্চল (Protected Areas of Bangladesh) : সরকারি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (চ্যাপ্টার …১৩, ১৭, ১৮, ১৯ ধারা অনুযায়ী) সংরক্ষিত অঞ্চল (বনাঞ্চল) ঘোষণা করা হয়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাই এর …। সব অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ … এবং ট্রাডিশনাল হেরিটেজ অঞ্চল 'সংরক্ষিত অঞ্চলের' অন্তর্ভুক্ত।

…জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রধানত দু'প্রকার, যথা- (ক) ইন-সিটু সংরক্ষণ (খ) এক্স-সিটু সংরক্ষণ ।

(ক) প্রাকৃতিক বাসস্থানে সংরক্ষণ বা ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-situ conservation) : মূল বাসস্থানে তথা প্রাকৃতিক …এর বিবর্তনীয় গতিশীল ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাকে বলা হয় ইন-সিটু সংরক্ষণ। …সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও সিক্ত পরিবেশে সুন্দরী গাছ জন্মে থাকে। কাজেই সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনের মূল … তথা ঐ পরিবেশতন্ত্রে সংরক্ষণ করাই হলো ইন-সিটু সংরক্ষণ বা স্বস্থানে সংরক্ষণ এর একটি উদাহরণ।

…সিটু সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ

(i) কোনো প্রজাতি সংরক্ষণের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো যে বাসস্থানে ইহা জন্মে সেই বাসস্থানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এর ফলে উক্ত প্রজাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণিকুলও সংরক্ষিত হয়।

(ii) অনেক উদ্ভিদ তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে তাদের মাইকোরাইজাল ছত্রাকের উপর নির্ভরশীল। ইন-সিটু সংরক্ষণের ফলে মাইকোরাইজাল ছত্রাকও সংরক্ষিত হয় এবং ঐ উদ্ভিদের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়।

(iii) একটি প্রজাতি বা একটি উদ্ভিদ কেবলমাত্র একটি ইকোসিস্টেমের অংশই নয়, ইহা বিভিন্নভাবে আশপাশের অন্যান্য প্রজাতির সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে এবং অনেক প্রজাতিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ইন-সিটু সংরক্ষণে এ সুবিধা থাকে।

(iv) কোনো প্রজাতিকে তার বাসস্থানে সংরক্ষণের সবচেয়ে উপকারী দিক হলো এই যে এতে করে বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলো চালু থাকে।

(v) যে দেশ বা অঞ্চলে ফ্লোরা এখনো ভালোভাবে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি অথবা বিশদভাবে স্টাডি করা সম্ভব হয়নি সে দেশ বা সে অঞ্চলে ইন-সিটু সংরক্ষণ আবশ্যক। অনেক দেশেই সংকটাপন্ন প্রজাতির (endangered species) তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হয়নি, সেসব দেশে এক্স-সিটু অবস্থানে কোন কোন প্রজাতি সংরক্ষণ করতে হবে তাও সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়নি, কাজেই ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ করা তথা ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতিই সেখানে আদর্শ সংরক্ষণ পদ্ধতি।

(vi) যে অঞ্চলে এখনো অনেক প্রজাতি অনাবিষ্কৃত রয়েছে সে অঞ্চলেও ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতি আবশ্যক।

(vii) রিক্যালসিট্র্যান্ট (recalcitrant) বীজ সংরক্ষণের জন্য ইন-সিটু পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

…সিটু সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যমগুলো নিম্নরূপ :

১। জাতীয় উদ্যান (National Park) : ন্যাশনাল পার্ক বলতে বোঝায় প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনামূলকভাবে …অঞ্চল যেখানে বন্যজীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সুরক্ষিত থাকবে। গবেষণা ও বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে … পার্কে প্রবেশ করা যায়। বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক হলো—

বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক

সংরক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক	গাজীপুর	৫০২২	১৯৮২
২। মধুপুর "	টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ	৮৪৩৬	১৯৮২
৩। রামসাগর → (সবচেয়ে ছোট)	দিনাজপুর	২৭.৭৫	২০০১
৪। হিমছড়ি → (সর্ব প্রথম)	কক্সবাজার	১৭২৯	১৯৮০

(ঙ) বঙ্গবন্ধু যমুনা ইকোপার্ক : বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পশ্চিম পাশে এটি বনবিভাগ কর্তৃক সৃজন করা ইকোপার্ক। ...১২৪ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৭।

(চ) বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক : মৌলভীবাজার শহরের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টের ৮৮৭ একর জায়গা নিয়ে ২০০৬ সালে ...ষ্ঠিত হয় এই ইকোপার্ক। এখানে অবজার্ভেশন টাওয়ার, ইকো-কটেজ, পিকনিক স্পট এবং বক্তৃতা থিয়েটার ও জেলার ...য় আছে।

৩। সাফারি পার্ক (Safari Park) : সাফারি পার্ক এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি যেখানে বন্য প্রাণীরা (বিশেষ...) ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত থাকে, মুক্তাবস্থায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং দর্শনার্থীগণ বিশেষ বাহনে ...ে থেকে তাদের গতিপ্রকৃতি অবলোকন করে আনন্দ লাভ করে সেই পার্ক হলো সাফারি পার্ক। সাফারি পার্কে দেশের ... এবং বিদেশ থেকে আনা বন্যপ্রাণী প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাণীরা এখানে মুক্তভাবে ... করতে পারে। সাফারি পার্কের উদ্দেশ্য হলো: (i) ইকোট্যুরিজম, (ii) বিনোদন, (iii) কনজার্ভেশন এবং গবেষণা, ...জনগণের মধ্যে সংরক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টি। বাংলাদেশে দুটি সাফারি পার্ক আছে। যথা-

(i) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা। এটি ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক নামেও পরিচিত। ...আয়তন প্রায় ২২২৪ একর। উপজেলা চকোরিয়া, জেলা কক্সবাজার। প্রতিষ্ঠা ১৯৯৯। ...এখানে ১৬৫ প্রজাতির প্রায় ৪০০০ প্রাণী আছে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে গর্জন, বৈলাম, তেলসুর প্রধান। প্রাণীর ...মধ্যে অধিক সংখ্যায় হাতি আছে, আরো আছে সিংহ, ভাল্লুক, গয়াল, কুমির, হরিণ ইত্যাদি।

(ii) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর। এটি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা অঞ্চলে অবস্থিত। আয়তন ...০ একর বনভূমি। ২০১১ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৩ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এটি ...ল্যান্ডের সাফারিওয়ার্ল্ড-এর মডেলে তৈরি করা হয়েছে। প্রধান উদ্ভিদ শাল। বন্যপ্রাণী-বাঘ, সিংহ, হাতি, সাম্বার, হরিণ, ..., হনুমান, ভাল্লুক, গয়াল, কুমির এবং বিভিন্ন পাখি।

৪। বন্যজীব অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary) : এমন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে মাটি, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব ...সুরক্ষার জন্য অক্ষত রাখা হবে যাতে করে সব ধরনের জীব মুক্তভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বন্যজীব অভয়ারণ্য হলো-

বন্যজীব অভয়ারণ্য

সংরক্ষিত এলাকার নাম		স্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। রেমাকেলেঙ্গা	অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫	১৯৯৬
২। চর কুকড়ি-মুকড়ি	(সবচেয়ে ছোট)	ভোলা (প্রথম)	৪০	১৯৮১
৩। সুন্দরবন (পূর্ব)	"	বাগেরহাট	৩১২২৬	১৯৯৬
৪। সুন্দরবন (পশ্চিম)	(সবচেয়ে বড়)	সাতক্ষীরা	৭১৫০২	১৯৯৬
৫। সুন্দরবন (দক্ষিণ)	"	খুলনা	৩৬৯৭০	১৯৯৬
৬। পাবলাখালী	"	রাঙ্গামাটি	৪২০৮৭	১৯৮৩
৭। চুনতি	"	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩	১৯৮৬
৮। ফাঁশিয়াখালী	"	কক্সবাজার	১৩০২	২০০৭
৯। দুধপুকুরিয়া-ধুপাছড়ি	"	চট্টগ্রাম	৪৭১৬	২০১০
১০। হাজারিখিল	"	চট্টগ্রাম	২৩৩১	২০১০
১১। টেকনাফ (এটি পূর্বে গেমরিজার্ভ ছিল)		কক্সবাজার	১১৬১৫	২০১০
১২। সাঙ্গু	"	বান্দরবান	২৩৩১	২০১০
১৩। টেংরাগিরি	"	বরগুনা	৪০৪৮	২০১০
১৪। দুধমুখী	"	বাগেরহাট	৫৮০	২০১২
১৫। ঢাংমারি	"	বাগেরহাট	৩৪০	২০১২
১৬। সোনারচর	"	পটুয়াখালী	২০২৬	২০১১
১৭। নাজিরগঞ্জ (ডলফিন)	"	পাবনা	১৪৬	২০১৩

৫। গেম রিজার্ভ : এমন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে বন্যজীব সুরক্ষিত থাকবে, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে শি... করা যাবে। বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভটি ছিল কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরে অবস্থিত টেকনাফ গেম রিজার্ভ... বর্তমানে এটি বন্যজীব অভয়ারণ্য।

৬। বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) : ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক... খ্যাতিসম্পন্ন এলাকা বা স্থাপনাকে বিশ্বসম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনকে ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট ঘোষণা করে।

৭। মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary) : অভয়ারণ্যে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষিত হয়। তাই মাছের জন্য পৃথক অভয়াশ্রমের প্রয়োজন দেখা দেয়, বিশেষ করে দেশি মাছের জন্য। এ ধরনের অভয়াশ্রম হলো বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওড় ও হাকালুকি হাওড় এবং চট্টগ্রামের মাছ প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী।

টাঙ্গুয়ার হাওড় (Tanguar Haor) : বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত ওয়েটল্যান্ড হলো টাঙ্গুয়ার হাওড়। এটি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলায় অবস্থিত। ৫১টি জলমহাল নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওড় গঠিত। স্থানীয়ভাবে এটি 'নয় কুড়ি বিল নয় কুড়ি কান্দা' নামে পরিচিত। আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটার। টাঙ্গুয়ার হাওড়কে ১৯৯৯ সালে ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং ২০০০ সালে একে Ramsar site ঘোষণা করা হয়। এই হাওড়ে নিজস্ব পাখি ছাড়াও শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে আগত প্রায় ২০০ প্রকার বিভিন্ন বিদেশি পাখি এসে থাকে। এখানকার উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ প্রজাতি হলো হিজল, করচ, বরুন ইত্যাদি।

হাকালুকি হাওড় (Hakaluki Haor) : আয়তনের দিক থেকে হাকালুকি হাওড় বিশ্বের সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ১৮১.১৫ বর্গ কিলোমিটার। মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার পাঁচটি উপজেলায় (কুলাউড়া, জুরি, বড়লেখা, গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) এর বিস্তৃতি। ১৯৯৫ সাল হতেই এটি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া এবং রামসার সাইট হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ হাওড়ে আছে বহু প্রজাতির দেশি মাছ ও অন্যান্য প্রাণী, আর আছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি। শাপলা, পদ্মসহ বহু প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ এখানে জন্মে থাকে।

হালদা নদী (Halda River) : হালদা নদী বাংলাদেশের অধিকাংশ কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের হালদাছড়া থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি ফটিকছড়ির রাউজান, হাটহাজারীর কালুরঘাট ও চাঁদগাঁও-এর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে কর্ণফুলী

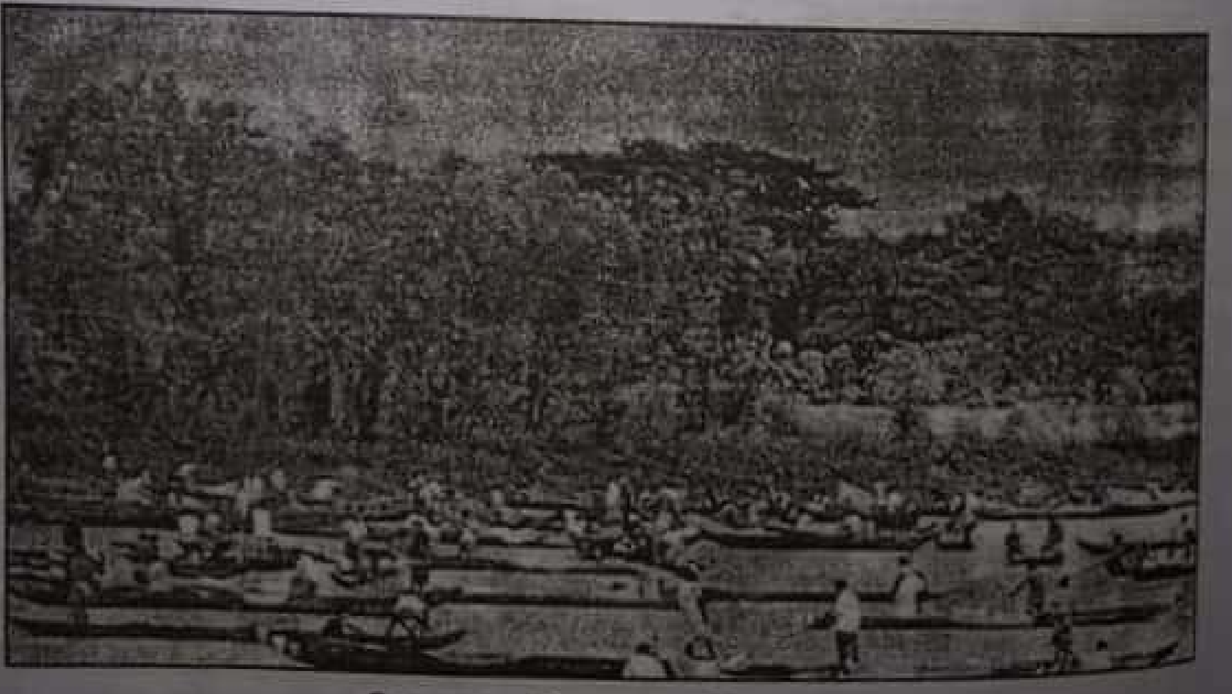

চিত্র : হালদা নদীতে জেলেদের ডিম ধরার দৃশ্য

...দীতে পড়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫ কিলোমিটার। এই নদীতে সময়মত ও সঠিক মতো ডিমপাড়ার উপর আমাদের ...র চাহিদা পূরণের অনেকটাই নির্ভর করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এই প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রের গুরুত্ব ...র্ণনীয়। বলা হয়ে থাকে এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। সাধারণত এপ্রিলের শেষ বা মে ...সের প্রথম দিকে এখানে মা-মাছেরা ডিম পাড়ে এবং জেলেরা তা সংগ্রহ করে। নদী দূষণের কারণে ডিমের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। এ প্রজনন কেন্দ্রকে অবশ্যই দূষণ মুক্ত রাখতে হবে।

(খ) কৃত্রিম বাসস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু সংরক্ষণ (Ex-situ conservation) : বায়োডাইভারসিটির উপাদানসমূহকে তাদের মূল বাসস্থান বা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে বাঁচিয়ে রাখাই হলো এক্স-সিটু সংরক্ষণ। সিলেট বনের আগর গাছকে বা সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগিয়ে সংরক্ষণ করা হলো এক্স-সিটু সংরক্ষণ একটি উদাহরণ। নিম্নলিখিত উপায়ে এক্স-সিটু সংরক্ষণ করা হয়।

১। উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical garden) : সারা বিশ্বে প্রায় ২,০০০ বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। বোটানিক গার্ডেনে সাধারণত দুর্লভ প্রজাতি, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং ট্যাক্সোনমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। বিশ্বের মোট পুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো আছে বোটানিক গার্ডেনগুলোতে। কাজেই বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণের একটি বড় উপায় হলো বোটানিক গার্ডেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনে এমন কিছু প্রজাতি সংরক্ষিত আছে যা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাজ নিম্নরূপ :

(i) পাবলিক সার্ভিস (সামাজিক, কালচারাল, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক, বিশেষ কাজ) যেমন-ফ্লাওয়ার শো,
(ii) শিক্ষা, (iii) কনজার্ভেশন, (iv) গবেষণা, (v) হার্বেরিয়াম এবং প্রকাশনা।

পৃথিবীর প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল থিওফ্রাস্টাস-এর স্কুল (লাইসিয়াম = Lyceum) সংলগ্ন গার্ডেন। তারপর উল্লেখযোগ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো ইতালির Lucaghini (১৪৯০-১৫৫৬) নামক উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গার্ডেন। পরবর্তীকালে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ইতালির Padua বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গার্ডেন (১৫৪৫) উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্ভবতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন যা ১৯৪০ দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এ গার্ডেনে অনেক দুর্লভ উদ্ভিদ আছে। দেশের বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিরপুর, ঢাকা। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ৮৪.২ হেক্টর জায়গার এক বিশাল গার্ডেন। এই গার্ডেনে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, অর্কিড মিলে প্রায় ৫৭,০০০ উদ্ভিদ নমুনা আছে। এই গার্ডেনে কোনো হার্বেরিয়াম নেই, তবে এর এক কোণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম অবস্থিত।

বিনোদন বা শখের বাগান বোটানিক্যাল গার্ডেন নয়। বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সৃজন করা গার্ডেনই বোটানিক্যাল গার্ডেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবসার জন্য "চৈতন্য নার্সারী" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৯৪ সালে জামালপুরে। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ১৯০৯ সালে ঢাকার ওয়ারীতে একটি শখের বাগান বলধা গার্ডেন তৈরি করেন। বহু বিদেশী দুর্লভ উদ্ভিদ সমৃদ্ধ হয়ে এটি এখনো টিকে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বনবিভাগ এ বাগানকে বোটানিক্যাল গার্ডেন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

২। বীজ ব্যাংক (Seed bank) : সীড ব্যাংকের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ একটি সহজতর উপায়, কারণ সীড ব্যাংকে অল্প জায়গায় অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচে অধিক প্রজাতি ধরে রাখা যায়। সীড ব্যাংকে এমন অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ সংরক্ষিত আছে যা বাস্তবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। *Bronus interruptus* (Kackel) Druce এবং *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla এমন দুটি প্রজাতি যারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সীড ব্যাংকে এদের বীজ সংরক্ষিত আছে।

বীজকে শুকিয়ে –20°C তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করলে প্রায় অধিকাংশে উদ্ভিদ প্রজাতির বীজকেই (orthodox ...) শতাব্দীর পর শতাব্দী অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসহ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এ ধরনের বীজ মোট সবীজী উদ্ভিদের শতকরা ... ভাগ। অন্য ৩০ ভাগ বীজ recalcitrant বীজ হিসেবে পরিচিত। যে সব বীজকে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তা হলো রিক্যালসিট্রান্ট বীজ, যেমন আম।

৩। ফিল্ড জিন ব্যাংক (Field gene bank) : ফিল্ড জিন ব্যাংকের মাধ্যমে রিক্যালসিট্রান্ট বীজবাহী উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা সম্ভব। কোনো প্রজাতির স্বাভাবিক এলাকার বাইরে অন্য কোনো স্থানে এসব প্রজাতির জীবন্ত নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। ক্রপ প্রজাতির জন্য এ প্রক্রিয়া উত্তম। কাসাভার জন্য কলম্বিয়াতে ফিল্ড জিন ব্যাংক আছে। বাংলাদেশের হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে আম, লিচু ও নারিকেলের ফিল্ড জিন ব্যাংক রয়েছে।

৪। জিন ব্যাংক (Gene bank) : উদ্ভিদের জিন তত্ত্বের সম্পদগুলোকে সংরক্ষণে এবং পৃথিবীর বিশাল শস্য প্রকরণ (variety) এবং তাদের বর্ণ প্রজাতিগুলো সংরক্ষণের ও উৎপাদনে জিন ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনাগুলোকে সময়ে সময়ে জন্মানো হয় এবং এ থেকে নতুন বীজ উৎপন্ন করে সংরক্ষণ করা হয়।

৫। চিড়িয়াখানা (Zoo) : চিড়িয়াখানা এমন এক ধরনের স্থাপনা (এলাকা) যেখানে জীবন্ত বন্য প্রাণীসমূহ আবদ্ধ করে রেখে সেখানে বিনোদন, গবেষণা ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটা জাতীয় পর্যায়ে এক বৃহৎ পরিসরে আবার ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠে। উদাহরণ-মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা।

৬। নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ (Low temperature conservation) : অঙ্গজ বংশবিস্তারে সক্ষম এমন ফসলের অঙ্গজ অংশ (যেমন-রাইজোম, বাল্ব, টিউবার, কন্দ) সাধারণত অল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায় যদি না এদেরকে উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা ৪°–৫° সে. তাপমাত্রায় গোল আলুকে ৫–৭ মাস হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায়। আবার ১৪° সে. তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতায় মিষ্টি আলু ... সংরক্ষণ করা যায়। তবে এভাবে বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

৭। ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ (In-vitro conservation) : ইন-ভিট্রো উপায়ে ল্যাবরেটরিতে রিক্যালসিট্রান্ট প্রজাতির ক্যালাস (callus) টিস্যু সংরক্ষণ করা যায় বা তরল আবাদ মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে Cryogenic পদ্ধতিতেও (–১৯৬° সেন্টিগ্রেড) এদেরকে সংরক্ষণ করা যায়, তবে এতে সময়, খরচ ও অধিক সতর্কতার দরকার হয়।

৮। ডিএনএ সংরক্ষণ (DNA conservation) : উদ্ভিদ থেকে DNA আহরণ করে তা সংরক্ষণ করা হয়। DNA সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্ক্ষিত জিন সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু এখনো সংরক্ষিত DNA থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবিত হয়নি।

৯। পরাগরেণু সংরক্ষণ (Pollen grain conservation) : পরাগরেণুকে নিম্নতাপমাত্রায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং পরে জীবন্ত উদ্ভিদের সাথে ক্রসিং-এ ব্যবহার করা যায়। সংরক্ষিত পরাগ থেকে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদও সৃষ্টি করা যাবে। পরাগ সংরক্ষণের মাধ্যমে কেবল উদ্ভিদের পুরুষ দিকটি সংরক্ষিত হয়, স্ত্রী দিকটি নয়।

কোন কোন প্রজাতি সংরক্ষণের দাবিদার

এক্স-সিটু কনজার্ভেশনে সব উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়, তাই কোন কোন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সংরক্ষণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

(i) দুর্লভ (rare) এবং সংকটাপন্ন (endangered) প্রজাতি প্রথম অগ্রাধিকার পাবে।

(ii) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দরকারি উদ্ভিদ প্রজাতির নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি অগ্রাধিকার পাবে, কারণ এসব নিকট সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদ জেনেটিক সম্পদের (genetic material) উৎস হিসেবে কাজ করে, যেমন- রোগ প্রতিরোধী জিন।

(iii) ট্যাক্সোনমিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি ও তার নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি সংরক্ষণে অগ্রাধিকার পাবে।

> দলগত কাজ : কোনো বোটানিক্যাল গার্ডেন, ন্যাশনাল পার্ক, অভয়াশ্রম, অভয়ারণ্য ভ্রমণ করে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন তৈরি কর এবং শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of biodiversity conservation)

প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি ও ধ্বংসে একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু গত এক শতাব্দী যাবৎ ধ্বংসের হার সৃষ্টির চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এর মূল কারণ মানুষের কর্মকাণ্ড। বন ধ্বংসে ও জলাশয় ভরাট করে কৃষিজমি সম্প্রসারণ, অধিক ফসল ফলাতে রাসায়নিক সার, আগাছা নাশক, কীটপতঙ্গ নাশক, ছত্রাক নাশক প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ আহরণ, ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক বনভূমি ও জলাভূমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণিকুল তার খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সরাসরি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল থাকায় বনভূমি ও জলাভূমি হ্রাসের সাথে সাথে বহু প্রাণী প্রজাতিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অথবা বিলুপ্তির পথে আছে। একসময় আমাদের পত্রবহুল বনে ময়ূর ছিল বলে জানা যায়। আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও বাঘের উপদ্রব ছিল, বানরের জন্য বনের ধারে বাড়িতেও থাকা যেতো না। এখন ময়ূর নেই, বাঘও নেই, বানরও প্রায় নেই বললেই চলে।

বনভূমির দ্রুত হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা দিয়েছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু। ঝড়, টর্নেডো, হ্যারিকেন, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েই চলেছে। এসব কারণে মানুষের অস্তিত্বই আজ হুমকির মুখে। কাজেই মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পৃথিবীব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। সৃষ্টি হয়েছে IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources); WWF (World Wildlife Fund & Nature); UNEP (United Nations Environmental Program); WCMC (World Conservation Monitoring Centre); CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), EAS (Environmental Awareness Strategies), UNICEF (United Nations International Children Emergence Fund) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

নিজ দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের উপর নির্ভর করার চেয়ে নিজেরাই সচেতন হবো এবং জনসাধারণকে সচেতন করবো। জনগণকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝাতে পারলে সহজেই আমাদের এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে ভারতের হিমালয় অঞ্চলের 'চিপকো' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। চিপকো স্থানীয় আদিবাসী শব্দ যার অর্থ হলো লেপ্টে থাকা। কোনো বৃক্ষ কাটতে এলে ঐ আন্দোলনের কর্মীরা গাছের সাথে লেপ্টে থাকে, ফলে ঐ গাছটি কাটা হতে থেকে রক্ষা পায়। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আমাদেরও অবস্থা অনুযায়ী কোনো উপায় আবিষ্কার করতে হবে।

নিম্নোক্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বকে নিম্নলিখিত উপায়ে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করা যায়।

১। **জীববৈচিত্র্য ও কৃষি :** কৃষি উন্নয়নের জন্য জীববৈচিত্র্য থাকা অপরিহার্য। ফসলী উদ্ভিদের নিকট সম্পর্কযুক্ত বন্য উদ্ভিদের জিন ব্যবহার করে আমাদের কৃষি প্রজাতির ফলন অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে, খরা সহিষ্ণু, লোনা জল সহিষ্ণু প্রকরণও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও মানব সমাজের খাদ্য যোগানের জন্য অধিক প্রয়োজনীয়। তাই জীববৈচিত্র্য (বিশেষ করে বন্য জীববৈচিত্র্য) মানব সমাজের খাদ্য যোগানের পার্শ্বক্ষমতিত। আবার মানুষের পছন্দের হয়ে যায়।

২। **জীববৈচিত্র্য ও মাছের চাহিদা :** বহু জাতের মাছ আছে, এদের পুষ্টিমানও পার্থক্যমণ্ডিত। জীবকুল যত বৈচিত্র্যময় হবে, আমাদের নিত্য চাহিদা বহুমুখী। আবার এক মাছ আরেক মাছের খাবার। কাজেই জীবকুল যত বৈচিত্র্যময় হবে, নতুন নতুন উদ্ভিদ চাহিদা ততটাই পূরণ হবে।

৩। **জীববৈচিত্র্য ও ওষুধ :** মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জীববৈচিত্র্য নির্ভর। নতুন নতুন উদ্ভিদ গবেষণায় নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। মানুষের জেনেটিক পার্থক্য ব্যাপক, বর্তমানের রোগের ধরনও ব্যাপক। এই বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটাতে ব্যাপক বৈচিত্র্যময় জীব প্রজাতি থাকা অপরিহার্য। আমেরিকার The National Cancer Institute ৩৫,০০০ হাজার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির এক লক্ষটি নির্যাস পরীক্ষা করে মাত্র একটি থেকে Taxol (Pacific Yew Tree থেকে) নামক ক্যান্সার কেমোথেরাপির ওষুধ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ৩৫,০০০ হাজার প্রজাতির মধ্যে যদি ঐ একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতো তাহলে কেমোথেরাপির এই ওষুধটি আর আবিষ্কৃত হতো না। এ থেকেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

... জীববৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নির্মাণ সামগ্রী, ... ওষুধ, রং, মোম, কাগজ শিল্প, কর্ক শিল্প, রাবার শিল্প ইত্যাদি বহু ধরনের সামগ্রী জীবজগৎ থেকে আসে। বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ, বৈচিত্র্যময় সামগ্রীর যোগান দেয়। জীববৈচিত্র্য সংকুচনের সাথে সাথে আমাদের ব্যবসা ও শিল্প সংকুচিত হয়।

৫। **জীববৈচিত্র্য ও ইকোট্যুরিজম :** জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এলাকাকে ইকোট্যুরিজমের জন্য বেছে নেয়া হয়। বৈচিত্র্যময় জীব দেখার জন্য দেশ-বিদেশের প্রচুর লোক সেখানে যায় এবং এর মাধ্যমে দেশ বিপুল অংকের মুদ্রা (বৈদেশিক মুদ্রা) লাভ করে।

৬। **জীববৈচিত্র্য ও এথনোবায়োলজি :** উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধরনের জীবকে ব্যবহার করেছে। সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সাথে তাদের সমৃদ্ধজীবন-যাপন নির্ভরশীল। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ উপজাতীয় গোষ্ঠীর সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য দরকার।

৭। **জীববৈচিত্র্যের নান্দনিক গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্যের নান্দনিক গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পরিপাটি এবং মনোরম পরিবেশ মানুষকে দিয়ে থাকে অনাবীল আনন্দ, মানসিক শান্তি ও দৈহিক প্রশান্তি। মানসিক শান্তি মানুষকে করে চিন্তামুক্ত, রোগমুক্ত ও দীর্ঘজীবী। এটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য অধিক উপযোগী।

৮। **জীববৈচিত্র্য এবং অবকাশ যাপন ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্য কবি সাহিত্যক ও চিত্র শিল্পীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগায়, কাজে আনে নতুনত্ব ও গতি। অনেকেই অবসর সময় কাটান বাগান করে, পাখি পালন করে, অ্যাকুরিয়ামে সুন্দর মাছ চাষ করে।

৯। **জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ইকোসিস্টেম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। কোনো ইকোসিস্টেমের ১/২টি কীস্টোন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ফুড চেইন ও ফুড ওয়েব দুটিই জীববৈচিত্র্যনির্ভর। কাজেই জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব অপরিসীম।

১০। **শরণার্থী হ্রাস :** বিশ্বের বহুস্থানে পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে শরণার্থী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে ১ জন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করলে জলবায়ুর অসুবিধাগুলো দূর হবে এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনা নিলে শরণার্থী সংখ্যা হ্রাস পাবে।

IUCN Red List Categories

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) একটি বিশ্বভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী সংস্থা বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির আশঙ্কায় আছে এমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা করেছে, যা IUCN Red List নামে পরিচিত। বিস্তর গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের আলাপ-আলোচনার পর IUCN এ সংক্রান্ত কতিপয় ক্যাটাগরি (শ্রেণি) নির্ধারণ করে দিয়েছে। IUCN এর বর্তমান নাম World Conservation Union (WCU)।

ক্যাটিগরিসমূহ নিম্নরূপ :

১। **Extinct Species বা বিলুপ্ত প্রজাতি :** যে প্রজাতিটির সম্ভাব্য সব বাসস্থান এবং বছরের সব ঋতুতে পর্যায়ক্রমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর পর নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, প্রজাতিটির সর্বশেষ সদস্যটির মৃত্যু হয়েছে। এর আর কোনো সদস্য বেঁচে নেই। বাংলাদেশের এন্ডেমিক *Nothopegia acuminata* J. Sinclair এখন বিলুপ্ত।

২। **Extinct in the Wild বা বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত :** যে প্রজাতিটি তার প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশে আর পাওয়া যায় না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে কিন্তু বাগানে চাষাবস্থায় বা কোথাও পালিত অবস্থায় (প্রাণীর ক্ষেত্রে) এখনও সংরক্ষিত জীবিত সদস্য রয়েছে তাকে বলা হয় বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত। *Anthurim leuconeurum* এমন একটি প্রজাতি যা বন্য অবস্থায় বিলুপ্ত কিন্তু Kew garden-এ লাগানো আছে।

৩। **Critically Endangered বা অতিবিপন্ন :** বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার মতো চরম ঝুঁকিতে আছে তা হলো অতিবিপন্ন শ্রেণি।

৪। **Endangered Species বা বিপন্ন প্রজাতি :** বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে অতিবিপন্ন অবস্থায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটি হলো বিপন্ন প্রজাতি।

৫। **Vulnerable Species বা বিপদগ্রস্থ/শঙ্কাগ্রস্থ :** বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতি ভবিষ্যতে বিপন্ন প্রজাতিভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো বিপদগ্রস্থ বা শঙ্কাগ্রস্থ শ্রেণি।

৬। **Rare Species বা বিরল প্রজাতি :** এসব প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা খুব কম এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত বা কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমিত থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতিবিপন্ন, বিপন্ন, বিপদগ্রস্থ শ্রেণি তিনটিকে একত্রে হুমকিগ্রস্থ (threatened) প্রজাতি বলে।

IUCN এর অন্যান্য ক্যাটিগরি হলো Least concern (LC), Data deficient (DD) এবং Not evaluated (NE)
৩, ৪ এবং ৫নং ক্যাটিগরিকে বলা হয় Threatened Category.

> দলগত কাজ : এলাকার বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথ্য অনুসন্ধান, তালিকাকরণ, ফটোগ্রাফকরণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। বছর শেষে কাজের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য : Biodiversity-এর বাংলা জীববৈচিত্র্য করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে পৃথিবীতে বিরাজমান জীবসমূহের সামগ্রিক সংখ্যাপ্রাচুর্য ও ভিন্নতা হলো জীববৈচিত্র্য। জীব বলতে অণুজীব, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বুঝায়। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব রয়েছে। এরা একটি থেকে অপরটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং পৃথকযোগ্য। একটি প্রজাতির সব ব্যক্তি (individual) কি একই রকম? সামগ্রিক গঠনে একই রকম হলেও সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যে এরা পার্থক্যমণ্ডিত। পৃথিবীর সকল মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রতিটি মানুষই একজন থেকে অপরজন আলাদা। জিনগত পার্থক্যের কারণে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথকযোগ্য, ভিন্ন। পরিবেশ তথা ইকোসিস্টেম জীব প্রজাতিসমূহকে ধারণ করে। একটি ইকোসিস্টেম থেকে অন্য একটি ইকোসিস্টেমের গঠনগত পার্থক্য থাকলে তাদের ধারণকৃত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যেও পার্থক্য থাকবে। একটি জলজ ইকোসিস্টেমে যে ধরনের জীব বাস করে, একটি স্থল ইকোসিস্টেমে অন্য ধরনের জীব বাস করে। সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমে যে ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে, মধুপুর বনের ইকোসিস্টেমে অন্য ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। কাজেই দেখা যায় জীববৈচিত্র্যের সাথে জিন, প্রজাতি ও ইকোসিস্টেম নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই জীববৈচিত্র্যকে সাধারণত তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়, যথা জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity), প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity or Taxonomic diversity) এবং ইকোসিস্টেমগত বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)। এই তিন প্রকার বৈচিত্র্য মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity। প্রাথমিকভাবে Biological Diversity নামে ১৯৮০ সালে দু'টি প্রবন্ধে বিষয়টি প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে Walter Rosen দু'টি শব্দকে মিলিয়ে Biodiversity হিসেবে প্রকাশ করেন।

সংরক্ষণ বা কনজারভেশন : কনজারভেশন (conservation) শব্দটি জীববৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করার নামই কনজারভেশন। বাংলায় সংরক্ষণ বলতে প্রিজারভেশনকেও বোঝায় কিন্তু প্রিজারভেশন ও কনজারভেশনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কনজারভেশন হলো মানুষ কর্তৃক জীবমণ্ডলের ব্যবহার সংক্রান্ত এমন ব্যবস্থাপনা যাতে করে জীবমণ্ডল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সুফল প্রদান করতে পারে এবং একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সব প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাও সমভাবে অক্ষুণ্ন থাকে। কাজেই কনজারভেশন বলতে বোঝায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সহনীয় মাত্রায় প্রয়োগ, পুনরুদ্ধার এবং ব্যবহার। বিষয়টিকে সহজভাবে বলা যায়, আমার বর্তমান প্রয়োজনে একটি বৃক্ষ কেটে কাঠ ব্যবহার করবো এবং একই সাথে আমার সন্তানগণও যেন ভবিষ্যতে তাদের প্রয়োজনে এক বা একাধিক বৃক্ষ কেটে কাঠ ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করে যাবো (অর্থাৎ একটি গাছ কাটলে, দু'টি গাছ লাগাবো)।

কনজারভেশনের দু'টি প্রধান উপায় হলো (i) ইন-সিটু কনজারভেশন এবং (ii) এক্স-সিটু কনজারভেশন।

(i) ইন-সিটু কনজারভেশন হলো জীববৈচিত্র্যের উপাদানকে তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে রেখেই সংরক্ষণ করা। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হলো ইন-সিটু পদ্ধতিতে কনজার্ভ করা। ন্যাশনাল পার্ক, ইকোপার্ক, সাফারি পার্ক, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, মৎস্য অভয়াশ্রম ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে ইন-সিটু কনজারভেশন করা হয়।

(ii) এক্স-সিটু কনজারভেশন হলো জীববৈচিত্র্যের উপাদানকে তাদের নিজস্ব বাসস্থানের বাইরে অন্য কোনো স্থানে সংরক্ষণ করা। বোটানিক গার্ডেন, সীড ব্যাংক, ফিল্ড জিন ব্যাংক, নিম্নতাপমাত্রায় ও তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো হলো এক্স-সিটু কনজারভেশন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রাণী কোনটি?

(ক) পাতিকাক (খ) ঘড়িয়াল (গ) মেনিমাছ (ঘ) ডোরা চিতা

২। জীব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন-

(i) অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন, ইকোপার্ক তৈরি

(ii) যুদ্ধ-বিগ্রহ, বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ, কলকারখানা তৈরি

(iii) DNA সংরক্ষণ, টিস্যু সংরক্ষণ, লিভিং জিন ব্যাংক তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশের সব জায়গার মাটি ও আবহাওয়া এক রকম নয়। তাই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ জন্মায়। কোনো কোনো উদ্ভিদ চিরহরিৎ আবার কোনো কোনোটি পত্রঝরা। শাল, চাপালিশ, নলখাগড়া, সুন্দরী, গেওয়া, বান্দরহোলা, গোলপাতা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশে জন্মে থাকে।

৩। উদ্দীপকের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য-

(i) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম

(ii) শ্বাসমূল উপস্থিত

(iii) লুকায়িত পত্ররন্ধ্র উপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের পত্রঝরা উদ্ভিদ কোন অঞ্চলে বেশি জন্মে থাকে?

(ক) গঙ্গানদীর বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল

(খ) ঢাকা-ময়মনসিংহ বনাঞ্চল

(গ) বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল

(ঘ) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা:

১।(খ)	২।(খ)	৩।(ক)	৪।(খ)